প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সারা ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায়
এম এ, বি এ. (অনার্স ও পাস) পরীক্ষার বিভিন্ন পত্রের
আলোচনা এক অভিনব পরিকল্পনায় লিখিত।

সাহিত্যের তীর্থপথে

[দ্বিতীয় পর্ব]

অধ্যাপক শ্রীবিনয় সরকার, এম এ, নাট্যবিশারদ

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
AGARTALA
46711
28 11-56

একমাত্র পরিবেশক
ফোন : ৩৫-২১০৩

প্রধান কার্যালয়
৬।১ বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা—৬

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র
এ/৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

মূল্য বারো টাকা মাত্র

প্রকাশক :
রূপায়ণ
৬/১ বি, মদন মিত্র লেন ; কলিকাতা (৬)

প্রথম সংস্করণ, নবেম্বর, ১৯৫৫

বি. এ. অনার্স বিকল্প বাংলা পরীক্ষার জন্য

১। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের রূপলেখা : মূল্য ১০·০০
—অধ্যাপক বিনয় সরকার, এম. এ., নাট্যবিশারদ
মহামহাচার্য শিবশংকর শাস্ত্রী বাচস্পতি
কাব্য-ব্যাকরণ-পাণিনিতীর্থ (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত)

বি. এ. (অনার্স ও পাস) ঐচ্ছিক বাংলা পরীক্ষার জন্য

অধ্যাপক বিনয় সরকার, এম. এ., নাট্যবিশারদ
বিরচিত/সম্পাদিত

২। সাহিত্যের তীর্থপথে [প্রথম পর্ব] : মূল্য ১৩·০০
৩। সাহিত্যের তীর্থপথে [দ্বিতীয় পর্ব]
(এম. এ.-র জন্যও বটে) : মূল্য ১২·০০
৪। সাহিত্যের তীর্থপথে [তৃতীয় পর্ব] : মূল্য ১০·০০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** দুঃস্থ পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব একত্রে মোট তেইশ টাকায় এবং প্রথম—দ্বিতীয়—তৃতীয় পর্ব একত্রে মোট বত্রিশ টাকায় একমাত্র পরিবেশকের নিকট হইতে পাইবেন।]

৫। C. U. Questions on B. A. Alternative & Elective Bengali for Honours Candidates : মূল্য
৬। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস [প্রশ্নোত্তরে] : মূল্য ৩·৭৫
৭। C. U. Questions on B. A. Alternative & Elective Bengali for Pass Candidates : মূল্য
৮। সোনার তরী-বোধিনী (২·৫০), ৯। আধুনিক সাহিত্য বোধিনী (২·০০) ; ১০। প্রাচীন সাহিত্য-বোধিনী (২·৫০) ; ১১। কাহিনী-বোধিনী (২·৫০) ; ১২। মানসী বোধিনী (২· ০) ; ১৩। কল্পনা-বোধিনী (২·৯০) ; ১৪। সংকলন-বোধিনী (৩·২৫) ; ১৫। বিসর্জন-বোধিনী (৩·২৫) ; ১৬। রাজা ও রানী-বোধিনী (৩·[illegible]) ; ১৭। বলাকা-বোধিনী
১৮। চন্দ্রশেখর ['চন্দ্রশেখর-পরিচিতি'-সহ]
১৯। কৃষ্ণকান্তের উইল ['কৃষ্ণকান্তের উইল-পরিচিতি'-সহ]
Nov. ২০। কপালকুণ্ডলা ['কপালকুণ্ডলা-পরিচিতি'-সহ]

মুদ্রাকর : শ্রী[illegible]রণীকান্ত ঘোষ
নিউ লক্ষ্মীশ্রী প্রেস, ১২, [illegible]বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণের পূর্বভাষ

গত বৎসর 'সাহিত্যের তীর্থপথে', প্রথম পর্বের প্রথম সংস্করণের পূর্বভাষে বলিয়াছিলাম যে, এই বইখানি মোট দুইটি পর্বে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে এবং মোট আটটি পত্রের মধ্যে কেবল ছয়টি পত্রের প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনা থাকিতেছে। আর 'সাহিত্যের তীর্থপথে', দ্বিতীয় পর্বটিরও প্রকাশিত হইবার কথা ছিল গত বৎসরের পূজাবকাশের পূর্বেই। কিন্তু উক্ত পরিকল্পনা পরিবর্তিত হওয়ায় ঐ দ্বিতীয় পর্বটিও প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে এই নবতন পরিকল্পনা দাঁড়াইয়াছে এইরূপ :

প্রথম পর্বে যে-সমস্ত পত্র ও পত্রান্তর্গত পুস্তকাদি প্রশ্নোত্তরাকারে আলোচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ঠিকই বজায় রহিল। আপাতত উহাদের আর কোন পরিবর্তন করা হইল না।

দ্বিতীয় পর্বে থাকিতেছে (১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; (২) বাংলা ভাষার ইতিহাস, (৩) প্রবন্ধ-রচনা; (৪) Unseen : Poetry, Prose & Drama প্রথম খণ্ড বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন ও মধ্যযুগ-অংশে একুশটি প্রশ্নোত্তর এবং আধুনিক যুগ-অংশে ষোলোটি প্রশ্নোত্তর সংযোজিত হইয়াছে। আমার মনে হয়, ইহাই যথেষ্ট। তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা ইচ্ছা করিলে আধুনিক যুগ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত জ্ঞান আহরণের জন্য মল্লিখিত প্রশ্নোত্তরে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বইখানি দেখিতে পারেন। অতঃপর দ্বিতীয় খণ্ড বাংলা ভাষার ইতিহাসে মোট একুশটি প্রশ্নোত্তর সংবিন্যস্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পরীক্ষার পক্ষে ইহাও যথেষ্ট। তবে যাঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আরও বিস্তৃত জ্ঞানলাভের জন্য আগ্রহী, তাঁহাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীও প্রদত্ত হইয়াছে। আবার গত বৎসরের পরিকল্পনার বহির্ভূত ছিল যে প্রবন্ধ-রচনাংশটি বর্তমান পরিকল্পনায় তাহাই তৃতীয় খণ্ডে বিশেষ যত্নসহকারে লিখিত ও সংকেতিত হইয়াছে। এই-প্রবন্ধ-রচনাংশের মোট চুয়াল্লিশটি রচনা অনুশীলন করিলে পরীক্ষা-ব্যাপারে আর কোন শঙ্কারই কারণ থাকিবে না, ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস। 'অধিকন্তু ন দোষায়' ভাবিয়াই তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে 'আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধরচনার সংকেত-সূত্রে' তেরোটি প্রবন্ধের কথা তুলিয়াছি। সর্বমোট এই চুয়াল্লিশটি প্রবন্ধের সহিত পরিচয় থাকিলে খুবই ভালো হইবে। পরিশেষে এই পর্বের শেষাংশে অর্থাৎ Unseen : Poetryতে আছে ভাবপরিস্ফুটন ও কাব্যোৎকর্ষ বিচার; Unseen : Prose-এ আছে ভাবপরিস্ফুটন, ভাবের মৌলিকতা ও প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আলোচনা এবং Unseen : Drama-তে আছে নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. বাংলা অনার্স পরীক্ষায় যে-সমস্ত Unseen আসিয়াছে, তাহাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় পর্বে প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে (১) কাব্যকবিতা [আধুনিক] বিভাগে মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য, বিহারীলালের সারদামঙ্গল,

রবীন্দ্রনাথের বলাকা পুনশ্চ ও সঞ্চয়িতা, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসঞ্চয়ন, মোহিতলালের বিস্মরণী, কুমুদরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতা ও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কাব্যমালঞ্চ ; (২) গদ্য [বিংশ শতাব্দী] বিভাগে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসংগ্রহ (১ম খণ্ড), শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা ও গৃহদাহ, তারাশংকরের ধাত্রীদেবতা ও রাধা গ্রন্থাবলী। আবার সমালোচনা-তত্ত্ব (Principles of Criticism) সম্বন্ধেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর-মূলক রচনাও থাকিবে। ইহা ছাড়া বিশেষ পত্রের পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে মধুসূদন—বঙ্কিমচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-সমালোচনামূলক পুস্তকাদির একটি গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশকীয় তালিকা সংযুক্ত হইবে। 'সাহিত্যের তীর্থপথে'র এই তৃতীয় পর্বটি আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

অবশ্য ঐ বিশেষ পত্রের জন্য বাংলা সাহিত্যের যে চারজন দিকপালের সাহিত্য-সাধনার পরিচয় জানিবার নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে যথাযোগ্য পুস্তক রচনা করিবার সংকল্পও আমার আছে। যথাসময়ে আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

'সাহিত্যের তীর্থপথে'র দ্বিতীয় পর্বের পরিকল্পনাটি সত্যই অভিনব। কারণ এই পর্বটি এমনভাবে লিখিত হইয়াছে যে, নিখিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানেই বাংলায় এম. এ., ঐচ্ছিক বাংলায় বি. এ. (অনার্স ও পাস) পঠন-পাঠন-পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানেই এই বইখানি ছাত্রছাত্রীদের অনিবার্য প্রয়োজনে লাগিবে। তাই ইহা অধ্যয়নে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীবৃন্দ আশাতীত উপকৃত হইলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব। অলমিতিবিস্তরেণ।

সিটি কলেজ
১৮৮/১, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রাচীন ও মধ্যযুগ

আধুনিক যুগ

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলা ভাষার ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

প্রবন্ধরচনা

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ খণ্ড

Unseen : Poetry

Unseen : Prose

Unseen : Drama

সাহিত্যের তীর্থপথে

দ্বিতীয় পর্ব

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রাচীন ও মধ্যযুগ

প্রশ্ন ১। অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান লক্ষণের পরিচয় দাও। ইহাকে কতগুলি পর্বে বিভক্ত করা যায়? বিভিন্ন পর্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য কর।

উত্তর: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিবার পক্ষপাতী। বাংলা সাহিত্যের মুখ্য গবেষকগণ প্রায় সকলেই এই প্রধান বিভাগটি মানিয়া লইয়াছেন। ইংরেজ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত পুরাতন যুগ বা অনাধুনিক কাল। ইংরেজ বিজয়ের পরবর্তী কাল হইল আধুনিক যুগ। পুরাতন যুগের মধ্যে তুর্কিবিজয়ের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় পর্বের সাহিত্যকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহারা মূলতঃ একই যুগের সাহিত্য। মুসলিম বিজয়ের পরে বাংলার জীবনযাত্রায় গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। সাহিত্যও নূতন পথে বাঁক ফিরিল। কিন্তু এই পরিবর্তনের পরিমাণ বিপ্লবাত্মক নয়। মূল জীবনদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসিল, পুরাতন মূল্যবোধ একেবারে বিসর্জিত হইল—একথা বলা চলে না। তুলনামূলক ভাবে ইংরেজ আগমনের প্রভাবে আমাদের জীবনযাত্রা ও ভাবধারায় আমূল পরিবর্তন সূচিত হইল। ইংরেজ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য পুরাতন যুগ হইতে একেবারে পৃথক। কাজেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে আধুনিক এবং অনাধুনিক এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করা খুবই যুক্তিসংগত।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যকে সাধারণতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। প্রাচীন বলিতে তুর্কি-বিজয়পূর্ববর্তী কালের এবং মধ্যযুগের বলিতে মুসলিম শাসনকালের বাংলা সাহিত্য বুঝাইতেছে। এই পর্বের বাংলা সাহিত্যের মূল লক্ষণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতে পারে:

প্রথমতঃ, পুরাতন বাংলা সাহিত্যে এমন কোনো নিদর্শন মিলিতেছে না যাহার সঙ্গে ধর্মের যোগ নাই। সেকালের প্রতিটি সাহিত্যকর্ম প্রত্যক্ষভাবে ধর্মসম্পৃক্ত। ধর্মের দিক হইতে বিচার করিলে সেকালের বাংলা সাহিত্যকে কয়েকটি ধারায় ভাগ করা চলে। সহজিয়া তান্ত্রিক ধর্মসাধনার সঙ্গে যুক্ত একটি ধারা—মুসলিমপূর্ব যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগপর্যন্ত—বৌদ্ধ সহজিয়া গান, সুফীদের মুর্শিদগান, বাউল-সংগীত, বৈষ্ণব সহজিয়াদের পদ, শাক্ত তান্ত্রিকদের লেখা পদাবলীর মধ্য দিয়া বহমান। মঙ্গলকাব্যের ধারাটির সহিত

লৌকিক ধর্মবিশ্বাস জড়িত। বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে সাধারণভাবে পৌরাণিক-লৌকিক মিশ্র দেবভাবনা জড়িত ছিল। চৈতন্যপরবর্তী কালে উহা বিশিষ্ট ধর্মদর্শন অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের বাহন হইয়া উঠিল। এমন কি, রামায়ণ মহাভারতের যে কাহিনী ছিল মূলতঃ মানবরসপুষ্ট, তাহাই বাংলা অনুবাদের মধ্য দিয়া হইয়া দাঁড়াইল দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক ধর্মকাব্য।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মসম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও সেকালের বাংলা সাহিত্য কোনোকালেই মানবমূল্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তখন বাংলাদেশের সমাজজীবনে ধর্ম এবং মানববিশ্বাস একই সূত্রে আবদ্ধ ছিল। দেবতাকে অস্বীকার করিয়া মনুষ্যমূল্য ঘোষণা করিতে হয় নাই। সে ধর্মই ছিল মানবভাবভাবনার সহিত জড়িত। মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীরা মানুষের সমাজ ও পরিবারজীবনের অতি বাস্তব প্রয়োজন নির্বাহ করিতেন। বৈষ্ণব ধর্মদর্শন মানবিক প্রেমপ্রীতিকেই ধর্মবোধের স্তরে উন্নীত করিল। মরমিয়া-সহজিয়া সাধনার মধ্যেও মানবদেহকে স্বীকার করিবার কথাই আছে।

তৃতীয়তঃ, পুরাতন বাংলা সাহিত্যের সমগ্র আয়োজনই কবিতার। গদ্যে লেখা কোনো কিছুর সাক্ষাৎই আমরা পাই না। এমন কি, জীবনী রচনা করিতে গিয়াও সেকালীন বাঙালী কবিরা কবিতার ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙালীর জাতীয় স্বভাবের অতিরিক্ত গীতিপ্রবণতা ইহার অন্যতম কারণ। অপর কারণ বাংলা পয়ার ছন্দের শোষণক্ষমতা ও প্রকাশক্ষমতা।

চতুর্থতঃ, সেকালের বাংলা সাহিত্য আদ্যন্ত পুনরুক্তিতে ভরা। একই ধরনের কাহিনী বহুসংখ্যক কবি পর পর কাব্যাকারে লিখিয়া গিয়াছেন। শুধু কাহিনীগত ঐক্যই নয়, রূপরীতির সাদৃশ্য এবং বর্ণনাভঙ্গীর ঐক্যও অত্যন্ত সুলভ।

সেকালের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা চারিটি। ইহার মধ্যে আবার কিছু কিছু উপধারারও সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা প্রধান ধারাকয়টি এবং উহাদের অন্তর্ভুক্ত মুখ্য উপধারাগুলির উল্লেখ করিতেছি। বহুসংখ্যক কবি ইহার প্রত্যেকটি উপধারায় কাব্য লিখিয়াছেন। পুনরুক্তির পরিমাণ যে কত বেশী এই ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে: (১) **সাধনসংগীতের ধারা**। এই ধারার অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলি হইল—(ক) বৌদ্ধ সহজিয়া গান, (খ) বৈষ্ণব সহজিয়া গান, (গ) বাউল-সূফী সংগীত ও (ঘ) শাক্ত কবিতাবলী। এই সব রচনা গীতিধর্মী। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষতঃ সাধনভজনের কথাই স্থান পাইয়াছে। মানবজীবনের চিত্র বা ভাবাবেগ এই কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষ নাই। (২) **বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা**। এই ধারার অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলি হইল—(ক) বৈষ্ণব পদাবলী, (খ) বৈষ্ণব

চরিতগ্রন্থ (বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ)। চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কালে শুরু হইলেও চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের মধ্যেই এই ধারার বিকাশ। (৩) **মঙ্গলকাব্য**। এই ধারার মধ্যে পড়ে—প্রধানতঃ (ক) মনসামঙ্গল, (খ) চণ্ডীমঙ্গল, (গ) ধর্মমঙ্গল, (ঘ) শিবায়ন ও (ঙ) অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গল। এইগুলি সবই আখ্যানরীতির রচনা। গল্পকথন ও চরিত্রায়ণ ইহাদের মূল লক্ষ্য। (৪) **অনুবাদসাহিত্য**। এই ধারার মধ্যে আছে—(ক) রামায়ণ, (খ) মহাভারত, (গ) ভাগবত-পুরাণের অনুবাদ। এইগুলি প্রধানতঃ সংস্কৃত মূল গ্রন্থের অনুবাদ, তবে পরিবর্ধন পরিবর্জন ও পরিবর্তনের পরিমাণ সুপ্রচুর। (৫) **বিবিধ**। পূর্বোক্ত ধারাগুলিতেই কাব্য এবং কবির সংখ্যা সুপ্রচুর। ইহা ছাড়া আরও যে সব কাব্য সেকালে রচিত হইয়াছে তাহা হইল—(ক) নাথ সাহিত্য, (খ) মুসলমানী কাহিনী-কাব্য ও (গ) নানা ধরনের লোক-সাহিত্য।

দীর্ঘ আটশত বৎসরের ইতিহাস এই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের। এই কালে রচিত সাহিত্যের মধ্যে যে সব মুখ্য সাধারণ লক্ষণ দেখা যায় তাহার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই আটশত বৎসর ধরিয়া তাহাদের মধ্যে রূপলক্ষণগত কিছু কিছু পার্থক্যও দেখা গিয়াছিল। এই সব পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেকালের বাংলা সাহিত্যকে আমরা কতকগুলি পর্বে বা স্তরে ভাগ করিতে পারি। সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া যাঁহারা চর্চা করিয়াছেন তাঁহাদের মতে চারিটি স্তরে অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যকে ভাগ করিয়া পাঠ করা চলে: (১) তুর্কিবিজয়ের পূর্ববর্তী কাল। এই সময়ে চর্যাপদ রচিত হয়। বাঙালীর অপরাপর সাহিত্য-সাধনা সংস্কৃত এবং অপভ্রংশ ভাষার মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহাকে বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্ব বলাই সংগত। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এই পর্বের নাম দিতে চাহিয়াছিলেন "হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ"। তিনি যে সব নিদর্শনের উপরে ভিত্তি করিয়া এই নামকরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, পরবর্তী গবেষণায় তাহা সেকালের রচনা নয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তবে এই পর্বের সাহিত্য-ভাবনায় হিন্দু এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির যুগপৎ ছায়াপাত ঘটিয়াছে। (২) চৈতন্যপূর্ব পর্ব। এই সময়ে মুসলমান আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া উঠিয়া হিন্দুসমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইতে চাহিয়াছিল। তুর্কিবিজয়ের পরে প্রথম দু'শ বছরের কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন মেলে না। তাহার পরে অনুবাদকাব্য, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারার আবির্ভাব ঘটিল। বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগে যে নানামুখী বিকাশ লাভ করিল তাহার চিহ্ন এই পর্বেই দেখা গেল। (৩) চৈতন্যযুগ। চৈতন্যদেবের

আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়া বাংলা দেশে নবীন প্রেমধর্মের বন্যা বহিয়া গেল। উহার বিচিত্র প্রভাব বাংলা সাহিত্যের সর্ব শাখায় বর্ষিত হইল। একদিকে যেমন বৈষ্ণবসাহিত্য বিস্তৃতি ও পুষ্টিলাভ করিল, তেমনি অপরাপর সাহিত্যের মধ্যেও নব্যরস সঞ্চারিত করিল। (৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসমাপ্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতেই বাংলা সাহিত্যে প্রাণহীনতা এবং নীতিহীনতা চরমে উঠিল। প্রসাধনকলার আড়ম্বর অন্তরসৌন্দর্যকে আচ্ছন্ন করিল।

ইহার পর ইংরেজদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হইল।

প্রশ্ন ২। 'তুর্কিবিজয়-পূর্বকালীন বাঙালীদের রচিত সংস্কৃতাদি ভাষায় সাহিত্যও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য।' —এই মন্তব্যের তাৎপর্য কি? উক্ত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সহিত ইহার সম্পর্ক নির্ণয় কর।

উত্তর ঃ বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ ঘটে তুর্কিবিজয়ের পূর্ববর্তী কালে। নেপাল হইতে প্রাপ্ত "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়" গ্রন্থটিকে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলি খ্রীষ্টীয় ৮ম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বলিয়া অনেকেই মনে করেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হইল, ইহার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় লেখা অপর কোনো রচনারই সন্ধান মিলিতেছে না। কিন্তু এই সময়ে বাংলা দেশে বাঙালী লেখকেরা অন্যান্য ভাষায় অনেক কিছুই লিখিয়াছেন। সাধারণভাবে দেখিলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত উহার কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলাইয়া দেখিলে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্বের ইতিহাস উহাদের বাদ দিয়া অসম্পূর্ণ।

হিন্দু আমলের বাংলাদেশের সংস্কৃতি দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইত। এই ধারা দুইটি পাশাপাশি চলিলেও ইহাদের মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠ মিলনসূত্র রচিত হয় নাই। ইহার একটি ব্রাহ্মণ্য-স্মার্ত-পৌরাণিক ধারা, অপরটি অব্রাহ্মণ্য-অস্মার্ত-অপৌরাণিক সংস্কৃতির ধারা। প্রথমটি অভিজাতশ্রেণীর দ্বারা পোষিত, দ্বিতীয় ধারাটি লৌকিক। ইহা অনভিজাত শ্রেণীর ভাব-ভাবনা ও কল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তুর্কিবিজয়ের পরবর্তী কালে বাঙালীর সংস্কৃতির এই দুই ধারার যেমন মিলন লক্ষ্য করি, পূর্বে সেইরূপ ছিল না।

এই সময়ে অপভ্রংশ ভাষার খোলস ছাড়াইয়া বাংলাভাষা নিজস্ব রূপ গ্রহণ করিতেছিল। আপামর জনসাধারণের ব্যবহারের ভাষা হিসাবেই উহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। কিন্তু অভিজাত সমাজে, শিক্ষানিকেতনে, পূজা-অর্চনায়, রাজকীয়

কর্মাদি পরিচালনার জন্য সংস্কৃত ভাষাই বহুল ব্যবহৃত হইত। অভিজাত এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-আশ্রিত বাঙালীরা স্বাধীনভাবে কিছু লিখিতে গেলেই সংস্কৃত ভাষায় তাহা লিখিতেন। রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করিত সংস্কৃতভাষায় লেখা এই সব গ্রন্থই।

ইহা ছাড়া অপভ্রংশ-অবহট্ট ভাষারও কিছু প্রচলন ছিল। ইহা পূর্বভারতের অঞ্চলগুলিতে সর্বসাধারণের বোধগম্য এবং ব্যবহারযোগ্য একটি সাধারণ ভাষা (lingua franca) হিসাবে প্রচলিত ছিল। এই ভাষায়ও কিছু কিছু সাহিত্য রচিত হইয়াছে।

একটি ভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে, ঐ ভাষার বাহিরে যাইবার রীতি নাই। কিন্তু তুর্কিপূর্ব যুগের বাঙালীকে সমগ্রত: চিনিতে হইলে তাহার রচিত বাংলা এবং সংস্কৃতাদি অপরাপর ভাষার রচনাবলীর সহিত পরিচিত হইতে হইবে। সমকালীন বাঙালীর ভাবভাবনা এবং অনুভূতি দুই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। বাংলা এবং সংস্কৃতাদি অপর ভাষায় বাঙালী-রচিত সাহিত্যসম্পদ বিচার করিলে বুঝা যাইবে, সেকালের বাঙালীর মন কোন্ ভাবে আন্দোলিত হইত। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সহিত এই পর্বের অপর ভাষায় রচিত সাহিত্যের সম্পর্কটি দৃষ্টি এড়াইবে না।

সংস্কৃত সাহিত্য : বাঙালী-রচিত সেকালীন সংস্কৃত সাহিত্যকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—(১) প্রস্তর, তাম্রপত্র, মন্দিরগাত্র প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ রাজকীয় শাসন বা নির্দেশ বা দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক শ্লোকসমূহ। (২) কাব্য। (৩) প্রকীর্ণ কবিতা। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই সব সংস্কৃত রচনার পরিমাণ বড় কম নয়। বহুসংখ্যক লেখক এই সকল কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বাংলা দেশে সংস্কৃতই তখন ছিল সভাশোভন ভাষা।

(১) **প্রস্তর ও তাম্রোৎকীর্ণ শ্লোকসমূহ**—এই সব শ্লোকের বেশীর ভাগই প্রয়োজনের তাগিদে লেখা। কোনরূপ তথ্য পরিবেশনেই ইঁহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এমন শ্লোকের সংখ্যাও কম নয় যাহারা ভাষা-সৌকর্যে এবং বর্ণন-ভঙ্গীতে প্রয়োজন ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এই সব শ্লোক-রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই যে খাঁটি কবি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। উদাহরণ হিসাবে ভাস্করবর্মার প্রশংসা-বাচক নিধনপুর অনুশাসনটির নাম করা চলে। ভাস্করবর্মার সভাকবি গদ্যে অলংকার-বহুল পদ রচনায় বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। দেবপালদেব এবং নারায়ণ পালদেবের প্রশস্তিবাচক শ্লোকগুলিতে বুদ্ধের মহিমাকীর্তন কবিত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নারায়ণ পালের মন্ত্রী ভট্টগুরব-মিশ্রের প্রশস্তি করিয়া ২৮ শ্লোকে একটি ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য লেখা হইয়াছিল। কতকগুলি শ্লোকে কৃষ্ণের ব্রজলীলার সুন্দর বর্ণনা স্থান পাইয়াছে।

এই সব রচনার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি বাচস্পতি প্রণীত মন্ত্রী ভবদেবের ত্রয়স্ত্রিংশৎ শ্লোকাত্মক প্রশস্তিকাব্য।

সেন রাজাদের বন্দনাসূচক শ্লোকগুলিতে হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর রূপ ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। এই কালে রচিত প্রশস্তিকাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল দেওপাড়া শিবমন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ বিজয়সেনদেবের প্রশস্তি। কাব্যটি ষট্‌ত্রিংশৎ শ্লোকাত্মক। বিখ্যাত কবি উমাপতি ধর ইঁহার রচয়িতা।

(২) **কাব্য**—পাল রাজত্বকালে লেখা সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে দুইখানি রামায়ণ পাওয়া যাইতেছে। অভিনন্দের লেখা "রামচরিত" ছত্রিশ সর্গে খণ্ডিত। বোধ হয় কবি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাংলা দেশে লেখা ইহা প্রাচীনতম রামায়ণ, এবং আশ্চর্যের ব্যাপার ইহার মধ্যেও দেবীমাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, অবশ্য হনুমানের মুখে। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" গ্রন্থটি খুবই দুরূহ। ইহা আর্যাছন্দে রচিত এবং আদ্যন্ত দ্ব্যর্থক। ইহার এক অর্থে পাওয়া যায় রামায়ণ-কাহিনী, অপর অর্থে পর পর রামপালদেব, দ্বিতীয় গোপালদেব এবং মদনপালদেবের কাহিনী।

সেন আমলের কবিদের লেখা বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ্মণসেনের পাঁচজন সভাকবির নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সকলেই খণ্ড খণ্ড কবিতা রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। অনেকে সুন্দর গীতি-কবিতাও লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের কাহারও কাহারও পূর্ণাঙ্গ কাব্যও পাওয়া যাইতেছে। জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাত্মক আখ্যানকাব্য। কিন্তু আখ্যানরসের সহিত গীতিরস এখানে যুক্ত হইয়াছে। "গীতগোবিন্দ" আখ্যানের সূত্রে গাঁথা গানের মালা। জয়দেব প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। কালিদাসের পরবর্তী কালে এত বড় শক্তিধর কবি সংস্কৃত সাহিত্যে আর দেখা যায় নাই। জয়দেব বাংলাদেশে প্রচলিত লৌকিক যাত্রাগানের রূপটিকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার কাব্যটিকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। জয়দেবের এই কাব্যটির খ্যাতি এবং প্রভাব সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের উপর ইহার গুরুতর প্রভাব কার্যকর হইয়াছিল। [জয়দেব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ২নং প্রশ্নোত্তরে দ্রষ্টব্য।] কবি হিসাবে জয়দেবের বিশেষ কৃতিত্ব হইল পদলালিত্য সৃষ্টি করায়। তাঁহার কবিতা সংগীতের ন্যায় অপরূপ মাধুর্য সৃষ্টি করিয়া হাজার বৎসর ধরিয়া বাঙালীকে মোহমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

জয়দেব ছাড়া লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ী "পবনদূত" নামে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। উমাপতিধর রচিত বিজয়সেনদেবের প্রশস্তি-কাব্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আচার্য গোবর্ধন "আর্যাসপ্তশতী" নামে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া পাল ও সেন রাজত্বকালে বাংলাদেশে বেশ কিছু সংখ্যক সংস্কৃত নাটক রচিত হইয়াছিল।

(৩) **প্রকীর্ণ কবিতা**—পূর্ণদেহ কাব্য অপেক্ষা ছোট ছোট সরস কবিতার প্রতিই সমকালীন বাঙালীর সবিশেষ আকর্ষণ ছিল। এইরূপ চূর্ণ কবিতা বাঙালী কবিরা বহুসংখ্যক রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা দেশে সেকালে সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার দুইটি উল্লেখযোগ্য সংকলনও গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাদের সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করিয়াছেন, "সেকালের বাঙালী কবি বড় বড় কাব্য অপেক্ষা ছোট ছোট কবিতা বা খুচরা শ্লোক রচনায় বেশি তৎপর ছিলেন এবং তাহাতেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন সমধিক। ইহার কারণও আছে। তখন মহাকাব্যের দিন অনেককাল চলিয়া গিয়াছে। জনসাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য ছিল প্রাকৃত কবিতা এবং অপভ্রংশ ছড়া ও পদ। সংস্কৃত রচনার সুদীর্ঘ কাঠিন্যের সহিত যুঝিবার মত রসহীন পাণ্ডিত্য ও নিরঙ্কুশ ধৈর্য কম লোকেরই ছিল। সাহিত্যে বাংলাদেশের এই প্রগতিপরায়ণতা একাদশ-দ্বাদশ শতকের পূর্বেই প্রকট হইয়াছিল ছোট ছোট কবিতায় ও প্রকীর্ণ শ্লোকে। শ্লোকগুলির মধ্যে আমরা শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের গতানুগতিকতাই পাই না, বাংলাদেশের বহিঃপ্রকৃতির বিশেষ রূপটির এবং বাঙালীর মানসপ্রকৃতির বিশেষ ছাঁদটির আভাসও অনেকগুলি শ্লোকে ফুটিয়াছে। প্রকৃত কবিদৃষ্টির অভাবও নাই অনেক কবিতায়।"

প্রথম সংকলনগ্রন্থটির নাম "কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়"। ইহার সব রচনা এবং সংকলন দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী। ভারতবর্ষে সংস্কৃত শ্লোকের ইহাই প্রথম সংকলনগ্রন্থ। ইহার মধ্যে অবাঙালী কবির রচনাও আছে, কিন্তু বাঙালী কবির কবিতাসংখ্যা সুপ্রচুর। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাবিষয়ক বহু কবিতা এই সংকলনগ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় সংকলনগ্রন্থটি "সদুক্তিকর্ণামৃত"। সংকলন করিয়াছিলেন শ্রীধর দাস। সংকলনকাল দ্বাদশ শতকের শেষভাগ এবং ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভকাল। ইহা প্রথমটি অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড়। গ্রন্থটি অত্যন্ত সুসম্পাদিত। ইহার মধ্যেও সর্বভারতীয় কবিদের রচনার সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক বাঙালী কবির কবিতা স্থান পাইয়াছে। বাংলাদেশের সমকালীন জীবনযাত্রার ছবি অনেকগুলি শ্লোকে সুন্দর ধরা পড়িয়াছে।

গৌড়ী রীতি—প্রাচীন বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা প্রসঙ্গে গৌড়ী রীতির উল্লেখ অবশ্য কর্তব্য। সমকালীন সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থে গৌড়ী রীতি সম্বন্ধে বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ; শব্দপ্রাচুর্য ও ঝংকারপ্রাচুর্য দ্বারা মণ্ডিত এবং অলংকৃত একটি রীতি। আসল কথা হইল অত

পুরাতন সময়েও বাঙালী নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে একটি নিজস্ব রচনাভঙ্গি আবিষ্কার করিয়া।

অপভ্রংশ-অবহট্ট ভাষার কবিতা ঃ বাংলা বৌদ্ধসহজিয়া পদগুলির পাশাপাশি একই ভাবপরিমণ্ডলে গড়িয়া উঠিয়াছে অপভ্রংশ-অবহট্ট ভাষার কিছু সাহিত্য। উত্তরপূর্ব ভারতের বিস্তৃততর অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে 'আপনাদের ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের বাসনায় কোনো কোনো চর্যারচয়িতা অপভ্রংশ-অবহট্ট ভাষায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই ধারার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা সরহ এবং কাহ্ন-পাদের দোঁহাকোষ। ইঁহারা দুইজনেই চর্যাপদের রচয়িতা। ভাব এবং রচনারীতিতে চর্যা এবং দোঁহাগুলির মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায়। ভাষাই শুধু পৃথক।

অপভ্রংশ ভাষায় রচিত আর একটি সংকলনগ্রন্থ "প্রাকৃতপৈঙ্গল" চতুর্দশ শতকে রচিত। ইহার মধ্যেও অনেক বাঙালী কবির রচনা স্থান পাইয়াছে। সংকলনগ্রন্থের বহু কবিতা কাব্য-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ—বিরহিণী নারীর আর্তি, বর্ষাপ্রকৃতির পটভূমি, মল্লভূমির রাজাদের যুদ্ধযাত্রা অতি সংক্ষিপ্ত চিত্রের আকারে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে কতকগুলি রচনায়।

পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সহিত সম্পর্ক ঃ তুর্কিপূর্ব বাংলা দেশে অপর ভাষায় রচিত পূর্বোক্ত কাব্যকবিতাগুলি বাংলা কবিতার স্বাভাবিক ধারা হইতে বিচ্যুত নয়। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সহিত ইহাদের সুরের নানারূপ ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। প্রথমেই আসে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র বিষয়বস্তুর কথা। বৈষ্ণব সাহিত্যের পূর্বসূত্রটি এইসব সংস্কৃত-অপভ্রংশ কাব্যকবিতার মধ্যে অবশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। "সদুক্তিকর্ণামৃত" এবং "কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে" উদ্ধৃত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলামূলক বহুসংখ্যক কবিতা আছে। রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ ছাড়াও নরনারীর প্রেমকবিতা আছে অনেকগুলি। "প্রাকৃতপৈঙ্গলে"ও প্রকৃতি এবং প্রেম বিষয়ে লেখা কবিতা আছে কয়েকটি। ইহাদের সহিত ভাবে রসে রূপে বৈষ্ণব পদাবলীর গভীর সম্পর্ক আছে। বিশেষ করিয়া জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" কাব্যটিতে বাংলা বৈষ্ণব কবিতার আদিসূত্র মিলিতেছে। তাহা ছাড়া চর্যাপদ এবং দোঁহাগুলিতে যে কাব্যরীতির আবির্ভাব হইল উহাই পরবর্তী কালে বাউলগান, দেহকড়চা, শাক্তসংগীত, বৈষ্ণব সহজিয়া পদের মধ্য দিয়া একটি বিপুল সংগীতধারার জন্ম দিয়াছে।

প্রত্যক্ষভাবে এই দুইটি সাহিত্যধারার সহিত হিন্দুযুগের অপর ভাষার সাহিত্যের সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায়। পরোক্ষভাবে আরও কিছু সম্বন্ধ রহিয়াছে। বাঙালী যে রামায়ণ কাহিনীর প্রতি আসক্তি অনুভব করিত, কৃত্তিবাসের বহু পূর্বে রচিত

সংস্কৃত রামায়ণ কাব্যদুইটি তাহার প্রমাণ দিতেছে। বাংলাদেশের সমকালীন সমাজ-জীবনের বাস্তব ছবি ধরিয়া রাখিয়াছে প্রকীর্ণ কবিতাগুলি। পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি এই কাজই অনেক বিস্তারিতভাবে করিয়াছে। অপভ্রংশ যুদ্ধবর্ণনায় ধর্মমঙ্গল কাব্যের পূর্বরেশ যেন মিলিতেছে। শিবের গৃহস্থালী প্রসঙ্গে মনোরম মানবিক চিত্রগুলিও পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের পূর্বসূত্ররূপে গৃহীতব্য।

সবচেয়ে বড় কথা হইল—বাংলা মিল পদরচনা রীতিটি জয়দেব-দোঁহাকোষ-চর্যাপদ মিলিয়া এই যুগেই সুনির্দিষ্টভাবে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল।

প্রশ্ন ৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জয়দেবের কোনো স্থান নির্দেশ চলে কিনা বুঝাইয়া দাও। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্কের পরিমাণ নির্ণয় কর।

উত্তর ঃ জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় "গীতগোবিন্দ" নামে যে কাব্যটি লিখিয়াছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার স্থাননির্ণয় একটি সমস্যাবিশেষ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলা ভাষায় লেখা সাহিত্যের কথাই মাত্র বলা হইবে, আপাতদৃষ্টিতে ইহাই আমরা প্রত্যাশা করিয়া থাকি। জয়দেবের কাব্যটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। উহাকে কোন্ যুক্তিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করা যায়? জয়দেব বাঙালী কবি, বাংলা দেশে বসিয়াই তিনি কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যের ভাষাটি স্বতন্ত্র।

জয়দেব যে কালে কাব্যরচনা করিয়াছিলেন তখন বাংলা ভাষা নিজস্ব রূপ পাইয়াছে। জনসাধারণের ব্যবহারে উহা প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। এমন কি, বৌদ্ধ সহজিয়াদের গানেও এই নবজাত ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তবুও মনে রাখিতে হইবে, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবন তখনও পর্যন্ত দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইত। তখনও এই দুই ধারা মিলিয়া একটি ধারা হইয়া ওঠে নাই। একটি তো ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারা। উহা অভিজাত সমাজের পরিপোষিত, রাজসভার আনুকূল্য উহারাই লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত উহাদের ভাবানুভূতি এবং চিন্তাশিক্ষার বাহন। অপর ধারাটি হইল অব্রাহ্মণ্য লৌকিক সংস্কৃতি-আশ্রিত, জনসাধারণই ইহার অবলম্বন। নবজাত বাংলাভাষায় ইহাদের ভাবভাবনা প্রকাশিত। এই পর্বে প্রাপ্ত একমাত্র বাংলাভাষার রচনা চর্যাপদে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। চর্যাপদের পাশাপাশি সংস্কৃতাদি ভাষায় যে সাহিত্য বাঙালী লেখকেরা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যেও বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির অনেকখানি পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। বাঙালীর ভাবভাবনা অনেকখানি প্রতিফলিত হইয়াছে সংস্কৃতাদি ভাষায় লেখা কাব্য-কবিতার মধ্যে।

মুসলিম-পূর্ব যুগের সাহিত্যের সঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক যোগসূত্র খুঁজিতে গেলে চর্যাপদের সহিত সমকালে রচিত সংস্কৃত এবং অবহট্ট ভাষার সাহিত্যের প্রসঙ্গও তুলিতে হইবে। বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় লেখা সাহিত্যের মধ্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দের সহিতই পরবর্তী সাহিত্যের যোগাযোগ সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। জয়দেবকে বাদ দিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়া তাই সম্ভব নয়।

জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় কাব্যটি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কাব্যটির ভাব রস ও রচনারীতিগত এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহাতে বাঙালীর জাতীয় জীবনের সহিত এবং চারিত্রিক প্রবণতার সহিত ইহাকে সহজে সম্পর্কিত করিয়াছে। জয়দেবের কালে ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের আখ্যানকাব্যধারাটি প্রাণহীন নীরস হইয়া পড়িয়াছিল। জয়দেব তাই পুরাতন রীতির আখ্যানকাব্য লিখিলেন না। উহাকে একেবারে ঢালিয়া সাজিলেন। তিনি বাঙালীর স্বভাবপ্রবণতার অনুগামী করিয়া অতিরিক্ত গীতিধর্ম সঞ্চারিত করিয়া আখ্যানকাব্যের চরিত্রই বদলাইয়া দিলেন। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যটির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা একটি শিথিলবদ্ধ কাহিনীর রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কাব্যটি প্রায় সম্পূর্ণই কথোপকথনে গ্রথিত। সংলাপগুলি পৃথকভাবে দেখিলে এক একটি স্বতন্ত্র পদসংগীত বা গানরূপে বিবেচিত হইতে পারে। আসলে কবি এখানে তৎকালে প্রচলিত বাংলা যাত্রাপালার রূপরীতিটির অনুসরণ করিয়াছেন। তখনকার যাত্রাগানে সাধারণতঃ তিনটি চরিত্র থাকিত। কৃষ্ণযাত্রায় রাধা, কৃষ্ণ এবং একজন দূতী থাকিত। ইহারা উত্তর-প্রত্যুত্তরে যে নাট্যপালার অভিনয় করিত তাহা সম্পূর্ণতঃ গীতিরসপুষ্ট। গানে গানেই তাহাদের সংলাপ চলিত। উহার মাধ্যমেই ঘটনা অগ্রসর হইত এবং চরিত্র সৃষ্ট হইত। এই গানগুলি স্বতন্ত্র আকারে যেমন গীতিরসের আকর, তেমনি পরস্পর গ্রথিত হইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ গ্রহণ করিত। জয়দেব বাংলা যাত্রাপালার আঙ্গিকটি গ্রহণ করিয়া মৃতপ্রায় কাহিনীকাব্যের ধারাটিকে আবার নূতন করিয়া আস্বাদ্য করিয়া তুলিলেন। ইহার পুরাতন জীর্ণরূপ যাত্রাপালার নাটকীয়তা সহযোগে অভিনবত্ব লাভ করিল।

জয়দেব স্বভাবতঃ গীতপ্রাণ কবি। বাংলার মাটিতে চিরকালই গীতিরস প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে, ইন্দ্রিয়ালু কল্পনায়, পেলবকোমল চরিত্র-চিত্রণে, ললিত ছন্দঝংকারে, আদ্যন্ত মাধুর্যের অতিবিস্তারে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যটি সত্যই "গীতি"।

এই কাব্যের প্রারম্ভে কবি বলিয়াছেন, হরিস্মরণ এবং বিলাসকলাকুতূহল দ্বিবিধ বাসনাই এই কাব্যপাঠে নিবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ এ কাব্যে ভক্তিরস ও আদিরসের সুন্দর মিশ্রণ ঘটিয়াছে। কিন্তু যে কোনো সতর্ক কাব্যরসিক পাঠকই ইহার মধ্যে ভক্তিরসের কিছুই পাইবেন না। ইহা পরিপূর্ণভাবে আদিরসের আকর।

জয়দেবের কাব্যের এই মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিলেই পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সহিত ইহার যোগসূত্র আবিষ্কার করা সহজসাধ্য হইবে। জয়দেব বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাটির প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পূর্বেই যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা সম্পর্কে গান রচিত হয় নাই এমন নয়। কিন্তু জয়দেব রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য লিখিলেন। পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতার যে ধারাটি প্রবল হইয়া ওঠে তাহা প্রত্যক্ষতঃ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' প্রভাবপুষ্ট। 'গীতগোবিন্দ' আসলে অনেকগুলি পদের সংকলন। কাহিনীর গ্রন্থিটি বেশ শিথিল। বিচ্ছিন্ন গানগুলি ভাব রূপ ও রসের বিচারে পদাবলীর পুরোধা। পদ বস্তুটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে পৃথক। শ্লোক দুই-চারি পংক্তিতে সমাপ্ত। ইহা অনেকটা চিত্রধর্মী। বাংলা কবিতার আদিরূপ হইল বহুচরণযুক্ত পদ। বহুচরণযুক্ত হওয়ায় উহা চিত্রময় না হইয়া সংগীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে। এই আঙ্গিকটি চর্যাপদ, জয়দেবের কাব্যের পদগুলি এবং দোঁহাকোষ মিলিয়া স্থিরীকৃত করিয়া দিয়াছে। বাংলা কবিতার আদি আঙ্গিকে জয়দেব-কৃত এই পদবন্ধতাই কত বড় গুরুত্বপূর্ণ সহজেই তাহা বুঝা যায়। শুধু আঙ্গিক নয়, ভাববস্তুর দিক হইতে যে কৃষ্ণরাধার গানে বাংলাদেশ চিরকাল উন্মত্ত, জয়দেবের হাতেই তাহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। রাধাকৃষ্ণের এই মধুর প্রণয়লীলা তাহাদের এই মানবীরূপই চিরকাল বাঙালীকে ভুলাইয়াছে। ভাগবতপুরাণের বীর্যবন্ত পরম পুরুষের প্রসঙ্গ বাৎসল্য সখ্য প্রণয়ের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। চৈতন্যপন্থী দার্শনিক পণ্ডিতেরাও বাঙালীর স্বভাবসুলভ ইন্দ্রিয়কোমল প্রণয়মাধুর্যকেই তাত্ত্বিকতার স্তরে উঠাইয়া লইয়াছেন।

জয়দেবের কাব্যে রাধাকৃষ্ণ এবং দূতীর সংলাপে প্রণয়ের যে সব ভাবানুভূতি এবং 'মুড্' প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সবগুলিই পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে বহুল অনুসৃত হইয়াছে: যেমন, মান, মানভঞ্জন, বিরহ-বেদনা সম্ভোগ প্রভৃতি ভাব; খণ্ডিতা, বাসক-সজ্জিকা, অভিসারিকা—নায়িকার এই সব বিবিধ রূপ। এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলী তুলনামূলক ভাবে অনেকখানি ধর্মভাবাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহার ঐতিহ্য খুঁজিতে গেলে যে জয়দেবে গিয়া পৌঁছিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

'গীতগোবিন্দ' কাব্যরীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাই বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে"। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও 'গীতগোবিন্দের' আদর্শেই গড়িয়া উঠিয়াছে। যাত্রাপালার রূপরীতিটি আখ্যানকাব্যের সঙ্গে মিশাইয়া, তাহার সহিত গীতিরসযুক্ত পদবন্ধন মিলাইয়া এই কাব্যাঙ্গিক গঠিত। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক নানা পালাগানে এবং কৃষ্ণলীলা-মূলক কাব্যগুলিতে এই ধারাটি আমরা অনুসৃত হইতে দেখি।

প্রশ্ন ৪। বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস অনুসন্ধান কর। ইহার জন্মের পিছনে লৌকিক প্রেমকবিতা এবং আধ্যাত্মিক ভাবনা, কাহার প্রভাব কতটুকু বিচার কর। চৈতন্যপূর্ব যুগ পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিতার ক্রমবিকাশের রূপরেখাটি সংক্ষেপে অনুসরণ কর।

উত্তর ঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি মুখ্য শাখা বৈষ্ণব পদাবলী। চৈতন্যের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালে প্রবলভাবে পদাবলীর ধারাটি প্রবাহিত হইয়া সেকালের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সাহিত্যিক গুণাগুণের দিক দিয়াও বৈষ্ণব পদাবলী মধ্যযুগের সাহিত্যসম্ভারের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এই ধারাটির উৎস সন্ধান করিতে গেলে বাংলা ভাষার সীমানা ছাড়াইয়া সংস্কৃতাদি অন্য ভাষার রচনার মধ্যেও সন্ধান লইতে হইবে। বাংলা দেশে চৈতন্যোত্তর কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনকে অবলম্বন করিয়া পদাবলী রচনার একটি জোয়ার আসিয়াছিল। ফলে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের সঙ্গে উহার যোগাযোগটি অচ্ছেদ্য বলিয়া অনেকেই মনে করেন। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বুঝা যাইবে, বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন বিধিবদ্ধ হইবার বহু পূর্ব হইতেই বৈষ্ণব কবিতার একটি সুনির্দিষ্ট রূপরীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণের মধুর লীলার নানারূপ বর্ণনা আছে। তবে এই সব পুরাণেই কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা বা শক্তিপ্রাবল্যের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে মধুর বৃন্দাবনলীলার বর্ণনাও স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ভাগবতপুরাণেও রাধার নাম নাই। অন্যান্য পুরাণে যেখানে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়চিত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণন করা হইয়াছে, সেখানে সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে প্রক্ষেপরূপেই উহা আসিয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতেরা ঐরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা লোক-প্রচলিত সংগীতরূপে দীর্ঘকাল পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। উহার সহিত ধর্মভাবনার কোনোরূপ সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয় না। অতি প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে হালের "গাহা সত্তসঈ" বা "গাথা সপ্তশতী" গ্রন্থে সংকলিত কতকগুলি শ্লোকের উল্লেখ করিতে পারি। উহা কৃষ্ণের প্রণয়লীলার পদ এবং উহার মধ্যে কোনোরূপ আধ্যাত্মিক ভাবনাই যুক্ত হইয়া নাই। উক্ত সংকলনের লৌকিক নরনারীর প্রণয়কবিতার সহিত ইহাদের একেবারে সগোত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বাংলা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতেই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়সংগীত প্রচলিত ছিল। বাঙালী লোককল্পনা যখনই দাম্পত্য প্রণয়ের কথা ভাবিয়াছে তখনই শিবদুর্গার কথা আনিয়া ফেলিয়াছে। আবার যখনই দাম্পত্য প্রণয়ের বাহিরমণ্ডলের কোন মুক্ত, অবৈধ প্রণয়-বৈচিত্র্যের সুর তুলিতে চাহিয়াছে, তখনই রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ লইয়া আসিয়াছে। বাংলা দেশের লোকজীবনে বৈষ্ণব ধর্ম যখন প্রথম প্রবেশ করিল

তখন তাহা বিষ্ণুভক্তির রূপ লইয়াই দেখা দিল। উহার সহিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বৈচিত্র্যের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই।

বাংলা দেশে বাঙালী কবিরা যে বেশ পুরাতন কাল হইতেই রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বিষয়ে সংস্কৃতে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহার প্রমাণ মিলিতেছে "কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়" এবং "সদুক্তিকর্ণামৃত" নামক সংকলনগ্রন্থদ্বয়ে। ইহাদের মধ্যে সংকলিত রাধাপ্রণয়ের কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দুইটি সিদ্ধান্ত করা চলে : (১) সেকালের কবিরা যে দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সাধারণ নরনারীর প্রেমকবিতা লিখিতেন, সেই একই ভাবের বশবর্তী হইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমকবিতাও লিখিয়াছেন। উহা তাঁহাদের নিকট কোনোরূপ ভক্তির ব্যাপার ছিল না, নেহাৎই লৌকিক ব্যাপার। (২) এই সংকলনগ্রন্থ দুইটিতে সংকলিত রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত এবং অপরাপর প্রণয়কবিতায় দেখা যায়, রূপে রসে ভাবে নায়ক বা নায়িকার মুড্ প্রকাশে পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতার সহিত নানারূপ ঐক্য রহিয়াছে। এমন কি, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিতার নায়িকার অভিসার বা বিরহবেদনা বা মিলনানন্দ প্রকাশের ভঙ্গীটি যেন বহুপূর্বের এই সব সংস্কৃত শ্লোকে সংহতরূপে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' আসিয়াই প্রথম বাংলা বৈষ্ণব কবিতার রূপটি পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ, জয়দেব এবং চর্যাকারেরা মিলিয়া বাংলা পদবন্ধ-রীতিটি সুনির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ বাংলার লোকপ্রচলিত সংগীতাদির আদর্শেই তাঁহারা এই রীতিটি বাঁধিয়া দিতে সমর্থ হইলেন। সংস্কৃত শ্লোকের সহিত ইহার পার্থক্য তিনটি এবং নিঃসন্দেহে উহা গুরুত্বপূর্ণ। শ্লোকে অন্ত্যানুপ্রাস নাই। পদে অন্ত্যানুপ্রাস প্রতি দুই চরণে ঝংকারাবর্তের সৃষ্টি করে। শ্লোক দুই কিংবা চারি চরণে সমাপ্ত হয়। পদে দশ, বারো, চৌদ্দ, ষোলো প্রভৃতি জোড়সংখ্যক অনেকগুলি চরণ থাকে। এই সব চরণ মিলাইয়া উহার একটি "unit"। শ্লোক হইল চিত্রধর্মী। সংহত ভাবে ছবি আঁকায়ই শ্লোকের সার্থকতা। পদে সংগীতরসই মুখ্য। সে রস লীলায়িত ভঙ্গিতে আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রবাহিত হয়। এই রূপরীতি—বাংলায় যাহা পদ বলিয়া পরিচিত—আমাদের গীতিকবিতার আদি রীতি। বৈষ্ণব পদাবলী এই রীতির মধ্যেই সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা বৈষ্ণব কবিতা যদি শ্লোকের আকারে প্রকাশ পাইত উহাতে গীতোচ্ছ্বাস এত স্ফূর্তি পাইত না। দ্বিতীয়তঃ, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' মান, মানভঞ্জন, সম্ভোগ প্রভৃতি ভাবরূপের আশ্রয়ে পূর্ণদেহ বৈষ্ণব পদ প্রকাশ পাইয়াছে। রাধার বিচিত্র রূপের মধ্যে খণ্ডিতা, অভিসারিকা, প্রোষিতভর্তৃকা বাসকসজ্জিকা প্রভৃতিও পদবন্ধে রূপ পাইয়াছে। বাংলার বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে ভাবে রূপে ও রসে জয়দেবের সম্পূর্ণই মিল। জয়দেব হইতেই বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পূর্ণ সূত্রপাত। অবশ্য জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত উহাই প্রধান বাধা। কিন্তু জয়দেবের সংস্কৃত ভাষাও বাংলার বড়ই নিকটবর্তী।

জয়দেব গীতিকবিতা রচনা করেন নাই। 'গীতগোবিন্দ' আখ্যানকাব্য। কিন্তু এই আখ্যানকাব্যও আসলে কতকগুলি পদের সংকলন। পদগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে আস্বাদ করিলে রসোপভোগে কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটে না। কাহিনীর সূত্রটিও অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই ইহার আখ্যানধর্ম সত্ত্বেও পদসাহিত্যের পূর্বসূরীত্ব দাবি করিবার ক্ষেত্রেও কোনরূপ অসুবিধা নাই। বিশেষ করিয়া বহুল চর্চায় ও অনুসরণে জয়দেব বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর জগতে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব কবিতা পাই প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তুর্কিবিজয়ের পরে প্রায় দুইশত বৎসর বাংলাভাষার চর্চা কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট রাখে নাই। রাজনৈতিক ডামাডোল কিছুটা স্থিতিলাভ করার পরে চণ্ডীদাস নামধেয় দুইজন কবির রচনা পাওয়া গেল। বড়ু চণ্ডীদাস লিখিলেন "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নামক আখ্যানকাব্য। অপর এক চণ্ডীদাস অনেকগুলি কবিতা লিখিলেন রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ব্যাপার লইয়া। ইঁহাদের আবির্ভাবকাল এবং ব্যক্তিত্ব লইয়া পণ্ডিতমহলে অন্তহীন তর্ক আছে। তবে আমাদের মনে হয় (ক) ইঁহারা একজন নন, অন্ততঃ দুইজন কবি। যিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' লিখিয়াছিলেন তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহাকে বড়ু চণ্ডীদাস নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। গীতিকবিতার মুখ্য রচয়িতা অপর কবি। কারণ নাম চণ্ডীদাস হইলেও ইঁহাদের প্রেমভাবনা এবং রচনারূপে আকাশপাতাল পার্থক্য। চণ্ডীদাস নাম গ্রহণ করিয়া অপর কোনো কোনো কবি পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের কবিতাগুলি পূর্বোক্ত দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের সঙ্গে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সেগুলি খাঁটি জিনিস নয়, ভালো জিনিসও নয়। উহাদের সতর্কভাবে পৃথক করিতে পারিলে পদাবলীরচয়িতা চণ্ডীদাসের প্রতিভার যথার্থ পরিচয় মিলিবে। (খ) এই দুইজন চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী। অন্ততঃপক্ষে একজন তো বটেই। অপরজন—কিছু পরবর্তী কালের হইলেও কিছুতেই চৈতন্যপরবর্তী নন, তাঁহার সমসাময়িক— কিন্তু চৈতন্যমণ্ডলের অপরিচিত বহু দূরবর্তী কবি। সম্ভবতঃ সহজিয়া মতে বিশ্বাসী। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আখ্যানকাব্য হইলেও জয়দেবের কাব্যের আদর্শে রচিত। ইহার গানগুলিই প্রধান। সেগুলি এক একটি বৈষ্ণবপদরূপে গ্রহণযোগ্য। কৃষ্ণের ভাগবতলীলায় লেখকের কিঞ্চিৎ বিশ্বাস এই কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে ঠিকই, কিন্তু কাব্যরসের দিক হইতে উহা সম্পূর্ণই লৌকিক। এমন কি, বলা যাইতে পারে একটু বেশী মাত্রায় দেহভাবনাসচেতন।

পদাবলীরচয়িতা চণ্ডীদাসের কবিতা একটি স্বতন্ত্র আদর্শ সূচিত করে। উহার মধ্যে বস্তুর অতীতলোকের সৌন্দর্য এবং ইন্দ্রিয়োর্ধ প্রেমাকৃতি অনাড়ম্বর ভাষায় এবং ললিত ছন্দে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার কবিভাষায় প্রসাধনকলার

চিহ্ন কোথাও নাই, কিন্তু আছে এক অতলান্ত গভীরতা। মানবপ্রেমজিজ্ঞাসার যে স্তর চণ্ডীদাসের কবিতা উদ্ঘাটিত করিয়াছে তাহা পৃথিবীর সাহিত্যে অল্পই মেলে।

প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব সাহিত্যের অপর বিশিষ্ট কবি হইলেন বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যজগতের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রশ্নে বিতর্ক দেখা দিয়াছে। বিদ্যাপতি বাঙালী কবি নন, বাংলা ভাষায়ও লেখেন নাই। তাঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কবিতাবলী ব্রজবুলি ভাষায় লেখা। ব্রজবুলি ভাষা বাংলা এবং মৈথিলির মিশ্রণে গঠিত। যাহাতে বাঙালী এবং মিথিলাবাসী উভয়ে বুঝিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কবিতাগুলি এই ভাষায় রচিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়াও বিদ্যাপতির উক্ত কবিতা-বলীর সহিত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের পূর্বাপর সম্বন্ধ আছে। বিদ্যাপতির দ্বারা বাংলা বৈষ্ণবকবিতা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। বৈষ্ণবপদ সংকলনে এবং কীর্তনে বিদ্যাপতির পদাবলী সর্বদাই বিশেষ স্থান দখল করিয়াছে। বিদ্যাপতির কবিতায় আধ্যাত্মিকতার চিহ্নমাত্র নাই। প্রসাধননিপুণ তাঁহার রচনা। অভিজাত সমাজের ইন্দ্রিয়-উদ্বেল প্রণয়-আবেগ ইঁহার কবিতার আস্বাদকে বিশিষ্টতা দিয়াছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, তত্ত্বভাবনা প্রভৃতির আমদানী হইল। কিন্তু মূলতঃ উহার রূপরীতি এবং ভাবপরি-মণ্ডলটি প্রাক্-চৈতন্য যুগেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

প্রশ্ন ৫। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদকাব্য রচনার ধারাটি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক কারণ নির্দেশ কর। বাংলা অনুবাদকাব্যের মুখ্য বিশিষ্টতাগুলি লইয়া আলোচনা কর।

উত্তর: তুর্কিবিজয়ের প্রথম প্রতিক্রিয়া কাটিয়া যাইতে প্রায় দুইশত বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময়কার কোনো রচনা পাওয়া যায় নাই। এ পর্বে নিশ্চয়ই কিছু কিছু সাহিত্য রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার পরিমাণ বেশী হইবার কথা নয়। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন তখন একটা বড় ধরনের সংকটের মধ্য দিয়া চলিতেছিল। সাহিত্যসৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ রচিত হইতে কিছু সময় লাগিয়াছে।

এই দুর্যোগপূর্ণ কাল কাটিয়া হুসেন শাহ প্রভৃতির আমলে বাংলায় রাষ্ট্রশক্তি যখন কিছু পরিমাণে স্থিতিলাভ করিল, তখনই নব্য সাহিত্য সৃষ্টির একটা জোয়ার দেখা দিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা সাহিত্য দেখা দিল তিনটি ধারায়: (১) অনুবাদকাব্য, (২) মনসামঙ্গল, (৩) বৈষ্ণব কবিতা। ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া অনুবাদশাখাটি আমাদের বর্তমানে আলোচ্য। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের উল্লেখযোগ্য অনুবাদগ্রন্থ হিসাবে নাম করা যায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (ভাগবতপুরাণের আংশিক অনুবাদ), সম্ভবতঃ সঞ্জয়ের মহাভারত, কবীন্দ্রপরমেশ্বর

এবং শ্রীকর নন্দীর মহাভারত। ইহাদের মধ্যে মালাধর বসুর কাব্যটি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য রূপে পাওয়া গিয়াছে, কবীন্দ্রপরমেশ্বরের অনুবাদটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পুরাতন, শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধপর্বের বিস্তারিত অনুবাদ করিয়াছিলেন জৈমিনী সংহিতার অনুসরণে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে রূপটি প্রচলিত উহার সহিত মূল রচনার সম্পর্ক খুবই অল্প। যুগে যুগে লিপিকার এবং কথকঠাকুরদের হাতে পরিবর্তিত হইতে হইতে উহা এমন একটি অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে মূল লেখকের রচনাশৈলীর নিদর্শন কতটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা নির্ণয় করাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সঞ্জয়ের অনূদিত মহাভারতকে অনেকে সর্বপ্রাচীন মহাভারত-অনুবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। সঞ্জয়ের প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পর্কেই অনেকের সন্দেহ আছে। সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় সঞ্জয়ের প্রকৃত প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না বলিয়া কিছু কিছু প্রমাণ মিলিতেছে। প্রথম যুগের এই সব অনুবাদগ্রন্থের উপরে নির্ভর করিয়া আমাদের বাংলা অনুবাদসাহিত্যের পশ্চাৎবর্তী প্রকৃত কারণটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

প্রাক্-তুর্কি আমলে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য-স্মার্ত-পৌরাণিক সংস্কার সংস্কৃতি একটি ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে আপন আভিজাত্য এবং রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লইয়া। অপর ধারায় বহিয়া চলিয়াছে বাংলার লৌকিক সংস্কৃতি—তাহার অস্মার্ত-অপৌরাণিক-অব্রাহ্মণ্য জীবনাচরণ। ইহাদের মিলন ঘনীভূত হইয়া উঠিতে বেশ কিছু সময় লাগিয়াছে। তুর্কি আক্রমণের অভিঘাত ইহাদের স্বাতন্ত্র্য ঘুচাইয়া ফেলিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা রাজ্য ও প্রতিপত্তি হারাইল। নিম্নবর্ণের মধ্যে মুসলমানদের ধর্মবিজয় প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। এই অবস্থার অবসান বাসনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-প্রধানদের দিক হইতেও একটা মিলনের তাগিদ অনুভূত হইল। তুর্কিবিজয়ের অব্যবহিত পরের দুইশত বৎসর রাজকীয় মাৎস্যন্যায় এবং ধর্মনৈতিক অত্যাচারের মধ্যে এই মিলনপ্রয়াস চলিয়াছে এবং অনেকখানি কার্যকর হইয়াছে। ইহারই ফলে অভ্যুদয় ঘটিয়াছে আধুনিক বাঙালী জাতির। এই মিলনের পরে লৌকিক দেবদেবীরা উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে স্বীকৃতি পাইয়াছে। পৌরাণিক বহু দেবতা আবার লৌকিক-আচার আচরণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। জীবনের আচার আচরণে দুই ধারার মিশ্রণ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই নবগঠিত বাঙালী জাতির সামনে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আদর্শটি ধরিয়া দেওয়া দরকার। না হইলে যে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির বিজয়-অভিযান রোধ করিবার উদ্দেশ্যে এই দুই শতাব্দীব্যাপী মিলনপ্রয়াস সত্যই অর্থহীন হইয়া যায়। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শস্থল রামায়ণ এবং মহাভারত। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বিশেষ করিয়া ভাগবতপুরাণ। কাজেই আপামর বাঙালী পাঠকের নিকট পূর্বোক্ত মহাগ্রন্থগুলির অনূদিত রূপ ধরিয়া

দিতে পারিলে হিন্দুধর্ম এবং তাহার আদর্শ একটা বিস্তৃত পরিমণ্ডল লাভ করে। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম অনুবাদকেরা। তাঁহারা যে সকলে এই দায়িত্বের সামাজিক-ঐতিহাসিক গুরুত্ব সবটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এমন নাও হইতে পারে। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটিই ঘটিয়াছে।

মহাকাব্যদ্বয় এবং ভাগবতের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ হইবার পরোক্ষ কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী কারণটি আমরা উপরে ব্যাখ্যা করিলাম। কিন্তু আরও কতকগুলি কারণ আছে। সব কারণই একসঙ্গে সক্রিয় থাকিয়া বাংলা অনুবাদসাহিত্যের ধারাটিকে সম্ভাবিত করিয়াছে—এইরূপ বলা চলে।

প্রাক্-তুর্কি আমলে বাংলা ভাষায় শুধুমাত্র চর্যাপদ রচিত হইয়াছিল। এই গানগুলির রচনা ঐতিহাসিক ঘটনা হইলেও বাংলা ভাষার শক্তির সূচনামাত্র উহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। একটা বৃহৎ এবং নতুনভাবে সচেতন জাতির ভাব ও আবেগের ভাষা হইবার জন্য যে-পরিমাণ শক্তির অধিকারী উহাকে হইতে হইবে, তাহা সাধনা করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। বহু ভাষার ইতিহাসেই দেখা যায়, প্রাচীনতর সমৃদ্ধ ভাষার গ্রন্থরাজি অনুবাদের মধ্য দিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে চায়। বাংলাভাষাও তাহাই করিয়াছে। সংস্কৃত মহাকাব্য এবং ভাগবতের ন্যায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অনুবাদের মধ্য দিয়া উহা হাত পাকাইয়াছে; কাহিনীকাব্য রচনার রীতিনীতি, চরিত্রচিত্রণের পদ্ধতি তাহাকে শিখিয়া লইতে হইয়াছে। সাহিত্যিক কারণ হিসাবে ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে রাজকীয় আনুকূল্যের কথাও আসিয়া পড়িবে। আচার্য দীনেশচন্দ্র যেরূপ সোচ্চার কণ্ঠে মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলিয়াছেন, উহা সর্বদা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুবাদে তাহাদের উৎসাহ থাকিবার কোনো কারণ নাই। তবে কোনো কোনো মুসলমান নৃপতি গল্পরসের জন্য ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন। আদিযুগের মহাভারত রচনায় মুসলমানদের আনুকূল্যের নিশ্চিত প্রমাণ আছে। পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত গল্প ভাষান্তরিত করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাঁর পুত্র ছুটিখাঁ শ্রীকরণ নন্দীকে দিয়া যুদ্ধবর্ণনাপ্রধান অশ্বমেধপর্বের বিস্তৃত কাহিনী লেখাইলেন। উভয়ক্ষেত্রেই গল্পরসের আবেদনই ছিল আসল কথা। মালাধর বসুর কাব্যরচনায় রুকনুদ্দিন বারবাক শাহের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কবির স্তুতিবাদ দূর হইতে বিধর্মী নৃপতিকে নমস্কার করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা—অনেকে এইরূপ মনে করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের কাব্যটির পশ্চাতে রাজানুকূল্য ছিল এবং সম্ভবতঃ উহা কোনো হিন্দুরাজার। সাধারণভাবে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-গ্রন্থগুলিই যথার্থ রাজানুকূল্য পাইয়াছে—সম্ভবতঃ ইহাদের বিশেষ আভিজাত্যের

জন্য। মঙ্গলকাব্যের কোনো কোনো কবি রাজার অনুগ্রহ পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা গ্রাম্য জমিদার স্তরের লোক।

অনুবাদের অন্যতম কারণ সাধারণ বাঙালীর এই সব গল্পের প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ। পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় কথকতায় সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতাদির কাহিনী বহু পূর্ব হইতেই লোকপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে নিজ ভাষায় অনুরূপ কাহিনী পাইবার জন্য তাহাদের মধ্যে তীব্র আগ্রহ দেখা দিতে লাগিল। "তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন"—মধুসূদনের এই কথা শুধুই কবির কল্পনা নয়।

পরবর্তীকালে সেকালের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যধারা, বৈষ্ণবসাহিত্য-ধারার ন্যায় অনুবাদকাব্যের ধারাও একটা প্যাটার্ন হইয়া দাঁড়াইল।

আধুনিক কালের অনুবাদের ন্যায় সেকালের অনুবাদের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল না। একালে অনুবাদকের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হইল মূলানুগত্য; মূলের বিষয়বস্তুর হুবহু অনুসরণ করা চাইই। তদুপরি মূলের ভাবরস কতখানি যথাযথভাবে রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার উপরেই কোনো গ্রন্থের অনুবাদমূল্য নির্ভর করে। সেকালে অনুবাদ সম্পর্কে এরূপ কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না বলিয়া নানারূপ আদর্শই অনুসৃত হইত।

অনুবাদের একেবারে প্রথম যুগে কবিরা যথাসাধ্য মূলানুগত্য বজায় রাখিবার চেষ্টা কবিরা করিতেন। মালাধর বসুর গ্রন্থ তাহার প্রমাণ। কৃত্তিবাসের গ্রন্থের বর্তমানে যেরূপ অবস্থা প্রথমে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বাল্মীকি-অনুকারী ছিল বলিয়া গবেষকেরা মনে করেন। কিন্তু ক্রমেই মূল হইতে অনেকগুলি পার্থক্য উহাদের মধ্যে দেখা যাইতে থাকে। লোকপ্রচলিত নূতন নূতন কাহিনী কোনো কোনো কবি সংযোজন করিয়া উহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। পুরাতন কোনো কোনো কাহিনী অনেকে বাদ দেন। প্রসঙ্গতঃ তরণীসেনবধ এবং শ্রীবৎস কাহিনীর সংযোজনের কথা বলা যায়।

ইহা অপেক্ষাও গুরুতর পার্থক্য দেখা যায় রসের ও চরিত্রভাবনার ক্ষেত্রে। মহাকাব্য দুটির মধ্যে যে উদাত্ত গম্ভীর মহান্ ও তরঙ্গিত জীবনরস নিত্য উদ্বেলিত তাহার ছায়াটুকু মাত্র আমরা অনুবাদে পাই না। অনুবাদগুলি বাংলার পলিমাটির মত নরম এবং বেতসলতার মত নমনীয় হইয়া উঠিয়াছে চরিত্রগুলির মধ্যে যে রূঢ় পৌরুষ, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, ভাস্কর্যোচিত গঠনসৌষ্ঠব, বর্বরোচিত বীরত্ব এবং মহান্ ঔদার্য দেখা যাইত তাহা অনুবাদে কিছুমাত্র রক্ষিত হয় নাই। অনুবাদকাব্যগুলিতে ভক্তিরস প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে।

মূল কাব্যগুলিতে, বিশেষ করিয়া রামায়ণ-মহাভারতে মাঝে মাঝে যে অপরূপ সুন্দর বর্ণনা স্থান পাইয়াছে, অনুবাদ করিবার সময়ে সে সব বর্ণনা পরিপূর্ণভাবে

বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাঙালী কবিরা কাহিনীটি বিবৃত করিতেই সম্পূর্ণ চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছেন, অন্য কোনো দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবকাশ পান নাই।

মহাভারত অনুবাদ করিতে গিয়া কেহ কেহ গল্পটি সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ অংশবিশেষ বাছিয়া লইয়া অনুবাদ করিয়াছেন। একজনের পক্ষে সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করা একরূপ অসাধ্য মনে করিয়া অনেকেই সে আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অশ্বমেধপর্ব অনুবাদ করিবার সময়ে অনেকে জৈমিনী মহাভারতের আশ্রয় লইয়াছেন। সেই গ্রন্থে পর্বান্তর্গত যুদ্ধকাহিনীগুলির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পাঠকের গল্পরসতৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য এইরূপ করিতে হইয়াছে। মালাধর বসুর পরবর্তী কবিরা ভাগবত অনুবাদে মলের অনুকরণ বড় করেন নাই। ভাগবতের কাহিনীর স্থানে কৃষ্ণের প্রণয়লীলার নানা উপাখ্যান যুক্ত হইয়া এক নূতন ধরনের কৃষ্ণলীলাকাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলার সামাজিক জীবনের পরিবর্তনও নানা ধরনের প্রভাব ফেলিয়াছে। চৈতন্যোত্তর যুগে সারা বাংলাদেশ জুড়িয়া ভাবাবেগের যে প্রবল বন্যা আসিয়াছিল, যে কৃষ্ণভক্তি ধর্মভাবুকতা এবং গীতিরস দেখা দিয়াছিল তাহার প্রভাব অনুবাদগুলির মধ্যেও পড়িয়াছে। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর রুচিবৈকল্য এবং আদিরসের বাড়াবাড়ি অনুবাদকেও কতকটা পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে।

বাংলা অনুবাদকাব্য তাহার বৈশিষ্ট্য লইয়া বাংলারই একটি নিজস্ব ধারা।

প্রশ্ন ৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের পশ্চাতে যে ভাবগত প্রেরণা কাজ করিয়াছে উহার পরিচয় দাও। কিভাবে তাহা দেবকল্পনা এবং কাহিনীগ্রন্থনের মধ্যে অনুসৃত হইয়াছে দেখাও। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্যগুলির রূপলক্ষণগত মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ কর।

উত্তরঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত যে ধারাটির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহা নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধারাটি বাংলার একেবারে নিজস্ব। ইহার পুষ্টিও ঘটিয়াছিল অত্যধিক। বাংলাদেশের বহুসংখ্যক কবি বহুসংখ্যক মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। জনসাধারণের নিকটে ইহা যে সবিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মুখ্য ধারা—(১) মনসামঙ্গল, (২) চণ্ডীমঙ্গল এবং (৩) ধর্মমঙ্গলের। ইহার পরেই নাম করিতে হয় (৪) শিবায়ন এবং (৫) অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গলের। ইহা ছাড়া আরও আগে দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন প্রসঙ্গে আরও বহুসংখ্যক মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল এবং এই সম্পর্কে অনেকগুলি একান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচালী-জাতীয় কাব্যও রচিত হইয়াছিল।

বিশেষ কোন্ সামাজিক পরিবেশে, কি জাতীয় ভাবপরিমণ্ডলে এই সাহিত্য-

শাখাটির উদ্ভব ঘটিল, তাহা বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। তুর্কি-বিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশের সমাজজীবন দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। তাহার একটি হইল অব্রাহ্মণ্য-অস্মার্ত-অপৌরাণিক লৌকিক সংস্কৃতির ধারা; অপরটি হইল ব্রাহ্মণ্য-স্মার্ত-পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারা। ইহাদের জীবনাদর্শে এবং আচার-আচরণে গুরুতর পার্থক্য ছিল এই দুইটি ধারার মিশ্রণের মধ্য দিয়া বঙ্গ সংস্কৃতি, বঙ্গীয় হিন্দুজাতি গড়িয়া উঠিল মুসলমান আক্রমণের মধ্য দিয়া। তুর্কিবিজয়ের ফলে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের হিন্দুরা হইয়া পড়িয়াছিল অধিকারচ্যুত। তাহারা রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও সুবিধা হারাইয়া ধর্মনৈতিক দিক হইতে প্রতিরোধ সৃষ্টি করিতে চাহিল। লোকসাধারণ দলে দলে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। উচ্চবর্ণের পক্ষ হইতে ইহা বন্ধ করিবার জন্য একটি ঘনীভূত হিন্দু-সংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মিলনের ফলে বাঙালী জাতি সংহত রূপ গ্রহণ করিল। উহার ধর্মভাবনায়, জীবনাদর্শে, প্রাত্যহিক আচার-আচরণে দুই সংস্কৃতির মিশ্রণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মঙ্গলদেবদেবীগুলির উদ্ভব ঘটিল এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণের ফলস্বরূপ।

অধিকাংশ মঙ্গলদেবদেবীই আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সহিত সম্পর্করহিত। পুরাতন বৈদিক গ্রন্থসমূহে বা পৌরাণিক দেবভাবনার মধ্যে ইহাদের উল্লেখমাত্র দেখা যায় না। ইহারা অধিকাংশই লোকসংস্কারজাত। জনসাধারণের সহজ ভয় বিশ্বাস ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সর্বদেশেই নানারূপ আদিম দেবদেবীর জন্ম দিয়া থাকে। আমাদের মঙ্গলদেবদেবীরাও মূলতঃ জনভাবনার আদিম স্তরেরই প্রতিফলন। আদিম সমাজে যে সব পূজার্চনাপ্রণালী থাকে তাহার মধ্যে প্রধান হইল (১) টোটেমপূজা, (২) ইন্দ্রজাল, (৩) প্রাচীন সূর্যোপাসনা। কোনো পশুপক্ষী বা বৃক্ষকে আদিমতম কুলপতিজ্ঞানে পূজা করিবার নিয়ম অতি প্রাচীন। মনসা-কল্পনার পশ্চাতে সর্প টোটেম, সিজগাছ টোটেমের পূজা প্রচলিত ছিল। চণ্ডীকল্পনার ভিত্তিতে গোধিকা-টোটেম যে অনেকটা কার্যকর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য এই ভিত্তির উপরে আরও নানাবিধ লৌকিক ভাবভাবনার ছায়াপাত ঘটিয়াছে। ইন্দ্রজাল, প্রধানতঃ প্রজননশক্তির বৃদ্ধিকে কামনা করে। ইহার সহিত শিকারী সমাজ বা কৃষিজীবী সমাজের বাস্তব জীবনের দাবি ক্রমে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। আয়ত্ত কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আয়ত্তাতীত লক্ষ্য ভেদ করাই ইহার উদ্দেশ্য। প্রজননশক্তির সমৃদ্ধি আদিম মানুষের একটি প্রধান কাম্য ব্যাপার ছিল। মানববংশবৃদ্ধি, শস্যের বৃদ্ধি এবং গবাদি পশু, শিকারের পশুর বৃদ্ধি সবই ইহার দ্বারা সূচিত হইত। মনসাদেবীর ভিত্তিতে শুধু টোটেম-কল্পনাই সক্রিয় ছিল না, এই প্রজননশক্তির সমৃদ্ধিকামনাও কার্যকর ছিল। সাপ সর্বদেশেই

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY AGARTALA 46771

প্রজননশক্তির প্রতীকরূপে চিহ্নিত ছিল। সূর্যপূজাও আদিম পূজা। মানবজীবনধারণ এবং ফসল ফলানোর কাজে সূর্যের উত্তাপ ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অতি পুরাতন সূর্যপূজা তাই ব্রতকথা প্রভৃতিতেও স্থান করিয়া লইয়াছে। ধর্মঠাকুর আসলে আদিম সূর্যদেবতা ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রাম্য শিবকল্পনায়ও সূর্যভাবনার প্রভাব পড়িয়াছে। তাহার প্রমাণ গাজন উৎসবে।

মঙ্গলদেবতারা সকলেই মূলতঃ অনার্য লোকসংস্কারের মধ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার সহিত পৌরাণিক ও ব্রাহ্মণ্য হিন্দুভাবনার মিলন ঘটিয়াছে। অনার্য ব্যাধেদের শিকার ও যুদ্ধের দেবতা চণ্ডী শিবপত্নী পার্বতীর সহিত যুক্ত হইয়াছে। সাপের ভয় হইতে বাঁচিবার কল্পনা, টোটেমভাবনা ও প্রজননশক্তির দেবী মনসা শিবের কন্যারূপে গৃহীত হইয়াছে। আদিম সূর্যদেবতার সহিত শিব ও বিষ্ণুর ভাবনা কিছুটা মিলিত হইয়া ধর্মঠাকুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লৌকিক কৃষি দেবতা ও পৌরাণিক শিব হইয়া গিয়াছে একাকার।

মঙ্গলকাব্য যে-যুগে রচিত সে-যুগ বাঙালী জাতির জীবনে একটা পরাজয়ের ভাব বহন করিত। দৈবমাহাত্ম্য ছাড়া জীবনে সাফল্যলাভ আদৌ সম্ভব বলিয়া তাহারা মনে করিত না। দৈবই সর্বশক্তিমান। উহা ভিখারীকে রাজা এবং রাজাকে ভিক্ষুক করিতে পারে। জীবনের চারিপাশে যে অজস্র সমস্যা রহিয়াছে, অভাব-অভিযোগ যে ভাবে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে দৈব ছাড়া আর কেইবা রক্ষা করিতে পারে? মঙ্গলকাব্যের দেবতারা মানুষের প্রতিটি বাস্তব প্রয়োজন মিটাইয়া থাকেন। মনসা সাপের হাত হইতে বাঁচান। দক্ষিণ রায় বাঘের হাত হইতে রক্ষা করেন। চণ্ডী হারানো স্বামীপুত্র হইতে ছাগল পর্যন্ত ফিরাইয়া দেন। ধনদান করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের সকলেরই আছে, এমন কি ব্যাধকে রাজা করাও অনেকের নিকট অনায়াসলব্ধ। মনসা কখনো কখনো মুসলমানদের অত্যাচার হইতেও বাঁচান। বিদ্যাসুন্দরের কালী অবৈধ প্রণয়ের আশ্রয়দাত্রী। অন্নদামঙ্গলের দেবী দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে অন্নদান করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া পুত্রহীনাকে পুত্রদান এবং ছোটখাটো হেকিম-কবিরাজের কাজ যে তাঁহারা কত করিয়া থাকেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ধর্মঠাকুর ধবল রোগের পরম চিকিৎসক; যুদ্ধে সাফল্যও দান করেন।

মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙালীর জীবনের এক বিশেষ পর্যায়ে অনেকটা তাহার সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এবং অনেকটা বাঙালীর জাতিগত প্রবণতার অনুসরণে জন্ম লইয়াছে। তুর্কিবিজয়ের অব্যবহিত পরবর্তী বৎসরগুলিতে মঙ্গলকাব্য রচিত হইবার উপযুক্ত পরিমণ্ডল গড়িয়া ওঠে। পরবর্তী কালে ইহা একটি সাহিত্যিক রীতি বা art form-এ দাঁড়াইয়া যায়। তখন বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক-সামাজিক কারণ

ছাড়াই, শুধু একটা বিশেষ জাতের কাব্য 'রচনা' করিবার জন্য বা কোনো বিশেষ দেব-দেবীর প্রতি ভক্তির কারণেই অনেকে মঙ্গলকাব্য রচনায় উৎসাহ বোধ করেন।

মঙ্গলকাব্যের রূপরীতিগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও ক্রমে ক্রমে দাঁড়াইয়া যায়। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রথমতঃ মঙ্গলকাব্য কাহিনীকাব্য। কাহিনী বর্ণন এবং চরিত্রচিত্রণ এই জাতীয় কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পদসাহিত্য বা সেকালীন গীতিকবিতা হইতে ইহাদের সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিবার মত। মঙ্গলকাব্যের গল্পগুলি এবং চরিত্রকল্পনা বাঙালীর নিজস্ব মৌলিক ভাবনার ফল। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ঋণের পরিমাণ কোথাও কিছু কিছু থাকিলেও তাহার পরিমাণ বেশী নয়।

দ্বিতীয়তঃ, মঙ্গলকাব্যগুলি বস্তুনিষ্ঠ রচনা। নানা প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কবিরা সমকালীন সমাজজীবনের একটা পরিপূর্ণ ছবি রচনা করিতে চাহিয়াছেন। কখনও পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা, কখনো আহার্য দ্রব্যের তালিকা, কখনো হাটবাজারের কথা, কখনও বিবাহ—স্ত্রী-আচার—জন্ম—জাতকর্ম প্রভৃতির বিস্তারিত পরিচয় মঙ্গলকাব্য-গুলিকে 'সমকালীন বাঙালী' জীবনের নির্ভরযোগ্য দলিলে পরিণত করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মঙ্গলকাব্যের গল্পটি উদ্দেশ্যমূলক। উদ্দিষ্ট দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন, কিভাবে তাহার পূজা লোকসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইল, গল্পটির মধ্যে তাহাই উদাহরণের মতো করিয়া উপস্থিত করা হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ, মঙ্গলকাব্যে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে। অধিকাংশ কবিই তাহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। প্রথমেই দেববন্দনা দিয়া কাব্যের সূত্রপাত। ইহারও খুব বাড়াবাড়ি—দেববন্দনা যেন শেষ হইতেই চায় না। তাহার পরে কবি আত্মজীবনী বর্ণনা করেন। সব কবিই দেব দেবীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে বা স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনা করেন, একথা সোৎসাহে উল্লেখ করেন। তাহার পরে স্বর্গখণ্ডের কথা। দেবতা স্বর্গ হইতে কোনো ছোট দেবতার খুঁত বাহির করিয়া তাহাকে অভিশাপ দিয়া নররূপে পৃথিবীতে পাঠান। কাহিনীও তখন পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করে। কাহিনীর মধ্যে থাকে বারমাস্যা—নায়িকার সুখদুঃখের বর্ণনা, নারীগণের পতিনিন্দা—স্থূল হাস্যরসসৃষ্টিই ইহার উদ্দেশ্য থাকে চৌতিশা—চৌত্রিশ অক্ষরে মিলাইয়া উদ্দিষ্ট দেবতার স্তবগান

মঙ্গলকাব্য এইভাবে ভাবাদর্শ, সামাজিক জিজ্ঞাসা এবং "প্যাটার্ন"-এর দিক হইতে একটি বিশিষ্ট কাব্যধারা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

প্রশ্ন ৭। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় কর।

অথবা, চৈতন্যদেব নিজে কোনো সাহিত্যরচনা না করিলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন।

উত্তর : চৈতন্যদেবের আবির্ভাব শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের পক্ষে নয়, বাঙালী জাতির পক্ষেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাঙালী জাতি তুর্কিবিজয়ের অভিঘাতে প্রথম একটি সুসংহত জাতিরূপে গড়িয়া উঠিল। কিন্তু জাতিগত লাঞ্ছনার এবং পরাজিতের মনোভাব তাহার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। প্রাক্-চৈতন্যপর্বের বাঙালী জাতি হিসাবে নিজেকে সংহত করিয়া, পৌরাণিক আদর্শ সামনে রাখিয়া, লৌকিক বিশ্বাসকে অনেকখানি গ্রহণ করিয়া জীবনপথে চলিতেছিল। কিন্তু একটা বৃহৎ ও মহৎ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে জ্বলিয়া ওঠে নাই। চৈতন্যদেবের মধ্যে ছিল সেই প্রতিভা। বাঙালী জাতির মর্মমূলে আঘাত করিয়া তিনি এক অমৃতসংগীত বাজাইতে লাগিলেন। বাঙালী জাতির পরিপূর্ণ উদ্বোধন ঘটিল। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া যে ধর্মান্দোলন দানা বাঁধিল তাহার মধ্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব মানবতার স্পর্শ ছিল। তিনি বলিলেন, "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণ", "যেই জন কৃষ্ণভজে সে মোর ঠাকুর।" মধ্যযুগে ধর্মনীতির ক্ষেত্রে এই প্রত্যয় ছিল বৈপ্লবিক। মনুষ্যমহিমার প্রতি এইরূপ স্বীকৃতি সেকালে বড় সহজলভ্য ছিল না। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নগর-সংকীর্তনের কথা প্রসঙ্গক্রমে মনে আসিতে পারে। জনসাধারণকে ধর্মীয় প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন তিনি, দূরে সরাইয়া রাখেন নাই। চৈতন্যদেবের ধর্মভাবনার কেন্দ্রে ছিল প্রেম। মানবিক অনুভূতির মধ্যে উহাই সর্বোত্তম। উহাকে sublimated করিয়া দর্শন ও ধর্মসাধনরূপে দাঁড় করানোই হইল গৌরাঙ্গ প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের সবাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের মূলে রহিয়াছে ভাবাবেগের অতি তরল, গীতিপ্রবণ উচ্ছ্বাস। চৈতন্যদেবের ধর্ম এবং রসবিহ্বল আচরণাদি জাতীয় ভাবনার সেই মূল ধরিয়া নাড়া দিল। গোটা জাতির অন্তরাত্মার জাগিয়া উঠিতে তাই বিলম্ব হইল না। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দুজাতির জীবনে চলিতেছিল আত্মসংকোচন, মুসলিম আক্রমণের সামনে তাহারা ক্রমেই পিছু হটিতেছিল। হিন্দুরাও মুসলিম আচার-আচরণে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। চৈতন্যদেবের জীবনের কয়েকটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : যেমন,—(১) নবদ্বীপের কাজীর হিন্দুদমন অত্যাচারের প্রতিরোধ। চৈতন্যদেব নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীর এক বিরাট নগরসংকীর্তন বাহির করিয়া হিন্দুর ধর্মাচরণের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ তুলিয়া লইতে কাজীকে বাধ্য করিলেন। (২) যবন হরিদাসের বৈষ্ণবীভক্তি। মুসলমান হরিদাসকে ভক্তমণ্ডলীমধ্যে গ্রহণ। মুসলমানেরা শুধু অপরের ধর্ম গ্রাস করিয়া আসিতেছিল এতদিন। এইবার মুসলমানরাও হিন্দুধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইল। (৩) ইসলামী আচরণে অভ্যস্ত এবং মুসলিম শাসকদের গোয়েন্দা জগাই-মাধাইএর উদ্ধার বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে শুধু নয়, প্রতিনিধিত্বমূলক বিষয় হিসাবেই বিচার্য। (৪) রূপ-সনাতন এই নবধর্মের আহ্বানে মুসলমান শাসনযন্ত্রের অত্যুচ্চ পদ হইতে সরিয়া আসিল, সন্ন্যাস গ্রহণ করিল। চৈতন্যদেব হিন্দু বাঙালীকে নূতন জাতীয় ভাবনায় এবং আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিলেন।

বাঙালীর জাতীয় জীবনে চৈতন্যের এই সুগভীর প্রভাব বাংলাদেশের সাহিত্যের উপরেও নানামুখী হইয়া দেখা দিল। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাবকে মূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করিয়া বিচার করা যাইতে পারে—(১) বৈষ্ণব সাহিত্য, (২) অন্যান্য সাহিত্য। চৈতন্যদেবের প্রভাবে শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যেই পরিবর্তন দেখা দিল না, অপরাপর সাহিত্যধারায়ও নানারূপ পরিবর্তন সূচিত হইল। তবে বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রতিফলিত পরিবর্তনগুলি হইল প্রত্যক্ষ, অপরাপর সাহিত্যের নবত্ব পরোক্ষ ভাবে দেখা দিল।

বৈষ্ণব সাহিত্য : বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্ব প্রচলিত ধারায় যেমন নবীন ভাব দেখা দিল, সেইরূপ নূতন নূতন ধারাও আসিয়া যুক্ত হইয়া মধ্যযুগের এই সাহিত্য-শাখাকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রম-বিকাশের অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যাইবে চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মান্দোলন-নিরপেক্ষ-ভাবেই ঐ কাব্যধারাটি শুরু হইয়াছিল। লৌকিক প্রণয়কবিতা হিসাবে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোকের মধ্য দিয়া এই ধারাটি জয়দেবের হাতে আসিল। জয়দেব ভূমিকাস্বরূপ একবার হরিস্মরণের প্রসঙ্গ তুলিলেও কামকলাকুতূহলের বশবর্তী হইয়াই লিখিলেন ''গীতগোবিন্দ'। তাঁহার এই কাব্যে রূপে রসে এবং ভাবে বৈষ্ণবপদাবলীর ঠিক পূর্বসূরীত্ব দেখা গেল। বড়ু চণ্ডীদাস সংস্কৃত ভাষার বন্ধন হইতে বাংলা রূপে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় পদকে লইয়া আসিলেন। প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে অপর বিশিষ্ট কবি হইলেন পদাবলীরচয়িতা চণ্ডীদাস অবাঙালী কবি বিদ্যাপতির ব্রজবুলি কবিতাগুলিও প্রাক্‌চৈতন্য বৈষ্ণব কবিতার অংশরূপেই বিবেচ্য। এই কবিতাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল—(১) বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের সঙ্গে ইহারা স্বভাবতঃই সম্পর্কহীন। (২) ইহাদের মধ্যে ধর্মের কোনো প্রভাব থাকিলেও তাহা বহিরঙ্গ এবং লৌকিক-পৌরাণিক বিশ্বাস, বড়জোর সহজিয়া মত কোনো বিধিবদ্ধ দার্শনিক ধর্মপ্রত্যয়ের অঙ্গ নয়। (৩) রূপে ভাবে রসে এই কবিতাগুলি একেবারে লৌকিক, মানবিক প্রেমকবিতার একটি বিশেষ রূপ হিসাবে ইহাদের গ্রহণ করিতে বাধা কোথাও নাই।

চৈতন্যধর্মান্দোলনের ফলে পুরাতন ধারাটিকে নব রসে ও ভাবে সঞ্জীবিত করিয়া উপস্থিত করা হইল। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী যে ধর্মতত্ত্ব বিধিবদ্ধ করিলেন তাহা অচিরে বঙ্গীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে সামগ্রিকভাবে স্বীকৃত হইল। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কবিতা রচনা ও আস্বাদন ধর্মসাধনার অঙ্গরূপে স্বীকৃত হইল। ইহার ফলে চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন স্পষ্ট হইয়া উঠিল : (১) বৈষ্ণব ধর্ম ও তত্ত্বের পটভূমিকাটি ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিল। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা যে আসলে সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের আপন স্বরূপশক্তি মূর্তিমতী হ্লাদিনী রাধার সহিত প্রণয়, কবিরা তাহা কখনও আভাসে-ইঙ্গিতে, কখনও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। (২) রাধা ও কৃষ্ণের বহিরঙ্গ রূপটা অনেকটা মানবিক থাকিলেও অন্তরের

মধ্য হইতে ধর্মীয় তাত্ত্বিক ভাবনা সর্বদাই প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে আসলে অপ্রাকৃত—মানবপ্রেম যদি লৌহ হয়, এই প্রেম তাহা হইলে সুবর্ণ—এই পার্থক্যটি বজায় রাখিবার আপ্রাণ চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন। (৩) বৃন্দাবনী রসতত্ত্ব অনুসারে পদরচনায় তাঁহারা উৎসাহ বোধ করিতেন। ব্যক্তিগত উপলব্ধি অপেক্ষা শাস্ত্রীয় নির্দেশকে তাঁহারা কম মূল্য দিতেন না।

সর্বাপেক্ষা বড় কথা হইল, চৈতন্যোত্তর বাংলা পদাবলীতে রচনার জোয়ার আসিল। এত বেশীসংখ্যক কবি এত বেশী সংখ্যায় কবিতা লিখিতে লাগিলেন যে তাহার সংখ্যানির্ণয় খুবই কঠিন।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিতায় নূতন বস্তু যাহা আসিল তাহাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া গীতিকবিতা রচিত হইতে আরম্ভ করিল। চৈতন্যের ব্যক্তিত্ব প্রেমবিগলিত রূপ, হৃদয়ার্তি, রাধাভাবে ভাবিত কৃষ্ণানুসন্ধান, নিমাইসন্ন্যাসের দুঃখ গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলীর বিষয়বস্তুরূপে গণ্য হইতে লাগিল। শুধু তাহাই নয়, বৈষ্ণব তত্ত্বভাবনানুসারে চৈতন্যদেব হইলেন "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ"। গৌরাঙ্গের ভাবচিত্র আঁকিতে গিয়া তাঁহার মধ্যে কখনো কৃষ্ণ, কখনো রাধার রূপ অনুভব করিয়াছেন কবিরা। আবার রাধার প্রেম ও বিরহের ভাব আঁকিতে গিয়া অনেক সময়ে চৈতন্যের রূপ ও ভাবনা আসিয়া পড়িয়াছে।

চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া বাংলা সাহিত্যে একেবারে নূতন একটি ধারা দেখা দিল। তাহা হইল জীবনীসাহিত্য। চৈতন্যের অলৌকিক জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া একাধিক জীবনচরিত রচিত হইতে লাগিল। চৈতন্যদেবই মানবিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্রে স্থাপন করিবার সাহস যোগাইলেন মধ্যযুগের কবিদের।

অন্যান্য সাহিত্যঃ চৈতন্যদেবের প্রভাব বাংলাকাব্যের অপরাপর ধারাগুলিকেও অনুরঞ্জিত করিল। ভাগবতপুরাণের অনুবাদের যে ধারা মালাধর বসুর হাতে শুরু হইয়াছিল, তাহা ঐশ্বর্যপ্রধান। চৈতন্যপ্রভাবে মাধুর্যপ্রধান কৃষ্ণলীলা-কাহিনীর দিকেই বাঙালী শ্রোতাদের ঝোঁক বাড়িয়া গেল। ভাগবতের যথাযথ অনুবাদের প্রশ্ন আর রহিল না। উহা হইয়া দাঁড়াইল কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার কাহিনীমূলক উপস্থাপন। রামায়ণ অনুবাদেও চৈতন্যপ্রভাব প্রকট। লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে বৈষ্ণবী বিনয় এবং ভক্তি লইয়া আসিল তরণীসেন। রামচরিত্রের কঠোরতা সম্পূর্ণ বিদূরিত হইল, সর্বত্রই কীর্তনগানের প্রেমঢলঢল ভক্তিরসসিক্ত একটা পরিবেশ। রামের হাতে ধনু ফেলিয়া বাঁশী পর্যন্ত তুলিয়া দিয়াছেন কোনো কোনো কবি। মহাভারতের মহাযুদ্ধের মধ্যেও কৃষ্ণের শক্তিময় বিপুল মূর্তির চারিপাশে ভক্তিবিহ্বলতার গভীর সুর লাগানো হইয়াছে। কাহিনীকে বিশেষ পরিবর্তিত না করিয়া কৃষ্ণভক্তিরস প্রচারের চেষ্টা মহাভারত-অনুবাদগুলিতে বিশেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

জীবনবোধ এবং সাহিত্যরূপ দুই দিক হইতেই মঙ্গলকাব্য বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য হইতে একেবারে পৃথক। বস্তুনিষ্ঠ, জীবনানুগ এই কাহিনীকাব্যের মধ্যেও চৈতন্যভাবুকতার স্পর্শ লাগিয়াছে। কোনো কোনো কবি মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই মাঝে মাঝে "পদ" যুক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ সোজাসুজি কৃষ্ণবিষয়ক পদ আনিয়া ভাবরসের সুরটি ধরাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। কেহ আবার কোনও চরিত্রের ভাবাবেগ প্রকাশ করিবার জন্য কিছু কিছু গীতিকবিতা আনিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের দেবকল্পনার রূঢ়তাও ক্রমে কোমল হইয়া আসিয়াছে। সামগ্রিকভাবে প্রাক্-চৈতন্য মঙ্গলকাব্যে যে ধর্মীয় সংঘাতের রূপ দেখা যায়, তাহা অনেকটা প্রশান্ত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্য রচনা একটা সাহিত্যিক pattern-এ পরিণত হইয়াছে। একজন কবি তো চণ্ডীর কাছে বিষ্ণুভক্তি চাহিয়াই লইয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের বন্দনা-অংশে নানা দেবদেবীর স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যবন্দনাও দেখা দিতে লাগিল। চৈতন্যদেব বাংলা সাহিত্যকে এক নবতর স্তরে সমুন্নীত করিলেন।

প্রশ্ন ৮। বাংলা ভাষায় রচিত মুখ্য চৈতন্য-জীবনীগুলির পরিচয় দাও। বাংলা সাহিত্যে এই নবধারাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া বল।

উত্তর: চৈতন্যদেবকে ভক্তরা ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মহাপুরুষ বলিয়া সর্বসাধারণে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহার অবির্ভাবের ফলে বাংলাদেশের জীবনে এক অতি প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যও নানা দিক দিয়া প্রভাবিত হইয়াছিল। সমগ্র মধ্যযুগ ধরিয়া বাংলাদেশে আর কেহই এরূপ একক ব্যক্তিত্ব এবং যুগনেতৃত্ব লইয়া দেখা দেন না। চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিয়া একটি স্বতন্ত্র কাব্যধারা বাংলাদেশে দেখা দিল—উহা হইল চৈতন্যচরিতকাব্য।

চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতেই প্রথম চরিতরচনার সূত্রপাত ঘটিল। তাঁহার ভক্ত বিশিষ্ট পাঠকেরা প্রথম চরিতরচনায় অগ্রসর হইলেন। এই সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল মুরারিগুপ্ত রচিত "কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত," পরমানন্দ সেন-কবিকর্ণপুরের "চৈতন্যচরিতামৃত" মহাকাব্য এবং "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটক। লেখক দুইজনই চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনীর অনেকটাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে সংকলন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনীকারেরা অনেক তথ্যই ইঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাংলায় লেখা প্রাচীনতম চৈতন্যচরিতকাব্য হইতেছে বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য-ভাগবত"। 'চৈতন্যভাগবত' খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা মত দিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবকে দেখিয়াছিলেন, তবে তাঁহার নবদ্বীপলীলা দেখেন নাই বলিয়া গ্রন্থমধ্যে আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যজীবনীর অধিকাংশ উপকরণ

নিত্যানন্দের নিকট পাইয়াছিলেন। অন্যান্য চৈতন্য-পারিষদের নিকট হইতেও কোনো কোনো ঘটনা পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বৃন্দাবন দাস তথ্য কিছু তৈরী করেন নাই, তবে নিজস্ব ব্যাখ্যায় তথ্যের রূপ বহু ক্ষেত্রে পাল্টাইয়া গিয়াছে। 'চৈতন্যভাগবত' তিনখণ্ডে বিভক্ত—আদি, মধ্য, অন্ত। আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর গয়াগমন পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণেই মধ্যখণ্ডের সমাপ্তি। অন্তখণ্ডে সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে গমন এবং নীলাচল বাসকালীন কতিপয় ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। তবে চৈতন্যজীবনের শেষাংশ এই গ্রন্থে খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ।

'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটির কাব্যমূল্য বিচার প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "চৈতন্য-ভাগবত বৃন্দাবনদাসের স্বতঃস্ফূর্ত রচনা। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র এবং নিত্যানন্দের মহিমা কবিকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিল যে, এই সুবৃহৎ কাব্যটির মধ্যে কবির লেখনী যেন কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। কবিত্ব ফলাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নাই, তথাপি চৈতন্য-চরিত্রের অপরিসীম মাধুর্য এবং কবির অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত ভক্তিরস চৈতন্যভাগবতকে অকৃত্রিম কাব্যের দীপ্তি দান করিয়াছে। চৈতন্যভাগবতের যে কোনো স্থান পড়িলেই ভক্ত কবিহৃদয়ের আবেগ পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইতে বিলম্ব হয় না।"

চরিতগ্রন্থ হিসাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের জীবনকে একটা বিশেষ আদর্শের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। চৈতন্যদেব যেন পাপে পূর্ণ পৃথিবীর ভূভার হরণ করিবার জন্য কলিকালে নররূপী স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান। এই বিশ্বাস নবদ্বীপের অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর মত তাঁহারও ছিল। ভাগবতের আদর্শে তিনি চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী লিখিতে চাহিয়াছেন। তবে চৈতন্যদেবের বাল্যকালের দুরন্তপনা, প্রথম যৌবনের উদ্ধত পুরুষকার এবং উজ্জ্বল পাণ্ডিত্য চমৎকার ব্যক্তিমূর্তিতে ধরা পড়িয়াছে তাঁহার রচনায়। তাহা ছাড়া 'চৈতন্যভাগবতে' সমসাময়িক ও ঐতিহাসিক নানাবিধ তথ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। ষোড়শ শতকের প্রথম পাদের ও তৎপূর্ববর্তী কালের পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস রচনার পক্ষে এই বিভিন্ন প্রকার তথ্যগুলি অতিশয় মূল্যবান।

লোচন দাসের "চৈতন্যমঙ্গল" 'চৈতন্যভাগবতের' পরবর্তী কালের রচনা। কাব্যটি মুখ্যভাবে গীত হইবার জন্য রচিত। মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের প্রত্যক্ষ অনুসরণ ইহার মধ্যে দৃষ্ট হয়। তথ্যের দিক হইতে বড় কিছু নূতন ইহার মধ্যে নাই। জীবনচরিত হিসাবে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ শ্রেষ্ঠতর রচনা, কিন্তু রচনালালিত্য এবং পল্লবিত কবিত্বে লোচনের কাব্য বৃন্দাবন দাসের কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবন দাসের কাব্য মূলতঃ বর্ণনাময় এবং লোচনের রচনা প্রধানতঃ রসাত্মক। ষোড়শ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা ছিলেন লোচন দাস। তাঁহার রচিত চৈতন্যজীবনীতে তাই গীতিকবিতার লালিত্য যে প্রচুর পরিমাণে মিলিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

চৈতন্যজীবনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুলিখিত এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতেছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত"। মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের চরিতকথা কেবল ইহাতেই পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত দার্শনিক মতের বিচার ও বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে সুনিপুণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের পাণ্ডিত্য ও ভক্তিমত্তার অনুযায়ী কাব্যটিও গভীর ও সরস হইয়াছে। ষোড়শ শতকের বাংলা ভাষায় এইরূপ একখানি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে যে কতটা শক্তির প্রয়োজন তাহা এই বইখানা না পড়িলে ধারণা করা শক্ত। মনীষার ও রসজ্ঞতার তুলাদণ্ডে বিচার করিলে 'চৈতন্যচরিতামৃত' অবিসংবাদিতভাবে আধুনিকপূর্ব বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি তিন খণ্ডে কল্পিত। আদিলীলার প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি মুখবন্ধ। তাহার পর মহাপ্রভুর চব্বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নবদ্বীপলীলার বর্ণনা। বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনের পর মধ্যলীলার পরিসমাপ্তি। ইহার পর শ্রীচৈতন্য আর নীলাচল পরিত্যাগ করেন নাই। এই সতেরো-আঠারো বছরের স্থূল ঘটনাগুলি এবং তাঁহার দিব্যোন্মাদের অবস্থা অন্ত্যলীলায় বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার তিরোধানের কোনো উল্লেখ এই গ্রন্থে নাই।

'চৈতন্যচরিতামৃত' চৈতন্যচরিতকাব্যমাত্র নয়। জীবনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের খুঁটিনাটি বিচার উপস্থিত করা হইয়াছে। সামান্যতম সুযোগেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের নানাদিক উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য সুপ্রচুর যত্ন লইয়াছেন। জীবনচরিত গ্রন্থের পক্ষে ইহা অনাবশ্যক বলা চলে না। কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবকে শুধু একজন অবতার পুরুষরূপেই দেখেন নাই, তাঁহার মধ্যে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের সমগ্রতা দেখিতে পাইয়াছেন। সেই ধর্মের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক পরিচিতি ছাড়া মহাপ্রভুর জীবনকাহিনী পরিপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সমালোচকদের মতে "তত্ত্বালোচনার দুস্তর সাগরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে কিরূপ অবলীলাক্রমে পয়ার ত্রিপদীর পাড়ি জমাইয়াছেন তাহা চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ না করিলে অনুমান করিতে পারা যায় না। যথাসম্ভব সংক্ষেপে অথচ কবিত্বের সহিত তথ্য ও তত্ত্বব্যাখ্যান কার্যে কৃষ্ণদাসের সফলতা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে দুরূহ কীর্তিরূপে চিরকাল বিরাজ করিবে।"

বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের সহিত 'চৈতন্যচরিতামৃতের' গোড়াকার পার্থক্য হইল চৈতন্য অবতারের স্বরূপ ব্যাখ্যানে। ইহাই কেন্দ্রীয় কথা। যে মহাপুরুষের জীবনী রচিত হইতেছে তাঁহার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্যের কেন্দ্রটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। উভয়েই সে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব ভক্ত হিসাবে অবতারত্বের দিক দিয়াই করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনী তত্ত্বে বিশ্বাসী। স্বরূপ দামোদর প্রভৃতির ন্যায় তিনিও এই সত্যটিকেই কেন্দ্রে রাখিয়াছেন যে, মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হইবার মুখ্য কারণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া স্বাত্মানন্দ অনুভব করা। কৃষ্ণের বিবিধ কার্যের সহিত

তাই রাধার ভাবানুভূতির ঐক্য খোঁজা হইয়াছে এই কাব্যে। বিশেষ করিয়া মহাপ্রভুর নীলাচলবাসের শেষ বৎসরগুলির দিব্যোন্মাদে মাথুর বিরহের রূপ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন।

জয়ানন্দ "চৈতন্যমঙ্গল" নামক যে-গ্রন্থটি লিখিয়াছিলেন তাহাও পাঁচালী ধরনের কাব্য। ইহার মধ্যেও উপাদান হিসাবে ইতিহাস ও জনশ্রুতি মিশিয়া গিয়াছে। জয়ানন্দের কাব্যটির রচনাকাল ষোড়শ শতকের শেষভাগ। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের তিরোধানের যে কাহিনী আছে তাহা অন্য প্রমাণ না পাইয়া গ্রহণ করা চলে না।

'গোবিন্দ দাসের কড়চা" নামে অপর একখানি গ্রন্থের প্রামাণ্যতা এক সময়ে স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের গবেষণা ইহাকে আর অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণের পক্ষপাতী নয়।

চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নানা দিক দিয়া তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ ব্যক্তির জীবনেতিহাস এবং দেশ-কালের প্রকৃত পরিচয় সম্বলিত গ্রন্থরচনার দরজাটি এই প্রথম উন্মুক্ত হইল। বাংলা সাহিত্য মানুষের জীবন ও মাহাত্ম্যকে কাব্যের কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া এবং তাহা করিতে গিয়া যথার্থ ঐতিহাসিকত্ব বজায় রাখিবার যে চেষ্টা তাঁহাদের করিতে হইল, বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ইতিহাসে তাহা অন্যত্র ঘটে নাই। তাহা ছাড়া চৈতন্যদেবের জীবনী রচনা করিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ সমকালের যে ইতিহাস ইঁহারা লিখিয়াছেন, কাহিনী ও গীতিপ্রধান বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনো কোন চৈতন্যচরিত গ্রন্থ আবার দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্মকথা আলোচনা করিতে গিয়া বাংলা ভাষার নূতন শক্তি প্রকাশ করিলেন। কবিতার ভাষায় এইরূপ দুরূহ কায সিদ্ধ করা কম শক্তির পরিচায়ক নয়। আসলে জীবনসাহিত্য বা তত্ত্বালোচনা—দুইটিই ভাবাবেগপূর্ণ কাহিনীকাব্য বা ললিত উচ্ছ্বসিত গীতিকবিতা হইতে স্বতন্ত্র জাতের বস্তু। উহার জন্য হৃদয়ের আবেগ অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার অনেক বেশী প্রয়োজন। পরবর্তী কালে প্রবন্ধসাহিত্যই এই অংশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। পুরাতন বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যচরিতগ্রন্থের শাখা বাংলা ভাষায় ভবিষ্যৎ প্রবন্ধ সাহিত্যের বীজ বপন করিয়াছে।

প্রশ্ন ৯। চরিতগ্রন্থের আদর্শ কি? বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে চৈতন্য-চরিতশাখার গুরুত্ব কোথায়? 'চৈতন্যভাগবত' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে চরিতগ্রন্থ হিসাবে তুলনামূলক বিচার কর।

উত্তর: চরিতগ্রন্থের লক্ষ্য হইল মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী বিবৃত করা।

সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনী লিখিবার প্রশ্ন আসে না। বিশিষ্ট ব্যক্তি, জীবনের কোনো-না-কোনো দিকে কৃতী মানুষ অথবা মনীষীদেরই জীবনকাহিনী রচিত হইয়া থাকে। জীবনকাহিনীর মধ্যে আমরা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনের সমগ্র তথ্যই পাইতে চাই। কিন্তু শুধু তথ্য পাইয়াই আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না। উহার মধ্যে তাঁহার মাহাত্ম্যটি অনুভব করিতে চাই। তাঁহার ব্যক্তিত্বটি বুঝিতে চাই, তাঁহার জীবনসাধনার কেন্দ্রটি খুঁজিতে চাই। সূত্রাকারে একখানি চরিতগ্রন্থের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে—

(১) উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনের সম্ভবমত সকল তথ্যই সংকলন করিতে হইবে। জীবনীকারের প্রথম কাজ তথ্য সংকলন। তথ্য সংকলনে অবহেলা বা অপ্রাচুর্য ভুল সিদ্ধান্তে লইয়া যাইবে। ছোট বড সব তথ্যই সংকলন করিতে হইবে। কারণ বাহির হইতে দেখিয়া কোন্ তথ্য ছোট, কোন্ তথ্য গুরুত্বপূর্ণ তাহা বুঝা যাইবে না। প্রথম দিকে তাই নির্বাচনের প্রশ্নই ওঠে না।

(২) প্রাপ্ত তথ্যাদি বারংবার পর্যালোচনা করিতে করিতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে একটি মূল ব্যাখ্যান, তাঁহার মাহাত্ম্য এবং গৌরব সম্বন্ধে একটি সত্য পরিচয় পাওয়া যাইবে। এমন হইতে পারে দুইজন জীবনীকার একই ধরনের তথ্যের পর্যালোচনা করিয়া একই ব্যাখ্যানে গিয়া পৌঁছাইলেন না। সেইরূপ পার্থক্যের সম্ভাবনা মানিয়া লইতে হইবে। সে ক্ষেত্রে যাঁহার ব্যাখ্যান তথ্যের প্রাচুর্যদ্বারা অধিক সমর্থিত এবং যুক্তিদ্বারা অধিক সত্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাই সবিশেষ নির্ভরযোগ্য।

(৩) লেখক এইভাবে পর্যালোচনার মধ্য দিয়া যে জীবনসত্যটি লাভ করিলেন তাহারই সূত্রে তখন তথ্যবিন্যাস করিতে হয়। সেই সত্যের আলোয় তথ্য নির্বাচনও করিতে হয়। এইভাবে নির্বাচন ও বিন্যাসের মধ্য দিয়া যেন উক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকট হইয়া ওঠে। যদি তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব সূচিত না হয় তাহা হইলে চরিতরচনাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলি বিশেষ করিয়া "চৈতন্যভাগবত" এবং "চৈতন্যচরিতামৃত" —এই মুখ্য চরিতগ্রন্থ দুইটি কতটা আদর্শ জীবনারূপে গ্রাহ্য হইবে, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যজীবনকে অবলম্বন করিয়া চরিতগ্রন্থ রচনার প্রবর্তন ঘটিল। এদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা নানাদিক হইতেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চৈতন্যদেব বাংলাদেশের মধ্যযুগকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিলেন। বাঙালী জাতির জীবনে সেকালে এরূপ মহৎ ও সামগ্রিক ভাবান্দোলন আর দেখা যায় নাই। চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বন করিয়া রচিত জীবনীগ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নূতন পথ খুলিয়া দিল। এতকাল কাহিনীকাব্য, পদাবলী এবং

অনুবাদকাব্য রচনাই ছিল বাঙালী সাহিত্যিকদের একমাত্র প্রয়াস। দেবতার মাহাত্ম্যগানই সেখানে লক্ষ্য। মানবজীবনের রূপ তাহার চারিপাশে আপনি আসিয়া যাইত। এই প্রথম মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা মানবচরিত রচনার লক্ষ্যে আপনাদের সাহিত্যিক চেষ্টা নিয়োজিত করিলেন। ইহা সেকালের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলা সাহিত্যে মানবমূল্যবোধ প্রকাশের দিক হইতে ইহা যে একধাপ অগ্রগমন তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহা ছাড়া ইহাও লক্ষণীয় আখ্যানকাব্য কিংবা নীতিকবিতায় ভাবাবেগ, উচ্ছ্বাস, সুরের তরল লালিত্য, হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রভৃতিই বিশেষ করিয়া প্রয়োজনীয়। চরিতগ্রন্থ কিন্তু জ্ঞান-পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি, বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, মননের চর্চার উপরে নির্ভর করে। ইহা গদ্যসাহিত্যেই সম্যক প্রকাশ পাইতে পারে। কাব্যের বিষয় ইহা নয়। কিন্তু পুরাতন বাংলা সাহিত্যে গদ্যের প্রচলন ছিল না—কাব্যই গদ্যের কাজ করিয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির মধ্যে 'চৈতন্যভাগবত' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' এই দুইখানিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ। প্রথমখানি বৃন্দাবন দাসের লেখা, দ্বিতীয়খানির লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভাগবত" বাংলা ভাষায় লেখা চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী-গ্রন্থ। গ্রন্থটির যাবতীয় তথ্যই চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পারিষদবর্গের নিকট হইতে সংকলিত। বেশীর ভাগ নিত্যানন্দ গোস্বামীর সূত্রে প্রাপ্ত। কবি কল্পনা করিয়া কিছু সংযোজন করেন নাই। বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার বিবরণ এই চরিতগ্রন্থে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। অপরপক্ষে চৈতন্যদেবের নীলাচলে বাসকালীন শেষ জীবন সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত এবং খণ্ডিত। তথ্যচয়ন প্রভৃতির দিক দিয়া মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য সন্দেহ নাই।

'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটি চরিতগ্রন্থ হিসাবে মূল্যবান নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য—

(১) সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই গ্রন্থটি রচিত। সেই কারণেই কাব্যের শেষাংশ অসম্পূর্ণ—অনেক গবেষক এইরূপ মনে করেন। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষদর্শী না হইলেও (অল্প বয়স হেতু) চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। চরিত-রচয়িতার পক্ষে ইহা কম কথা নয়। গ্রন্থটি তথ্যগতভাবে নির্ভুল হইবার একটি বড় সম্ভাবনা রহিয়াছে ইহার মধ্যে। তাহা ছাড়া চৈতন্যদেবের ভগবত্তা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার ফলে চরিতগ্রন্থে মানবিক রূপ অনেক বেশী প্রকট হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। বৃন্দাবন দাসের চরিতগ্রন্থটিতে এই দুইটি গুণই বর্তাইয়াছে।

(২) বৃন্দাবন দাসের তথ্যের সূত্র খুবই -নির্ভরযোগ্য। নিত্যানন্দ গোস্বামীই প্রধানতঃ তথ্য-পরিবেশক। অপরাপর পারিষদবর্গের নিকট হইতেও কিছু গৃহীত হইয়াছে। তথ্যের ক্ষেত্রে কিছুই তিনি কল্পনা করিয়া লন নাই।

(৩) চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পূর্বেকার এবং সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের এইরূপ ইতিহাসসম্মত বিবরণ খুব কম গ্রন্থেই মিলিতেছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে ঐতিহাসিক প্রেকৃত পটভূমিতে দাঁড় করাইয়াছেন তাঁহার জীবনীকার।

(৪) চৈতন্যদেবের শৈশবজীবনের দুরন্ত রূপটি প্রাণবন্ত হইয়াছে বৃন্দাবন দাসের লেখায়। কিশোর চৈতন্যদেবের পাণ্ডিত্যের অহমিকায় দৃঢ়ভাস্বর একটি ব্যক্তিত্বও প্রকাশ করিয়াছেন লেখক বিশেষ নির্ভরযোগ্য ভাবে। চরিতকাররূপে বৃন্দাবন দাসের গৌরবটি তথ্যবিন্যাস ছাপাইয়া ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সমর্থ হইয়াছে।

(৫) বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের ভক্তগণের ন্যায় চৈতন্যদেবের অবতারত্ব সম্বন্ধে একটি বিশেষ ধরনের বিশ্বাস মনে মনে পোষণ করিতেন। নবদ্বীপের ভক্তরা চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের পূর্ণাবতার বলিয়া মনে করিতেন। ভগবান কৃষ্ণ কলিযুগে পাপের বিনাশ এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সংকীর্তনরূপ অস্ত্র লইয়া চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। বৃন্দাবন দাস এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া চৈতন্যজীবন ব্যাখ্যানে কিছু কিছু অলৌকিকতা আনিয়া ফেলিয়াছেন। চৈতন্যের বাল্যলীলার বহু ঘটনার সহিত ভাগবতপুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার সাদৃশ্য দেখাইয়া দিয়াছেন। চৈতন্যদেব সম্পর্কে নবদ্বীপের আদি ভক্তবৃন্দের মত বৃন্দাবন দাসেরও ইহাই কেন্দ্রীয় ভাবনা। একালের দৃষ্টিতে দেখিলে ইহার মধ্যে কিছুটা অবিশ্বাস্য অলৌকিকতা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের পরিবেশের কথা ভুলিলে চলিবে না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ কিছুকাল পরে রচিত হয়। এই গ্রন্থে চৈতন্যের জীবনী এবং দর্শন ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কীয় মতামত খুবই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাস সহ পূর্ববর্তী চৈতন্যজীবনীগুলি (বাংলা এবং সংস্কৃত উভয় ভাষায় রচিত) ভালোভাবে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। তাহা ছাড়া বৃন্দাবন এবং নীলাচলবাসী বহু চৈতন্য-পারিষদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের সহায়তা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তথ্যসঞ্চয়ের ক্ষেত্রে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মন ছিল খাঁটি প্রারম্ভিকের ন্যায় যুক্তিবাদী। ভাবাবেগ তাঁহার ছিল না এমন নয়; কিন্তু মননের নিকটে উহা গৌণ হইয়া পড়িয়াছিল। বৃন্দাবন দাসের প্রতি তিনি গ্রন্থমধ্যে বিস্তর শ্রদ্ধাও দেখাইয়াছেন। তাই মনে হয়, যেখানে তিনি বৃন্দাবন দাস অপেক্ষা স্বতন্ত্র তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, সেখানে সুনিশ্চিত প্রমাণ না পাইয়া সেইরূপ করেন

নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়-রহিত। চরিতগ্রন্থ হিসাবে ইহার মূল্য বিচার করিলে দেখা যাইবে যে—

(১) কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রাবন্ধিকের মন লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া তথ্য নির্বাচন করিয়াছেন। মননের দ্বারা ভক্তিকে তিনি সংযত করিতে পারিয়াছেন। তাই তথ্যের দিক হইতে তাঁহার গ্রন্থ বৃন্দাবন দাস অপেক্ষাও নির্ভরযোগ্য। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে আদিলীলার তথ্যসমৃদ্ধ, প্রায় পূর্ণাঙ্গ, বর্ণনা স্থান পাইয়াছে বলিয়া তিনি আপন গ্রন্থে নবদ্বীপখণ্ডের কথা প্রায় সূত্রাকারে সারিয়াছেন, 'চৈতন্যভাগবতে'র উপর পূর্ণতর প্রসঙ্গের জন্য বার বার বরাত দিয়াছেন। কিন্তু মধ্য ও অন্ত্যলীলার ক্ষেত্রে তাঁহার গ্রন্থ অত্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ উপস্থিত করিয়াছে। তিনি প্রায়ই প্রাপ্ত তথ্যাবলী কোন্ কোন্ সূত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে গ্রন্থখানি তথ্যের প্রামাণিকতার দিক দিয়া আরও নির্ভরযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

(২) কৃষ্ণদাস কবিরাজ পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বিপুল গ্রন্থটিতে আদ্যন্ত ছড়াইয়া আছে। যেমন তাঁহার সুবিস্তৃত অধ্যয়ন, তেমনি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ অনুধাবন ও মননক্ষমতা। চৈতন্যজীবনী রচনায় তিনি ইহাকে কাজে লাগাইয়াছেন। চৈতন্যদেব কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিকট একই সঙ্গে একটি ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁহার ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য উদ্ঘাটনেই তিনি চরিতকারের কর্তব্য সমাপন মনে করেন নাই। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের যে অভিব্যক্তি ঘটিল—একটি বিপুল ধর্মান্দোলন সম্ভাবিত হইয়া উঠিল, তাহাও তিনি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' তাই একসঙ্গে মহাপ্রভুর জীবনকাহিনী এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম ও দর্শনতত্ত্বের ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণের একখানি কোষগ্রন্থ। ঘটনার সঙ্গে তত্ত্বকে মিলাইয়া একাকার করিয়া ফেলা বড় সহজ কাজ নয়। কবিরাজ গোস্বামী সুকৌশলে সেই দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

(৩) চৈতন্যদেবের নীলাচলবাসের শেষ কয় বৎসরের চিত্রাঙ্কনে কবিরাজ গোস্বামীর কবিত্বশক্তি মননকে ও তত্ত্বভাবনাকে ছাপাইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দিব্যোন্মাদ অবস্থায় তাঁহার ব্যাকুলতা, তাঁহার রাধাভাবে কৃষ্ণানুসন্ধান জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে কৃষ্ণদাসের রচনায়। ইহা শুধুমাত্র তথ্য সাজাইয়া প্রকাশ করিবার নয়। ইহা তথ্যাতিরিক্ত ব্যক্তিসত্যের প্রকাশ। ইহাকে সার্থক ভাষারূপ দান করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই কবিরাজ গোস্বামীর উচ্চ প্রশংসা করিতে হয়।

(৪) কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে চৈতন্য সম্পর্কীয় যে কেন্দ্রীয় ভাবনাটি প্রকাশ পাইয়াছে, যে ভাবনার উপরে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে, তাহা বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ হইতে মূলতঃ স্বতন্ত্র। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যকে রাধাভাবে বিগলিত, রাধার

কান্তি আশ্রয়কারী শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। নিজ প্রেমের মহিমা আস্বাদন করিবার' জন্যই তাঁহার ধরাধামে পূর্ণাবির্ভাব। যুগধর্ম-প্রবর্তনাদি গৌণ কর্ম। প্রেমলীলাই (এ ক্ষেত্রে স্বপ্রেমমাধুর্যের স্বাদগ্রহণ) পূর্ণাবির্ভাবের মুখ্য কারণ।

প্রশ্ন ১০। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রচলিত বাংলা গীতিকবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ইহার মধ্যে ভাব ও রূপগত যে সব বৈশিষ্ট্য প্রকট তাহা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর: পুরাতন বাংলা সাহিত্যে মূলতঃ দুইটি স্বতন্ত্র কাব্যরীতির প্রচলন ছিল: (১) আখ্যানকাব্যের রূপরীতি ও (২) পদাবলী। আখ্যানকাব্যে চরিত্র-চিত্রণ ও কাহিনীকথন মুখ্য। বর্ণনা ও ভাবাবেগের প্রকাশ উহার সহিত বিজড়িত অবস্থায় প্রকাশ পায়। মঙ্গলকাব্যের শাখাটি পুরাতন আখ্যানকাব্যের সর্ববৃহৎ মৌলিক শাখা। অপর প্রধান শাখাটি অনুবাদাত্মক। ইহা ছাড়াও অন্যান্য ধরনের কিছু আখ্যানও মিলিতেছে। পদাবলীই হইল পুরাতন বাংলার গীতিকবিতা। ইহার মধ্যে কোনো কাহিনীকথনের বা চরিত্রচিত্রণের উদ্দেশ্য নাই। মানবহৃদয়ের বিচিত্র ভাবাবেগ, অনুভূতি ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করাই ইহাদের লক্ষ্য। সেকালের বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটি নানা প্রশাখায় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

বাঙালী জাতির চরিত্রের মধ্যেই রহিয়াছে গীতিপ্রাণতা। ভাবনার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়ালু তারল্য, উচ্ছ্বাসাতিরেক, প্রকাশভঙ্গির লালিত্য জাতিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবেই বাঙালীর মনোলোকের সহিত সমন্বিত হইয়াছিল। বাঙালীর হাতে পড়িয়া তাই অতি সহজেই সংস্কৃত চূর্ণশ্লোক উহার সংহত চিত্রধর্ম হারাইয়া বিলম্বিত সংগীতের উচ্ছ্বসিত তারল্যে আত্মপ্রকাশ করিল। আদি বাংলা কবিতা চর্যাপদ খণ্ডকবিতা; কিন্তু সংস্কৃতরীতির শ্লোক নয়। উহা পদ। চর্যাকারেরা বাংলা ভাষায় প্রথম যে কাব্য লিখিলেন, বাঙালীর জাতিগত একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য উহার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। তাহা গীতিপ্রাণতা। চর্যার কবিতাগুলি (১) দুই-চারি পংক্তির সংহত চিত্র নয়, উহা বহুচরণবিশিষ্ট দীর্ঘায়ত; (২) চরণে চরণে অন্ত্যানুপ্রাসের মঞ্জীর বাজিতেছে। ইহার অনিবার্য ফল হইল একটি সংগীত-ময়তা। সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখিতে গিয়াও বাঙালী জয়দেব এই একই ধারার পদ রচনা করিলেন—কান্ত কোমল পদাবলীর ক্ষীণসূত্রে গাঁথা আখ্যান "গীতগোবিন্দ"—শ্লোকবদ্ধ কাব্য নয়। জয়দেব, চর্যাকার এবং প্রাকৃতপৈঙ্গলের কবিরা মিলিয়া বাংলা পদসাহিত্যের রূপরীতিটি বাঁধিয়া দিলেন তুর্কিবিজয়ের বহু পূর্বেই।

বাংলা পদসাহিত্যের ধারাটি পরবর্তী কালে নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়াছে। উহাদের স্বতন্ত্র করিয়া পরিচয় গ্রহণ করা উচিত: (১) বৈষ্ণব পদাবলী

(২) শাক্ত পদাবলী, (৩) বৈষ্ণব সহজিয়া কবিতা (৪) বাউল ও সূফী কবিতা প্রভৃতি। চর্যাপদের প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চর্যাপদে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মসাধকেরা তাঁহাদের ধর্মসাধনার নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ চিত্রাকারে উপস্থিত করিয়াছেন। এই চিত্রগুলির মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই কাম্যবস্তু লাভ করিবার জন্য সাধকচিত্তের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। চর্যাপদের বহু কবিতা শুধুই তত্ত্বের রূপক। সংগীতোচ্ছ্বাস যে সর্বত্র প্রকাশ পায় নাই, সে কথা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কিছু কিছু কবিতায় তত্ত্বপ্রকাশক রূপকটির সহিত কবিহৃদয়ের আবেগোচ্ছ্বাস তীব্রভাবে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। সেখানে গীতিসুর নিঃসন্দেহে বাজিয়া উঠিয়াছে।

তবুও সত্য সেখানে অবাঙ্‌মানসগোচর। কবিসাধকের লক্ষ্য সেখানে নির্বিকল্প অবস্থাপ্রাপ্তি, রূপজগৎ সেখানে ভ্রান্তির ছলনা। সহজ কবিত্ব, সৌন্দর্যসৃজন ও ভাবাবেগের তীব্র গভীর প্রকাশ সেক্ষেত্রে খুব অপেক্ষিত নয়। তুলনামূলক ভাবে বাউলগানে বা বৈষ্ণব সহজিয়া সংগীতে তত্ত্বকথা ভেদ করিয়া হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। বাউলসাধক সত্যকে মনের মানুষ করিয়া লইয়াছে। তাই বিরহের তীব্র বুকফাটা ক্রন্দন ভাষারূপে ধরা পড়িয়াছে। বাউল কবিতায়ও তত্ত্বকথার প্রত্যক্ষতা আছে, কিন্তু বেদনাবোধ যেন কবির ব্যক্তিত্বকে অনেকখানি স্পর্শ করিয়াছে। বৈষ্ণব সহজিয়াদের কবিতা অবশ্য কবিতা হিসাবে আরও সার্থক। ইহাদের মধ্যে প্রেমকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রেম ধর্ম বলিয়া প্রেমানুভূতির সূক্ষ্মতা ও অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি প্রকাশে দুএকজন কবি আশ্চর্য নিপুণতা দেখাইয়াছেন—যেমন চণ্ডীদাস। তবে তাঁহার কবিতা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সম্পদ বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। সহজিয়াদের কবিতায় মাঝে মাঝে রূপক ও প্রহেলিকার অতিরেকও চোখে পড়ে। যে কোনো সাধনসংগীতেই ইহার বাড়াবাড়ি থাকিবে। কবিতা হিসাবে ইহা নিশ্চয়ই খুব উচ্চশ্রেণীর নয়। যেখানেই মানবিক ভাবাবেগ তীব্র গভীর ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই গীতিসৌন্দর্য দেখা দিয়াছে।

শাক্ত পদাবলীর মধ্যে দুই জাতের কবিতা আছে—(ক) উমাবিষয়ক ; (খ) শ্যামাবিষয়ক। উমাবিষয়ক কবিতাগুলি মানবিক রসে পরিপূর্ণ। ইহার পশ্চাৎপটে বাংলাদেশের গ্রামের চিরকালীন দুঃখকাহিনী গুপ্ত আছে। তাহা ছাড়া পৌরাণিক শিবদুর্গা কাহিনীর পটভূমিও এই কবিতাগুলির পিছনে রহিয়াছে। কিন্তু এই কবিতাগুলি কাহিনীকথন বা চরিত্রচিত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই। ইহাদের মধ্যে সদ্যবিবাহিতা বালিকা কন্যা উমা এবং কন্যাবিরহবিধুরা জননী মেনকার চিত্ত-আন্দোলন নানা তরঙ্গে ধরা পড়িয়াছে। মাতা কন্যার মান-অভিমান, আসন্ন-মিলনের আগ্রহ, বিচ্ছেদকাতরতা সুন্দর সরল ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে।

শাক্ত কবিতার অপর শ্রেণী শ্যামাবিষয়ক। এইগুলি সংখ্যায় অনেক বেশী। এইগুলির মধ্যে তান্ত্রিক সাধকের কালীরূপ ধ্যান এবং মুক্তির আকূতি বিচিত্র সুর ও ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে। শক্তিরূপিণী ভয়ংকরী দেবী মাতৃরূপা কোমলা শ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তির অনাবিল ব্যাকুলতা এবং মাতৃ-উপলব্ধির বিচিত্র সুর এই কবিতাগুলিকে বিশেষ আস্বাদ দিয়াছে। তবে শাক্ত পদাবলীর শ্যামাসংগীতও সাধনসংগীত। ইহার মধ্যে এমন কবিতার সংখ্যা বড় কম নয়-যাহার মধ্যে সাধনতত্ত্বঘটিত শুষ্ক বিবরণ, রূপকধৃত ধর্মভাবনা বা সাংকেতিক ভাষায় ব্যঞ্জিত গূঢ় কথা স্থান পাইয়াছে। অবশ্য প্রকৃত গীতিকবিতার হৃদয়ব্যাকুলতাও বড় কম নাই।

মধ্যযুগের গীতিকবিতার প্রধান শাখাটি বৈষ্ণব কবিতার। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে যত বেশী কবিতা, যত ভালো কবিতা, ভাব-রস-সুর ও রচনাকলার যত বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে এমন আর কোনো শাখায় নয়। প্রাকচৈতন্যপর্বের বৈষ্ণব পদাবলী যেমন লৌকিক প্রণয়কবিতারূপেই গ্রাহ্য, সেইরূপ চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিতায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বভাবনা ও দর্শনচেতনার ছায়াপাত ঘটিয়াছে। কিন্তু কোনো স্তরেই মানবপ্রেমের বিচিত্র সৌন্দর্য এবং গভীর ভাবনা অপ্রকাশিত থাকে নাই। তত্ত্বের দিক হইতে কোনো গভীরতর অর্থ থাকিলেও বৈষ্ণব পদাবলী রসের দিক হইতে মানবপ্রণয়ের কবিতা। মানবপ্রণয়ের আলোছায়ার বিচিত্র লীলা ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার পটভূমিতেও রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার কাহিনী রহিয়াছে; চরিত্রপরিকল্পনাও যে একেবারে নাই এমন নয়। কিন্তু উহা পদগুলির প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নয়। পদগুলি ভাবানুভূতির বিচিত্র সুর ও উচ্ছ্বাস শুধু প্রকাশ করিয়াছে, ঘটনাবিন্যাসাদির উপর নির্ভর করিয়া থাকে নাই। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে এমন কয়েকজন সত্যকার প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছে যে বিস্মিত হইতে হয়। চণ্ডীদাসের কবিতায় অলংকারবিরলতাই ভাবগভীরতার অতল স্তরে পাঠকদের লইয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রসাধননৈপুণ্য এবং আভিজাত্য ও নাগর বৈদগ্ধ্য আস্বাদ্য। গোবিন্দ দাসের চিত্ররচননৈপুণ্য এবং জ্ঞানদাসের গীতিবিহ্বল রূপমুগ্ধতা স্বাদবৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে।

কালানুক্রমের দিক দিয়া বিচার করিলে চর্যাগানগুলির স্থান সর্বাগ্রে। ইহা বাংলা সাহিত্যের প্রথম রচনা। তুর্কিবিজয়ের পূর্বেই ইহা রচিত। বৈষ্ণব পদাবলীর আদিরূপ মিলিবে জয়দেবের সংস্কৃত কাব্যে। তুর্কিবিজয়ের পরবর্তী কালে বড়ুচণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতির বাংলা পদাবলী এবং বিদ্যাপতির ব্রজবুলি কবিতার মধ্য দিয়া ইহা বিকশিত হয়। ইহার পরে ঘটে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। বৈষ্ণব পদাবলীর উপরে ইহার গুরুতর প্রভাব বর্তায়। তৎকালীন বিশিষ্টতম কবিরা হইলেন জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরামদাস, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, শেখর প্রভৃতি। ইঁহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর

শেষ পর্যন্ত এই ধারাটি বহমান রাখিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সহজিয়া পদ চৈতন্যের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালে সুপ্রচুর লেখা হইয়াছে। কবি হিসাবে ভণিতায় বিশিষ্ট মহাজন পদকর্তাদের নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহার যাথার্থ্যে অবশ্য সন্দেহ করার কারণ আছে। সাধারণ স্তরের কোনো কোনো কবিই হয়তো ইহাদের রচয়িতা।

বাউল গানের রচয়িতা হিসাবে হিন্দু মুসলমান দুই ধরনের কবিই পাইতেছি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কবিই বেশী। শাক্ত পদাবলীর আবির্ভাব অষ্টাদশ শতকে। রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি।

পুরাতন গীতিকবিতা বা পদসাহিত্যের ধারাটির বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় বাঙালীর প্রাণধর্মের সহিত ইহার কিরূপ সাযুজ্য ঘটিয়াছিল।

প্রশ্ন ১১। রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদের ন্যায় ভাগবত-পুরাণের অনুবাদ সেরূপ জনপ্রিয় হয় নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই ধারণা কি সত্য? এরূপ হইলে কেন হইয়াছে কারণ নির্দেশের চেষ্টা কর।

উত্তর: রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত এই তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতকের আবির্ভাবকালের অনুবাদক-কবি হিসাবে কৃত্তিবাস (রামায়ণ), সঞ্জয় (?), কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী (মহাভারত) এবং মালাধর বসুর (ভাগবত) নাম উল্লেখ করা চলে। বাংলা অনুবাদ কাব্যের ধারাটি অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ চলিয়াছে সমান উৎসাহে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। তাহাদের মধ্যে সুরের কিছু পরিবর্তন ঘটিলেও অনুবাদ ব্যাপারটি চলিয়াছে অব্যাহতভাবে; কিন্তু ভাগবতপুরাণের খাঁটি অনুবাদ পরবর্তী কালে বড় দেখা যায় না। ভাগবতের অনুবাদের স্থানে কৃষ্ণ-রাধার বিভিন্ন লীলাকাহিনী (দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি) পল্লবিত রূপ লইয়া দেখা দিতে লাগিল। ক্বচিৎ দু-একজন মোটামুটি ভাগবতের কাহিনীধারা অনুসরণ করিলেন। অধিকাংশই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রীতিতে লীলামূলক ঘটনার দিকেই ঝোঁক দেখাইলেন, ঐশ্বর্যমূলক কীর্তিকথায় নয়। ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হইবে না যে, ভাগবতপুরাণ অনুবাদে কবিরা বিশেষ উৎসাহ পাইতেন না। কারণ পাঠক-শ্রোতা সমাজে ইহার বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল না। পাশাপাশি রামায়ণ এবং মহাভারত অনুবাদে কবিদের উৎসাহ ছিল ক্লান্তিহীন। কেন এইরূপ ঘটিল তাহা ভাবিবার মতো।

মনে হয় কোনো একটিমাত্র কারণের জন্য এইরূপ ঘটে নাই। অনেকগুলি কারণ একত্র হইয়া এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে :—

প্রথমতঃ, রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে কাব্যগুণের দিক দিয়া ভাগবতপুরাণের

তুলনাই হয় না। রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ এবং জীবন-ব্যাখ্যান পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টির সমতুল। অনুবাদে মূলের আস্বাদ অনেকখানি বিনষ্ট হইলেও সামান্য কিছু অবশিষ্ট থাকিবে এইরূপ ভাবিবার অবকাশ আছে। মহৎ সাহিত্যের সেই ছিটেফোঁটার রসাস্বাদও আপামর জনসাধারণ প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছে। তুলনায় ভাগবতপুরাণ ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের দিক হইতে কতকটা প্রচারধর্মী। উচ্চ সাহিত্যিক কুশলতা মূল সংস্কৃত গ্রন্থেও ততটা নাই। কাজেই অনুবাদের কাব্যমূল্য কিছুতেই মহাকাব্যদ্বয়ের অনুবাদের সমতুল হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, রামায়ণ-মহাভারত ভারতীয় হিন্দুমাত্রের ধর্মগ্রন্থ। সর্বশ্রেণীর হিন্দুই অনায়াসে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার লাভ করিতে পারে। রামাইত সম্প্রদায়ের জন্য রামায়ণের আবেদন সীমাবদ্ধ নয়, বৈষ্ণবদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নয় মহাভারত। পক্ষান্তরে ভাগবতপুরাণ বিশেষ করিয়া কৃষ্ণ-বিষ্ণু ভক্তসম্প্রদায়ের নিজস্ব গ্রন্থ। সব পুরাণের পরিকল্পনায়ই কতকটা সাম্প্রদায়িক ছাপ আছে। ভাগবতপুরাণও তাহা হইতে মুক্ত নয়। অপর সম্প্রদায়ের নিকট তাই ইহা আদরণীয় হইতে পারে নাই।

তৃতীয়তঃ, কিন্তু যে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইহা পবিত্র গ্রন্থ, তাঁহারাও কি ইহার উপরে সম্পূর্ণতঃ নির্ভর করিতে পারিয়াছেন? চৈতন্য-পরবর্তী সুসম্বদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় তাঁহাদের দার্শনিক তত্ত্বভাবনার দিক হইতে ভাগবতের প্রত্যয় হইতে বহু দূরবর্তী হইয়া পড়িলেন। ভাগবতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপই প্রকটিত। তিনি ভূভার হরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে বার বার অবতীর্ণ হইয়াছেন। দ্বাপরে আবির্ভাবের কারণও তাহাই, পাপে পূর্ণ ধরিত্রীর উদ্ধার। সেই ধর্মাদর্শের দিক হইতে কৃষ্ণের বীর্যমূলক কর্মাদি বর্ণিত হইয়াছে ভাগবতে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে, কৃষ্ণলীলার মূল কারণ রসাস্বাদন। রাধিকার প্রেমরসাস্বাদনের বিচিত্রতা উপভোগ করিবার জন্যই তিনি বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। স্বকীয়া রাধার সঙ্গে পরকীয়া প্রেমের অভিনব আস্বাদটি তিনি পাইতে চান। প্রসঙ্গক্রমে সখ্য বাৎসল্য অন্যান্য লীলারসও তিনি আস্বাদ করিবেন। ভাগবতের দৃষ্টিভঙ্গিতে বৃন্দাবনবাসকালীন মাধুর্যলীলা গৌণ। উল্লেখ্য ভাগবতে রাধার নাম পর্যন্ত নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে, বৃন্দাবনের মাধুর্যলীলাই মুখ্য। রাধাই এই লীলার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিতা। তিনিই কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সার। মথুরা-দ্বারকা-কুরুক্ষেত্রের ঐশ্বর্যাত্মক ভূভারহরণকার্য গৌণ। ফলে গৌড়ীয় ভক্তেরা ভাগবতকে যতটা শ্রদ্ধা জানান ততটা গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণব পদাবলী তাঁহাদের দাবি মিটায়। উহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা শতধারে ভাষাছন্দে বর্ষিত হইয়া প্লাবনের সৃষ্টি করে। উহার সহিত যদি কোনো কবি কাহিনীরস মিলাইতে পারেন তাহারা সন্তুষ্ট হন। অধিক কিছু চাহেন না। ভাগবতের অনুবাদ লইয়া তাঁহারা বিশেষ ভাবিত নন। ফলে

ভাগবতোক্ত কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কাহিনী হইতে সামান্য কিছু গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণকীর্তনাদি কাব্যের আদর্শে মধুর রসাত্মক পালাগান রচিত হইতে লাগিল। ভাগবতের অনুবাদ নয়। ইহাদের অনেক কবিই প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যপন্থী এবং স্বতন্ত্রভাবে পদাবলী রচনায়ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বীররসাত্মক ভাগবতের অনুবাদধারাটি তাই আরম্ভেই লুপ্ত হইল।

প্রশ্ন ১২'। প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কোনটি কাহিনীকল্পনা তথা চরিত্রচিত্রণের দিক হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ ? কেন শ্রেষ্ঠ বুঝাইয়া বল।

উত্তর ঃ বাংলা মঙ্গলকাব্য বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে প্রধান ধারা তিনটি : (১) মনসামঙ্গল, (২) চণ্ডীমঙ্গল ও (৩) ধর্মমঙ্গল। কাব্যোৎকর্ষ এবং বহুসংখ্যক কবির দীর্ঘকালীন চর্চা—দুই'দিক দিয়াই ইহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। মনসামঙ্গলের ধারাটি পঞ্চদশ শতক হইতে, চণ্ডীমঙ্গল ষোড়শ শতক হইতে এবং ধর্মমঙ্গল সপ্তদশ শতক হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত রচিত হইয়াছে। অন্য দুইটি উল্লেখযোগ্য ধারা—শিবায়ন এবং কালিকা-অন্নদামঙ্গল দুই চারিজন করিয়া কবিকেই মাত্র আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। প্রথম তিনটি শাখার মধ্যেই গুণাগুণ বিচার করা শ্রেয়।

সাহিত্যিক উৎকর্ষের প্রশ্নে অবশ্য মতভেদ ঘটা অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের যাহা মনে হয় তাহাতে মনসামঙ্গলই কাহিনীগত এবং চারিত্রিক বিশিষ্টতার জন্য ধারা হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারে। অবশ্য একথা ঠিক মনসামঙ্গলের ধারায় মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের সমশক্তিসম্পন্ন কবি আবির্ভূত হন নাই। এইরূপ প্রথম শ্রেণীর কবির হাত পড়িলে মনসামঙ্গলে ব্যবহৃত উপকরণের দ্বারা বিস্ময়কর কাব্য রচনা করা যাইত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা মুকুন্দরামের ন্যায় কবিকে পাইয়াছি। তাঁহার চণ্ডীকাব্য বড় প্রতিভার স্পর্শ পাইয়া আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সাধারণভাবে সব চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা চলে না। স্বল্পশক্তিসম্পন্ন কবিদের চণ্ডীমঙ্গল একান্তভাবে আকর্ষণহীন। ইহা কাব্যধারায় প্রযুক্ত উপকরণেরই ত্রুটি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাহিনীগত সুকঠিন সংসক্তির অভাব। চণ্ডীমঙ্গলকে বলা যাইতে পারে চিত্রধর্মী কাহিনী। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অনিবার্য পরিণতির দিকে ইহা পাঠককে লইয়া যায় না। কালকেতুর কাহিনীগ্রন্থনে আদ্যন্ত নিটোল ঐক্য মেলে না। ধনপতির কাহিনীরও যাহা গুণ, পরিবার চিত্রের উপস্থাপনায়। চরিত্রের দিক হইতেও সেইরূপ অটল পৌরুষ, মহান্ গাম্ভীর্য অঙ্কিত করিবার সুযোগ চণ্ডীমঙ্গলে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস্তবধর্মী চরিত্রচিত্রণের সম্ভাবনা আছে।

ধর্মমঙ্গলে আবার পরিবারজীবনকথা একরূপ নাই বলিলেই হয়। উহার মধ্যে আমরা পাই যুদ্ধের পরে যুদ্ধবর্ণনা, লাউসেনের বিচিত্র যুদ্ধমূলক অ্যাড্‌ভেঞ্চার। তাহারই মালা গাঁথিয়াছেন কবি লাউসেন মহামদ পাত্রের বিরোধের সূত্রে। ধর্মমঙ্গলের কাব্যকাহিনীটির আকর্ষণ এই বীররসাত্মক যুদ্ধবর্ণনামূলক খণ্ড খণ্ড কাহিনীতে। পরিবারজীবনের প্রাত্যহিকতা হইতে মুক্ত করিয়া এক বিপুল উল্লাস, এক মহান্‌ কলরোলের মধ্যে ইহা যেন পাঠককে লইয়া যায়। ধর্মমঙ্গলে চরিত্রগত উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছে বীরাঙ্গনা নারীকুল। লাউসেন ধর্মরাজের ছত্রচ্ছায়াতলে বর্ধিত এবং মহামদের দ্রোহবুদ্ধি কোনো গভীরতর জীবনচেতনাজাত নয়।

এই দুইটি কাব্যকাহিনীর তুলনায় মনসামঙ্গলের কাহিনীটি অনেক ঘনপিনদ্ধ। কাহিনীরসের সেই উৎকর্ষ প্রথম দিকের কবি বিজয়গুপ্ত-নারায়ণদেবেই সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছে। পরবর্তী কালের কবিরা জীবনবোধের দিক হইতে তুলনায় আরও অনেক দুর্বল হওয়ায় কাহিনীগত সম্ভাবনাটিকে সর্বদা ঠিক কাজে লাগাইতে পারেন নাই।

মনসামঙ্গল কাব্যের কেন্দ্রে রহিয়াছে মনসা ও চাঁদসদাগরের দ্বন্দ্ব। এই সংঘর্ষের কেন্দ্রে কাহিনীটি একটি বৃত্তের মত সজ্জিত। কাব্যকাহিনীতে এমন কোনো অংশই নাই যাহা এই সংঘাতের সহিত নিঃসম্পর্কিত। চাঁদসদাগর কিছুতেই মনসার পূজা করিবে না এবং মনসাও চাঁদকে দিয়া আপনার পূজা করাইয়া লইবে। এই দুই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, জীবনাদর্শের দ্বন্দ্বকে কাহিনীকেন্দ্রে নিপুণভাবে বদ্ধ করিয়াছেন কবি। মনসা বিচিত্র পন্থায় চাঁদকে দিয়া আপনার পূজা করাইয়া লইতে চাহিয়াছে। নানারূপ অনুনয়-বিনয় করিয়া যখন কোনো ফল পাওয়া যায় নাই, মনসা নিজের রুদ্ররূপ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। চাঁদকে ভয় দেখাইয়া বশ করিতে চাহিয়াছে। চাঁদসদাগরের সম্পদ বিনাশ চলিয়াছে। তাহার বাগানবাড়ি নষ্ট করিয়াছে মনসা। বন্ধু ধন্বন্তরী ওঝার প্রাণনাশ করা হইয়াছে। চাঁদ যে মহাজ্ঞানবিদ্যার অধিকারী ছিল তাহাও মনসা ছলনা করিয়া হরণ করিয়াছে। কিন্তু চাঁদসদাগর তাহার প্রতিজ্ঞায় অটল রহিয়াছে। ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা চাঁদসদাগরকে সংকল্পচ্যুত করা যাইবে না। অবশেষে চাঁদ সপ্তডিঙা সাজাইয়া বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছে। প্রভূত লাভ করিয়া দেশে ফিরিবার সময়ে মনসা তাহার সব সম্পদ ডুবাইয়া দিয়াছে। চাঁদ অতি কষ্টে তাহার জীবনটি বাঁচাইয়াছে। তাহার পরে ভিখারীর বেশে নানা দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে নিজ আবাসে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই চরম দুঃখের দিনে মনসা বারবার প্রলোভন দেখাইয়াছে, একবার চাঁদ তাহার পূজা করিলেই মনসা তাহাকে সব বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে, সব হৃতসম্পদ ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু চাঁদ কোনো মূল্যেই আপন প্রতিজ্ঞা হইতে চ্যুত হয় নাই। অবশেষে মনসা চরম আঘাত হানিয়াছে। পূর্বেই চাঁদসদাগরের

ছয় পুত্রকে কৌশলে বিষভাত খাওয়াইয়া হত্যা করা হইয়াছিল। চাঁদ বাণিজ্যবিপর্যয়ের পরে দেশে ফিরিয়া আসিল, বৃদ্ধ বয়সে তাহার এক পুত্র হইল। নাম হইল লক্ষীন্দর। লক্ষীন্দরকে কেন্দ্র করিয়া মনসার সঙ্গে চাঁদসদাগরের চরম সংগ্রাম ঘটিল। কিন্তু লক্ষীন্দরকে শত চেষ্টা করিয়াও চাঁদ বাঁচাইতে পারিল না। লক্ষীন্দর মনসার সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইল। মনের দিক হইতে চাঁদসদাগর প্রচণ্ড আঘাত পাইল। চাঁদ মনসার সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনে সুখ পাইল না, শান্তি পাইল না, তাহার স্নেহের আশ্রয়গুলি পর্যন্ত একের পর এক ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পৌরুষ ও দৃঢ়তার দাঁড়াইবার আর জায়গা রহিল না। কিন্তু হৃদয়ের দিক দিয়া বিধ্বস্ত চাঁদ তাহার সমগ্র জীবনের যে আদর্শ তাহার অন্যথা করিল না।

কাহিনীর গ্রন্থন যেমন নাট্যধর্মী, আদ্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি বিপরীত প্রান্তের চরিত্র দুইটির মহিমায়ও উজ্জ্বল। চাঁদসদাগরের চরিত্রকল্পনা এবং ট্র্যাজেডির দীর্ণ মাহাত্ম্য পুরাতন বাংলা সাহিত্যের চরিত্রবোধের গৌরবরূপে অবশ্যই অভিহিত হইবে। সেকালের কবিদের পক্ষে ব্যক্তিত্বের গৌরব অনুধাবন করা অবশ্য খুব সহজ ছিল না। দেবতার নিকট মানুষের গৌরবহানি তাঁহারা অসম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন না। তাই অধিকাংশ কাব্যেই শেষ পর্যন্ত চাঁদের চরিত্রগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। কিন্তু তবুও একথা স্বীকার করিতে হইবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চাঁদের মত চরিত্রপরিকল্পনা আর একটিও নাই। মনসাকে যদি দেবী হিসাবে না দেখিয়া মানবী হিসাবে দেখি, তাহার চরিত্রভাবনার অভিনবত্বেও বিস্মিত হইতে হয়। এরূপ কুটিল হিংস্র চরিত্র, এরূপ আদ্যন্ত সুসংগতভাবে কল্পনা করা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক।

মনসামঙ্গলের শেষাংশ উজ্জ্বল হইয়া আছে বেহুলা-চরিত্রের মাহাত্ম্যে। মৃত স্বামীকে লইয়া সে দুস্তর মৃত্যুসাগর অতিক্রম করিয়াছে। ইহার মধ্যে কোনো কোনো সমালোচক যে মানবের মৃত্যু-উত্তীর্ণ হইবার চিরকালীন কামনার প্রতীক দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাকে একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সব মিলাইয়া মনসামঙ্গল কাব্যধারাটি বাংলা মঙ্গলকাব্যসমাজে সর্বাপেক্ষা বেশী সম্ভাবনাপূর্ণ। প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার দৃষ্টিতে পড়িলে ইহাই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যধারা হইয়া দাঁড়াইত।

প্রশ্ন ১৩। বাংলায় রামায়ণ অনুবাদের ধারাটি অনুসরণ করিয়া মুখ্য লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। সংস্কৃত রামায়ণের সহিত অনুবাদের পার্থক্যগুলি নির্দেশ কর।

উত্তর : কথকঠাকুরদের মুখে রামায়ণের কাহিনী-অংশ বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণগণও নিশ্চয়ই নানা প্রসঙ্গে মূল

রামায়ণের গল্পাদির উল্লেখ করিতেন। বাংলা রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বেই এই কাহিনী ছিল এদেশে সুপরিচিত এবং লোকপ্রিয়। কৃত্তিবাসই প্রথম এই সংস্কৃত ভাষা হইতে পূর্ণাঙ্গ রামায়ণকাহিনী বাংলায় অনুবাদ করেন।

কৃত্তিবাস বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি ছিলেন। তাঁহার নামে চলিত রামায়ণটি এখনও ভক্তিসহকারে গৃহে গৃহে পঠিত হয়। কিন্তু তাঁহার জীবৎকাল এবং তাঁহার নামে প্রচলিত গ্রন্থটি—উভয় বিষয়েই পণ্ডিতমহলে সন্দেহ গবেষণা ও বিতর্কের আর শেষ নাই। কৃত্তিবাসের যে আত্মজীবনীটি পাওয়া গিয়াছে, কালনির্ণয়ের দিক হইতে তাহা পাঠককে বিশেষ সহায়তা করে না। উক্ত আত্মকথায় উল্লিখিত নৃপতি কে, তাহা লইয়াও সমস্যার শেষ নাই। মোটামুটিভাবে ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় যে সব যুক্তির বলে পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ তাঁহার জীবৎকাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কৃত্তিবাসের গ্রন্থটির প্রকৃত স্বরূপ কি, সে বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত রামায়ণটির কোনো কোনো অংশ পরবর্তী অন্যান্য কবিদের রচনা হইতে আসিয়াছে। লিপিকর এবং পরবর্তী গায়েনেরা অনেক-কিছু নূতন নূতন প্রসঙ্গ আনিয়া যোগ করিয়াছেন। প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি কৃত্তিবাসের কাব্যে বৈষ্ণব ভাবুকতার প্রভাব রহিয়াছে পূর্ণমাত্রায়। ইহা পরবর্তী কালের প্রভাবজাত সন্দেহ নাই। কোনো কোনো গবেষক প্রথম যুগের অপরাপর অনুবাদগ্রন্থের (মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত প্রভৃতি) সাক্ষ্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, কৃত্তিবাস মূল রামায়ণের যথাযথ অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে কোনোরূপ নিশ্চিত মতামত প্রকাশ করা চলে না।

ষোড়শ শতকে কোচবিহার রাজদরবারের আশ্রয়ে বাংলা সাহিত্যের চর্চা বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কোচবিহার কামরূপ অঞ্চলের দুইজন বিশিষ্ট কবি এই শতাব্দীতে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহারা হইলেন মাধবকন্দলী এবং শংকরদেব। এই সাহিত্য এখন প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য বলিয়া পরিচিত। এ বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মত এই—ইহা আধুনিক আসাম বলিয়া পরিচিত অঞ্চলের সাহিত্য বটে, তবে অসমীয়া সাহিত্য নয়। অসমীয়া ভাষার সুস্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সপ্তদশ শতকের পূর্বে দেখা দেয় নাই। ষোড়শ শতকের কামরূপ সাহিত্যের ভাষা পুরোপুরিভাবে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কথ্যভাষা। মাধবকন্দলী লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছিল। শংকরদেব কামরূপে গোষ্ঠীপতি সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কামরূপে বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ধারা গড়িয়া উঠিয়াছিল। শংকরদেব রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অনুবাদ করেন। কাব্যটি সুবিস্তৃত, ভক্তিরসে উজ্জ্বল এবং কামতা-কামরূপ অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।

অদ্ভুতাচার্য ভণিতায় একাধিক কবি 'রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের নিত্যানন্দ ইঁহাদের অন্যতম। তাঁহার কাব্য সুপ্রচলিত ছিল। মূল কৃত্তিবাসের নিকট তাঁহার ঋণ ছিল গুরুতর। অবশ্য নিজেও অনেক কিছু নূতন যোগ করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর রামশংকর দত্তও 'অদ্ভুতাচার্য' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন।

মল্লভূমির কবি ছিলেন শংকর কবিচন্দ্র। তাঁহার উদ্ভাবিত "অঙ্গদ রায়বার" অংশটি স্থূল হাস্যরসের জন্য বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। দ্বিজ ভবানী দাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামায়ণ রচনা করিতে গিয়া নূতন নূতন কাহিনী উদ্ভাবিত করিতে থাকেন। বহুক্ষেত্রে তাঁহারা শ্লীলতা ও রুচির গণ্ডি বজায় রাখিতে পারেন নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সম্পূর্ণ রামায়ণকাহিনী রচিত হইতে থাকে। উহার পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট ছোট পালা রচনার দিকে ঝোঁক যায়। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রবণতা দেখা যায় লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত পালাগানের এবং "রায়বার" আখ্যাত পালার। 'অঙ্গদ রায়বার'ই সর্বাধিক জনপ্রিয় হইয়াছিল। আর ছিল বিভীষণ ও কালনেমীর রায়বার। ইহার মধ্যে বিতর্ক ও কলহের উত্তেজনা এবং স্থূল হাস্যরস থাকিত। এইগুলি সম্পূর্ণভাবে বাঙালী কবিদের নিজেদের উদ্ভাবনা। মূল রামায়ণে ইহার উল্লেখমাত্র নাই। এইরূপ আর একটি নূতন বিষয় শিবরামের যুদ্ধ। এই জাতীয় খণ্ডক্ষুদ্র পালাগানের দিকে মূল পূর্ণাঙ্গ কাব্যের তুলনায় অধিক আকর্ষণ বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য দেয়।

এই শতাব্দীর পূর্বদেশে রামায়ণকাব্যের মধ্যে নাম করিতে হয় তিনখানির। উহাদের রচয়িতারা সবাই সাধক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। রামানন্দ যতি ছিলেন পণ্ডিত সন্ন্যাসী। ইনি একাধিক বাংলা কাব্য এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদির বহুসংখ্যক টীকা-ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার রামায়ণে তুলসীদাসের কিছুটা প্রভাব আছে।

রামানন্দ ঘোষ নামক জনৈক কবির কাব্যটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। কবি নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। তিনি দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেবের উপাসক ছিলেন। ম্লেচ্ছের নিকট হইতে বলে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া দারুব্রহ্মকে দিবার বাসনা তাঁহার ছিল। তাঁহার নিকট জগন্নাথ এবং রামচন্দ্র ছিলেন অভিন্ন। শেষ পর্যন্ত কবির বিশ্বাস অটুট থাকে নাই। দারুব্রহ্মকে উপাসনা করিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহাকে করিতে হইয়াছে, যৌবনের আশা ও কামনাকে বিসর্জন দিতে হইয়াছে, তাহার জন্য তিনি তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছেন।

রামায়ণের অপর দুইজন কবি পিতাপুত্র। জগৎরাম-রামপ্রসাদ একযোগে রামচন্দ্রবিষয়ক দুইটি কাব্য রচনা করেন। তাঁহাদের রামায়ণে আছে নয় কাণ্ড।

পুষ্করকাণ্ড এবং রামরাস সম্পূর্ণ নূতন। দুর্গাপাঞ্চরাত্রির বিষয় হইল রামচন্দ্রের অকাল-বোধন। ইহা মূল রামায়ণে নাই। বাংলাদেশের শাক্ত প্রভাবের ফল।

বাংলাদেশে রামায়ণের বহুসংখ্যক অনুবাদ হইয়াছে। তাহাদের সহায়তায় অনুবাদের সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে :

(১) বাংলা রামায়ণে মূলের জীবনচিত্র এবং চরিত্রকল্পনা বিশেষ রক্ষিত হয় নাই। মূল রামায়ণে যে আদিমতা, বীর্যবত্তা, মানবজীবনের বিচিত্রগভীর সত্য ভাষারূপে আশ্চর্য রূপ লাভ করিয়াছে, তাহার বিশেষ প্রতিফলন নাই বাংলা রামায়ণে। তাহা ছাড়া চরিত্র-কল্পনায় যে ভাস্কর্যোচিত দৃঢ়তা এবং বহুবৃত্তির বিজড়িত জটিল ও গভীর রূপ মূল মহাকাব্যে আছে বাংলা অনুবাদে তাহা রক্ষিত হয় নাই।

(২) বাংলা অনুবাদে কাহিনী ও চরিত্রভাবনা মধ্যযুগের সরলতা ও ভক্তিরস প্রবলতাকে আশ্রয় করিয়াছে। বাঙালী কবিরা রামকে ভগবানে রূপান্তরিত করিয়া বিগলিত ভক্তির অশ্রুতে তাঁহাকে দ্রবীভূত করিয়াছেন।

(৩) মূলে মাঝে মাঝে যে অপূর্ব সৌন্দর্যবর্ণনা রহিয়াছে, বাঙালী কবিরা তাহা সম্পূর্ণই বাদ দিয়াছেন। কাহিনীকথনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। অন্য কোনো দিকে দৃক্‌পাত করিবার সুযোগ তাঁহারা পান নাই।

(৪) কোনো কোনো কবি রামায়ণ কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন, কেহ আবার কোনো কোনো অংশকে বিস্তৃততর করিয়াছেন। অনেক সম্পূর্ণ নূতন কাহিনী উদ্ভাবিত হইয়াছে। খুব পরিচিত প্রসঙ্গের মধ্যে তরণীসেনবধ, মহীরাবণবধ, অঙ্গদ রায়বার, শিবরামযুদ্ধ প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র নূতন কাহিনীর উল্লেখ করা যায়।

(৫) পরিপূর্ণ রামায়ণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালা রচনায় সেকালের কবিরা বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন। বিশেষ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই জাতীয় মৌলিক এবং অনুবাদাত্মক পালা রচনার প্রচলন বিশেষ বাড়িয়া যায়।

প্রশ্ন ১৪। মহাভারত অনুবাদের ধারাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই ধারার বিশিষ্ট কবিদের পরিচয় দাও। মহাভারত অনুবাদ করিতে গিয়া বাঙালী কবিরা যে সব বিশিষ্ট প্রবণতা দেখাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ কর।

উত্তর : সংস্কৃত রামায়ণ এবং মহাভারত মহাকাব্য দুইটির কাহিনী ছিল বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে এই কাহিনী প্রচার লাভ করিয়াছিল। শুধুমাত্র বাংলাদেশের জনগণই নয়, মুসলমান নৃপতিবৃন্দও মহাভারতের যুদ্ধকাহিনী শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ফলে মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ হয়। আরও নানাবিধ সামাজিক কারণে রামায়ণ অনুবাদের ন্যায় মহাভারত অনুবাদেরও সূত্রপাত ঘটিল।

চৈতন্যপূর্ব বাংলা সাহিত্যেই আরম্ভ হইল মহাভারতের অনুবাদ। প্রথম অনুবাদক সম্ভবতঃ সঞ্জয়। সঞ্জয়ের কাল এবং ব্যক্তিত্ব লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সন্দেহ আছে। এতদিন পর্যন্ত অনেকেই সঞ্জয়ের মহাভারতকে বহুজনরচিত একটি সমন্বিত গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় দেখা গিয়াছে এই গ্রন্থটির মূল্য অস্বীকার করা সহজ নয়। এ সম্বন্ধে অবশ্য এখনই কোনো চরম সিদ্ধান্ত লইবার সময় আসে নাই।

নিশ্চিতভাবে যে মহাভারত-অনুবাদটিকে আমরা প্রথম বাংলা মহাভারতের মর্যাদা দিতে পারি, উহা হইল কবীন্দ্র পরমেশ্বরের লেখা। কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁ নামক চট্টগ্রামবাসী মুসলমান সেনাপতির অনুরোধে এই কাব্যটি অনুবাদ করেন। পরমেশ্বরের কাব্য মহাভারতের মত আঠারো পর্বে বিভক্ত। বাহুল্য বর্জন করিয়া শুধু কাহিনীর অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া কাব্যটির আকার খুব বড় নয়। রচনা সহজ, সরল ও কাহিনীনিষ্ঠ।

পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁও বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য দেখাইয়াছেন। পরমেশ্বর রচিত কাব্যে অশ্বমেধপর্বের কাহিনী বিশেষ সংক্ষিপ্ত। এইজন্য তিনি আপনার সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে অশ্বমেধপর্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া কাব্য রচনা করিতে বলেন। জৈমিনী মহাভারতে অশ্বমেধপর্বের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে থাকায় শ্রীকর নন্দী উক্ত গ্রন্থের অনুসরণে তাঁহার মহাভারত লিখিলেন।

অশ্বমেধপর্বের অপর দুইটি অনুবাদ হইয়াছিল অল্পকালের মধ্যে—প্রাক্‌-চৈতন্য যুগে, অন্ততঃ চৈতন্যপ্রভাব বিস্তৃত হইবার পূর্বে। কাব্য দুইটির রচয়িতা রামচন্দ্র খান এবং রঘুনাথ। দুইটি কাব্যই জৈমিনী মহাভারতকে অনুকরণ করিয়াছে। এই সময় হইতেই মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত বিচ্ছিন্ন কাহিনী অবলম্বনে কাব্যরচনা আরম্ভ হয়। অশ্বমেধপর্বের যুদ্ধকাহিনীর পাশাপাশি প্রণয়ধর্মী রোমান্টিক কাহিনীর প্রতি বাঙালীর আকর্ষণের তীব্রতা ইহার দ্বারা সূচিত হয়। এইরূপ প্রথম রচনা পীতাম্বর প্রণীত নলদময়ন্তীর কাহিনী। কোচবিহারের রামসরস্বতীও মহাভারতের আনুপূর্বিক অনুবাদ না করিয়া কয়েকটি নির্বাচিত অংশ অবলম্বনে পাঁচালী ধরনের কাব্য লেখেন।

মহাভারতের অনুবাদকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছিল কাশীরাম দাসের অনুবাদটি। কাশীরাম সপ্তদশ শতকে তাঁহার মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে প্রচলিত গ্রন্থটির প্রথম তিন পর্ব তাঁহার রচনা। অন্যান্য পর্বগুলি অপরাপর কবিরা লিখিয়াছিলেন। কাশীরামের কাব্যে চৈতন্যযুগের প্রভাব মিলিতেছে। কবি মহাভারতকাহিনীতে সহজ সুরে কৃষ্ণভক্তির রস প্রচার করিয়াছেন। যুদ্ধবর্ণনায়ও তাঁহার ভাষা সহজ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থটি সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেনের

অভিমত উল্লেখযোগ্য : "কৃত্তিবাসের মত কাশীরামও বাঙ্গালার জাতীয় কবি। এই দুইজনের মত আর কোন বাঙ্গালী কবি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এত লোকের শ্রবণমনের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া আসিতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর জাতীয় মনোভাব গঠনেও এই দুই কবির দাবি সমান সমান। কাশীরাম বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। ইহা যুগধর্ম এবং তাঁহার বংশধর্মও বটে। কবির মনে অনুদারতার স্থান ছিল না। তিনি প্রায় সকল দেবদেবীর নিকটে ভক্তিনম্র প্রণতি জানাইয়া কৃষ্ণভক্তি মাগিয়া লইয়াছেন।" কাশীরামের কাব্যের অসমাপ্ত অংশ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল নন্দরাম, কৃষ্ণানন্দ বসু, জয়ন্ত দাস প্রভৃতির হাতে।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে নিত্যানন্দ ঘোষ সংক্ষিপ্ত ভারতপাঁচালী লিখিয়াছিলেন। ইহার কোনো কোনো পর্ব স্বতন্ত্রভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে মহাভারতের পর্ব ধরিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনুবাদের প্রচলন দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাভারতের নানান কাহিনী লইয়া পালা রচিত হইয়াছিল। সমগ্র অনুবাদের তুলনায় খণ্ড খণ্ড কাহিনীর দিকে বাঙালী কবি এবং পাঠক-শ্রোতাদের আকর্ষণ বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই জাতীয় আখ্যান-পালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল শকুন্তলা উপাখ্যান, দাতাকর্ণের কাহিনী, নলদময়ন্তী উপাখ্যান, শ্রীবৎস উপাখ্যান প্রভৃতি। দাতাকর্ণ, শ্রীবৎস প্রভৃতির কথা সম্পূর্ণতঃ বাংলার নিজস্ব ব্যাপার। শকুন্তলা উপাখ্যান, নলদময়ন্তীর কথা মূল মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়া বাড়ানো হইয়াছে। তাহা ছাড়া জৈমিনী সংহিতা হইতে সংকলিত দণ্ডীরাজার কাহিনী লইয়া রচিত কাব্যও পাওয়া যায়। অশ্বমেধপর্বের জনপ্রিয়তা প্রথম দিন হইতেই সমানে চলিতেছিল। অন্যান্য পর্বের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনুবাদ চলিতে লাগিল।

মহাভারত-অনুবাদের যে সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ উপস্থিত করা হইল, তাহা হইতে এই কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে :

(১) মহাভারতের কাহিনী জীবনদর্শনগত বৈশিষ্ট্য অনুবাদে রক্ষিত হয় নাই, রক্ষা করিবার চেষ্টাও নাই। মূলকবির প্রতিভার সমকক্ষতা দাবি করিতে পারেন বাঙালী কবিদের মধ্যে এরূপ একজনও ছিলেন না। বিশেষ করিয়া মধ্যযুগের ধ্যানধারণা ও জীবনভাবনা লইয়া মহাভারতের উদাত্ত ও বিপুল, গম্ভীর ও মহান্, দুর্ধর্ষ ও কোমল এবং অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের রূপ এবং চরিত্রচিত্রণ আয়ত্ত করা অসম্ভব। মহাভারতে শিল্পগত এই তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করাও সম্ভব ছিল না। মধ্য-যুগের বাঙালী কবিরা সে চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহারা কাহিনীটি পাঠকদের উপহার

দিতে চাহিয়াছেন এবং সে চেষ্টায় অনেকখানি সফলও হইয়াছেন। মহাভারতের কাহিনীগত আকর্ষণই এত তীব্র যে সেই উদ্দেশ্যে কবিদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই।

(২) অনূদিত মহাভারতগুলিতে বৈষ্ণব ধর্মভাবনার প্রভাব বিশেষভাবে পড়িয়াছে। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের মহাভারত-অনুবাদের সংখ্যা বেশী নয়। চৈতন্যোত্তর অনুবাদগ্রন্থগুলিতে বৈষ্ণব ভাবব্যাকুলতা ও কৃষ্ণভক্তিরসের প্রভাব বিশেষভাবেই বর্তিয়াছে।

(৩) মহাভারত গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করা কোনো কবিরই একক চেষ্টায় প্রায় সম্ভব নয়। বাঙালী কবিদের মধ্যে অধিকাংশই সে চেষ্টাও বড় করেন নাই। দু'একজন অবশ্য সংক্ষিপ্তাকারে পূর্ণ কাব্যানুবাদ করিতে চাহিয়াছেন। বেশীর ভাগ কবিই বিচ্ছিন্নভাবে পর্ব ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

(৪) বিচ্ছিন্ন পর্ব হিসাবে অশ্বমেধপর্বের অনুবাদের দিকে আগ্রহ দেখা গিয়াছে সর্বাধিক। সম্ভবতঃ ইহার বিস্তারিত যুদ্ধ-কাহিনীই অনুরূপ আকর্ষণের কারণ। অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ করিতে গিয়া কবিরা প্রায়ই জৈমিনী সংহিতার সাহায্য গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। জৈমিনী সংহিতায় এই পর্ব মূল মহাভারত অপেক্ষাও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) মহাভারত অনুবাদে বাঙালী কবিরা কখনো কখনো প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান নৃপতিদের আনুকূল্য লাভ করিয়াছেন। রামায়ণের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে নাই। মহাভারতের গল্পরসের বিচিত্রতা ইহার কারণ হইতে পারে।

(৬) বাংলা মহাভারতে দাতাকর্ণ, শ্রীবৎস প্রভৃতির একেবারে নূতন কাহিনী মিলিতেছে। কোনো সংস্কৃত মহাভারতে ইহা নাই। তাহা ছাড়া জৈমিনী সংহিতা হইতে কোনো কোনো নূতন কাহিনী (যেমন দণ্ডীকাহিনী) ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

(৭) অষ্টাদশ শতকে বিশেষ করিয়া মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে স্বতন্ত্র পালা রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শকুন্তলা, নলদময়ন্তী প্রভৃতি প্রেমবিষয়ক পালাগুলি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়।

প্রশ্ন ১৫। মনসামঙ্গল কাব্যধারার মুখ্য কবিদের কালানুক্রমিক বিবরণ দাও। বাংলা সাহিত্যের পুরাতন যুগের ইতিহাসে এই কাব্য-ধারার ভূমিকা ও তাৎপর্যের বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ঃ বাংলা সাহিত্যে মৌলিক আখ্যানকাব্য রচনার সূত্রপাত হইল পঞ্চদশ শতকে। একদিকে পাওয়া গেল বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, অপরদিকে কয়েকজন কবির মনসামঙ্গল। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলের ধারাটিই প্রাচীনতম।

আমরা অন্ততঃপক্ষে তিনজন কবির তিনটি মনসামঙ্গল কাব্যের সন্ধান পাইতেছি, যাহা এই শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিতে বাধা নাই। এই তিনজন কবি হইলেন : (১) বিজয় গুপ্ত, (২) নারায়ণ দেব এবং (৩) বিপ্রদাস পিপলাই। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুই জন পূর্ববঙ্গের কবি, তৃতীয় জন পশ্চিমবঙ্গের। মনে হয় আরও পূর্ব হইতেই মনসাপূজার এবং মনসামঙ্গল কাব্যকাহিনীর প্রচলন ঘটিয়াছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে। আদি কবি কানা হরিদত্ত সম্বন্ধে অবশ্য বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

বিজয় গুপ্ত এবং নারায়ণ দেবের কাব্যগুলির প্রাপ্ত পুঁথির বিচারে কোনো কোনো সমালোচক ইহাদের প্রাচীনত্ব ও অকৃত্রিমতায় সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। বহুল প্রচলনের ফলে ইঁহাদের প্রাপ্ত পুঁথিগুলিতে সংমিশ্রণ কিছু কিছু ঘটিয়াছে—তাহা ঠিক। কিন্তু ইঁহাদের ভণিতায় বহুসংখ্যক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের বাস্তুভিটা এবং বংশধরদেরও কোথাও কোথাও সন্ধান মিলিতেছে। ইঁহাদের নামে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য না হইলেও ইঁহারা প্রাচীন কবি এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহাদের রচনা সম্পর্কেও প্রাপ্ত গ্রন্থ হইতে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে। প্রাচীন বাংলার অনেক কবিরই রচনা নানাভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। উহার সর্বপ্রধান উদাহরণ কৃত্তিবাস ; শুধুমাত্র অনুরূপ কারণে বিজয়-গুপ্ত-নারায়ণদেবকে অস্বীকার করা উচিত হইবে না।

বিজয় গুপ্তের রচনারীতির মধ্যে অনেকেই বলিষ্ঠতার সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার উপমাদি ভাষাভঙ্গির মধ্যে নানারূপ অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। উহা সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন সংস্কৃতানুগ রীতির চর্বিত চর্বণ নয়। বিজয় গুপ্তের কাব্যে কৌতুকরস সৃজন আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। চাঁদসদাগরের বাণিজ্যব্যাপার এবং শিবের চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবি উচ্চহাস্যের আয়োজন করিয়াছেন। শুধুমাত্র তাহাই নয়, মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র-বিশ্লেষণের দিক হইতেও কবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মনসার চরিত্রের ক্রমবিকাশে যে নৃশংসতা দেখা দিল তাহার স্তরবিন্যাসগুলি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন কবি। চাঁদসদাগরের দৃঢ় পৌরুষের চিত্রাঙ্কনেও বিজয় গুপ্ত সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন।

করুণরস স্ফুরণে নারায়ণ দেবের সার্থকতা সর্বাধিক। নারায়ণ দেব চাঁদসদাগরের চরিত্রের দৃঢ়তা এবং অবক্ষয়ী পৌরুষের হাহাকারের চিত্রটি চমৎকার আঁকিয়াছেন। এইরূপ ট্র্যাজিক চরিত্র পুরাতন বাংলা সাহিত্যে বড় বেশী নাই। বেহুলাচরিত্রের রূপভাবনাটিও নারায়ণ দেবের রচনায় সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। বেহুলা মৃত স্বামীকে লইয়া যেভাবে অসমসাহসে ভর করিয়া স্বর্গপুরীতে হানা দিল, তাহার তাৎপর্যটি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন কবি।

বিপ্রদাস পিপলাইয়ের কবিত্বশক্তি পূর্বোক্ত দুইজনের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের। তিনি পুরাণ হইতে নানাবিধ কাহিনী সংকলন করিয়াছেন। দেবদেবীপ্রসঙ্গে নানারূপ উদ্ভট গল্পের আসর জমাইয়াছেন। এইরূপ বিবিধ গল্পের মধ্যে মনসা-চাঁদ সংগ্রামের মূল প্রত্যয়টি আবৃত হইয়া—আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মনসা-চাঁদ-সংঘাত কাব্যটির একটি গৌণ অংশ হওয়ায় চরিত্র-চিত্রণেও এমন কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই।

চৈতন্যোত্তর মনসামঙ্গল কাব্যগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দুইটি :—(১) মনসা-দেবীর চরিত্রের রূঢ়তা ও হিংস্রতা যেন কতক পরিমাণে শান্ত হইয়া আসিয়াছিল। কাহিনীর প্রয়োজনে যতটুকু না বলিলেই নয় ততটুকুই মাত্র আছে। প্রাক্-চৈতন্য মনসামঙ্গলে মনসার পূজাপ্রচারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে ঐতিহাসিক সংঘর্ষের তাৎপর্য যুক্ত ছিল পর-চৈতন্য কাব্যে তাহার চিহ্ন ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। (২) চাঁদসদাগরের চরিত্রের সুদৃঢ় পৌরুষ এবং বীর্য আর রহিল না। তাহার মনসা বিরোধিতা অনেকটা কাহিনীগত প্রথানুগত্যে রূপান্তরিত হইল।

মনসামঙ্গল কাব্যে এই যে দ্বিমুখী পরিবর্তন দেখা গেল, ইহার কারণ চৈতন্য ভাব-ভাবনা ও আন্দোলনের প্রভাব। একটা তরল কোমল উচ্ছ্বাসপ্রবণতা বিস্তারিত হইয়া এই নবত্বের সৃষ্টি করিল। এই পর্বের কবিদের মধ্যে বিশিষ্টতম কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

দ্বিজ বংশীদাস পূর্ববঙ্গের কবি ছিলেন। মনসার ভাসান গান গাহিয়া বেড়াইতেন তিনি। তাঁহার কাব্যটি আদ্যন্ত ভক্তিরসে সিঞ্চিত। ভাষাভঙ্গির মধ্যে একটি সহজ সরল সৌকুমার্য রহিয়াছে। চাঁদসদাগরের চরিত্রটি যেমন অনেকটা দুর্বল হইয়াছে, তেমনি কোমলতায় এবং মাধুর্যে বেহুলা ও সনকার চরিত্র নূতন মর্যাদা পাইয়াছে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের কবি। তাঁহার কাব্যটি চরিত্রপরিকল্পনার দিক হইতে ছিল বিশেষ দুর্বল। কাহিনীগ্রন্থনেও বিশেষ কোনো কৃতিত্বের পরিচয় নাই। মনসামঙ্গলের কাহিনীগত সম্ভাবনাকে তিনি যথাযথ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বমূলক কাহিনীর তুলনায় নানা উপকাহিনী অতি বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু একটি দিক হইতে ক্ষেমানন্দের কাব্যের প্রশংসা করিতে হয়। এই কাব্যটির ভাষা আদ্যন্ত মার্জিত। কোথাও অলংকার প্রয়োগে অতিরিক্ত বহুলতা ছিল না। ফলে প্রয়োগজনিত সুমিত শিল্পসিদ্ধি হইয়াছিল অনায়াসলব্ধ। একটি মৃদু গীতিসুরও তাঁহার কাব্যভাষার মধ্য দিয়া হিল্লোলিত।

বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল হাসানহোসেন পালার বর্ণনায়। মনসার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্বন্ধটিও স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে এই কাব্যে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো মনসামঙ্গলে ধর্ম ও মনসার একটি সম্পর্ক স্থাপিত। পূর্ব বা উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলে এইরূপ দেখা যায় না।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গলের বিশিষ্ট লেখক হইলেন উত্তরবঙ্গের জগজ্জীবন ঘোষাল এবং জীবনকৃষ্ণ মৈত্র। পূর্ববঙ্গের ষষ্ঠীবর সেনের নামও উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের কাহারো কাহারো কাব্যে নানারূপ নূতন কাহিনী আছে। কিছু কিছু বিকৃত রুচির পরিচয় মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের পুরাতন যুগে মনসামঙ্গল ধারাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ণয় করিতে গেলে বলিতে হয়ঃ

(১) পুরাতন বাংলা স্বাধীন আখ্যানকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলই সর্বাপেক্ষা বেশী সম্ভাবনাপূর্ণ। বাঙালীর মন যে সেকালে এইরূপ একটি কাহিনী কল্পনা করিতে পারিয়াছে ইহা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। মৌলিক কাহিনীর মধ্যে অপরাপর মঙ্গলকাব্য, নাথসাহিত্যের কাহিনীদ্বয় প্রভৃতির সহিত তুলনায় মনসামঙ্গলের গল্পগ্রন্থন পাকা শিল্পসিদ্ধির পরিচয় বহন করে।

(২) চরিত্র-পরিকল্পনার দিক হইতেও মনসামঙ্গলের স্থান বিশেষ উচ্চে। চাঁদ-সদাগরের ন্যায় পৌরুষদৃঢ় ব্যক্তিত্ব সেকালের সাহিত্যে দ্বিতীয়টি মেলে না। বেহুলা-চরিত্রের পরিকল্পনার মধ্যেও এমন একটি অভিনবত্ব ও কমনীয়তার মিশ্রণ ঘটিয়াছে যাহার তুলনা পুরাতন বাংলা সাহিত্যে বিরল।

(৩) মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে লৌকিক ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত বেশ তীব্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কারণ মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য শাখার সহিত তুলনায় এই ধারাটি অনেক বেশী পুরাতন। কাজেই আদি সংঘর্ষের ভাবটি এই কাব্য-কাহিনীতে যতটা রক্ষিত হইয়াছে, অপর মঙ্গলকাব্যগুলিতে সেরূপ হয় নাই।

(৪) বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় মনসামঙ্গলই ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। যত বেশী সংখ্যক মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে এমন আর কোনো মঙ্গলকাব্য নয়। তাহা ছাড়া উত্তর, পশ্চিম এবং পূর্ব বাংলার সর্বপ্রান্তের কবিরা এই কাব্য লিখিয়াছেন। সারা বাংলা দেশ হইতেই মনসামঙ্গলের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ধর্মমঙ্গল কিন্তু রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। চণ্ডীমঙ্গলের প্রচলন ছিল ব্যাপকতর। কিন্তু তাহাও মনসামঙ্গলের সহিত উপমিত হইবার নয়। লক্ষণীয় পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত মনসামঙ্গলে মনসা ও ধর্মঠাকুরের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহা পারস্পরিক প্রভাবজাত। অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত মনসামঙ্গলে কিন্তু এইরূপ কোনো সম্পর্ক দেখা যায় না।

(৫) মনসামঙ্গলের এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রথম শ্রেণীর কবি এই কাব্যরচনায় হাত দেন নাই।

প্রশ্ন ১৬। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁহার কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কর। পুরাতন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীমঙ্গলকাব্য-ধারার অবদান বিষয়ে মন্তব্য কর।

উত্তর ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার আদি কবি হিসাবে অনেকেই মানিক দত্তের নাম করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই মানিক দত্ত প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি ছিলেন। কিন্তু মানিক দত্তের নামে যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে অনেক পরবর্তী কালের রচনা, আদি মানিক দত্তের গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাক্-চৈতন্য পর্বের কোনো চণ্ডী-মঙ্গলই আমাদের হাতে আসিয়া পড়ে নাই। কাজেই চণ্ডীমঙ্গলের আদি রূপ সম্বন্ধে কোনো সুনিশ্চিত ধারণা করিবার সুযোগ আর নাই। চৈতন্যোত্তর কালের চণ্ডীমঙ্গল লইয়াই আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করিতে হইবে। প্রাক্-চৈতন্য চণ্ডীমঙ্গলের তুলনায় ইহার মধ্যে কিরূপ নূতনত্ব সূচিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার কোনো উপায় আর অবশিষ্ট নাই।

প্রথমেই ষোড়শ শতকের শেষ পাদে রচিত দ্বিজ মাধবের কাব্যের উল্লেখ করিতে হয়। দ্বিজ মাধব পূর্ববঙ্গের কবি। পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার কাব্যের বিশেষ প্রভাব ছিল না। দ্বিজ মাধবের কাব্যটি সংক্ষিপ্ত। রচনার মধ্যে কোথাও কবিত্ব ফলাইবার চেষ্টা নাই। বর্ণনাংশ সহজ ও সরল কিন্তু প্রাণবন্ত। অতিসংক্ষিপ্ততা তাঁহার কাহিনীর রসসৌন্দর্যের হানি ঘটাইয়াছে। কারণ অবান্তর প্রসঙ্গ বাদ দিয়া শুধু মূল কাহিনী সংহতরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টায় তাঁহার কাব্যটি সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করে নাই। অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু মঙ্গলকাব্যে প্রযুক্ত রীতিমাফিক প্রসঙ্গের বর্ণনায় কবি অনলস। মূল কাহিনীই স্থানে স্থানে অকারণে সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা শিল্পগুণের পরিচায়ক নয়। কিন্তু মনে হয় দ্বিজ মাধব সামনে কোনো উপযুক্ত আদর্শ পান নাই। লোক-কথা হইতে প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্যের আদর্শে মাধবকে কাব্যটি গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। মাধবের কাব্যের দেবখণ্ডটি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আদর্শে কবির নিজের কল্পিত। মাধবের কাব্যে কোথাও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিজাত আদর্শবাদের প্রভাব পড়ে নাই। বাস্তবতার অনুরঞ্জিত চিত্রাঙ্কনে কবির সাফল্য উল্লেখযোগ্য। দ্বিজ মাধবের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব স্পষ্ট। কাহিনীর মাঝে মাঝে ভাবাবেগের সুরটি ধরাইয়া দিবার জন্য কবি বিষ্ণুপদ নামক কতকগুলি কৃষ্ণবিষয়ক পদ সংযোজিত করিয়াছেন। ইহা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে গৃহীত হইবার যোগ্য।

কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সন্ধিকালে তাঁহার কাব্যটি রচনা করেন। মুকুন্দরামই চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। শুধু চণ্ডীমঙ্গলের কেন, মধ্যযুগের

বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন কাহিনীকাব্য পাই না। সমালোচকের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি অবশ্যই স্বীকার্য : "মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল পুরানো বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। বিষয় নূতন নয়, পরিকল্পনাও অভিনব নয়। শুধু চরিত্রচিত্রণে, ঘটনার নাটকীয়তা স্ফুরণে, এবং সূক্ষ্ম সরস বাস্তব দৃষ্টির আলোকে কাব্যটির অসাধারণ উৎকর্ষ দীপ্তি পাইয়াছে। আত্মকাহিনীতে, দরিদ্র গৃহস্থালীর বর্ণনায়, দম্পতী-কলহে, সপত্নীদ্বন্দ্বে, ভাঁড়ু দত্তের শঠতায়, বাঙ্গাল মাঝির খেদে—সর্বত্র মুকুন্দরামের সহৃদয় কবিচিত্ত অকৃত্রিম মানবরসের উৎসটির সন্ধান পাইয়াছে। জীবনে কবি অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতে জীবনরস তাঁহার কাছে তিক্ত হইয়া যায় নাই। তাই কবির ব্যঙ্গোক্তি কচিৎ তীব্র হইলেও সর্বদা জ্বালাহীন। বাংলা সাহিত্যের পুরানো কবিদের মধ্যে শুধু মুকুন্দরামের প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-রচয়িতার ভাব ও রসদৃষ্টি ছিল।" মুকুন্দরাম ছিলেন বাস্তব দৃষ্টির কবি। কিন্তু বস্তুভারকে তিনি সরস কৌতুকের সহযোগে আস্বাদ্য করিয়া তুলিয়াছেন। মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলের তিনটি কাহিনীতে বাঙালীর পরিবারজীবনের তিনটি স্বতন্ত্র রূপের পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। শিবপার্বতীর দাম্পত্য জীবনে উচ্চবর্ণের দারিদ্র্যতাড়িত পরিবারের একটি বাস্তব চিত্র ধরা পড়িয়াছে। বাস্তব দারিদ্র্যদুঃখের বর্ণনা অস্বস্তিকর। কবি শিবচরিত্রের শিশুসুলভ কার্যবিমুখতা এবং পার্বতীর কলহপ্রবণতার সহযোগে সেই দুঃখের বর্ণনাকেও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনীতে রহিয়াছে ব্যাধপরিবারের জীবনচিত্র। উহাদের সরল স্বল্পবুদ্ধি কালকেতুর শিকারপদ্ধতির বর্বরতা, চণ্ডীর ধনদান উপলক্ষে প্রকাশিত কৌতুক কাব্যটিকে সাহিত্যগুণে ভূষিত করিয়াছে। মুরারি শীলের শাঠ্যও প্রকাশভঙ্গিতে কৌতুকের উৎস হইয়া উঠিয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত চরিত্রটিতে একটি খল ব্যক্তির চরিত্রবৈশিষ্ট্য মনস্তাত্ত্বিক নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে। ধনপতি আখ্যানে ধনীপরিবারের সতীনকলহের চিত্র আঁকা হইয়াছে। লহনার বিগতপ্রায় যৌবনজ্বালাজাত ঈর্ষার চিত্রটি পর্যাপ্ত মনস্তত্ত্বজ্ঞানের প্রমাণ হইয়া আছে। মুকুন্দরাম আপন প্রতিভাবলে চণ্ডীমঙ্গলের অতি সাধারণ কাহিনী ও চরিত্রভাবনার মধ্যেও একটা সুবিপুল পরিবর্তন আনিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিজ হরিরাম একটি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি সর্ব দিক দিয়াই বৈশিষ্ট্যহীন। কবি শোভাসিংহের আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন।

এই শতাব্দীর অপর কবি দ্বিজ জনার্দন যে কাব্যটি লেখেন তাহা একান্ত ক্ষুদ্র, ব্রতকথা জাতীয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চণ্ডীবিষয়ক সংস্কৃত পুরাণের অনুবাদ চলিতে থাকে। কিন্তু স্বাধীন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও কিছু কিছু রচিত হয়। মুক্তারাম সেনের কাব্যটি

সংক্ষিপ্ত। কালকেতুর কাহিনী খুব অল্প কথায় শেষ করা হইয়াছে। রচনাভঙ্গি বেশ সরল। রামায়ণ রচয়িতা রামানন্দ যতি একখানি চণ্ডীমঙ্গল লেখেন। মুকুন্দরামের কাব্যের নানারূপ দোষ প্রদর্শন করিয়া তিনি কাব্যকাহিনীর সূত্রপাত করেন। জয়নারায়ণ রায় নামক জনৈক কবি চণ্ডীমঙ্গল নামে এক কাব্য লেখেন। ইহাতে কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী ছাড়াও 'ক্রিয়াযোগসার' হইতে সংকলিত "মাধব-সুলোচনা"র উপাখ্যান রহিয়াছে। তাঁহার লেখায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। ভবানীশংকর একটি চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালী লেখেন। কিন্তু উহাতে কবির সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান অত্যন্ত উৎকটভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার কাব্যে অনেকগুলি কৃষ্ণ-লীলাত্মক এবং ভক্তিবিষয়ক পদ সংযুক্ত হইয়াছিল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এই বিবরণ হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উহার বিশিষ্ট অবদানের মূল্য নির্ণয় করা যাইতে পারে:

(১) তিনটি প্রধান মঙ্গলকাব্যের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতেই পরিবার-জীবনের বাস্তব রূপ অঙ্কনের সুযোগ রহিয়াছে সব চাইতে বেশী। ইহার এই সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা কাব্য রচনা করিয়াছেন তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের পুরাতন যুগকে সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছেন।

(২) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এবং তাহার অন্তর্লীন বাস্তবরসসৃষ্টির এই সম্ভাবনাই বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরামের মত কবির আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার গৌরব এইখানে যে উহা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মত মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাধর আখ্যানকাব্যস্রষ্টাকে উপহার দিয়াছে।

(৩) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারাটি মুকুন্দরামকে বাদ দিলে খুবই অসমৃদ্ধ। দ্বিজ মাধব ব্যতীত বিশেষ উল্লেখ করা করা যায় এমন কবিই নাই। কাব্যরচনার সংখ্যাও বেশী নয়। মনে হয় মুকুন্দরামের পরবর্তী কালে কোনো বিশিষ্ট শক্তিধর কবিই আর এই ধারার অনুবর্তন করিতে চাহেন নাই। মুকুন্দরামের প্রতিভাই উহার কারণ। কাব্যধারাটির সমৃদ্ধির পথে উহা একটি বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

(৪) অষ্টাদশ শতাব্দীতে একদিকে পৌরাণিক চণ্ডীকাহিনীর অনুবাদ, অন্যদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রতকথা জাতীয় রচনার প্রাদুর্ভাব ঘটায় পূর্ণাঙ্গ চণ্ডীমঙ্গল রচনায় বাধার সৃষ্টি হইল। তাহা ছাড়া সপ্তদশ শতকে শিবচণ্ডীর কাহিনী স্বতন্ত্র কাব্যাকারে দেখা দিতে লাগিল শিবায়নের মধ্যে। অপরপক্ষে চণ্ডীর নবরূপ অন্নপূর্ণামঙ্গলের মাহাত্ম্যকীর্তনকে আশ্রয় করিল।

প্রশ্ন ১৭। বাংলা ধর্মমঙ্গলের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মমঙ্গল সাহিত্যের বিশিষ্টতা নির্ণয়ের চেষ্টা কর।

উত্তর ঃ ধর্মঠাকুরের পূজা পশ্চিমবঙ্গে খুব প্রাচীনকাল হইতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির সন্ধান মিলিতেছে সপ্তদশ শতকে। তাহার পূর্বে লেখা ধর্মমঙ্গলের পুঁথি একালের পাঠকের হাতে আসিয়া পৌছায় নাই। ময়ূরভট্ট নামক ধর্মমঙ্গলের জনৈক আদি কবির নাম শোনা যায়। কিন্তু জনশ্রুতি ছাড়া তাঁহার বিষয়ে আর বিশেষ কিছু নির্ভরযোগ্য ভাবে জানা যায় নাই। রামাই পণ্ডিত নামক জনৈক কবির ধর্মপূজা-পদ্ধতিকে কেহ কেহ খুব প্রাচীন বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় উহাকে নেহাৎই অর্বাচীন রচনা বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

খেলারাম চক্রবর্তীর কাব্যকেই প্রাপ্ত ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু জনশ্রুতির অধিক বস্তুগত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সম্পূর্ণ পুঁথিখানা পাওয়া গেলেও শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের যে রচনাংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা বেশ পুরানো বলিয়া মনে হয়। তবে তাঁহার রচনার কাল নির্ণয় করা আদৌ সম্ভব নয়।

সুনির্দিষ্ট সন-তারিখযুক্ত ধর্মমঙ্গল পাওয়া গেল রূপরাম চক্রবর্তীর। তাঁহার কাব্যটি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত। রূপরাম লিখিতে জানিতেন, কাব্যের আরম্ভে কবি ধর্মমঙ্গল রচনার সূত্ররূপে নিজের প্রথম জীবনের দুঃখকাহিনী সবিস্তারে বলিয়াছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সহৃদয়তা ও রসবোধ মিলিত হইয়া এই বর্ণনাটিকে সবিশেষ উপভোগ্য করিয়াছে। পুরানো বাংলা সাহিত্যে যদি আধুনিক ছোটগল্পের মত কোনো জীবন-রস-নিটোল রচনা থাকে, তবে তাহা রূপরামের এই আত্মকাহিনী। রূপরামের কাব্যকলা বাহুল্য ও অলংকারভার বর্জিত। এইখানে তাঁহার সহিত পরবর্তী অধিকাংশ কবির প্রধান পার্থক্য। রচনার প্রধান গুণ সারল্য ও স্পষ্টতা। মানবরসের স্পর্শ কৌতুকরসের উচ্ছলতাকে সংযত করিয়া ভাষায় দীপ্তি সঞ্চারিত করিয়াছে। রঞ্জাবতীর শালে ভর দিবার প্রসঙ্গটির বর্ণনায় কবি মানবরস প্রকাশে ও সহৃদয়তায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি রামদাস আদক ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। তাঁহার কাব্য বৈশিষ্ট্যহীন। তবে সরল সহজভাবে ধর্মমঙ্গলের আকর্ষণীয় কাহিনীটি তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অপর কবি সীতারাম দাসও একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যটিতেও কবির আত্মকাহিনী অংশ বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পুরাদমে ধর্মমঙ্গল কাব্যরচনা চলিতে থাকে। মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাঁটা দেখা দেয়। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্য-শাখাটির আরম্ভই ঘটিয়াছে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। একশত দেড়শত বৎসরের মধ্যে তাই এই শাখার প্রাণরস শুষ্ক হইয়া যায় নাই।

অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মমঙ্গলের কবি হইলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরামের কাব্যের প্রধান গুণ স্বচ্ছন্দতা ও গ্রাম্যতাহীনতা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাধারণভাবে বাংলা কাব্যকাহিনীতে প্রসাধনের যে অতিরেক দেখা গিয়াছিল ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যেও তাহা দুর্লভ নয়। বিশেষ করিয়া শব্দালংকারের ঘটা তাঁহার কাব্যকে আশ্চর্য শ্রুতিমাধুর্য দিয়াছে। কাব্যের সর্বত্র ঘনরামের উদারচিত্ততার পরিচয় মিলিতেছে, দেশাত্মবোধের আকৃতিও দেখা গিয়াছে মাঝে মাঝে। "রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ" অষ্টাদশ শতাব্দীতে অস্পষ্টভাবে হইলেও এক ধরনের দেশাত্মবোধ দেখা দিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি সংস্কৃতির প্রভাবে প্রকটিত নব্য জাতীয় ভাবনার কিঞ্চিৎ পূর্বাভাষ অষ্টাদশ শতকেই পাওয়া যাইতেছে।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মমঙ্গলকাব্য এই শতকের প্রথমার্ধে রচিত হইয়াছিল। কাব্যের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই। নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গলের বিশিষ্টতা কবির আত্মকাহিনীর জন্য। লেখক উচ্চশিক্ষিত, বিষয়জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। নবাব দরবারে বীরভূমের সামন্ত নৃপতির উকীল হিসাবে কাজ করিতেন। তাঁহার সামাজিক পদমর্যাদা এবং আভিজাত্য অবশ্য স্বীকার্য। এই জাতীয় ব্যক্তির পক্ষে ধর্মঠাকুরের মঙ্গলকাহিনী রচনা একটু বিস্ময়ের ব্যাপার সন্দেহ নাই।

সমসাময়িক অপরাপর ধর্মমঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে নাম করিতে হয় প্রভুরাম মুখুজ্জে, হৃদয়রাম সাউ, শংকর চক্রবর্তী প্রভৃতির। মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে অষ্টাদশ শতাব্দীসুলভ ভাবাভঙ্গি এবং অতিরিক্ত প্রসাধনকলা লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার বিশিষ্টতা সম্পর্কে কিছু ধারণা হইবে :

(১) ধর্মমঙ্গল যুদ্ধবহুল আখ্যানকাব্য। ইহার কাহিনী-অংশে যেমন যুদ্ধবর্ণনার প্রাধান্য, তেমনি ইহার চরিত্রগুলিও প্রধানতঃ বীররসকে আশ্রয় করিয়া প্রকটিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যেই বীরাঙ্গনা বাঙালী নারীর জীবন্ত চরিত্রমূর্তি পাইতেছি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অনুবাদকাব্যে কখনো কখনো বীররসের চর্চা করিলেও মৌলিক বাংলা কাব্য পরিবারধর্মের উত্তেজনাহীন তরঙ্গহীন কাহিনীই বলিয়াছে। কচিৎ দু'একটি চরিত্রে বীর্য থাকিলেও নারীর কোমল পেলব মূর্তিই সেখানে দেখা গিয়াছে। বাংলাদেশের ললিত কোমল কাব্যকল্পনার জগতে ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ও চরিত্রধারা নূতন রূপ ও রসের আস্বাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। এই দিক হইতে দেখিলে ধর্মমঙ্গলের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেই হইবে।

(২) ধর্মমঙ্গল কাব্যধারায় আমরা এমন কবির সন্ধান পাইয়াছি যাঁহারা তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্য হইতে আসিয়াছেন। ধর্মসাহিত্য এবং ধর্মপূজার

সহিত নিম্নমার্গের জনসাধারণের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর। ফলে এই ধারার কাব্য রচনায় তাঁহারাও আগাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা যে ব্যাপকভাবে আসরে একাব্যের পালা গান করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) ধর্মমঙ্গল কাব্যের সহিত ধর্মপূজাপদ্ধতি নামক এক ধরনের কাব্যও রচিত হইতে দেখি। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সহিত এইরূপ কোনো পূজাপদ্ধতি রচিত হইবার সংবাদ মেলে না।

(৪) মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের ন্যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পাওয়া যায় নাই। বিশেষ করিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরে রাঢ়ের অঞ্চল-বিশেষের কবিরা এই কাব্য রচনায় উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্মপূজা কোনোকালেই বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলে সেইরূপ ছড়াইয়া পড়ে নাই। তদুপরি হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণগুলির নিকটে ইহা সমান আদরে গৃহীত হয় নাই। মনসা এবং চণ্ডী যেমন নিম্নস্তরে জন্মলাভ করিয়াও সংস্কৃতি-সমন্বয়ের মধ্য দিয়া উচ্চস্তরের নিকটও বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে, এবং হিন্দুর পৌরাণিক দেব-দেবীর সহিত একাকার হইয়াছে বা গভীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, ধর্মঠাকুরের ক্ষেত্রে সেইরূপ ঘটে নাই। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে পৌরাণিক শিব বা বিষ্ণুর বা বুদ্ধের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহা মিশ্রণমাত্র, খাঁটি সমন্বয় নয়। ধর্মঠাকুরের ক্ষেত্রে দুই সংস্কৃতির মিলন সম্পূর্ণ ঘটে নাই।

(৫) ধর্মমঙ্গল কাহিনীর পশ্চাৎপটে রহিয়াছে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অতীতের একটি পটভূমি। সম্ভবতঃ পালরাজাদের কামরূপ বিজয় বা অনুরূপ একটি বড় ধরনের যুদ্ধায়োজনের কিছু ভাঙা ও অস্পষ্ট স্মৃতি ঘুমাইয়া আছে এই কাহিনীর মধ্যে। বাংলাদেশের বীরত্বপূর্ণ অতীতের কিছু বাস্তব পরিচয়ের রেশ যেন এই কাব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।

(৬) অষ্টাদশ শতাব্দীর রুচিবিকৃতির যুগে গোলাহাট পালার পৃথক পুঁথি বহুসংখ্যায় লেখা হইয়াছিল। ইহার অন্তর্ভুক্ত কাহিনীর মধ্যে আদিরসের যে ছড়াছড়ি আছে, কবি এবং পাঠকদের তাহা আকৃষ্ট করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া এই শতকের লেখকদের মধ্যে অনেকেই প্রসাধনকলার উপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন ১৮। মঙ্গলকাব্য-ধারায় যে পরিণতি দেখা দিল অষ্টাদশ শতকে তাহার স্বরূপ নির্ণয় কর। পুরাতন মুখ্য মঙ্গলকাব্যগুলির তুলনায় নূতন নূতন মঙ্গলকাব্য দেখা দিল। তাহার কারণ কি? এই নব ধারাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

অথবা, (ক) শিবায়ন এবং (খ) অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গল

কাব্যধারার পরিচয় দাও। কি অবস্থায় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই কাব্যধারাগুলি দেখা দিল তাহার বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ঃ মঙ্গলকাব্য-ধারা পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই চারিশত বৎসরের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য-ধারায় কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই, একথা স্বীকার করা চলে না। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনধারায় এই কালপর্বে নানারূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল অষ্টাদশ শতকে। মঙ্গলকাব্যের মুখ্য ধারা হইল মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গলের ধারা। রচনার সংখ্যা, উৎকর্ষ এবং দীর্ঘকাল প্রচলনের দিক হইতে এই তিনটি ধারাই প্রধান। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই তিনটি ধারায়ই পরিবর্তন দেখা দিল।

মনসামঙ্গল ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল কাব্যের কয়েকজন মুখ্য কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই ধারাটি সমানে তিনশত বৎসর চলিবার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া ইহার সর্ববিধ প্রাণশক্তি ক্ষীয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। মনসা-মঙ্গলের পুরাতন কাহিনী-গাম্ভীর্য এবং চরিত্রপৌরুষ সমকালীন যুগজীবনের পক্ষে মূল্যহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলকাব্যের কবিরা প্রাণহীন কাব্যের সাধনা করিতেছিল। উত্তরবঙ্গের যে দু'একজন কবি পূর্ণদেহ মনসামঙ্গল লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এমন কিছু সৌন্দর্য ছিল না। তাহা একান্তভাবে গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল।

চণ্ডীমঙ্গল ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আরম্ভ ষোড়শ শতকের শেষভাগে। অতি অল্পকালের মধ্যে এই কাব্যধারায় মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মত অত্যুচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কবির আবির্ভাবের ফলে পরবর্তী চণ্ডীমঙ্গল রচনার ধারা নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। কোনো প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনায় আর অগ্রসর হইলেন না। কারণ মুকুন্দরামের পরে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়া বিশেষ কিছু করা আর সম্ভবপর ছিল না। তাই সপ্তদশ শতক হইতেই চণ্ডীমঙ্গলধারায় আর উল্লেখযোগ্য কবির আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় না।

ধর্মমঙ্গল ঃ সপ্তদশ শতক হইতে ধর্মমঙ্গলের কাব্যরূপ দেখা যাইতে লাগিল। ধর্মমঙ্গলের ধারাটি স্বল্পবয়স্ক বলিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সমানে প্রবাহিত হইয়াছে। মাত্র একশত বৎসরে ইহা জীর্ণ হইয়া পড়ে নাই।

প্রধান তিনটি মঙ্গলকাব্যধারার মধ্যে একমাত্র ধর্মমঙ্গলেই অষ্টাদশ শতকেও ঘনরাম চক্রবর্তীর ন্যায় যথার্থ শক্তিমান কবি দেখা দিলেন। চণ্ডীমঙ্গল বা মনসা-মঙ্গলে শুধুই গতানুগতিকতা চলিয়াছে এই শতকে। তবে সাধারণভাবে অষ্টাদশ

শতাব্দীর জীবনপরিবেশের প্রভাবের ফলে কিছু পরিমাণ আদিরসের বাড়াবাড়ি এবং রুচিহীনতা ইহাদের মধ্যেও প্রবেশ করিতেছিল। অন্যদিকে অতিমাত্রায় প্রসাধন-নৈপুণ্য, অলংকার প্রয়োগের প্রবণতা দেখা দিল।

এই অবস্থায় বাংলা সাহিত্যে নূতন ধারার মঙ্গলকাব্য কিছু কিছু দেখা দিল। তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল শিবায়ন এবং অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গলের ধারা। প্রথমটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শুরু হয়. আর দ্বিতীয় ধারাটি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই নূতন মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাবের পশ্চাতে যুগপ্রয়োজন কতখানি কাজ করিয়াছে তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

মঙ্গলকাব্য রচনার প্রথম যুগে ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে লৌকিক ভাবভাবনার সংঘর্ষ প্রয়োজনীয় পটভূমির সৃষ্টি করিয়াছিল। মঙ্গলকাব্যগুলি আসলে লোকসংস্কারের দেবদেবীর উচ্চবর্ণের নিকট স্বীকৃতিলাভের এবং দেশব্যাপী পূজা-প্রচলনের কাহিনী। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এই সামাজিক সত্যের আর কোনো বাস্তব মূল্য ছিল না। এই সব লৌকিক দেবদেবী গতানুগতিক ভক্তি ও বিশ্বাসের পাত্রপাত্রী মাত্র ছিল, তাহার অধিক আর কিছু নয়। তাহা ছাড়া মঙ্গল-কাব্যের পুরাতন কাহিনীগুলি যথেষ্ট পরিচিত ও আকর্ষণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মধ্যযুগে সম্পূর্ণ নূতন নূতন ধরনের মৌলিক আখ্যানকাব্য রচনার সুযোগ বড় ছিল না। মঙ্গলকাব্যের বাহিরে নূতন কোনো কাব্যাঙ্গিক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কাজেই মঙ্গলকাব্যের ধারায়ই নূতন কাব্য রচিত হইল। তবে মঙ্গলদেবদেবী সম্পর্কীয় ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসিয়াছিল। সুতরাং নূতন যে সব দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া কাব্য রচিত হইল তাহাদের স্বভাবচরিত্র ভিন্নজাতীয়। কাব্যরূপের মধ্যেও কিছু পরিবর্তন দেখা গেল।

(ক) **শিবায়ন**ঃ শিবায়ন কাব্যটি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বহু রচনায় দেবখণ্ড-রূপে সংক্ষিপ্তাকারে প্রচলিত ছিল। মনসামঙ্গল-কাব্যের দেবখণ্ডেও শিবপার্বতী সংক্রান্ত নানা উপাখ্যানের সন্ধান মিলিতেছে। শিবায়ন কাব্যে ইহাই স্বতন্ত্র কাব্যের রূপ লইয়া দেখা দিল। শিবদেবতার মধ্যে পুরাণ ও লৌকিক উভয় প্রান্তের চমৎকার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই দেবতাটির ভাবকল্পনায় নানারূপ পরিবর্তন ও মিশ্রণ চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় কথা হইল, মঙ্গলকাব্যের অপরাপর দেবতা আপন মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া যেভাবে দেশব্যাপী পূজা প্রচলন করিতে চায়, সেদিক দিয়া শিবদেবতাটির কোনোরূপ উৎসাহ নাই। আদি মঙ্গলকাব্য-গুলি হইতে শিবায়ন এখানে স্বতন্ত্র আকার গ্রহণ করিয়াছে। ইহারও কারণ যে যুগগত পরিবর্তন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলার শিব কৃষকের দেবতা। তাহার চরিত্রে পৌরাণিক মাহাত্ম্য আর

একেবারেই অবশিষ্ট নাই। গ্রাম্য মানুষ শিবের মধ্যে নিজেদের নিকটজনকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গলের দেবখণ্ডে শিব-দেবতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নাথপন্থীদের দুইটি কাব্যে—গোর্খবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গানেও শিবচরিত্র রহিয়াছে। নাথপন্থীদের শিব যোগসাধনার আদি পুরুষ। তাঁহার চরিত্র নাথপন্থী তত্ত্বের মধ্য দিয়া অনেকখানি আদর্শবাদমণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের শিব একেবারে লৌকিক দেবতা। লোকপ্রচলিত ছড়ায় ও গানে শিবের এই রূপই প্রকট। মনসামঙ্গলের শিব ইন্দ্রিয়শিথিল বৃদ্ধ, দারিদ্র্যও আছে—তবে চণ্ডীমঙ্গলের শিবে দারিদ্র্য, আলস্য, ভোজনলোলুপতা প্রধান। শিবায়নে শিব আর ভিক্ষাজীবী নয়, কৃষিজীবী।

শিবায়নের কবি শিবদুর্গার যে জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহা দরিদ্র কৃষিজীবী পরিবারের জীবনচিত্র হিসাবে আশ্চর্য সার্থক। কিন্তু লক্ষণীয় অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় শিবপূজা প্রচারের কথা (ব্রতকথা ছাড়া) মুখ্য কাব্যগুলিতে প্রধান হইয়া ওঠে নাই। শিবদেবতাকে পূজা করিলে পার্থিব জীবনে কোন্ সুখলাভ ঘটিবে তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা হয় নাই। আসলে মঙ্গলকাব্যের পুরাতন রূপরীতির মধ্যেও শিবায়নের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিবার মত।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই প্রথম শিবায়ন কাব্য রচিত হইতে থাকে। কয়েকটি ক্ষুদ্র রচনায় শুধু শিবচতুর্দশীর উপাখ্যানটি অবলম্বিত হইয়াছে। এই কাব্যগুলি 'মৃগলুব্ধ' নামে পরিচিত। 'মৃগলুব্ধে'র রচয়িতাদের মধ্যে নাম করিতে হয় দ্বিজ রতিদেব এবং শিশুরাম রায়ের।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের জনৈক সভাকবি কবিচন্দ্র একখানি পূর্ণাঙ্গ শিবায়ন কাব্য রচনা করেন। সম্ভবতঃ ইনিই রামায়ণ অনুবাদও করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন বৃহৎ কাব্য। কাব্যটি পঁচিশটি পালায় বিভক্ত। উপাখ্যানগুলি হইল সৃষ্টিপত্তন, দক্ষযজ্ঞ, তারকবধ, উমার জন্ম-তপস্যা-বিবাহ-বাসর-যাপন-কৈলাসযাত্রা, সমুদ্র-মন্থন, বলি-অগস্ত্য-সগর-গঙ্গা-ত্রিপুর কাহিনী, দুর্গার কোন্দল, তারক-শুক্র-অন্ধক-পরশুরাম কাহিনী, ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী: কবির রচনায় কিছু কিছু লৌকিক প্রসঙ্গ থাকিলেও পৌরাণিক উপাখ্যানই বেশী সংকলিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতকে শিবায়নের শ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বর চক্রবর্তী কাব্য রচনা করেন। তিনি এই শতকের বিশিষ্টতম কবিদের মধ্যে একজন। ইনি সত্যনারায়ণে পাঁচালীও লিখিয়াছিলেন। শিবায়ন রচনা শেষ হয় এই শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে। শিবায়ন আট-পালার কাব্য। ইহার মধ্যেও পুরাণ হইতে সংকলিত কোনো কোনো আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণ, ভাগবত, নন্দিকেশ্বর পুরাণ হইতে

সেইগুলি সংগৃহীত। কিন্তু কৃষক শিবের লৌকিক কাহিনীই এই কাব্যের প্রধান অংশ।

রামেশ্বরের রচনা অনায়াসসুন্দর এবং সরল। ভারতচন্দ্রের চটক ইহাতে নাই। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বিলাসী রাজসভাসদের কাব্য, রামেশ্বরের শিবায়ন চাষী গৃহস্থের পাঁচালী। রামেশ্বরের রুচিবোধ যদি তাঁহার অনুবর্তী ভারতচন্দ্র পাইতেন, তবে অন্নদামঙ্গলের উৎকর্ষ বাড়িত। শিবায়নের কোনো কোনো কাহিনী—যেমন বাগ্দিনীর পালা—কম আদিরসসিক্ত নয়। কিন্তু রামেশ্বর কোথাও তাহাকে অশ্লীল হইয়া উঠিতে দেয় নাই। রামেশ্বরের কবিতায়ও অলংকরণাতিরেক এবং নাগরবৈদগ্ধ্য আছে। কবির পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে নানা স্থানে। কিন্তু কবির মানবপ্রীতির স্নিগ্ধ পরিচয় গোটা কাব্যে ছড়াইয়া আছে।

শিবায়ন কাব্যের ধারাটি অল্পকালেই লুপ্ত হইয়া গেল। এই কাহিনীর পটভূমিতে উমা-মেনকার মান-অভিমানকে কেন্দ্র করিয়া দেখা দিল আগমনী ও বিজয়া গান। কাহিনীকাব্যের ধারাটি গীতিকাব্যের মধ্যে লীন হইয়া গেল।

(খ) **অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গলঃ** কালিকামঙ্গলকাব্য আসলে বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনী। নামে কালিকামঙ্গল হইলেও একটি আদিরসাত্মক প্রণয়কাহিনীর বিবরণই ইহার লক্ষ্য। দেবীর মহাত্ম্যপ্রচার বা পূজাপ্রচলনের কোনরূপ কাহিনী ইহার মধ্যে স্থান পায় নাই। মাহাত্ম্য যাহা আছে তাহাকে মাহাত্ম্য না বলাই ভালো। অবৈধ প্রণয়ের কামকেলীকে রক্ষা করার মধ্যে কোনই গৌরব নাই। মঙ্গলকাব্যের দেবতার এই জাতীয় পরিণতি যুগগত রুচিবিকলতার প্রমাণ বহন করে।

কালিকামঙ্গল প্রথম লেখেন কবি কৃষ্ণরাম দাস। ইনি ষষ্ঠীমঙ্গল রায়মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তদশ শতকের কবি। ঐ শতকেই কাব্য লেখেন একজন প্রাণরাম চক্রবর্তী এবং সাবিরিদ খাঁ। মুসলমান কবি নিশ্চয়ই বিদ্যাসুন্দরের রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনীর দ্বারাই এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতকে বলরাম চক্রবর্তী কালিকামঙ্গল লেখেন। কাব্যটির রচনারীতি মার্জিত, কিন্তু পাণ্ডিত্যবর্জিত এবং সরল। গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল বৃহৎ কাব্য। কাব্যটি পাঁচ অংশে বিভক্ত। শেষ অংশ বিদ্যাসুন্দর কাহিনী। অন্য চারিটি উপাখ্যান হইল—বৃত্রাসুরবধ বা দেবরাজ্যে দেবীমাহাত্ম্য প্রচার, ইন্দ্রের অহল্যা-হরণ পাপ ও দেবীর কৃপায় নিস্তারলাভ, চণ্ডী সপ্তশতী অনুযায়ী মহিষাসুর বধ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান অর্থাৎ ভোজরাজকন্যা ভানুমতীকে বিবাহ এবং তালবেতাল সিদ্ধি। কাব্যটি সুরচিত। ইহার ভাষা সরল ও মধুর। ছন্দের

বৈচিত্র্য আছে। কতকগুলি গানও আছে। উহা আখ্যানকাব্যে শ্রী সম্পাদন করিয়াছে। গানগুলির কোনো কোনোটি ব্রজবুলিতে লেখা।

অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায় শুধু অষ্টাদশ শতকের বিশিষ্টতম কবি নহেন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম মুখ্য প্রতিভাধর কবি। কিন্তু প্রতিভানুযায়ী কাব্য সৃষ্টি করিবার সুযোগ তিনি লাভ করেন নাই। ভারতচন্দ্র বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। দীর্ঘকাল রাজসভায় বাস করিবার ফলে তাঁহার রুচি যেমন আভিজাত্য লাভ করিয়াছিল, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ, নাগরিক বুদ্ধি তির্যক এবং আদিরসের প্রতি অত্যধিক আসক্তি দেখা গিয়াছিল। এই সমস্তই তাঁহার রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড অন্নদামঙ্গল। ইহাতে কাশীধামে অন্নপূর্ণাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। নানা পুরাণ হইতে এবং কিছুটা নিজের কল্পনালোক হইতে ইহার উপাদান কবি সংকলন করিয়াছেন। কাব্যের দ্বিতীয়াংশ হইল বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল; তৃতীয়াংশ মানসিংহ নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে ইতিহাস-কিংবদন্তী ও কল্পনা বিজড়িত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রই প্রথম বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের বিষয় লইয়া কাব্যরচনার সূত্রপাত করিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল—(১) অতিরিক্ত মাত্রায় বাচনসৌকর্য। শব্দচয়ন, শব্দবয়ন, অলংকার-পারিপাট্য সব মিলাইয়া তিনি এমন একটি কাব্যজগৎ গড়িয়া তুলিয়াছেন যাহাকে "তন্বী শ্যামা শিখরদশনা" নামে অভিহিত করা চলে। তাঁহার ভাষা যেমন শাণিত তেমনি গতিশীল। আধুনিক বাংলা ভাষার সব লক্ষণ তাঁহার রচনার মধ্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সংস্কৃত, পার্সী এবং খাঁটি বাংলা বুলির এইরূপ সুখী সম্মিলন প্রায় কল্পনা করা যায় না। ঐ ভাষায় একটি নাগর বৈদগ্ধ্য এবং মনঃপারিপাট্য লক্ষ্য করা যায়। (২) ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্য শুধু ভাষা ব্যবহারে নয়, নানারূপ দার্শনিক তত্ত্বের উপস্থাপনে এবং বিতর্কে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। (৩) ধর্মবোধের সর্বজনীনতা। তাহা অপেক্ষাও বড় কথা, তিনি ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতাকে যতটা বুদ্ধির দিক দিয়া দেখিতেন ততটা হৃদয়াবেগের দিক দিয়া অনুভব করিতেন না। (৪) আদিরসের বাড়াবাড়ি যে ভারতচন্দ্রে আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। (৫) ভারতচন্দ্রের কাব্যে রক্তমাংসের মানুষ বড় দেখা যায় না। সব চরিত্রই টাইপ। অনেকগুলি বাস্তবের 'ক্যারিকেচার'।

পরবর্তী বাংলা কাব্যধারার উপরে ভারতচন্দ্রের প্রভাব গুরুতর। ভারতচন্দ্রের অনুকরণে আদিরসাত্মক রোমান্টিক কাব্যকাহিনী উনিশ শতক পর্যন্ত চলিয়াছে। তাঁহার বাচনভঙ্গীর প্রভাব সমকালে এবং পরবর্তী কালে বহু লেখকের উপরই বর্তাইয়াছে।

রাধাকান্ত মিশ্র রচিত "শ্যামামঙ্গল" কলিকাতা-নিবাসী কবির লেখা প্রাচীনতম কাব্য। তাঁহার রচনায়ও যুগোপযোগী মার্জিত বাচনভঙ্গি রহিয়াছে। তবে অলংকারের চটকে চোখ ধাঁধাঁইবার চেষ্টা নাই।

রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর কাব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আখ্যানের শেষে সুন্দরের শবসাধনা-কাহিনী অভিনব এবং তান্ত্রিক কবির উপযুক্ত। "ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শিল্পচাতুর্যে এবং ভাষার মনোহারিত্বে ভারতচন্দ্রের কাব্য রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে অপকৃষ্ট। রামপ্রসাদের বর্ণিত ভূমিকাগুলি যথাসাধ্য স্বাভাবিক, আর ভারতচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্র সবই টাইপ ধরনের এবং প্রায়ই satirical বা ব্যঙ্গায়িত। এইজন্য ভারতচন্দ্রের কাব্যের তুলনায় রামপ্রসাদের কাব্য নিষ্প্রভ। রামপ্রসাদের কাব্যের আর একটি বড় গুণ হইতেছে human touch অর্থাৎ ঘরোয়া ভাবের স্পর্শ। তবে শব্দশিল্পী হিসাবে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের কাছে দাঁড়াইতে পারেন না।" [—ডঃ সুকুমার সেন।]

প্রশ্ন ১৯। শাক্ত পদাবলী কাব্য-ধারার আবির্ভাব ঘটিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এত বিলম্বিত আবির্ভাবের কারণ কি বিশ্লেষণ কর। শাক্ত পদাবলীর পশ্চাতে বৈষ্ণব পদাবলী এবং মঙ্গলকাব্যের কতটা প্রভাব পড়িয়াছে, আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

উত্তর: শাক্ত পদাবলী রচনার আরম্ভ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে। রামপ্রসাদ সেনের হাতে আমরা এই কাব্যধারার গোড়াপত্তন দেখিতে পাই। ইহার পূর্বে বাংলা সাহিত্য নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া প্রচলিত ছিল। কিন্তু শাক্ত পদাবলী কাব্যধারার প্রাক্-রূপ প্রায় কোথাওই দেখিতে পাওয়া যায় না। এত বিলম্বে একটি কাব্য-ধারার আগমনের কারণ কি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

পঞ্চদশ শতক হইতে বাংলা সাহিত্যে শাক্ত সাহিত্য রচিত হইয়া আসিতেছিল। এইগুলি প্রধানতঃ মঙ্গলকাব্য আকারেই প্রচলিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে যে দেবীর কথা বলা হইয়াছে, শাক্ত পদাবলীতেও সেই একই দেবতার ভিন্ন রূপের আরাধনা করা হইয়াছে। উহা ছাড়া মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং দুর্গাসপ্তশতীর নানা অনুবাদও প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার বাহিরে শক্তিদেবতার অর্থাৎ কালী বা পার্বতীকে অবলম্বন করিয়া অন্য ধরনের কাব্যরচনার প্রয়োজনীয়তা শাক্তসাধক ভক্তেরা অনুভব করেন নাই। তাহা ছাড়া বৈষ্ণবদের সঙ্গে শাক্তদের সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস ও ভাবনাগত দূরত্ব এত বেশী ছিল, সংঘাত এত উচ্চকণ্ঠ ছিল যে বৈষ্ণবদের আদর্শে কোনো কিছু রচনা করিবার কথা তাহারা ভাবিতেও পারিত না। সর্বশেষে বলা যায়, শাক্ত ভক্তসম্প্রদায়ের মধ্যে যথার্থ

কাব্যপ্রতিভাসম্পন্ন সাধকের আবির্ভাব এতকাল ঘটে নাই বলিয়াই শাক্ত পদাবলী কাব্যধারা দেখা যায় নাই।

অষ্টাদশ শতকে মঙ্গলকাব্যের পুরাতন ধারাগুলি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যদিকে শাক্ত বৈষ্ণবদের সংঘাতও অনেক পরিমাণে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। অন্ততঃপক্ষে একথা ঠিক যে, বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শ অনুসরণ করিবার পক্ষে শাক্ত সাধকদের বিশেষ কোনো বাধা ছিল না। বিশেষ করিয়া রামপ্রসাদের ন্যায় গীতি-প্রতিভাসম্পন্ন সাধকের আবির্ভাব ঘটিল অষ্টাদশ শতকে। এই সব সুযোগের মিলনে শাক্ত পদাবলীর সৃষ্টিকর্ম শুরু হইল।

শাক্ত পদাবলী গীতিধর্মী কবিতা। বাংলা সাহিত্যে এই নবধারাটির আগমন ঘটিবার আগে নানা শাখায় শাখায়িত বিচিত্র ও বিস্তৃত রূপ ইহা গ্রহণ করিয়াছিল। এই নূতন শাখাটির উদ্ভবের পিছনে তাহাদের ভাববিশ্বাসগত এবং রূপাঙ্গিকগত প্রভাব কতটা কার্যকর হইয়াছিল তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

প্রথমেই আসে রূপরীতির কথা। শাক্ত পদাবলী গীতিকবিতা। ইহা "পদাবলী" নামে সাধারণ্যে পরিচিত। বৈষ্ণব কবিতাও বহুকাল হইতে "পদাবলী" নামেই প্রচলিত ছিল। শাক্ত পদাবলীর কবিতাগুলি রূপরীতির দিক হইতে যে বৈষ্ণব কবিতার সমজাতীয়, নামের এই ঐক্যই তাহা প্রমাণ করে। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বেশ কিছু প্রভাব যে শাক্ত কবিতার গঠনরীতির উপরে পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগে দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত ছিল:—প্রথমটি হইল আখ্যানকাব্যের ধারা বা পাঁচালী, দ্বিতীয়টি গীতিকবিতা বা পদসাহিত্য। পদসাহিত্যে কাহিনী বা চরিত্র-চিত্রণের কোনোরূপ চেষ্টা থাকে না। মানবচিত্তের একটি দুটি ভাবাবেগের সূত্র, উচ্ছ্বাসের দীর্ঘশ্বাস ইহার মধ্যে একান্ত হইয়া উঠে। পঞ্চদশ শতক হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা পদসাহিত্যের প্রধানতম প্রতিনিধি হইয়াছিল বৈষ্ণব কবিতাই। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন নূতন গীতিকবিতার ধারা দেখা দিল, তখন তাহার পক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া উপায় ছিল না। শাক্ত কবিতাগুলি গীতিকবিতা এবং মানব-সম্পর্ক-বিগলিত ভক্তিভাব এখানে প্রধান এবং এই দুইটি বিষয়ই বৈষ্ণব কবিতার জগৎ হইতে গৃহীত।

শাক্ত কবিতার মধ্যে দুইটি শ্রেণী:-(ক) উমাবিষয়ক; (খ) শ্যামাবিষয়ক। ইহাদের রূপে ভাবে এবং রসাস্বাদে কিছু পার্থক্য আছে। ফলে ইহাদের উৎসসন্ধানও যে কিছুটা ভিন্নমুখী হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। উমাসংগীতগুলি উমা-মেনকার হৃদয়-ভাবব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে। মাতাকন্যার মান-অভিমান, অল্পবয়সে কন্যার বিবাহ দিয়া পর করিয়া দিবার দুঃখ, উমার দারিদ্র্য, আশ্বিন মাসে তিন দিনের জন্য উমার পিতৃগৃহে আগমনের আনন্দ, বিজয়া-বিদায়ের ক্রন্দন—এই শাক্ত পদাবলীর উমা এবং

মেনকার জবানীতে প্রকাশ পাইয়াছে। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ইহার পশ্চাতে কোথায় লুকাইয়াছে। মানবিক অনুভূতির বিচিত্র সুর এই সব কবিতার মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে। উমাসংগীত প্রসঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব বাৎসল্যরসের কবিতার, ঋণ যে সুপ্রচুর তাহাতে সন্দেহ নাই। রূপে রসে ইহারা যেন একই ধাতুতে গড়া। তাহা ছাড়া এই সব কবিতার পশ্চাতে কাহিনীগত একটি পটভূমিও রহিয়াছে। প্রত্যক্ষতঃ কোনো কাহিনী এখানে নাই; কিন্তু কতকগুলি পাত্র-পাত্রীর ভাবাবেগকে প্রকাশ করায়, একটি কাহিনী ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এইরূপ সহজেই অনুমান করা যায়। মধ্যযুগের তাবৎ শ্রোতার কাছে এই পটভূমিগত কাহিনীটি পরিচিত, তাই কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস অনুভব করিতে তাহাদের কিছু অসুবিধা হয় না। বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্যরস প্রভৃতির পশ্চাতে ভাগবতের কাহিনী রহিয়াছে, আবার রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার পটভূমিতে সর্বজন-পরিচিত লৌকিক বহুসংখ্যক কাহিনী আছে। শাক্ত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত উমাবিষয়ক কবিতগুলির অন্তরালে মঙ্গলকাব্যের কাহিনী রহিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে আমরা শিবদুর্গার কাহিনী পাই। শিবের দারিদ্র্য, শিব-গৌরীর বিবাহ, গৌরী-মেনকার মান-অভিমান নানা কাহিনীর সূত্রে বিদ্ধ হইয়া সেখানে প্রকাশ পাইয়াছে, আলোচ্য রচনাগুলি যেন উক্ত কাহিনীধারা হইতে ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে। শিবায়ন কাব্যে এই সব কাহিনী আরও বিস্তারিত আকারে পাই। কাজেই সিদ্ধান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, নানা মঙ্গলকাব্যে (বিশেষতঃ চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়নে) বহুকাল পূর্ব হইতেই শিবদুর্গা বিষয়ে যে সব কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে ভাবসর্বস্ব গীতিকবিতায় রূপান্তরিত হইল। উহাই শাক্ত পদাবলীর উমাবিষয়ক গান।

শ্যামাবিষয়ক গানের রূপ ও রীতি দুই-ই ভিন্ন। গীতিকবিতা এবং ভক্তি-রসাত্মক—এই দুই দিক দিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত ইহার সাধারণ মিল থাকিলেও উভয় ধারার বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করিবার মতো। এই বৈসাদৃশ্য উমাবিষয়ক এবং শ্যামা-বিষয়ক কবিতার মধ্যেও:—(১) উমাবিষয়ক কবিতা (এবং বৈষ্ণব পদাবলী) মানবিক হৃদয়ানুভূতি, অর্থাৎ বাৎসল্য, প্রণয় প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়াছে। শ্যামাবিষয়ক কবিতায় মাতৃভাবনা পুরোপুরি আধ্যাত্মিক। আরাধ্যা দেবীকে মাতা বলিয়া অনুভব করায় আর যাহাই হউক মানবিক রস প্রকাশের সুযোগ মেলে না। (২) উমা-বিষয়ক কবিতায় পাত্রপাত্রীর হৃদয়াকূতি ব্যক্ত হয়। কবি নিজে তাহাদের পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্যামাবিষয়ক কবিতায় কবি স্বয়ং নিজ ভাব-ভাবনা প্রকাশ করেন। কবি স্বয়ং এবং তাঁহার আরাধ্য দেবতায় মধ্যে এখানে ভাববিনিময়। কবিই এখানে একমাত্র বক্তা। তাঁহার চিত্তভাবই প্রত্যক্ষতঃ প্রকাশ পায়। (৩) শ্যামাবিষয়ক

কবিতার সঙ্গে ধর্মসম্প্রদায়ের যোগাযোগ থাকে বড় ঘনিষ্ঠ। একক কবি সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও বটেন আবার নিজস্ব ভাবধারার প্রকাশকও সত্য। কবি সাধনভজনের নানা প্রসঙ্গ, আরাধ্যা দেবীর স্বরূপ এই সব কবিতায় ব্যক্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে থাকে সাধকদের মুক্তির কামনা।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ইহার পশ্চাতে কাহিনী-পটভূমি ততটা নাই। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ব্যাখ্যাত কালীর রুদ্রমূর্তির বর্ণনা কবিদের কিছুটা প্রভাবিত করিয়া থাকিবে। কিন্তু এই ধরনের গীতিকবিতা বাংলা সাহিত্যের ধারায় একেবারে অপরিচিত নহে। বহু পূর্ব হইতেই সাধনসংগীতের যে ধারাটি প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার বৈশিষ্ট্যের সহিত ইহার আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। চর্যাপদ, বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বাউল গান, সুফী-মুর্শিদ গান, শাক্ত (শ্যামা) পদাবলী—সবই এক সুরে বাঁধা। ইহাদের ধর্মসাধনার মধ্যে নানারূপ পার্থক্য আছে। সাধ্যবস্তু সম্পর্কে অনেক রকমের ভিন্ন মতামত আছে। কিন্তু এইগুলির মধ্যে ভাবগত ঐক্যও আছে। ইহারা সকলেই বিশ্বকে মায়াপ্রপঞ্চ বলিয়া মনে করে, বিশ্বাতীত সত্যকে জানিতে চায়। ইহাঁদের সাধনপ্রণালীর মধ্যে যৌগিক-তান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসরণ রহিয়াছে। ইহারা সকলেই গুহ্য সাধনপ্রণালীতে বিশ্বাসী। এই সব কবিতায় উক্ত ভাবাবেগগুলি প্রকাশ পাইয়াছে। রূপরীতির দিক হইতেই ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য আছে। রূপকধর্মী কবিতা রচনা, গুহ্য সংকেতপূর্ণ আপাত-অর্থহীন পদ এই জাতীয় কবিতায় সর্বত্র দেখা যায়। কাজেই শাক্ত শ্যামাসংগীতগুলির সাহিত্যিক উৎস খুঁজিতে গেলে সাধনসংগীতের ধারাটির সহিত ইহাদের যুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রশ্ন ২০। আরাকানের মুসলমান কবিদের অবদানে বাংলা সাহিত্য কতটা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল বল। মধ্যযুগে বাঙালী মুসলমান কবিদের এত বিলম্বিত আবির্ভাবের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা কর।

উত্তর ঃ বাংলা লৌকিক প্রণয়কাহিনী মধ্যযুগে দুইটি স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হইতেছিল :—একটি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী, ইহা ধর্মসম্পৃক্ত; অপরটি ফার্সী প্রণয়কাহিনীর রাজ্য হইতে সংকলিত, এই দ্বিতীয় ধারাটি ধর্ম-অসম্পৃক্ত। প্রথম ধারাটির সঙ্গে হিন্দু কবিদের সম্পর্ক, দ্বিতীয় ধারাটি প্রধানতঃ মুসলমান কবিদের সঙ্গে জড়িত। দু'একজন মুসলমান কবি এখানে সেখানে এক-আধটি কবিতা লিখিলেও পুরাদস্তুর কাব্যরচনায় মুসলমান কবিরা সপ্তদশ শতাব্দীর আগে অগ্রসর হন নাই। ইহার পিছনে গুরুতর কারণ আছে বলিয়া মনে হয়।

আরাকান-চট্টগ্রামের রাজদরবারের আনুকূল্যে প্রথম কিছু কিছু মুসলমান কবি ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এই ধারার প্রথম কবি দৌলত কাজী। তাঁহার কাব্যের নাম "সতী ময়না" বা "লোর চন্দ্রাণী"। কাব্যটি সমাপ্ত হইবার পূর্বেই কবি ইহলোক ত্যাগ করেন। রোসাঙ্গের রাজার সেনাপতি থিরি-থু ধম্মার সেনাপতি আশরফ খানের অনুরোধে দৌলত কাজী কাব্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে তাঁহার কাব্যটি রচিত হয়। সম্ভবতঃ কোনো পূর্বী হিন্দী কাব্য অবলম্বন করিয়া দৌলত কাজীর কাব্য রচিত হইয়াছিল। তিনি শক্তিশালী কবি ছিলেন। কাব্যটির মধ্যে মধ্যে কতকগুলি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাতে বৈষ্ণব গীতিকবিতার সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। এই কাব্যকাহিনীর প্রশংসা করিয়া জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন, "এই কাহিনীর মধ্যে লোক-জীবনসম্ভব উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়বর্ণনের সঙ্গে লোক-পরিকল্পনা-মহিম সতীত্বের আদর্শও জীবনাবেদন-মধুর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। চন্দ্রাণী যেমন লোকসমাজের সার্থক রোমান্টিক প্রণয়িনী, তেমনই ময়নামতী লোকজীবনের শ্রদ্ধাপূত শাশ্বত সতী; প্রণয়-কলা-বিলাস এবং সামাজিক মহিমাবোধের এ এক অপূর্ব লোকশিল্পাত্মক সমন্বয়।"

রোসাঙ্গ রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল "পদ্মাবৎ" বা "পদ্মাবতী" কাব্য রচনা করেন। কবি জায়সীর ফার্সীকাব্য অবলম্বনে ইহা রচিত। কিন্তু ইহা স্বাধীন অনুবাদ। কবি সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। শুধু আরবী-ফার্সী ভাষাতেই তাঁহার দক্ষতা ছিল না, সংস্কৃত পুরাণ ধর্ম অলংকার ও নানা শাস্ত্রেও তাঁহার জ্ঞান ছিল। তাই আলাওলের পদ্মাবতীকাব্য হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমানী ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়-রূপ এক অপূর্ব মিলনাত্মক কাব্য হইয়া দেখা দিয়াছে। সংস্কৃত কাব্যদর্শনানুযায়ী নায়িকার বিভিন্ন ভাব ও রূপ বর্ণনা আয়ুর্বেদ জ্যোতিষাদি বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা, বিভিন্ন হিন্দু পুরাণ দর্শনাদির ব্যবহার এবং হিন্দু লোকাচারের কৌতুকাবহ বর্ণনায় গ্রন্থখানি একাধারে পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তথ্যসমৃদ্ধ এবং সরস হইয়া উঠিয়াছে। অপর পক্ষে আলাওলের কাব্যে মুসলমানী কাব্যসাহিত্যের প্রভাবও ছিল সমধিক। শুধু তাই নয়, চিশতিয়া-খান্দান্ সূফী সাধক জায়সীর কাব্য মানবকথার অন্তরালে গুহ্য সাধন কথার যে ফল্গুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, আলাওলের কাব্যনিষ্ঠার সঙ্গে তাহার ভাব, এমন কি ভাষাগত মর্যাদাও বহুলাংশে রক্ষা করিয়াছে। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য আলাওলের কাব্যের বাঙালিয়ানা।

আলাওলের অপরাপর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য "সৈফুলমূলক বদিউজ্জমাল" (ফারসী রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের মুক্ত অনুবাদ), "দারা সেকেন্দারনামা" (আলেকজাণ্ডারের বিজয়কাহিনীর কয়েকটি উপাখ্যান), "হপ্তপয়কর" (সাতটি অ্যাডভেঞ্চার গল্পের মুক্ত অনুবাদ) প্রভৃতি। তিনি দৌলত কাজী লিখিত "লোর চন্দ্রাণী"র অসম্পূর্ণ শেষাংশও লেখেন।

আলাওল রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কতকগুলি পদও লিখিয়াছিলেন। এই সব কবিতায় বৈষ্ণব ধর্মানুমোদিত আধ্যাত্মিক ভাবৈশ্বর্যের কথা নাই। থাকিবার কথাও নয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেম তাঁহার হাতে লৌকিক প্রণয়কবিতার রূপ গ্রহণ করিয়াছে, কখনও আবার সুফী সাধনার রূপক হইয়া উঠিয়াছে।

চট্টগ্রামের অধিবাসী সৈয়দ সুলতান সুফী সাধক ছিলেন। তাঁহার রচিত দুই খানি কাহিনী-কাব্য এবং কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে। সৈয়দ সুলতানের পদাবলীর মধ্যে সুফী সাধনার সাংকেতিক ইঙ্গিত আছে—কয়েকটি পদ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। এই রাধাকৃষ্ণ অবশ্য রূপক ছাড়া আর কিছুই নয়। কাহিনী দুইটির একটি "নবীবংশ"—মুসলমান নবীদের জীবনকাহিনী এবং অপরটি "জ্ঞানপ্রদীপ"—তান্ত্রিক যোগাচার সম্পর্কিত সাধনরীতিঘটিত গ্রন্থ

অপর উল্লেখযোগ্য কাব্য হইল মহম্মদ খান রচিত "মুক্তাল হোসেন"। এইখানি কারবালা যুদ্ধ সম্পর্কিত কাহিনী, সম্ভবতঃ আরবী হইতে অনূদিত।

বাংলা সাহিত্যে সপ্তদশ শতকের পূর্বে কেন মুসলমান কবিদের আবির্ভাব ঘটিল না, তাহার কারণ বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার মতো। বাঙালী মুসলমানের তাহাদের নবীন জীবনাচরণ ও বিশ্বাস লইয়া বাংলাদেশের চিরপ্রচলিত সংস্কৃতির সহিত নিজেদের মিলাইয়া লইতে পারে নাই। তাহাদের ধর্ম ভারতের বাহিরের আরব পারস্যের সংস্কৃতির একটা অংশ। কিন্তু বাংলাদেশের নিজস্ব ভাব সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিজ ধারায় বহিয়া চলিয়াছিল। উহার সহিত নিজেদের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করার প্রশ্নই দীর্ঘকাল ওঠে নাই। ক্রমে হিন্দুমুসলমান সম্পর্কের উন্নতি ঘটিতে থাকে। এবং মুসলমানেরা ধর্ম এবং দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিতে থাকে। নিশ্চিন্তভাবে আচার আচরণ ও ভাব কল্পনায় বাঙালী হইয়াও ধর্মে মুসলমান থাকা যায় এই বোধ দৃঢ় হইতে লাগিল। অবশেষে চট্টগ্রাম-আরাকানের বাঙালী মুসলমান অভিজাতবর্গের আনুকূল্যে মুসলমান কবিদের প্রতিভার উন্মেষ হয়।

মুসলমান কবিরা যে নব্যধারার সাহিত্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করিলেন তাহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য লক্ষ্য করিবার মতো। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে উহার মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য :

(১) এতকাল বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু দুইটি সূত্র হইতেই সংকলিত হইতেছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার প্রত্যক্ষতঃ নানারূপ উপাদান যোগাইয়া সেকালের বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে। তাহা ছাড়া বাংলার নিজস্ব লৌকিক কাহিনী এবং ভাবধারাও ছিল। সাহিত্যের গবেষকেরা এই দুই বিষয়-উৎসকে যথাক্রমে matter of Sanskrit এবং matter of Bengal বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। মুসলমান কবিরা উহার

সহিত একটি নূতন ধারা যুক্ত করিলেন। ফার্সী সাহিত্যের বিষয়বস্তু বাংলা সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। ইহাকে বলা যায় matter of Persian।

(২) বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্ম-অসম্পৃক্ত কোনরূপ কাব্য-কবিতার নিদর্শন আমরা পাই না। আরাকানের মুসলমান কবিরাই সম্পূর্ণ ধর্মসম্পর্ক-হীন রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যে নবীন ধারার সৃষ্টি করিলেন।

(৩) বাংলা সাহিত্য এতকাল পর্যন্ত ছিল শুধুমাত্র বাঙালী হিন্দুর সাহিত্য; এখন হইতে উহা বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সাহিত্য হইয়া উঠিল। আরাকানের মুসলমান কবিরা দেশের একটি বৃহৎ সম্প্রদায়কে বাংলা সাহিত্যের সীমানায় আমন্ত্রণ জানাইলেন। বাংলা সাহিত্য সমগ্র বাঙালী জাতির প্রতিনিধিস্থানীয় সম্পদ হইয়া উঠিল।"

প্রশ্ন ২১। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের প্রধান লক্ষণগুলির পরিচয় দাও। বাংলা সাহিত্যে এই শতাব্দী যে একটা যুগাবসান সূচিত করিতেছে তাহা সত্য বলিয়া মনে হয় কি?

উত্তর: বাংলা সাহিত্যের সূচনা ৯ম-১২শ শতকে, তুর্কি বিজয়ের পূর্বে। কিন্তু তখন এই সাহিত্যধারার উন্মেষমাত্র ঘটিয়াছে। ইহার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা পঞ্চদশ শতকে। ঐ শতকে নানা শাখায় ইহা শাখায়িত হইয়া উঠে। প্রধান প্রধান ধারার কাব্য রচনা তখন হইতেই আরম্ভ হইয়া যায়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যযুগ ষোড়শ-সপ্তদশ শতক। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙালী জাতির মধ্যে নব চৈতন্যের সঞ্চার হইয়াছিল। এই জাগরণের প্রতিফলন পড়িয়াছে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে। নানা দিকে উহার বিস্তার ও বিকাশ দেখা দিতে লাগিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষভাগ হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জীর্ণতার নানাবিধ লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠিল। তিন-শত বৎসর ধরিয়া কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধারায় বাংলা সাহিত্য বহিয়া আসিয়াছে। কবির পর কবি আসিয়াছেন। অনুকরণই সেখানে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কাহিনী বা চরিত্র কল্পনায় নূতন কিছু আসিবার সুযোগ ছিল না। পদসাহিত্যেও বলার বিষয়ে বা ভঙ্গিতে কোনোরূপ নূতনত্ব দেখা দেয় নাই। পুরাতনের গতানুগতিক প্রবাহ বাংলা সাহিত্যের প্রাণরস শুষ্ক করিয়া আনিয়াছিল। সর্বোপরি বাংলাদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় বাঙালীর ভাব ও ভাবনালোকে যে বেশ গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

বাঙালীর ভাবনায় এবং ভাবাবেগে অষ্টাদশ শতকে যে সব পরিবর্তন দেখা দিল তাহা যুগান্তরের ইঙ্গিত বহন করে। এই পরিবর্তনগুলি বাঙালীর সমকালীন সাহিত্যকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিল।

বাংলা সাহিত্যে পুরাতন ধারাগুলির স্থানে নূতন নূতন ধারা আসিয়া উপস্থিত হইল। মধ্যযুগের সাধারণ কাঠামো তখনও ভাঙিয়া পড়ে নাই। পুরাতন বিশ্বাস ও রুচিতে টান লাগিয়াছে। কিন্তু তাহাকে উৎপাটিত করিয়া স্থান করিয়া লইবার মত নূতন ভাবধারা আসে নাই। তবুও পুরাতন ধারাগুলির অতি-জীর্ণতাহেতু কিছু কিছু নূতন (বলা উচিত পুরাতন কাঠামোর মধ্যেই অর্ধ-নূতন) শাখার উদ্ভব ঘটিল। যেমন মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে শিবায়ন কাব্যের ধারাটি জনপ্রিয় হইল। সপ্তদশ শতকে এই ধারার আরম্ভ ঘটিলেও বর্তমান শতাব্দীতেই উহা প্রবল হইয়া উঠে। কালিকামঙ্গলের ধারাটির উদ্ভবও আগে ঘটিযাছিল। কিন্তু বিশেষ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার চর্চা বহুগুণ বাড়িয়া যায় লক্ষণীয় এই নূতন মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের পুরাতন সম্প্রাসখাদ চোখে পড়ে না। পার্থিব কামনা বাসনার চরিতার্থতার জন্য মঙ্গল দেব-দেবীর পূজা করার পুরাতন বিশ্বাসে ঘুণ ধরিয়াছে। এই নূতন মঙ্গলগুলি তাই স্বতন্ত্র সুরে বাঁধা। অনুবাদ সাহিত্যেও রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যানবিশেষ অবলম্বন করিয়া পৃথক পৃথক পালা রচনা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। এই সব পালা আসরে উপস্থাপনে কতকটা নাট্যধর্মী চমক সৃষ্টি করিত বলিয়া মনে হয়। গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব কবিতা উহার প্রাণরস হারাইয়া ফেলিযাছিল। উহার ভাব ও রূপ এতই গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল যে, আস্বাদে বিশেষ বিঘ্ন ঘটাইত নূতন গীতি-কবিতারূপে দেখা দিল শাক্ত পদাবলী। উহা একেবারে তাজা জিনিস। ভক্তি-ভাবনার সূত্রে কালীমাহাত্ম্য কীর্তনসাধক কবিদের আন্তরিকতাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। তাহা ছাড়া বাংলাদেশের বাস্তব সামাজিক পটভূমিকায় বাৎসল্যরসের করুণানির্ঝর সৃষ্টি করিতেও শাক্ত কবিরা কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। পুরাতন মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল একেবারে গতানুগতিক অনুকরণে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের ধারাটির উদ্ভব হইযাছিল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে। ইহার প্রাণশক্তি তখন ক্ষীণ হইয়া পড়ে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলকাব্যে একাধিক কবির ভালো রচনার সন্ধান আমরা পাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে খুব কম কবিরই কাব্যে প্রকৃত ভক্তির সুর বাজিয়াছে। পুরাতন ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তির ব্যাকুলতায় সার্বভৌমিক অধিকার সমাজজীবন হইতে মুছিয়া যাইতেছিল। চৈতন্যদেবের প্রভাবে ইহা হইয়া উঠিয়াছিল সর্বব্যাপী। সপ্তদশ শতকের শেষ হইতে ভাঁটার টান শুরু হয়। ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবিরা ধর্মের বিষয় লইয়া অনায়াসে ঠাট্টা-রসিকতা করিয়াছেন, ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই। নূতন ঐতিহাসিক কাব্যের উদ্ভব ঘটিয়াছে "মানসিংহ" (অন্নদামঙ্গলের অংশ) এবং "মহারাষ্ট্র-পুরাণে"র মধ্যে। ইহাতে দেবপ্রসঙ্গ থাকিলেও, দেবতা-নিরপেক্ষভাবে মানব

ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণ কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়াছে। বহু কাব্যে মানবভাবনার অতিরেক দেবমাহাত্ম্যকে সম্পূর্ণভাবেই অস্বীকার করিয়াছে। রামেশ্বরের শিবায়নের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। তাহা ছাড়া আছে সংশয়বাদ। ভারতচন্দ্রের লেখায় প্রত্যক্ষতঃ না হইলেও দেবভক্তিতে সংশয়ের সুর বক্রভাবে বাজিয়াছে। রামায়ণ-রচয়িতা জনৈক রামানন্দ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে তীব্র মনোভাব স্পষ্টই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে শাক্ত পদাবলীতেই প্রকৃত ধর্মভাবনা ও ভক্তিরসের সন্ধান মেলে।

এই শতাব্দীর জীবনযাত্রার মধ্যে নানা ধরনের রুচিহীনতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কাব্যকল্পনার মধ্যে উহা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশও করিয়াছে। নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্র তাঁহাদের গুরু। কিন্তু শতাব্দীর বহু কবিই আদিরসবহুল কাহিনী রচনায় অত্যুৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যগুলিতে নূতন নূতন আখ্যান প্রবেশ করিয়াছে। অনুবাদ-সাহিত্যেও চটকদার গল্পের আমদানী হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর রচনার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ, শিবায়নের বাগ্দিনী পালা, ধর্মমঙ্গলের গোলাহাট পালার জনপ্রিয়তা এবং এই বিষয়ে বেশ কিছু সংখ্যক স্বতন্ত্র পালা রচনা এই শতাব্দীর রুচিবৈশিষ্ট্যের উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের একদিক দিয়া নিরঙ্কুশ প্রশংসা করিতে হয়। এই যুগের সাহিত্যের রচনাপ্রণালীতে গ্রাম্যতা প্রায় কোথাও নাই। চারিদিকেই একটা রুচিচিক্কণ মার্জিত ভাব লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাহাই নহে, বহু কবিই প্রসাধন-পারিপাট্যের উপরে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ফলে বহুক্ষেত্রে বিষয়গত অন্তঃসারশূন্যতা তথা কৃত্রিমতা রূপরচনার নিপুণ পারিপাট্যে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

এই লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় পুরাতন সাহিত্যের ধারাটি যেন ধীরে ধীরে প্রাণোত্তাপ হারাইয়া ফেলিয়াছে। যে জীবনরসের উৎস হইতে এতকাল ইহার প্রয়োজনীয় বারিধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অথচ নবতর উৎসের সন্ধানলাভ এখনও ঘটে নাই। পুরাতনের সমাপ্তি যে ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা অনেকটা বোঝা যায়। কিন্তু নূতন সূর্য কোন্ রাজ্যে উঠিবে, কি রূপ লইয়া দেখা দিবে, তাহা স্থির করিয়া বলিবার কোনো উপায় নাই।

আধুনিক যুগ

প্রশ্ন ১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক কাল সম্ভাবিত হইল যে সব ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক কারণে, তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। পুরাতন বাংলা সাহিত্যের সহিত এই নবযুগের সাহিত্যের যে সব ক্ষেত্রে গুরুতর পার্থক্য দেখা গিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

উত্তর ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশের প্রকৃত শাসনভার ইংরেজদের হাতে আসে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত আমাদের জীবনধারার প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্কৃতির প্রভাব অনুভূত হয় নাই। এই অর্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া ইংরেজ শক্তি দেশের আইনানুগ এবং যথার্থ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া বসিল। এবং জীবনযাত্রাপ্রণালী ইংরেজি রীতিতে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই ইংরেজি আদর্শে শিক্ষাবিস্তার শুরু হইল। ইংরেজি সাহিত্য এবং উহার মাধ্যমে ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় ভাবভাবনা এবং জীবনবোধেও বাঙালী নূতন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিল। এই পরিবর্তনকে আমরা নবজাগৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে ইতালীতে মধ্যযুগের অবসানে জ্ঞান ও মানবভাবনা যখন মুক্তস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন তাহাকেও নব জাগরণ বা রেনেসাঁস বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। বাংলাদেশও পশ্চিম পৃথিবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া নব-জাগরণের মন্ত্র লাভ করিল।

এতকাল পর্যন্ত দেশব্যাপী যে জীবনধারা প্রবাহিত হইতেছিল ইংরেজ আমলে তাহার সহিত গুরুতর পার্থক্য ঘটিয়া গেল। এতকাল পর্যন্ত জীবন ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মীয় আচার-আচরণ, স্মৃতিসংহিতার নীতি নির্দেশ, সামাজিক প্রথা এবং বিবিধ সংস্কার অনুসরণ করিয়া জীবননির্বাহ করাই ছিল অবশ্যকর্তব্য। ভাবধারাও এইরূপ কতকগুলি স্থানদিষ্ট খাতে প্রবাহিত হইত। উহার বিচিত্র বিকাশ ও বহুমুখী স্বাতন্ত্র্য তখন আদৌ অনুভূত হয় নাই। মধ্যযুগের বাঙালীর জীবনযাত্রাও ছিল খুবই নিস্তরঙ্গ। কর্মের বহুলতায়, বৃহৎ উদ্যমে, সাহসিক আত্মবিস্তারে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। ধর্মমূলক ভাবপ্রবণতা এবং দৈবে বিশ্বাস দ্বারা তৎকালীন মানব-সমাজ বিশেষভাবে চালিত হইত। কিন্তু আধুনিক কালে ইংরেজি শিক্ষা তথা ইউরোপীয় রেনেসাঁর ভাবধারা, মানবচিন্তার ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্তন লইয়া আসিল। বাংলা সাহিত্যেও এই সব কারণে এমন সব পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা গেল।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ভাব ও রূপ দুই দিক হইতেই পুরাতন সাহিত্য হইতে অনেকাংশে পৃথক। সর্বাপেক্ষা প্রথম চোখে পড়ে আধুনিক সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য এবং সুরবৈচিত্র্য। সেকালের সাহিত্য মোটামুটি কয়েকটি মাত্র সুনির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বন করিয়া চলিত। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ-সাহিত্য, পদাবলী—এইগুলিই সেকালের প্রধান সাহিত্যধারারূপে বিবেচিত হইত। ইহাদের মধ্যে যে শাখাগুলি ছিল তাহাদের সংখ্যাও বেশী নয়। মোট কথা গুটি তিন চার মৌলিক গল্প এবং কয়েকটি মাত্র অনুভূতির সূত্র লইয়া মধ্যযুগের কবিরা ভূরি ভূরি কাব্য ও কবিতা রচনা করিয়াছেন। অনুবাদ যে করা হইয়াছে তাহাও মুখ্যতঃ তিনটি সূত্র হইতে। সেক্ষেত্রে আধুনিক সাহিত্যে কাহিনীগত ও ভাবাবেগগত অজস্র বৈচিত্র্য দেখা গেল। কত সংগ্রহ করা এবং কত নূতন উদ্ভাবন করা কাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। সেই কারণেই পুরাতন সাহিত্যকে যেমন কতকগুলি শাখা ও প্রশাখায় ভাগ করিয়া মোটামুটি চিনিয়া লওয়া যায়, আধুনিক সাহিত্যে এক উপন্যাসশাখায় যতজন ঔপন্যাসিক যতখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকটিই এক একটি স্বতন্ত্র বিষয়। নাটক, কাব্য—সবকিছুর ক্ষেত্রেই একথা সত্য।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই প্রায় সব-কিছু রচিত হইত। ধর্মদর্শনগত পটভূমি সর্বদাই বজায় থাকিত। কোথাও প্রত্যক্ষতঃ ধর্মপ্রচার বা দেব-মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইত। আধুনিক সাহিত্য মানুষকে কেন্দ্রে স্থান দিল। একালের সৃজনশীল সাহিত্যে ধর্মের কথা নাই এমন নয়, কিন্তু উহা মানবের আচরিত, মানবের উপলব্ধ বিশ্বাস ও অনুভূতিরূপেই সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। মানুষের জীবন, মন ও ভাগ্যই একালের সাহিত্যের বিষয়। উহার মধ্যেই এত রহস্য, এত গভীরতা ও এত বর্ণবৈচিত্র্য আছে যে নূতন করিয়া আর দেবলোকের সন্ধানে যাইতে হইবে না। মধ্যযুগের সাহিত্যেও মানুষের জীবনের ছবি ছিল। কিন্তু মানুষ সেখানে স্বতন্ত্র মহিমায় গৌরবান্বিত ছিল না। দেবগৌরবের বাহনরূপে তাহার কথা বলা হইত। আধুনিক কালের সাহিত্য মানুষকে প্রধান করিয়া তুলিল। দেবতা বা ধর্মের কথাও এখানে মানবভাবনার অংশরূপেই মাত্র স্থান পাইল।

আধুনিক সাহিত্যে সৃজনশীল রূপটির পাশে পাশে একটি বৃহৎ জ্ঞানকাণ্ডও গড়িয়া উঠিল। ইহা অবশ্য বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়। কিন্তু ইহার অন্তর্ভুক্ত সমালোচনা-সাহিত্যের ধারা কিংবা প্রবন্ধ সাহিত্য এবং সাহিত্যিক প্রবন্ধ বা রস-রচনা বিশুদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডারের খুবই নিকটবর্তী। ইহা যুক্তি-বুদ্ধির সহিত অনেকটা সংশ্লিষ্ট। সেকালের বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় রচনার নিদর্শন বড় ছিল না। চৈতন্য-চরিতামৃতের ন্যায় একটি দুটি কাব্যকেই মাত্র এই শ্রেণীভুক্ত করা চলিত। কিন্তু ইহা স্বভাবতঃ কাব্যে রচিত হইবার নহে। মননসাহিত্যের ভাষা গদ্য, গদ্যভাষা নিত্য-

প্রয়োজনের ভাষা। উহাকে সাহিত্যের বাহন করা যায় দুইভাবে :—(ক) মননসাহিত্যে—যুক্তিচিন্তা প্রকাশের উপযোগী করিয়া; এবং (খ) গদ্যভাষাকে নমনীয় করিয়া সৌন্দর্যসৃষ্টির উপযোগী করিয়া তোলায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর অংশ এই গদ্যসাহিত্য। পুরাতন বাংলা সাহিত্যে গদ্যের চিহ্নমাত্র ছিল না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্যভাষা নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া উহাকে বিশেষ সমৃদ্ধি দান করিয়াছে। গদ্যসাহিত্যের বহুল প্রচলন হইবার ফলে একদিকে দেশীয় শিক্ষা-প্রকল্পগুলির যেরূপ উন্নতি ঘটিয়াছে সেরূপ সাময়িকপত্রের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। গদ্যে রচিত সৃজনশীল সাহিত্যশাখাগুলির (যেমন উপন্যাস প্রভৃতির) বিকাশ ঘটিয়াছে।

আধুনিক সৃজনশীল সাহিত্যে এমন কয়েকটি নূতন ধারা দেখা দিল, যাহা সম্পূর্ণই নূতন—পূর্বকালে যাহার কিছু সন্ধান মেলে নাই। যেমন উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক এবং রসরচনা বা সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন প্রবন্ধ। উপন্যাস-সাহিত্যের বিকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। অল্পকাল মধ্যেই বহুসংখ্যক লেখকের উৎসাহে এবং বঙ্কিম-প্রমুখ উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন রচয়িতার হাতের স্পর্শে এই ধারাটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যশাখায় পরিণত হইল। ছোটগল্প অবশ্য ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সংযোগকালে উদ্ভূত। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে ছোটগল্প শাখাটি সুরবৈচিত্র্যে এবং রচনানৈপুণ্যে বিশেষ সমৃদ্ধ শাখায় পরিণত হইল। নাটকও বাংলা সাহিত্যে একেবারে নব উদ্ভূত ধারা। পুরাতন সাহিত্যে নাটক বলিয়া কিছু ছিল না। আধুনিক সাহিত্যে নাটক দেখা দিল। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য খুব সমৃদ্ধ হইলেও মধ্যযুগে উহার আদর্শে বাংলাভাষায় কোনো নাট্যসাহিত্যের ধারা দেখা দেয় নাই। অবশেষে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নাট্যসাহিত্য একটি বিপুল ধারা হিসাবে উপস্থিত হইল। লক্ষণীয় এই তিনটি শাখাই বিকশিত হইতে পারিল গদ্যসাহিত্যের বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটিবার জন্য। নাটক কখনো কখনো কবিতায় রচিত হইলেও মুখ্যতঃ এই তিনটি শাখাই গদ্যবাহন। গদ্যে রচিত প্রবন্ধের ধরনে শিল্পগুণসমৃদ্ধ কিন্তু non-dramatic, non-fictional এক ধরনের লেখা দেখা দিল। ইহারা সাহিত্যিক প্রবন্ধ বা রসরচনা নামে অভিহিত হইতে লাগিল। প্রবন্ধসাহিত্যের খুব নিকটবর্তী এই শাখাটি অতি অল্পকালের মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিল।

বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসিল। মধ্যযুগেও বাংলা সাহিত্যে কাব্য-কবিতা ছিল। বলা যাইতে পারে উহা ছিল কাব্যসর্বস্ব। কিন্তু আধুনিক কালের কাব্য রূপেরসে উহা হইতে একেবারে পৃথক। পুরাতন সাহিত্যে আখ্যানকাব্য ছিল—রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির রূপ ধরিয়া উহার প্রচলন ঘটিয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, চর্যাপদ প্রভৃতির আকারে প্রচলিত ছিল পদসাহিত্য বা গীতিকবিতা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই ধারা

দুইটির অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল। একালের আখ্যানকাব্য ইংরেজি কাব্যের রীতিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহা ছাড়া ইউরোপীয় আদর্শে মহাকাব্য রচনার প্রবর্তন ঘটিল। মহাকাব্যের ধারাটি অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হইল না। গীতিকবিতা কাব্য-সাহিত্যের রাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিল। এই গীতিকবিতার ধারাটির সঙ্গে পুরাতন পদসাহিত্যের রহিয়াছে বিশেষ দূরত্ব। আধুনিক গীতিকবিতা ইউরোপীয় লিরিকের সুরে বাঁধা। ইহার মধ্যে আধুনিক কবির হৃদয়বেদনার নিগূঢ় উপলব্ধি আত্মপ্রকাশ করে। তাহা ছাড়া সনেট প্রভৃতি কয়েকটি নব্য রীতিও কাব্যের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিল।

ইহা ছাড়াও সাধারণভাবে নবযুগের যে সব প্রতিক্রিয়া আধুনিক মনকে প্রভাবিত করিল এবং আধুনিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হইল তাহা লক্ষ্য করিবার মত। মানবতার কথা পূর্বেই তোলা হইয়াছে। সমাজসংস্কারে অথবা সাহিত্য-ভাবনায়, শিক্ষাবিস্তারে এবং কাব্যকল্পনায় সর্বত্র মানবমূল্য স্বীকৃত হইতে লাগিল; তাহার সহিত দেখা দিল যুক্তিবাদ। যুক্তিবাদ প্রধানতঃ ধর্মচিন্তার ও সমাজরীতির সংস্কারকার্যেই প্রযুক্ত হইল। অবশ্য সাহিত্যেও উহার কিছু কিছু প্রতিফলন যে দেখা না দিল এমন নয়। পুরাতন ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে ফিরিয়া চাহিবার মত মনোভাব তৈয়ারী হইল এই যুগেই, উহার গুরুত্বও অনুধাবনযোগ্য। মধ্যযুগের দৈব বিশ্বাস এবং প্রথাবদ্ধ, কর্মবিরহিত, সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনসাধনা বাঙালীকে অতীত সম্বন্ধে অনবহিত করিয়া তুলিয়াছিল। নব্য শিক্ষার আলোকে সে আপনার ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থগুলির উদ্ধার ও চর্চা চলিতে লাগিল। ইহার প্রতিফলন পড়িয়াছে সমকালীন সাহিত্যে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্য হইতে রূপরীতি ও ভাবাবেগ প্রভৃতি অনেক-কিছু গ্রহণ করিলেও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সংকলিত ঋণের পরিমাণও উহার কম নহে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও জীবনভাবনার একটি প্রধান সূত্র উহার স্বদেশানুরাগ। স্বদেশবাৎসল্য একটি নূতন রাজনৈতিক-সামাজিক ভাবনারূপে এই শতাব্দীতেই দেখা দিল। উহাও নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ফল। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যে নবীন বাঙালীর জীবনে উহার গুরুতর প্রভাব বিস্তারিত হইল।

একালের বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উহার ভাবসংঘর্ষে। জনৈক বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায় "বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি প্রচারের ফলে একটি শ্রেণীর মধ্যে বিদেশীয় ভাবধারা গ্রহণ করবার অত্যুৎসাহ নির্বিচার পরানুকরণে পরিণত হল। আচারে আচরণে আহারে-বিহারে এরা দেশীয় ভাবধারার বিরোধী হয়ে উঠলেন। এঁদের সাধারণতঃ "ইয়ং বেঙ্গল" নামে আখ্যাত করা হয়ে থাকে। আবার এর প্রতিবাদী অপর একদল বুদ্ধিজীবী দেশীয় ঐতিহ্যকে

গ্রহণের পক্ষেই মত দিলেন। হিন্দু রিভাইভ্যালিষ্ট নামেই এঁরা পরিচিত। এঁদের অবশ্য বাংলার নবজাগৃতির বিরুদ্ধপন্থী বলা সংগত হবে না। কারণ বিদেশী চিন্তাধারার প্রতি এদের অন্ধ বিতৃষ্ণা ছিল না এবং রেনেসাসের অনেক মন্ত্রই এঁরা গ্রহণ করেছিলেন।"

প্রশ্ন ৫। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাংলা গদ্যরীতির বিকাশের সূত্র অনুসরণ কর। ইঁহাদের সাধনার মধ্য দিয়া আদর্শ গদ্যরীতিটি কিরূপে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছিল তাহা দেখাইয়া দাও।

উত্তর ঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা কয়েকখানি বাংলা গদ্য লিখিলেন। গ্রন্থগুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল, বাংলা গদ্যসাহিত্যের দিক হইতে ইহাই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। ইহার পূর্বে বাংলা গদ্যে যাহা কিছু লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে উহা সংখ্যার দিক দিয়াও যেমন অকিঞ্চিৎকর, সেইরূপ রচনারীতি প্রচার ও প্রভাব বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতেও একান্ত নগণ্য। তাই উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা হিসাবে ফোর্ট উইলিয়াম পর্যায়কেই প্রথম স্থান দিতে হয়। ইহা পরবর্তী লেখকদের উপরে কিছুটা প্রভাব বিস্তারও করিয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ামের অনেক পণ্ডিতই বাংলায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনজনের রচনা। উঁহাদের রচনায় এমন কতকগুলি রীতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা সাহিত্যিক গদ্যের বিকাশে সহায়তা করিয়াছে। এই তিনজন হইলেন:—(ক) উইলিয়াম কেরী, (খ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার এবং (গ) রামরাম বসু।

উইলিয়াম কেরী শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষ হইতে বাইবেলের যে অনুবাদ করিয়াছিলেন (বা করাইয়াছিলেন) তাহার ভাষা কতকটা পরিমাণে ইংরেজি গদ্যের বাক্যবিন্যাসরীতি-ঘেঁষা। বাংলা ভাষার নিজস্ব স্বভাবের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক বড় বেশি নয়। এই জাতীয় রীতির পথ ধরিয়া বাংলা গদ্য ভাষার অগ্রগতির সম্ভাবনা বড় ছিল না। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরীর নামে যে দুইটি বই প্রচারিত হইয়াছিল তাহার গদ্যরীতি অনেক পরিমাণে মার্জিত। কোথাও কোথাও তাহা লৌকিক বুলির নিকটবর্তী। "কথোপকথন" নামক গ্রন্থটিতে গ্রাম ও সহরের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা সংকলন করা হইয়াছে। লিখিবার আদর্শ গদ্য হিসাবে এই জাতীয় কথ্যভাষার দাবিকে মানিয়া লইবার কথা সেকালে কেহই ভাবিতেও পারে নাই। তবে দেশে প্রচলিত, জনসাধারণের বোধগম্য ভাষারীতিরও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাহা উঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই মুদ্রিত গ্রন্থ নমুনা হিসাবে উহা সংকলিত হইয়াছে এবং সিভিল সার্ভিস ছাত্রদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে। কেরী

নামে প্রচলিত অপর গ্রন্থটি "ইতিহাসমালা"। উহার ভাষা ফোর্ট উইলিয়ামের প্রাথমিক যুগের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গদ্য রচনার একটা স্টাইলও ইহাতে লক্ষিত হয়। বাইবেল অনুবাদে আড়ষ্টতার চিহ্নমাত্র এখানে নাই। অবশ্য "কথোপকথনে"র সবেগ সাবলীলতা ইহাতে নাই, কিন্তু ভাষা নিতান্ত নীরসও নয়।

মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন সর্বপ্রধান। যদি গোষ্ঠীগত ভাবে না ধরিয়া একক ব্যক্তিত্ব হিসাবে ধরা যায়, তাহা হইলে রামমোহন বিদ্যাসাগরের সহিত পূর্ববর্তী এই লেখকের নামই উল্লেখ করা যায়। তিনি "হিতোপদেশ", "বত্রিশ সিংহাসন", "রাজাবলী", "প্রবোধচন্দ্রিকা" "বেদান্তচন্দ্রিকা" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচনারীতি মূলতঃ সংস্কৃতানুগ। কিন্তু তাঁহার রচনারীতির বিরুদ্ধে যে অতিরিক্ত দুরূহতার অভিযোগ আছে তাহা স্বীকার্য নয়। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য: "মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব—দুই হিসাবেই এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রগণ্য। তিনি একদিকে যেমন সাধু ভাষার আদিলেখক—অপরদিকে তিনি তেমনি চলতি ভাষারও আদর্শ লেখক। নিম্নে তাঁর চলতি ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মোরা চাষ করিব, ফসল পাবো। রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো, ছেলে-পিলাগুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটে, কেবল উড়ি ধানের মুড়া ও মটর মসুর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি।" ইহা যে খাটি বাংলা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সবল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্য রচনার উপযোগী, উপরিউক্ত নমুনাই তার প্রমাণ।..."আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি বিদ্যালংকার মহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন, তা হলে কালক্রমে এই ভাষা সংস্কৃত ও পুষ্ট হয়ে আমাদের ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করত।" মৃত্যুঞ্জয় সাধু ও চলিত বাংলা রীতির এই দুই মহলেই গদ্যসাহিত্যের জন্মমুহূর্তেই পদক্ষেপ করিয়াছেন—ইহা কম ক্ষমতার কথা নহে। তবে উহা অপেক্ষাও বড় কথা হইল এই যে সাধু বা চলিত—তাঁহার রচনায় খাঁটি বাংলা হইয়া উঠিয়াছে।

রামরাম বসুর গ্রন্থের সংখ্যা দুইটি:—"প্রতাপাদিত্যচরিত" এবং "লিপিমালা"। 'প্রতাপাদিত্যচরিত' যখন প্রকাশিত হয় তখন ফোর্ট উইলিয়ামের শ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুঞ্জয়ের কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। রামরাম বসু হাতের সামনে কোনো উল্লেখযোগ্য অনুসরণযোগ্য আদর্শ পান নাই। তাহার উপরে তিনি ছিলেন মুনসী। ফার্সী ভাষাটি ভালো করিয়াই জানিতেন। তখন রাজদরবার, সরকারী দপ্তর, কাজীর

বিচারালয় সর্বত্রই ফার্সী এবং ফার্সীমিশ্রিত এক ধরনের গদ্য ব্যবহৃত হইত। রামরাম বসু উহাকেই আদর্শ করিয়া গদ্য রচনায় হাত দিলেন। ফলে 'প্রতাপাদিত্য' চরিত হইয়া উঠিল দুরূহ এবং কৃত্রিম ভাষারীতির বাহক। ফার্সী ভাষার সহিত বাংলা ভাষার সম্পর্ক বহুদিনের। ঐ ভাষার বহু শব্দ এবং বাক্‌রীতির অংশ বাংলাভাষায় ইতিহাসের অগ্রগতির পথে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ফার্সীর সহিত জাতিগত সূত্রে বাংলার সম্পর্ক মোটেই নিকট নয়। ঐ ভাষার আদর্শে বাংলা গদ্যরীতি গড়িতে গেলে বিপর্যয়ই ডাকিয়া আনা হইবে। বসুমহাশয় তাহাই করিলেন। তাঁহার 'লিপিমালা' রচনার পূর্বে মৃত্যুঞ্জয়ের বই বাহির হইয়াছে। রামরাম হাতের সামনে একটি আদর্শ পাইলেন। তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ভাষার কোন্ আদর্শ স্থায়ী হইবে সহজে বুঝিতে পারিলেন। 'লিপিমালা' ভাষার দিক হইতে কতকটা স্বাভাবিক, অন্তত: ফার্সীর অক্রান্ত প্রভাবমুক্ত।

ফোর্ট উইলিয়ামের প্রধান তিনজন রচয়িতার ভূমিকা বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে, মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যরীতিকে একটি সুষ্ঠুরূপ দিবার জন্য কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বাইবেল অনুবাদক কেরীর "সাহেবী" গদ্য এবং রামরাম বসুর "আদালতী" গদ্য তাঁহার প্রভাবে পরিবর্তিত হইল, বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতি অনুসরণ করিবার দিকে প্রবণতা বাড়িয়া গেল।

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১৮১৫ সাল হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্ত' নামক মূল্যবান গ্রন্থদ্বয় ছাড়া তিনি সহমরণ বিষয়ক অনেকগুলি বই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মত। ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতেরা পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া আসিয়াছেন। উহাদের বিষয়বস্তুর মূল্য খুব বেশী নয়। গদ্য ভাষারীতির তখন যে অবস্থা তাহাতে কোনো গম্ভীর বা গভীর বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশ করিলে উহা ঠিকভাবে কিছুতেই প্রকাশ করা চলিত না। রামমোহন এই বিপদের কথা জানিতেন কিন্তু তবুও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। সামাজিক বিতর্ক এবং বৈদান্তিক আলোচনামূলক প্রবন্ধ রচনায় হাত দিলেন। 'বাংলা গদ্যকে তিনি বিষয়ের গৌরবে মুক্তি দিলেন এবং স্কুল-কলেজের সীমানার বাহিরে লইয়া আসিলেন।' তাঁহার ভাষা অতি দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় সর্বত্র সারল্য এবং সাবলীলতা বজায় রাখিতে পারিল না। বলা যায়, গদ্য ভাষারীতির সেই অপরিণতিকালীন শক্তি এই নবীন ও কঠিন বিষয়কে ঠিকমত বহন করিতে পারিল না, একটু অস্বচ্ছন্দ গতি হইল। কিন্তু কঠিনকে বরণ করিবার শক্তি-পরীক্ষায় উহা অবতীর্ণ হইল। ইহার মূল্য আছে।

এই সময়ে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটিল সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইল। সাময়িকপত্র জনসাধারণের নিকট পৌঁছিতে চায়

উহার ভাষাকে যথাসাধ্য সরল ও বোধগম্য করিবার দিকে সকলেরই একটা চেষ্টা থাকে। বিষয়বস্তুর মধ্যেও থাকে বৈচিত্র্য এবং জনপ্রিয়তার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া সাময়িকপত্রের আশ্রয়ে ধর্মনৈতিক ও সমাজসংস্কারমূলক বিতর্কও আরম্ভ হইয়া গেল। বিতর্ক করিতে গিয়া ভাষা কিছুটা তীক্ষ্ণ ও জীবন্ত হইয়া উঠিল।

রামমোহনের সমকালীন একজন গদ্যলেখক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণ "নববাবুবিলাস", "নববিবিবিলাস", "কলিকাতা কমলালয়" প্রভৃতি কৌতুক-রসপ্রধান নকশা রচনায় হাত দিলেন। বিষয়বস্তুর অনুরোধেই তাঁহার ভাষাকে খানিকটা লঘু এবং গতিশীল করিয়া তুলিতে হইয়াছে। অবশ্য সাধুভাষার কাঠামোটি বজায় রাখা হইয়াছে।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গদ্যলেখক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনেকগুলি বই লিখিয়াছিলেন, অধিকাংশই সংকলন ও স্বাধীন অনুবাদ জাতীয়। কিছু ছাত্রপাঠ্য ধরনের সমাজসংস্কারকেন্দ্রিক প্রবন্ধও আছে। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বই "সীতার বনবাস", "শকুন্তলা", "বেতালপঞ্চবিংশতি" "ভ্রান্তি-বিলাস" প্রভৃতি। বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য আদর্শ রূপটি পাইল, মৃত্যুঞ্জয়ের সাধনা পূর্ণ হইল বিদ্যাসাগরে আসিয়া।) রামমোহন ভবানীচরণের রচনার অন্যবিধ মূল্য আছে, কিন্তু ভাষারীতির ক্রমবিকাশের দিক হইতে উঁহারা মৃত্যুঞ্জয় অপেক্ষা কোনো ক্ষেত্রেই অগ্রসর নন। বিদ্যাসাগর আরও অনেক অগ্রসর এবং পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠাতা। বিদ্যাসাগরের গদ্য সাধুরীতির। উহাতে সমাসবদ্ধ পদ ও তৎসম শব্দ অনেক। কাঠামোটি মোটামুটি সংস্কৃতঘেঁষা। চলিত বা কথ্যরীতির রচনা তাঁহার কোনো গ্রন্থেই নাই। কিন্তু সাধুরীতির কাঠামোয় তিনি বাংলা বুলির নিজস্ব প্রাণধর্মটিকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন, এইখানেই তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব। বাংলা গদ্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিতে গিয়া তিনি প্রথমতঃ দেখিলেন সংস্কৃত পদবিন্যাসপদ্ধতির সহিত উহার গোড়ায় পার্থক্য রহিয়াছে। বিভক্তি প্রত্যয়ের উপরে নির্ভরশীল এই ভাষায় পদবিন্যাসের কোনো স্বতন্ত্র রীতি নাই। বাংলা ভাষা বিশ্লেষণধর্মী। উহাকে নির্দিষ্ট ভাবে না সাজাইলে অর্থবোধই বিপন্ন হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি লক্ষ্য করিলেন বাংলা গদ্য উপযুক্ত স্থানে থামিয়া পড়িলে ছন্দোময় হইয়া উঠে। তিনি যতিচিহ্নের ব্যবহার বাড়াইয়া, উহার হ্রস্বতা ও দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া, পদবিন্যাস নিয়মিত করিয়া ছন্দোসংগীতটি বাজাইয়া তুলিলেন। ইহা ছাড়াও তৃতীয়তঃ তাঁহার গদ্যরীতির একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হইল বাচ্যাতিরিক্ত রসসৃষ্টির ক্ষমতা।) "বিভিন্ন বাংলা শব্দের পরস্পর সমাবেশ অভিধানগত অর্থব্যতিরেকেও যে আর একটি অবর্ণনীয় রসের সৃষ্টি হইতে পারে, সেই অপূর্ব সত্য তিনিই সর্বপ্রথম মনে মনে অনুভব করিয়া, লেখনীর মুখে তাহার সম্ভাবনাও স্বদেশবাসীকে দেখাইতে

সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহার ফলেই শতাব্দীপাদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।" [—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়]

এইসব কারণেই রবীন্দ্রনাথও বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথম তাঁহাকে দিতে হয়।"

প্রশ্ন ৩। বাংলা গদ্যে চলিত ও সাধু ভাষার দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয়ের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা কর। বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া এই দ্বন্দ্ব কিরূপ পরিণতি লাভ করিল বল। উহার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা কর।

উত্তর: বাংলা গদ্যরীতির প্রাথমিক আদর্শ স্থির হইতে বেশ কিছু সময় লাগিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় হইতে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত উহার ক্রমবিকাশের ধারাটি আমরা সহজেই অনুসরণ করিতে পারি। বাংলা গদ্যরীতি নিজের পায়ে দাঁড়াইবার পূর্ব হইতেই ইহার রূপটি সম্পর্কে নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছিল। ইংরেজি সংস্কৃতির প্রভাব নানাভাবে বাঙালীর জীবনে ও কর্মে প্রতিফলিত হইতেছিল। প্রথম যুগে বাংলা গদ্যরীতি স্থিরীকরণে মিশনারীরা কিছুটা ভূমিকা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল। ফলে কোনো কোনো গ্রন্থে সাহেবী বাংলার এক উৎকট নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই। তেমনি মুসলমান আমলের অবশেষ হিসাবে অনেকের রচনায় ফার্সীবাহুল্য লক্ষ্য করা যাইতে লাগিল। মুন্সীদের এই আদালতী বাংলাও একটা কৃত্রিম ব্যাপার ছিল। বাঙালীর স্বাভাবিক ভাষারূপের সহিত ইহার কোনো সম্পর্কই ছিল না। সাহেবী ও আদালতী রীতির অনুশীলন অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগেই পণ্ডিতী ও কথারীতির প্রাধান্য লক্ষিত হইল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের হাতে পড়ায় বাংলা গদ্যে সংস্কৃতানুগ শব্দাদির ব্যবহারই আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল। সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ বহুক্ষেত্রে বাংলা গদ্যকে দুর্বোধ্য করিয়া তুলিল। সর্বোপরি সংস্কৃত ভাষার অনুসরণে পদবিন্যাস করিতে গিয়া খুবই গোলমালে পড়িতে হইল। পণ্ডিতী বাংলার নানাবিধ দোষসত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষার সহিত বাংলার সম্বন্ধ জন্মসূত্রের। সংস্কৃতানুসরণের অমিতাচার দূর করিতে পারিলে পণ্ডিতী বাংলা গদ্যরীতির একটি আদর্শ রূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারিত। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার হইতে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত এই অনুসন্ধান চলিয়াছে।

লক্ষণীয় পণ্ডিতী রীতির পাশাপাশি কথ্যরীতির পরিচয়ও ফোর্ট উই যুগেই পাওয়া যাইতেছে—কেরির 'কথোপকথনে' এবং মৃত্যুঞ্জয়ের কোনো

রচনায়। উহা জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষা। সিভিল সার্ভিস ছাত্রদের নিকট কথ্য ভাষার নিদর্শন হিসাবে উপস্থিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে উহা খাঁটি বাংলা ভাষা। উহার রূপরীতি অমার্জিত হইতে পারে, কিন্তু উহার মধ্যে প্রাণের লক্ষণ আছে। উহা যেমন বেগবান তেমনি প্রত্যক্ষ; উহার আগে সমকালে কেহই এই কথ্যরীতির সহায়তায় বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের আদর্শ স্থির করিবার কথা ভাবেন নাই। বলিবার ভাষা এবং লিখিবার ভাষার মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই। বলিবার ভাষার জন্য কোনো আদর্শ ঠিক করিয়া দিতে হয় না। লিখিবার ভাষার আদর্শটি গড়িয়া লইতে হয়। বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে বাংলা লেখ্য গদ্যের কোনোরূপ ঐতিহ্য ছিল না।

কিন্তু একথাও ঠিক লিখিবার গদ্যের একটি আদর্শ রীতি স্থির করিতে হইলে জাতির মুখের ভাষার সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। কথ্যভাষারই একটি রূপকে আশ্রয় করিয়া উহাকে মার্জিত করিয়া লইতে হয়। লিখিবার ভাষা মুখের ভাষার তুলনায় কিছুটা কৃত্রিম সন্দেহ নাই; কিন্তু উহার সহিত মুখের ভাষার কোনোরূপ আত্মিক সম্পর্ক না থাকিলে উহা নেহাৎই কৃত্রিম, নেহাৎই প্রাণহীন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। মৃত্যুঞ্জয় এই কৃত্রিমতা ভাঙিতে চাহিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর এই কৃত্রিমতা ও প্রাণহীনতাকে জয় করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর লিখিবার গদ্যের একটি আদর্শরূপ প্রায় স্থির করিয়া দিলেন। উহার সহিত পুরাতন পণ্ডিতী রীতির যোগ আছে। কিন্তু কথ্যরীতির আত্মা উহার মধ্যে সঞ্চারিত। বাংলা ভাষায় বিদ্যাসাগর-অনুসৃত এই রীতিই সাধু গদ্য নামে অভিহিত। দীর্ঘকাল, বাংলা গদ্যসাহিত্যে ইহার বিপুল অনুসরণ চলিয়াছে। Style-যের যতই পরিবর্তন হউক, ইহার কাঠামোটি অনেককাল পর্যন্ত অনতিক্রম্য থাকিয়া গিয়াছে। ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল?

বিদ্যাসাগরের সাধুরীতির গদ্য কথ্য রীতির নিকট হইতে প্রাণস্পন্দনটি গ্রহণ করিল। সাধুগদ্যও কোনো অঞ্চলবিশেষের কথ্য রীতির উপর ভিত্তি স্থাপন করে। কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা দেশে যে সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্রটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ঐ অঞ্চলে ব্যবহৃত কথ্য ভাষার নিকট বিদ্যাসাগরের ঋণ অনেক। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম লক্ষ্য করিলেন বাংলা কথ্যভাষার Syntax বা পদবিন্যাসপ্রণালী। উহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করিলেন। অন্যান্য ভাষা হইতে বিশেষ করিয়া সংস্কৃত ভাষার সহিত উহার পার্থক্য অনেক। এখানেই পণ্ডিতী রীতির সহিত বিদ্যাসাগরী সাধু গদ্যের প্রথম বিচ্ছেদ ঘটিল। বিদ্যাসাগর কথ্য বাংলার নিজস্ব পদবিন্যাসরীতি অনুসরণ করিলেন। সংস্কৃতভাষা বিভক্তিমূল (inflextional) বলিয়া উহার পদবিন্যাসে কোনো বাঁধাধরা রীতি নাই। বাংলা ভাষা বিশ্লেষণমূলক (analytical), কাজেই উহার পদবিন্যাস বেশ নির্দিষ্ট। একটু এদিক সেদিক হইলেই অর্থবোধে

বিপত্তি ঘটে। বিদ্যাসাগর কথ্য বাংলার নিকট হইতে এই সত্যটি গ্রহণ করার ফলে ভাষার দুরূহতা, বিশেষ করিয়া দূরান্বয়জনিত ত্রুটি অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বাংলা গদ্যের মধ্যেও যে একটা ছন্দ আছে তাহা আবিষ্কার করিলেন এবং যতিপাতের সাহায্যে উহাকে সাধুরীতির গদ্যে সুস্পষ্টভাবে নিবদ্ধ করিলেন। কথ্যরীতির নিকট হইতে তিনি এই দুইটি বড় জিনিস গ্রহণ করিলেন। ফলে বাংলা গদ্যরীতি সাধু হওয়া সত্ত্বেও জাতির প্রাণের সুর উহাতে বাজিতে লাগিল।

কিন্তু শব্দনির্বাচনের দিক হইতে বিদ্যাসাগরের বাংলা সংস্কৃতানুগ। তৎসম শব্দের ব্যবহার খুবই বেশী। তদ্ভবের ব্যবহারও স্বীকৃত। কিন্তু অর্ধতৎসম, দেশী বা বিদেশী শব্দের প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে অনেক সংকুচিত। অথচ এই জাতীয় শব্দসমূহ বাংলা শব্দভাণ্ডারের সম্পদবিশেষ। ইহাদের যথোপযুক্ত প্রয়োগে বাংলা ভাষার শ্রী নানাভাবে প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরী গদ্য সে সুযোগ গ্রহণ করিল না। তৎসম শব্দের আধিক্য এবং সমাসবদ্ধ দীর্ঘ পদের সুপ্রচুর ব্যবহার এই ভাষাকে অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া তুলিল। এই ভাষারীতির ভার এবং দ্রুতগতির অভাবও লক্ষ্য করিবার মত।

বাংলা ভাষায় সহজতর, লঘুতর একটি রূপরীতির অনুসন্ধানও পাশাপাশি চলিতে লাগিল। উহার প্রথম প্রতিফলন দেখি প্যারীচাদ মিত্রের রচনায়। প্যারীচাঁদ "আলালের ঘরের দুলালে" একটি সহজ ভাষা লইয়া পরীক্ষা করিলেন। ইহা আলালী ভাষা নামে পরিচিত হইয়াছে। প্যারীচাদের এই ভাষাকে চলিত রীতির বলা যাইতে পারে। পরবর্তী চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ইহার মধ্যে মিলিবে না; কারণ ক্রিয়া-পদ ও কতকগুলি সর্বনাম পদে এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে অভিশ্রুতি এবং স্বরসংগতির প্রয়োগজাত যে বৈশিষ্ট্য চলিত ভাষায় লক্ষণীয়, তাহা প্যারীচাঁদের ভাষায় সর্বত্র সমান ভাবে প্রযুক্ত নয়। আলালী ভাষার ক্রিয়াপদের কাঠামো অনেক ক্ষেত্রে সাধুভাষার মত। কিন্তু ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহাতে ইহাকে চলিত ভাষা বলিয়াই অভিহিত করিতে হইবে:—(১) ইহার ভাষা বেশ সহজ এবং বিদ্যাসাগরের ভাষা হইতেও সাধারণের পক্ষে অনেক বেশী বোধগম্য। (২) তদ্ভব, তৎসম, দেশী, বিদেশী, অর্ধতৎসম সর্ববিধ শব্দ গ্রহণেই এই ভাষারীতির উৎসাহ দৃষ্ট হয়। বরং তৎসম শব্দের ব্যবহার কিছু কম। সমাসবদ্ধ পদের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ নাই। (৩) বাংলা ভাষার নিজস্ব অনুসর্গ পদ প্রভৃতির প্রয়োগ খুব সুষ্ঠু। (৪) তাহা ছাড়া বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ব্যবহারে বাংলা ভাষার নাড়ীর টান এখানে স্পষ্ট অনুভূত হয়। আলালী ভাষায় রহিয়াছে এক গতি-চাঞ্চল্য। উহাতে বিদ্যাসাগরী গদ্যের গাম্ভীর্য এবং কিঞ্চিৎ স্থবিরত্ব দেখা যায় না।

বাংলা গদ্যে এইভাবে দুই রীতি আসিয়া পড়িল। বিশিষ্ট লেখকেরা ইহাদের

কোনোটির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতিই ভদ্র সাধু এবং শিক্ষিত সমাজে ব্যবহারের উপযোগী বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। আলালী রীতি নেহাৎই সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। উহার প্রতি উচ্চশিক্ষিত মহলের কৃপাকটাক্ষপাতই রহিল। এই সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" প্রকাশ করিয়া বাংলা গদ্যরীতিতে একেবারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়া দিলেন। কালীপ্রসন্ন কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য-বাংলাকে সামান্য মার্জিত করিয়া সাহিত্যে স্থান দিয়া বসিলেন। অনেক শুচিবায়ুগ্রস্ত লেখক এতটা পছন্দ করেন নাই। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া বাংলা ভাষার যে প্রচণ্ড শক্তি আত্মপ্রকাশ করিল তাহার তুলনা মেলা ভার। এ ভাষার মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট তীক্ষ্ণ গতি আছে, ব্যঙ্গের দীপ্তি আছে, বুদ্ধির চমক আছে। কিন্তু তবুও একটি সন্দেহ থাকিয়া যায় যে ভাবাবেগ বা সৌন্দর্যবোধ প্রকাশ করিতে, কোনো গভীর বা গম্ভীর ভাবনা চিন্তাকে ধরিয়া রাখায় ইহার কতটুকু শক্তি আছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইল।

হুতোমী চলিত ভাষার অনুকরণকারীর অভাব হইল না। বিশেষতঃ লঘু ব্যঙ্গাত্মক নক্‌শা রচনায় হুতোমের অনুসরণ বেশ প্রবলভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু সাধারণ চিন্তামূলক ও ভাবাবেগমূলক সৃজনধর্মী রচনায় ইহার প্রত্যক্ষ অনুসরণ চলিল না। তবে পরোক্ষভাবে আলাল হুতোমের প্রভাব সমকালীন গদ্যলেখকদের প্রায় কেহই একেবারে এড়াইতে পারিলেন না। ইহার ফলে সাধুরীতির গদ্য রচনায় কমতি হইল না। তবে উহার মধ্যে সরলতা এবং সহজবোধ্যতা দেখা দিতে লাগিল। বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ তথা প্রাবচনিক প্রয়োগ (অর্থাৎ idiomatic usage) অনেক বাড়িয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়ে ভাষা সম্পর্কে একটি সমন্বয়ের নীতি উপস্থিত করিলেন। সাধু ও চলিত উভয়রীতির মিশ্রণের মধ্য দিয়া আদর্শ গদ্যরীতি দেখা দিতে পারে। ভাষাকে সহজবোধ্য গতিশীল ও প্রাণবন্ত করিবার জন্য কথ্য রীতির অনুগামী করিতে হইবে। কিন্তু ভাবের গৌরব ও গাম্ভীর্য রক্ষার জন্য সংস্কৃতানুগ ভাষারীতির প্রয়োগও বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করিয়া সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য সুবোধ্যতার দাবি বহুক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশিত সমন্বয়ের সূত্রটি পরবর্তী অধিকাংশ লেখকই মানিয়া লইলেন। তবে কাহারও ভাষা একটু বেশী সাধুরীতিঘেঁষা, আবার কাহারও ভাষা সাধুর কাঠামোয় অনেকখানি চলিত রীতির অনুগামী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত রীতির সংঘর্ষ কোনো গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে নাই। সাধু কাঠামোটির মধ্যেই চলিত বাক্‌ভঙ্গি পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁহার ব্যক্তিত্বের বর্ণে গভীরভাবে রঞ্জিত। কাজেই আদর্শ গদ্যরীতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

কথা না তোলাই ভালো। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গদ্যে সংস্কৃত ভাষানুরাগ বিশেষরূপে প্রকটিত। কিন্তু কোথাও বাংলা কথ্য ভাষারীতির নিজস্ব কাঠামো হইতে এই ভাষা চ্যুত নয়। রবীন্দ্রনাথ সাধু কাঠামোটি না বদলাইয়া ধীরে ধীরে ভাষার মধ্যে চলিত ঢঙ্‌টি পুরাপুরি লইয়া আসিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মৌলিক style—ভাষার আশ্চর্য সৌরভ এবং প্রসাধনকলা—ইহার সর্বাঙ্গে লাগিয়া রহিল। কিন্তু মূলভাষা-কাঠামোটি সরলতা, প্রত্যক্ষতা এবং বিশিষ্টার্থক প্রয়োগপদ্ধতির গুণে চলিত রীতির সবগুলি গুণই প্রায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রধান প্রধান লেখকের গদ্যরীতিতে সাধু কাঠামোটি বাহিরে মোটামুটি রক্ষিত হইলেও উহার প্রাণধর্ম একান্তভাবেই চলিত রীতির অনুগামী হইয়া পড়িল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ সকলেই এই জাতের গদ্য লিখিতেন। কঠিন সংস্কৃতানুগ রীতি বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে আদৌ আর লক্ষিত হয় না।

এই সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে প্রমথ চৌধুরী বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে চলিত ভাষারীতির পক্ষে যে আন্দোলন শুরু করিলেন তাহা বৈপ্লবিক বলিয়া মনে হইবে না। ক্রিয়াপদ ও অভিশ্রুতি-স্বরসংগতি সহ বহিরঙ্গ কাঠামোটিও চলিত করিয়া তুলিবার দাবি তিনি তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে এই দাবি জোর পাইল। প্রমথ চৌধুরীর পরিচালিত এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা বিতর্ক ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই বিতর্কের সমাপ্তি ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের পথে আপনিই ঘটিয়াছিল। ক্রিয়াপদ, সবনামপদ এবং উচ্চারণঘটিত কিছু পার্থক্যের কথা ছাড়িয়া দিলে বাংলা গদ্যরীতি পুরোপুরি বোধগম্য চলিত রীতির অনুগামী হইয়া পড়িয়াছিল। এই আন্দোলনের একটি ফল ফলিল। মৌখিক ভাষার সহিত লেখ্য ভাষার দূরত্বও ঘুচিয়া গেল।

প্রশ্ন ৪। বাংলা সাহিত্যিক প্রবন্ধের (বা রসরচনার) সূত্রপাত বিষয়ে আলোচনা কর। ইহার আদিরূপের সহিত পরবর্তী রূপান্তরের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিকাল পর্যন্ত ইহার ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুসরণ করিয়া ভিন্ন মেজাজের শিল্পীর হাতে ইহার রূপ কিরূপ বিচিত্র হইয়া উঠিল দেখাইয়া দাও।

উত্তর ঃ বাংলা গদ্যসাহিত্য অনেকখানি বিকাশলাভ করিবার পরেই ইহাতে সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন রচনার আবির্ভাব সম্ভব হইয়া উঠিল। প্রথমে পাঠ্যপুস্তক আশ্রয় করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট রচনারীতি গড়িয়া তুলিবার দিকেই ছিল ইহার প্রবণতা। সে ভাষা শিল্পরূপসৃষ্টির যোগ্য ছিল না। রামমোহনের হাতে পড়িয়া বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনেকখানি বিস্তার ও গম্ভীরতা দেখা দিল। কিন্তু সৌন্দর্যপ্রাণ

ছিলেন না রামমোহন। সুন্দর কিছু ভাষায় গড়িয়া তোলার চেষ্টা তাঁহার ছিল না। তাঁহার ভাষারও সে শক্তি ছিল না। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নক্‌শাগুলির মধ্যে সরসভাবে ব্যঙ্গাত্মক চিত্ররচনার প্রয়াস ছিল। বাংলা সাহিত্যিক প্রবন্ধের অস্পষ্ট আদিরূপ বলিয়া ইহাদের গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বাংলা গদ্য শিল্পসম্ভাবনা লইয়া দেখা দিল। এই ভাষায় যে বিচিত্র মানবিক আবেগ প্রকাশ সম্ভবপর, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা নিজেই প্রমাণ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনায়ও সাহিত্যিক প্রবন্ধের ধারাটি বিশেষ বলশালী হইয়া উঠিল না। কারণ তিনি কিছু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন সামাজিক ও শিক্ষাগত সংস্কার সাধনের প্রয়োজনে। তাঁহার ভাষাসাধনার আসল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা কথাসাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন। মৌলিক গল্প উদ্ভাবন না করিলেও তিনি অনেকাংশে সেই কাজ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের একটি অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী পাওয়া গিয়াছে। উহা কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের লেখা। উহাকে রচনাসাহিত্য রূপে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। উহার মধ্যে এই মহাপ্রাজ্ঞ জ্ঞানতপস্বী, সমাজসংস্কারক ও গদ্যরীতির জনকের একটি আসক্তিহীন আত্মচর্চার চমৎকার রূপ ধরা পড়ে। নিজের বাল্যজীবনকে সম্পূর্ণভাবে মোহমুক্ত চিত্তে দেখা ও নিরাসক্তভাবে অপরের জীবনের মত বর্ণনা করা, অথচ একটি স্মিত কৌতুকে উহাকে সিঞ্চিত করা, রচনাটিকে বিশেষভাবে আস্বাদ্য করিয়া তুলিয়াছে। "প্রভাবতীসম্ভাষণ" নামক অপর একটি ক্ষুদ্র রচনায়ও তাঁহার অনাবৃত চিত্তের স্নেহব্যাকুল রূপ কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে।

বিদ্যাসাগরের পরবর্তীকালে বাংলা রচনাসাহিত্যের ধারা প্রধানতঃ ভবানীচরণ প্রদর্শিত নক্‌শার ব্যঙ্গতীব্র রূপটিকে আশ্রয় করিল। বঙ্কিমপূর্ব যুগে এই ধারার শ্রেষ্ঠ রচনা পাই "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায়"। বইটির ভাষা আদ্যন্ত চলিত। কোথাও স্থবিরতা নাই, যেন ঘোড়ার পিঠে দুল্‌কি চালে চলিয়াছে। উহার মধ্যে বক্র বিদ্যুৎচমক, বুদ্ধির পরিমার্জনা, কটাক্ষ ও বিদ্রূপের হাস্য তথা চিত্ররচনার নিপুণতা সমন্বিত হইয়াছে। হৃদয়ের ভাবব্যাকুলতা এইসব রচনায় বিশেষ প্রাধান্য পায় নাই। কিন্তু কোনোরূপ জ্ঞানচর্চা তথ্য-যুক্তির বিশ্লেষণ যেমন এই নক্‌শাগুলির লক্ষ্য নয়, সেইরূপ কাহিনীকথন চরিত্রচিত্রণ ইহাদের উদ্দেশ্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া বাংলা রচনসাহিত্যের বিকাশ ঘটিল অতি দ্রুত। হৃদয়াবেগ ও মননপ্রধান—দুটি ধারারই চর্চা তাঁহার লেখায় ঘটিয়াছে—এমন কি, দুই ধারাকে মিলাইবার সাধনায়ও তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার "লোকরহস্যে"র মধ্যে সংকলিত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই কৌতুকনক্‌শা। দুই একটি পূর্ণদেহ গল্প আছে। এই কৌতুকনক্‌শাগুলির পশ্চাতে বঙ্কিমের ব্যাপক সমাজদৃষ্টি সক্রিয় রহিয়াছে। কিন্তু

বঙ্কিমচন্দ্র রচনাগুলিকে আদৌ তত্ত্ব ও তথ্যবহুল করিয়া তোলেন নাই। এইগুলি সবই আস্বাদ্য ও উপভোগ্য, লেখক প্রায়ই এক একটি রূপকনক্শা রচনা করিয়াছেন। কোথাও গল্প-বলার একটা ভঙ্গি—কোথাও সংলাপপ্রধান একটা নাট্যরীতির আভাস। কিন্তু গল্প বা নাট্যরচনা তাঁহার একটুও লক্ষ্য নয়, অনায়াসেই তাহা পাঠকের চোখে পড়িবে। লেখকের ব্যঙ্গ বেশ তীক্ষ্ণ, কিন্তু রঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইয়া উপভোগ্য। মাঝে মাঝে উদ্ভট আজগুবি পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া উচ্চ হাস্যের জন্ম দিয়াছে। কিন্তু "কমলাকান্তে" আসিয়া বঙ্কিম শিল্পসৃষ্টির অনেক উচ্চস্তরে আরোহণ করিলেন। কমলাকান্তে ভাবাবেগপ্রধান রীতি এবং মননশীল তির্যক বিদগ্ধ ভঙ্গি দুইটিই সমানভাবে পাশাপাশি চলিয়াছে। দপ্তরের কতকগুলি প্রবন্ধ গদ্যে লেখা গীতিকবিতার ন্যায়। সেগুলিতে কবিচিত্তের আবেগ ঘনীভূত রূপ ধারণ করিয়াছে। অপর কতকগুলি রচনা রূপকধর্মী ব্যঙ্গাত্মক। সেগুলির আস্বাদ স্বতন্ত্র। কিন্তু সবগুলি রচনার মধ্যেই subjective সুরটিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা হইল কমলাকান্তের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র। অথচ রচনাটির মধ্যে কোথাও নাই কথাসাহিত্যের কোনোরূপ চেহারা, কাহিনীও নাই। কমলাকান্তের চরিত্রবৈশিষ্ট্য কাহিনীনিরপেক্ষভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রাক্-বঙ্কিমযুগের অন্যতম প্রধান লেখক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী প্রকাশিত হইবার পরে বাহির হয়। এই আত্মজীবনীটির মধ্যে লেখক আপনার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। লেখকের রচনাভঙ্গি সরল অনলংকৃত এবং আন্তরিক। এই 'আত্মজীবনী'র মধ্যে ভ্রমণপ্রিয় লেখকের ব্যক্তিগত দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতাও স্থান লাভ করিয়াছে। উহার মধ্যে স্থানকালোচিত সৌন্দর্য যেমন প্রকাশ পাইয়াছে তেমনি লেখকের আন্তরিক ভগবদ্ভক্তির সুরটিও ধরা পড়িয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "পালামৌ" নামক যে ভ্রমণকাহিনীটি রচনা করিয়াছিলেন শিল্পগৌরবে তাহার স্থানও অতি উচ্চে। পালামৌ-এর পাহাড় মানুষ সব-কিছুকে অবলম্বন করিয়া লেখকের অন্তরের সৌন্দর্যতৃষিত হৃদয়টি নানাভাবে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে।

বঙ্কিম-অনুজ লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার সরকার, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ লেখকদের নামোল্লেখ করিতে হয়। কমলাকান্তের প্রভাব ইঁহাদের সরস প্রবন্ধগুলির উপরে প্রত্যক্ষভাবে পড়িয়াছে। ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস এবং কৌতুকরস ইঁহাদের রচনার মুখ্য বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিতে"র নাম এই পর্বের লেখমালার মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয়। উহার সহজ কৌতুকের সুর, বিচিত্র অভিজ্ঞতার গ্রন্থিবদ্ধ উপস্থাপনভঙ্গি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পকণিকার অতিরিক্ত রসায়োজন রচনাটিকে বিশেষ মূল্য দান করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যিক প্রবন্ধের জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্ত" এবং রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থ—যেমন "পঞ্চভূত", "বিচিত্র প্রবন্ধ", "শান্তিনিকেতন"—বাংলা রচনা-সাহিত্যকে এমন একটা সমুন্নতি দান করিল যাহাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রচনার সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা ইহারা অর্জন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে আসিয়া বুদ্ধির বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত তীক্ষ্ণ ও চাতুর্যপূর্ণ ব্যঙ্গ-রচনারীতি অনেকখানি, সংকুচিত হইয়া ভাবাবেগপ্রধান, হৃদয়ের ব্যাকুল সৌন্দর্যোপলব্ধিতে সিক্ত রীতির সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। মননশীলতা, চাতুর্য ও বৈদগ্ধ্যের বৈদ্যুতি একটা বিশেষ রসাস্বাদে পরিণত হইয়া সৌন্দর্যমুগ্ধ ভাবাবেগগভীর রচনাভঙ্গিকে নবতর উপভোগ্যতা দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূতে' একটি বৈঠকী আলাপের মেজাজ তৈরী করা হইয়াছে। পাঁচটি চরিত্র কোনোরূপ কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত না হইয়া শুধুমাত্র সরস আলোচনায় এবং বিচিত্র কটাক্ষে জীবন্ত ব্যক্তিমূর্তি লাভ করিয়াছে। কোনো বিষয়েই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইবার চেষ্টা এই প্রবন্ধগুলির নাই। বরঞ্চ একটা প্রসঙ্গের উপরে নানাদিক হইতে আলো ফেলিয়া মানসিক বুদ্ধিচর্চা তথা হৃদয়াবেগ উদ্বেলিত করিয়া তোলার এক বিশেষ ধরনের আনন্দ এখানে পাওয়া যায়। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র প্রবন্ধগুলিতে জগৎ, জীবন ও শিল্পকলা প্রসঙ্গে কবির নানা ভাবনা স্থান পাইতেছে। কিন্তু যুক্তি-তথ্য-তত্ত্ব সংবলিত হইয়া উহা কোথাও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ হইয়া ওঠে নাই। ঐ প্রবন্ধগুলিতে, কবি প্রসঙ্গগুলিকে আশ্রয় করিয়া ভাবনা ও ভাবাবেগ মিশ্রিত করিয়া আপনার আত্ম-উদ্ঘাটন করিয়া চলিয়াছেন। ছবির পর ছবি সেই ভাবোপলব্ধির সূত্রটিকে বহন করিয়া চলিয়াছে, বর্ণের পর বর্ণের বৈচিত্র্য উহাকে রামধনুর সৌন্দর্য দান করিয়াছে। আসলে কবিতাকে গদ্যে রূপান্তরিত করা হইয়াছে, ভাবনার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া উহাকে এক ধরনের বিস্তার দান করা হইয়াছে। 'শান্তিনিকেতনে'র রচনাগুলির বিষয় হইল ধর্মোপলব্ধি। কিন্তু এই ধর্মভাবনা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা জগৎ ও জীবনবোধের যে বিশিষ্ট সত্যে স্থিত তাহার অনুরণন ইহার মধ্যে আগাগোড়া বাজিয়া চলিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তে রবীন্দ্রপ্রভাবিত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিছু সংখ্যক সাহিত্যিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলীও প্রধানতঃ রোম্যান্টিক সৌন্দর্যমুগ্ধতা প্রকাশ করিয়াছে। উহার মধ্যে অতীতচারী শিল্পীচিত্ত বর্তমানের গ্লানিজর্জর তুচ্ছতা হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়াছে, কিন্তু রোম্যান্টিক শিল্পীর স্বভাবানুগ বেদনায় ও হতাশায় ক্লিষ্ট হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যিক প্রবন্ধের মধ্যে বৈচিত্র্যের বহুলতা দেখা না গেলেও উৎকর্ষের দিক দিয়া উহার স্থান গৌরবের।

প্রশ্ন ৫। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের উদ্ভব কখন কি অবস্থায় ঘটিল? উহার প্রাথমিক রূপের পরিচয় দাও এবং বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত উহার বিকাশধারাটির অনুসরণ কর এবং যে সব বিশিষ্ট রীতিপদ্ধতি প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর: প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা ছিল না। থাকিবার কথাও নয়। কারণ সমালোচনা ভক্তিভাব ও ধর্মব্যাকুলতার মধ্যে জন্মায় না, দৈবী বিশ্বাসের ঘনীভূত পরিস্থিতিতেও উহার কোনো স্থান নাই। উহা মনন ও বিচার বিশ্লেষণের দান। তাহা ছাড়া কবিতা আবেগের বাহন। উহাতে বিচারমূলক সমালোচনার স্থান থাকিতে পারে না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্য বিচিত্র ভাব ও ভাবনা বহন করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিল। ফলে সমালোচনা-সাহিত্য সৃষ্ট হইবার অনুকূল পরিবেশ দেখা দিল। মানুষের যুক্তিবোধ মুক্তি পাইল। অতঃপর সাহিত্যের বিচার ও মূল্য নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল।

কিন্তু সমালোচনার সূচনার জন্য আরও দুইটি বস্তুর প্রয়োজন ছিল। সৌন্দর্যবোধ এবং সৌন্দর্যজিজ্ঞাসাই হইল সাহিত্য-সমালোচনার উৎস। ইংরেজি সাহিত্য ও সমালোচনার সহিত পরিচয়ের মধ্য দিয়া শিক্ষিত বাঙালীর সৌন্দর্যভাবনা পুষ্ট হয় এবং সাহিত্য-সমালোচনার বাসনা দেখা দেয়। কিন্তু জাতীয় সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি না থাকিলে সমালোচনা করিবার প্রকৃত তাগিদ অনুভূত হয় না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যখন সৃজনশীল সাহিত্যের জোয়ার আসিল তখন সাহিত্য-সমালোচনাও পুরাদস্তুর শুরু হইয়া গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় সৃজনশীল রচনার জোয়ার দেখা দিল। কিন্তু ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই বাংলা গদ্যসাহিত্য নানা জাতীয় প্রবন্ধ রচনায় আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছে এবং ইংরেজি সাহিত্যের চর্চার মধ্য দিয়া সাহিত্য সমালোচনায় আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছে। মধুসূদনই প্রথম বাংলা সাহিত্যে নব্যসৃষ্টির প্রাণবন্যা বহন করিয়া আনিলেন। তাঁহার রচনাবলীকে কেন্দ্র করিয়া সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাই মহামহোৎসব শুরু হইয়া যাইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহার পূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যমূল্য নিরূপণের যে সব চেষ্টা হইয়াছে তাহাতেই বাংলা সমালোচনার উৎস খুঁজিতে হইবে।

'সমাচারদর্পণ' হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম যুগের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিবার একটি প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। উহার সহিত যে সব মন্তব্য দেওয়া হইত তাহা সংক্ষিপ্ত পরিচয়পত্র মাত্র, সমালোচনা নয়। তাহা ছাড়া ঐ সময় পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থগুলি পাঠ্যপুস্তক জাতীয় রচনা—প্রকৃত সাহিত্য সমালোচনার বস্তু নয়। ১৮২১ সালে কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজিতে এক প্রবন্ধ লেখেন। বিষয় বাংলা সাহিত্যের

পরিচয়। তখন মুদ্রিত আকারে যে সব গ্রন্থ পাওয়া যাইত তাহার সহায়তায় প্রবন্ধটি রচিত। পুরাতন গ্রন্থের মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য স্থান পাইয়াছে এই প্রবন্ধে। লক্ষণীয় ভারতচন্দ্রের কাব্যের রুচিহীনতা এবং প্রসাধনপারিপাট্য তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রকাশিত কয়েকটি গদ্যগ্রন্থের উল্লেখও ইহাতে আছে। প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ ঐ বৎসরই 'সমাচারদর্পণে' বাহির হইয়াছিল। প্রবন্ধটির মধ্যে সমালোচনার অত্যন্ত প্রাথমিক ধরণের কিছু চিহ্ন দেখা যায়।

হিন্দু কলেজে ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষার ফলে সমালোচনার চেতনা অনেকখানি বাড়িয়া যায়। বাঙালী তরুণেরা ইংরেজি সাহিত্য এবং কখনো কখনো বাংলা সাহিত্য বিষয়েও ইংরেজিতে প্রচলিত পত্র পত্রিকাগুলিতে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। হরচন্দ্র ঘোষের একটি প্রবন্ধ "Bengali Poetry" Calcutta Review পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে বাংলা সাহিত্যের (স্বভাবতঃই পুরাতন) অকিঞ্চিৎকরতা বিষয়ে মন্তব্য করা হইয়াছিল। উহার উত্তরে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব" প্রকাশিত হয়। তিনি ইংরেজি কবিতার সহিত তুলনামূলক আলোচনায় ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবির গোরব প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। সমালোচনা হিসাবে প্রবন্ধটি মূল্যহীন। কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের সম্পর্কে গৌরববোধ এবং ইংরেজি সাহিত্যের তুলনায় আলোচনা এই দুইটি ধারাই বাংলা সমালোচনার বিশেষ লক্ষণরূপে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখা দিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই সময়েই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন বেথুন সোসাইটিতে। পরে উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় প্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়নের চেষ্টা। উহার নাম "সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব"। প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে তিনি নির্বিচারে চলেন নাই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টই স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। দু-একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তাঁহার নিগূঢ় সৌন্দর্যদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৫২ সালে প্রথম দুইখানি মৌলিক বাংলা নাটক প্রকাশিত হইল। নাটক দুইখানির ভূমিকা বাংলা সমালোচনার দিক হইতেও গুরুত্বপূর্ণ। তারাচরণ শিকদার "ভদ্রার্জুন" নাটকের ভূমিকায় ইংরেজি ও সংস্কৃত নাট্যরীতির তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং ইংরেজি নাট্যরীতি অনুসরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আলোচনাটি বহিরঙ্গ, কিন্তু প্রথম দিকের রচনা হিসাবে মূল্যহীন নয়। "কীর্তিবিলাস" নাটকের ভূমিকায় যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ট্র্যাজেডি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। ভারতীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বেশ অভিনবই বলিতে হইবে।

অল্পকাল মধ্যে "বিবিধার্থসংগ্রহ" পত্রিকা প্রকাশিত হইল। এই প্রথম একখানি মাসিক পত্রিকা সাহিত্য-সমালোচনাকে অন্যতম উদ্দেশ্যরূপে ঘোষণা করিল। প্রথম বৎসরেই হরিমোহন সেনের একটি প্রবন্ধ বাহির হইল রামপ্রসাদ সেন সম্পর্কে। প্রবন্ধটির বেশীর ভাগই জীবনী। তবে শেষ দিকে কিছুটা সাহিত্যসৌন্দর্য প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অবশেষে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব ঘটিল। তাঁহার কাব্য ও নাট্যাবলী বাঙালী সমালোচকদের সামনে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। এতদিনে বাংলা সমালোচনা একটা জীবন্ত ব্যাপারে পরিণত হইল। এমন একজন সাহিত্যিককে সে পাইল যাঁহার রচনার মান অতি উচ্চ স্তরের। জাতীয় সাহিত্যে একজন মহৎ সাহিত্যিকের আবির্ভাবে সমালোচনাও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। এই ব্যাপারে সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া 'বিবিধার্থসংগ্রহ' খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। মধুসূদনের কাব্যাদির সমালোচনা করিয়া প্রথম যুগে যে সব লেখক বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নাম করিতে হয় রাজনারায়ণ বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির। রাজনারায়ণ বসুর সমালোচনপ্রয়াস মধুসূদনের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার "বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" সেকালের একখানা উল্লেখযোগ্য সমালোচনাপুস্তক। এই সময় পর্যন্ত বাংলা সমালোচনা কোনো সুনির্দিষ্ট রীতিপদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। কতকটা সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের অনুসরণ, কতকটা ইংরেজি সমালোচনারীতির একটা মিশ্রণ উহার মধ্যে দেখা যাইত।

মধুসূদনের অব্যবহিত পরে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হইতে থাকে। বহু সাহিত্যরসিকই বঙ্কিমের রচনার সহৃদয় সমালোচনায় অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সমালোচকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য একটা উচ্চমানে পৌঁছিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করিলেন এবং সমালোচনামূলক বহু প্রবন্ধ রচনা করিলেন। সেই সব প্রবন্ধের মধ্যে "গীতিকাব্য", "উত্তরচরিত", "শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদিমোনা", "জয়দেব ও বিদ্যাপতি", "দীনবন্ধু মিত্র", "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত", "প্যারীচাঁদ মিত্র" প্রভৃতির নাম করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বাংলা সমালোচনার সামনে একটি সুস্পষ্ট আদর্শ ধরিয়া দিতে চাহিলেন। বলা বাহুল্য, উক্ত আদর্শ সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রানুমোদিত নয়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র রসশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। ইউরোপীয় রোম্যান্টিক সমালোচককুলের নিকটই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমালোচনার মূলকথা সমগ্রদর্শন। খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্লেষণের সাহায্যে কোনো রচনার প্রকৃত সৌন্দর্যের গভীরতম প্রদেশে অবতরণ করা সম্ভব হয় না। বঙ্কিমের এই আদর্শ রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির পুরাতন রীতিকে সমালোচনার রাজ্য হইতে একেবারেই সরাইয়া দিল। সমগ্রভাবে দেখিতে হইলে

বাহির হইতে সৃষ্টিকর্মের বিচার করিলে শুধু চলে না ; লেখকের ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া উহারই বিচ্ছুরিত আলোকে তাহাকে বুঝিয়া লইতে হয়। সমালোচনা করিতে গেলে সর্বাপেক্ষা সমস্যা হয় সাহিত্যের উদ্দেশ্য লইয়া। যদি সমাজসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারই সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে যে রচনা উক্ত লক্ষভেদে সফল তাহার মূল্যই অধিক বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সমকালীন অধিকাংশ সমালোচককেই ভাবিত করিত। সামাজিক কল্যাণবোধ তথা ধর্মনৈতিক আদর্শানুসরণকে সকলেই শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। সাহিত্য সমালোচনাও এই ভাবকল্পনাকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, সামাজিক কল্যাণবোধ এবং সৌন্দর্যসৃজন দুইটির মধ্যে কোনো সহজ বা স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। তিনি সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া অভিহিত করিলেন। নীতিধর্ম প্রচার গৌণ লক্ষ্য হইতে পারে, তাহার অধিক নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদর্শিত এই আলোকবর্তিকা সমকালে অধিক এবং পরবর্তীকালে বাংলা সমালোচনাকে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে। তাহা ছাড়া নূতন দৃষ্টিতে সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যবিচার, কালিদাস ও শেক্সপীয়রের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর সমালোচকদের অনেক মুখ্য প্রবণতার সামনে উন্নত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ভিত্তি সামান্যতা হইতে একটা উল্লেখযোগ্য মানে প্রতিষ্ঠিত হইল বঙ্কিমেরই চেষ্টায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার এই ভূমিকাও স্মরণ রাখার যোগ্য।

প্রশ্ন ৬। অনেক সমালোচকের মতে, ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের প্রভাবেই বাংলা নাটকের প্রতিষ্ঠা। অপর একদলের মতে, মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটকে ইংরেজি নাটকের যথার্থ প্রভাব সূচিত হয় নাই। ইহার মধ্যে কোন্ অভিমতটি তুমি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে কর, উক্ত পর্বের নাট্যধারাটি অনুসরণ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

উত্তর ঃ প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ছিল। উহা অভিজাত অনুষ্ঠান ছিল। নানাদিক হইতে উহার মধ্যে বিস্ময়কর উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যাইত। সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের প্রাণ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের একটা বড় অংশই একালের হাতে পৌঁছিয়াছে। উহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইউরোপীয় নাটকের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য একেবারে গোড়ার। বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে যাত্রানুষ্ঠানের বহুল প্রচলন ছিল। উহা ছিল লোকানুষ্ঠান। আবেদনগত স্থূলতাকে তাই পরিহার করা যাইত না। উহার সাহিত্যিক নিদর্শন বড় বেশী মিলে নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে সংস্কৃত নাটকাভিনয় একটা বিস্মৃত ব্যাপার। অপরপক্ষে যাত্রার যে নব্য রূপ কবি-তরজার সম্পর্কে আসিয়া দাঁড়াইয়া

গিয়াছিল তাহা যেমন রুচিহীন তেমনি স্থূল। কাজেই বাঙালীর নাট্যতৃষ্ণা অতৃপ্তই থাকিত। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালী কলেজে শেক্সপীয়র প্রভৃতির নাটক পড়িত। কলিকাতার নানাস্থানে ইংরেজি নাট্যালয়ও গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের নব্যরুচির নিকট ইংরেজি নাটক এবং নাট্যশালা খুবই আকর্ষণীয় বলিয়া বোধ হইল। ইংরেজি রঙ্গালয়ের আদর্শে রঙ্গমঞ্চস্থাপন এবং নাট্যাভিনয়ের নানা বিচ্ছিন্ন চেষ্টা চলিতে লাগিল। দুই একটি সংস্কৃত নাটক বা প্রহসনের অনুবাদও হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৫২ সাল হইতে পুরাদস্তুর নাটক লেখা আরম্ভ হইল। মৌলিক নাটকও পাওয়া যাইতে লাগিল।

নব্য নাট্যকারেরা অনেকেই ইংরেজি নাটক ও রঙ্গমঞ্চের প্রভাবে নিজেদের রুচি গড়িয়া লইয়াছিলেন। ইংরেজি রীতির নাট্যরচনায়ই তাঁহাদের আগ্রহ। বাংলার প্রথম দুইটি মৌলিক নাটকের রচয়িতা তারাচরণ শিকদার ("ভদ্রার্জুন") এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ("কীর্তিবিলাস") তাঁহাদের নাটকের যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন উহাতে তাঁহাদের এই মানসিক প্রবণতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তারাচরণ সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের রূপরীতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করিলেন এবং ইংরেজি রীতির পক্ষে কিছু যুক্তিও দেখাইয়াছেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ভারতীয় প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন এবং ইংরেজি ট্র্যাজেডির গুণকীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু নাটক দুটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইংরেজী নাটক সম্বন্ধে ইঁহাদের ধারণা একেবারেই ভাসাভাসা। ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের মধ্যে জীবনবোধগত পার্থক্য কোথায় ইঁহারা ধরিতে পারেন নাই।

হরচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও সংস্কৃতনাটকের নটী সূত্রধর ঘটিত বহিরঙ্গ অনুসরণ না করিয়া পারেন নাই।

১৮৫২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদনের আবির্ভাব অর্থাৎ ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নাটকগুলির লেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হইলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। তিনি কয়েকটি মৌলিক নাটক ও প্রহসন এবং কয়েকটি অনুবাদ নাটক রচনা করেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত নাট্যরীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। ইংরেজি নাটকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ ভাবগত পরিচয়ের কোনো চিহ্ন তাঁহার রচনার মধ্যে লক্ষিত নয়। একমাত্র মনোভাবের দিক হইতে তিনি ছিলেন অনেকখানি অগ্রসর। সামাজিক সংস্কারান্দোলনের পক্ষে তিনি আপনার লেখনীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও প্রহসনাদিতে সংলাপের ভাষায় আশ্চর্য লোকানুগামিতার পরিচয় দিয়াছেন।

এই পর্বের উল্লেখযোগ্য অপর দুইজন নাট্যকার হইলেন "বিধবাবিবাহের"

লেখক উমেশ মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ।* কালীপ্রসন্ন সিংহ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদক। ঐ আদর্শ সামনে রাখিয়াই তিনি একটি মৌলিক পুরাণাশ্রিত নাটক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার "বাবু" নামক প্রহসনটির বিষয়বস্তু আধুনিক হইলেও নাট্যরীতিতে সংস্কৃত ভঙ্গিই সেখানে জয়যুক্ত। কিন্তু "বিধবাবিবাহ" নাটকটি উল্লেখ-যোগ্য ইহার ঘনীভূত বেদনারসের জন্য। 'কীর্তিবিলাসে'র তুলনায় ইংরেজি নাট্য-রীতিসম্মত ট্র্যাজেডি-রস বিতরণে ইহার সাফল্য অনেক বেশী।

এই গোটা পর্বের নাট্যসৃষ্টি বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি সত্য প্রকট হইয়া উঠে—

প্রথমতঃ, যে সব রঙ্গালয় বাঙালীর চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাংলা নাটকের অভিনয় করিয়াছে তাহাদের সবই প্রায় ইংরেজি রীতির। কিন্তু যে সব নাটক অভিনীত হইত তাহার বেশীর ভাগই সংস্কৃতরীতির। form বা বহিরঙ্গ কৌশল তথা উপস্থাপন ও প্রসাধন প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের প্রভাব যেমন স্পষ্ট, content বা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে পুরাতনের প্রতি আকর্ষণও বেশ তীব্র। ইহাদের মধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, একশ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালীর মনে ইংরেজিরীতির নাট্যরচনার বাসনা জাগিয়াছে। তাঁহারা চেষ্টাও করিয়াছেন। তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন বাংলা নাটক কোন্ পথ ধরিয়া সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় পৌঁছিতে পারে। কিন্তু নিজেদের সাধ থাকিলেও সাধ্য ছিল না। সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের বহিরঙ্গ পার্থক্যটুকু মাত্র তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, প্রাণধর্মের স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তাই মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেও দুই একটি বাহিরের লক্ষণ ছাড়া অন্তরে সংস্কৃত প্রভাব থাকিয়াই গেল। একমাত্র একটি ক্ষেত্রে স্থায়ী প্রভাব প্রথমাবধিই লক্ষিত হইল। ট্র্যাজেডি রচনার দিকে বাঙালী নাট্যকারদের বিশেষ প্রবণতা দেখা গেল। মধুসূদনের পূর্বেই একাধিক ট্র্যাজেডি রচিত হইয়াছে, এবং এই ব্যাপারটি ভারতীয় প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাফল্যের পরিমাণ সর্বত্র সমান হইল না। কিন্তু এই নব সুরকে বাজাইবার সাধনা চোখে না পড়িয়া পারে না।

তৃতীয়তঃ, ১৮৫২ হইতে ১৮৫৮ সালের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লেখা হইয়াছে তিন শ্রেণীর নাটক : (১) সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ; (২) পুরাণকাহিনী অবলম্বনে রচিত মৌলিক নাটক ; (৩) সামাজিক সমস্যা লইয়া লেখা মৌলিক প্রহসন। সংস্কৃত নাটকের এত বেশী অনুবাদ প্রমাণ করে বাঙালী নাট্যকারদের মনের ভিত্তি কোন্ ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঁধা ছিল। পুরাণাশ্রিত নাটকগুলি মৌলিক হইলেও তাহার রূপরীতি ও রসাস্বাদ একেবারে সংস্কৃত নাটকের ধরনের। ইহাদের সমজাতীয়ত্ব অস্বীকার করা যায় না। মধুসূদনপূর্ব যুগে যে সব প্রহসন রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সমকালীন সমাজসমস্যার প্রতিফলন পড়িয়াছে। ইহারা বিষয়বস্তুর দিক হইতে মৌলিক এবং

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে আধুনিক হইলেও উহাদের আঙ্গিক ইউরোপীয় কমেডি ধরনের নয়, বরঞ্চ সংস্কৃত প্রহসন প্রকরণের সহিত ইহাদের বেশী মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

কাজেই বাংলা নাট্যসাহিত্যের আবির্ভাবের প্রথম পর্যায়ে ইংরেজি নাট্যরীতি এবং নাট্যভাব আয়ত্ত করিবার জন্য যত চেষ্টাই ঘটুক না কেন, যত আন্তরিক ইচ্ছাই থাকুক না কেন, সংস্কৃত প্রভাবের মধ্যেই উহা সম্পূর্ণতঃ নিমজ্জিত ছিল। এমন কি মধুসূদনের প্রথম দিকের নাটকগুলিও সম্পূর্ণতঃ সংস্কৃত প্রভাবের জগতে বাস করিয়াছে। মধুসূদন যখন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি রচনা করিলেন, তিনি ইংরেজি রীতির নাটক লেখার কথাই ভাবিয়াছিলেন। তিনি চিঠিতে এই নাটকের "foreign air"-এর কথা জানাইয়াও ছিলেন। বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই নাটকের মধ্যে সংস্কৃত আদর্শ হইতে সবিশেষ বিচ্যুতি ঘটিয়াছে বলিয়াছেন। কিন্তু আজ যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করা হয় দেখা যাইবে, বহিরঙ্গে এখানে সেখানে সংস্কৃতরীতি হইতে শর্মিষ্ঠার কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও উহা মূলতঃ সংস্কৃত রীতির। 'রত্নাবলী' নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাব 'শর্মিষ্ঠার' পরিকল্পনায় রহিয়াছে। কালিদাসের "বিক্রমোর্বশী" "মালবিকাগ্নিমিত্রের" প্রভাবও মধুসূদন অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মহাভারত হইতে কাহিনীটি গ্রহণ করিয়া তিনি স্বাধীনভাবেই নাট্যকাহিনী গঠন করিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রভাবনা, ঘটনাসংস্থান, সংলাপের ভাষাভঙ্গি, রসনিবেদনের বৈশিষ্ট্য সব-কিছুতেই সংস্কৃতরীতি প্রকট। মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী'র কাহিনীটি গ্রীক পুরাণ হইতে গৃহীত। কিন্তু ঘটনাবিন্যাসের ভঙ্গিতে এক্ষেত্রেও তিনি একেবারেই সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণ করিয়াছেন। চরিত্রকল্পনায়ও বিশেষ করিয়া কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটক হইতে অনেক-কিছুই অনুকরণ করিয়াছেন কবি। সংস্কৃত নাটকের মত এই দুইটি নাটকেই সংলাপ দীর্ঘ, বিবৃতিধর্মী। রসসৃজনই উদ্দেশ্য, প্রত্যক্ষ ঘটনাময়তা এবং সংঘর্ষপ্রাণতা ইহার মধ্যে মিলিবে না।

মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল ইংরেজি নাটকের প্রকৃত আদর্শটি অবলম্বন করা। কিন্তু বেলগাছিয়া থিয়েটার ছিল তাঁহার পৃষ্ঠপোষক। ঐ নাট্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইংরাজি রীতিতে রঙ্গমঞ্চকে সাজাইয়াছিলেন কিন্তু পুরাতন সংস্কৃতরীতির নাটকাভিনয়ের প্রতিই তাঁহাদের ঝোঁক ছিল। এক্ষেত্রে কোনোরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবার মত সাহস বা বৈপ্লবিক মনোভাব তাঁহাদের ছিল না।

'পদ্মাবতী'র পরে মধুসূদন যখন প্রহসন দুইটি লিখিলেন, তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ইংরেজি নাটকের আদর্শ অনুসরণ করিলেন। পূর্ববর্তী প্রহসনকারেরা সংস্কৃত প্রহসন প্রকরণের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদন "কমেডি 'অব ম্যানারস" অভিধায় পরিচিত ইংরেজি সমাজব্যঙ্গমূলক নাটকের আদর্শে প্রহসন দুইটি

রচনা করেন। ঘটনাগত প্রত্যক্ষতা ও সংঘর্ষ প্রহসন দুইটিতে আগুন্ত নাট্যঘন-প্রাণবন্ত আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রহসন দুইটিতে ইহার সূত্রপাত, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ইহার পূর্ণবিকাশ। 'কৃষ্ণকুমারী' গম্ভীর রসের ট্র্যাজেডি। ইহা দেহ এবং রসাবেদন দুইদিক হইতেই পুরোপুরি ইংরেজি রীতির নাটক। যদি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব মধুসূদনের পূর্ববর্তী নাট্যকারেরা মুখেই দু-একজন ইংরেজি প্রভাবের কথা বলিয়াছেন। আসলে মধুসূদনের পূব পর্যন্ত ইংরেজি প্রভাব বহিরঙ্গেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছিল। মধুসূদনই সর্বপ্রথম ইংরেজি প্রভাবকে অন্দরে আহ্বান জানাইলেন। তাহাও তাহার তৃতীয় নাটক হইতেই মাত্র স্পষ্ট ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রশ্ন ৭। মধুসূদন হইতে গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা নাটকের ক্রম-বিকাশে সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটক এবং যাত্রাগানের প্রভাবের পরিমাণ ও স্বরূপ নির্ণয় কর।

উত্তর ঃ মধুসূদনের হাতেই বাংলা নাটক প্রথম একটা উল্লেখযোগ্য স্তরে গিয়া পৌছিল। ইহার পূর্বে কিছুসংখ্যক নাটক রচিত হইয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত চলিয়াছে নেহাৎই প্রস্তুতিরপর্ব। মধুসূদন হইতে গিরিশচন্দ্র পযন্ত বাংলা নাটকের স্বর্ণযুগ। মধুসূদনের নাটক রচনার অল্প কিছুকাল পরে বাংলায় প্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইল। উহা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে পরিচিত হইয়াছিল। ১৮৭২ সালে এইভাবে শখের থিয়েটার যুগের অবসান হইল। বাংলা রঙ্গমঞ্চে পেশাদারী যুগ শুরু হইল। ইহার ফল নানাভাবে বর্তিয়াছে বাংলা নাটকের উপরেও। নাট্যরচনায় জোয়ার আসিয়াছে। শখের থিয়েটারের ধনী পরিচালকদের খেয়ালখুশিমত নাটক লিখিতে হইত বলিয়া স্বাধীন নাট্যবিকাশের পথ অনেকটা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং "বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ"র মত নাটকও অভিনীত হইবার মতো রঙ্গমঞ্চের সহায়তা পায় নাই। সেদিক দিয়া বিচার করিলে পেশাদার থিয়েটার বাংলা নাটকের উন্নতির সহায়ক হইয়াছে।

মধুসূদনের হাতে বাংলা নাটকের যথার্থ প্রতিষ্ঠা ; কিছু পরে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নাট্যাভিনয় ও নাট্যরচনার ক্ষেত্রে নবযুগ সম্ভাবিত হইল। এই দুইয়ে মিলিয়া বাংলা নাটকের গৌরবযুগের সূচনা ঘটাইল। এই যুগের বিস্তার উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। বলা যাইতে পারে গিরিশচন্দ্রে আসিয়া ইহার সমাপ্তি ঘটিল। শুধুমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল—ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি দুই একজনের মধ্যে ইহার উত্তরসূরীত্ব লক্ষ্য করি। উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবযুগের অবসান ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল।

রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া বাংলা নাটকের যে নূতন রূপ দেখা দিল তাহা স্বতন্ত্র ধারার জন্ম দিল—উহার সহিত প্রচলিত নাট্যধারার সম্পর্ক বেশী নয়।

আলোচ্য পর্বে বাংলা নাটকের ইতিহাসে নানারূপ বহিরাগত প্রভাব কাজ করিয়াছে। সংস্কৃত নাটকের প্রতি ঐতিহ্যগত ভাবে বাঙালীর উত্তরাধিকারের দাবি আছে। নব্যশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়া ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের প্রতি বাঙালীর সুতীব্র আকর্ষণ লক্ষ্য করিবার মত। তাহা ছাড়া বাংলার নিজস্ব লোকাভিনয় অর্থাৎ যাত্রার প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাবে পড়িয়াছে এই পর্বের বাংলা নাটকের উপরে।

মধুসূদনের পূর্ববর্তী নাটকের ধারায় দেখা যায়, দেশপ্রচলিত যাত্রাগান সম্বন্ধে নব্যশিক্ষিত বাঙালীর একটা বিরূপ মনোভাব জন্মিয়াছে। উহাকে অনুসরণযোগ্য আদর্শ বলিয়া কেহই আর মনে করিতেছেন না। তাঁহাদের একটি ভাবনা সংস্কৃত নাট্যাদর্শ গ্রহণ করিব, না ইংরেজি নাট্যরীতির অনুশীলন করিব। কিছু কিছু নাট্যকার ইংরেজি নাটকের সৌন্দর্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সংস্কৃতরীতিকে সরাসরি অস্বীকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই ইংরেজি ও সংস্কৃত নাট্যরীতির অভ্যন্তরীণ পার্থক্যটি যথাযথ অনুভব করিতে পারেন নাই। উহার বহিরঙ্গের পার্থক্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, কাজেই দেখা যায় নব্যরীতির উপাসকগণও বাহিরে ইংরেজি নাটকের ধরন কিছু গ্রহণ করিলেও ভিতরে ভিতরে পুরামাত্রায় সংস্কৃতানুগ রহিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের ছিল প্রাধান্য. মৌলিক নাটক যাঁহারা লিখিতেন তাঁহারা সংস্কৃত নাটকের আদর্শটিরই অনুগামী ছিলেন। প্রহসনগুলির বিষয়বস্তু ছিল সমকালীন বাংলাদেশের সমস্যা; কিন্তু এক্ষেত্রেও রামনারায়ণ প্রমুখ নাট্যকারেরা সংস্কৃত প্রহসন প্রকরণের রীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতেন। কাজেই একথা বলা যাইতে পারে মধুসূদনপূর্ব বাংলা নাটকে সংস্কৃত রীতি ও রসের প্রভাব ছিল সর্বাঙ্গীন। কোনো কোনো মহলে ইংরেজি ধারা অনুসরণের বাসনা দেখা দিলেও উহা চরিতার্থতা লাভ করে নাই, কিন্তু ইহারই পাশাপাশি নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে ইংরেজি ধরনের মঞ্চ ও পট এবং প্রযোজনারীতির প্রতি প্রায় সকলেরই আকর্ষণ ছিল গভীর।

মধুসূদন দত্ত যখন নাট্যকাররূপে দেখা দিলেন, তিনি ইংরেজি নাটকের অনুসরণ করিতেই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সমকালীন রঙ্গমঞ্চের চাহিদা এবং জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সংস্কৃতরীতির নাটকই তাঁহাকে লিখিতে হইয়াছে। তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে সংস্কৃত নাট্যাদর্শ প্রত্যক্ষতঃ অনুসৃত হইয়াছে। 'পদ্মাবতী'র কাহিনীটি বিদেশী কিন্তু নাটকীয় রূপরীতি বা রসপরিবেশনার দিক হইতে ইহা সম্পূর্ণই সংস্কৃত পন্থার পথিক। এই দুইটি নাটকেই সংলাপ দীর্ঘ, ভাষা বিবৃতিধর্মী বা বর্ণনামূলক

এবং সংস্কৃতানুসারী। প্রত্যক্ষ ঘটনা বা সংঘর্ষ বড় বেশী নাই। রসই মুখ্য, দ্বন্দ্ব নয়। অবশেষে প্রহসন রচনা করিতে গিয়া মধুসূদন সংস্কৃতরীতির আনুগত্য ত্যাগ করিলেন। সম্পূর্ণতঃ ইউরোপীয় নাটকের আদর্শ দেখা দিল। ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে "Comedy of manners" নামক এক শ্রেণীর প্রহসন প্রচলিত। উহা সমাজব্যঙ্গ-মূলক। মধুসূদনের প্রহসনগুলি ঐ জাতীয়। তাঁহার পূর্বে যে সব সংস্কৃত প্রহসন প্রকরণ রচিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার সম্বন্ধমাত্র নাই। এখানে ঘটনার উপস্থাপন প্রত্যক্ষ, সংলাপ জীবন্ত সংক্ষিপ্ত ও চরিত্রানুগ। বিপরীত আদর্শের, ব্যক্তিত্বের ও ঘটনার দ্বন্দ্ব রচনা দুইটিকেই উপভোগ্য করিয়াছে। এই সময় হইতেই বাংলা নাটকে ইংরেজি রূপরীতির অন্তরসত্য প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। (মধুসূদনের পরবর্তী নাটক গম্ভীররসের ট্র্যাজেডি 'কৃষ্ণকুমারী'র পূর্বেও বাংলায় বিয়োগান্ত নাটক লেখা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ সার্থক শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি রচনা আর হয় নাই। নাটকটির কোথাও সংস্কৃতরীতির প্রভাব নাই। ব্যতিক্রম দুই-একটি স্থানের সংলাপের ভাষা-বৈশিষ্ট্য।) চরিত্রভাবনায় বা নাটকীয়তা সৃষ্টিতে, বেদনারস পরিবেশনে ইংরেজি ট্র্যাজেডিকে আত্মস্থ করিয়া নবরূপে মণ্ডিত করিবার লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

মধুসূদন দত্ত সংস্কৃত নাট্যানুগ পথ ধরিয়া চলিতে শুরু করেন। কিন্তু ইংরেজি রীতির মধ্যেই যে বাংলা নাট্যসাহিত্যের মুক্তি, এই সত্যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি আমাদের নাটককে সেই পথে প্রতিষ্ঠিতও করিলেন। যাত্রার প্রতি বাঙালী বুদ্ধিজীবীর যে বিরূপতা ছিল তাহা বাংলা লোকাভিনয়ের ঐ ধারাটিকে আমাদের নাটকের মধ্যে এতাবৎকাল প্রবেশ করিতে দেয় নাই।

মধুসূদনের পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। মধুসূদনের ন্যায় পথের অনুসন্ধানে তাঁহাকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি ইংরেজি নাট্যরীতির বাঁধাপথে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার কমেডিগুলি প্রায়ই রোম্যান্টিক কমেডি জাতীয়। প্রহসন-গুলি ইংরেজি 'কমেডি অব ম্যানারস্'-এর সহধর্মী। 'নীলদর্পণ'ও ইংরেজি মেলোড্রামার আদর্শে রচিত। চরিত্রকল্পনায় মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আস্থা স্থাপন, ঘটনার প্রত্যক্ষ-তাকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা, কৌতুকরসের মার্জিত সহানুভূতিপূর্ণ রূপ ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফল। দীনবন্ধুর নাটকের ভাষায় মাঝে মাঝে সংস্কৃতানুকারিতা আছে, অকারণ দৈর্ঘ্য এবং গদ্যপদ্যের মিশ্রণও দেখা যায়। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রভাবের অবশেষে এখানে আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিলেও তাঁহার মৌলিক নাটকগুলিতে মধুসূদনপ্রদর্শিত পথ ধরিয়াই চলিয়াছেন। ইংরেজি আধা-ঐতিহাসিক আধা-রোম্যান্টিক স্বদেশপ্রেমপূর্ণ ট্র্যাজেডির আদর্শ এক্ষেত্রে অনুসৃত হইয়াছে

চড়ারও বহুক্ষেত্রেই নাটকগুলিকে মেলোড্রামাটিক করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যাদর্শের প্রতি তাঁহার দুর্বলতার চিহ্ন কোথাও নাই।

মধুসূদন দীনবন্ধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—উল্লেখযোগ্য নাট্যকারদের মধ্যে এই তিনজনের চেষ্টায় বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারা হইতে সংস্কৃত প্রভাবের চিহ্নটিও লুপ্ত হইল। পরবর্তীকালে আমাদের নাটক এই পথ ধরিয়া চলে নাই। কিন্তু সংস্কৃত রীতি ও আদর্শকে ফিরাইয়া আনিবার আর কোনো চেষ্টাও হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে সংস্কৃত নাটকের আদর্শে বিদূষক চরিত্রটিকে প্রায়ই উপস্থিত করা হইয়াছে। অবশ্য তাহার খোলনলচে একেবারে পাল্টাইয়া গিয়াছে। অন্য কোনো দিকে সংস্কৃতানুকারিতা নাই।

বাংলা নাটকে দীনবন্ধু—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমকালেই একটি নূতন সুর বাজিতে আরম্ভ করিল। উহা যাত্রার সুর। যাত্রাকে এতকাল সরব এবং নীরব অবহেলা জানানোই হইয়াছে। মনোমোহন বসু নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে ইংরেজি রীতির ব্যয়বহুল এবং আয়োজনসর্বস্ব আড়ম্বরপ্রধান পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করেন। উহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাটকের রূপেরও পরিবর্তন করিতে চাহিলেন। তিনি যাত্রার আদর্শে পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে নাটক লিখিতে লাগিলেন। ইংরেজি রীতির প্রতি তিনি আনুগত্য জানাইলেন না। মনোমোহন বসুর নাটকগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বহুসংখ্যক গানের সংযোজন। তাহা ছাড়া তরল ভক্তিরসের প্রাচুর্য এবং সংহত ঘটনাপ্রধান দ্বন্দ্বের স্থানে গীতিপ্রবণতা এই রচনাগুলির মধ্যে প্রকট। মধ্যযুগসুলভ ধ্যান ধারণা এবং ধর্মচিন্তা ইহাদের ভাবভিত্তি রচনা করিয়াছে। রাজকৃষ্ণ রায়ও মনোমোহন বসুর ধারাই অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন।

এইভাবে জাতীয় আদর্শ, বাঙালীর নিজস্ব ভাব—ইহার নাম করিয়া মধুসূদন-দীনবন্ধু প্রবর্তিত নাট্যাদর্শের একটি বিরুদ্ধ ধারার সূত্রপাত হইল। সহজে জনসাধারণকে আকর্ষণ করিবার উপকরণ ইহার মধ্যে ছিল। গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবে এই ধারাটি কিছুটা পরিবর্তিত হইল এবং বিশেষ শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। গিরিশচন্দ্রের সহিত ইংরেজি নাটকের পরিচয় ছিল। ইংরেজি ধরনের নাট্যাভিনয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নূতন যুগ এবং ইংরেজি সাহিত্যের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া থাকিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মনোমোহন বসুর ন্যায় মঞ্চকল্পনা ও অভিনয়রীতিতে পশ্চাৎপদ হইবার কিছুমাত্র বাসনা তাঁহার ছিল না। তিনি কিছুপরিমাণ সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার মূল সহানুভূতি ছিল পুরাতন বাঙালীর ভক্তিভাবনা, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার-সংস্কৃতির দিকে। তিনি সামাজিক নাটক লিখিবার সময়ে অযথা মধ্যযুগীয় ধর্মভাবনা লইয়া আসেন নাই। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে পুরাতন জীবনযাত্রাপ্রণালী ভাঙিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তিনি

দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সামাজিক নাটকের রূপরীতি ইংরেজি নাটকের আদর্শ হইতে চ্যুত হয় নাই। ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি স্বাদেশিকতা ও সম্ভবমত ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বেশীর ভাগ নাটকই পুরাণাশ্রিত এবং মহাপুরুষ প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া রচিত। এই সব নাটকে গিরিশচন্দ্র ইংরেজি রীতি এবং যাত্রারীতির একটি মিশ্রণ ঘটাইতে চেষ্টা করেন। তাঁহার নাটকগুলিতে ঘটনাগত চাঞ্চল্য এবং প্রগল্‌ভতা সর্বদা অনুভব করা যায়। ঘটনা যেমন প্রত্যক্ষ, দ্বন্দ্বসংঘাত তেমনি তীব্র। ইহা ইংরেজি নাটকের প্রভাবজাত। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য নাটকের মাধ্যমে ভক্তিরস প্রচার, মধ্যযুগীয় ধর্মভাবনাকে জাগাইয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যে প্রচুর গান, তরল ও উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা প্রভৃতির জন্য নানারূপ সুযোগ করিয়া দিয়াছেন নাট্যকার। যাত্রাপালার আঙ্গিক হইতেও অনেক-কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুইটি রীতি ও রস—ইংরেজি নাটকসুলভ কর্মবহুলতা ও দ্বন্দ্বসংঘাত এবং যাত্রাসুলভ তরল উচ্ছ্বাস ও ধর্মোপলব্ধি—এতই পৃথক যে উহাদের সমন্বিত করা একরূপ দুরূহ। তবে গিরিশচন্দ্র উহাদের সমন্বিত করিয়া বাংলা নাটকের একটি নিজস্ব আকৃতি প্রকৃতি গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, ইহা কম কথা নয়।

প্রশ্ন ৮। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তিন প্রধান শাখার (অর্থাৎ গল্পোপন্যাস, কাব্যকবিতা এবং নাটক) মধ্যে নাটকের শাখাটির তুলনামূলক দুর্বলতার কারণ কি?

উত্তর: আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তিনটি প্রধান শাখা:—কথাসাহিত্য বা গল্পোপন্যাস, কাব্যকবিতা এবং নাট্যসাহিত্য (অর্থাৎ সর্বজাতীয় নাটক)। ইহাদের মধ্যে নানাপ্রকার শাখা-প্রশাখাও রহিয়াছে। বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ এবং বহুল সৃষ্টির জন্য এই ধারাগুলি প্রধান বলিয়া চিহ্নিত। ইহাদের মধ্যে গল্পে এবং উপন্যাসে অতি উচ্চস্তরের সৃষ্টির এবং পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে এমন কয়েকজন লেখকের সন্ধান আছে। কবিতার ক্ষেত্রেও তাহাই। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর সন্ধান মিলিবে না। অতি প্রতিভাসম্পন্ন লেখকও যখন অন্য ধারায় সাফল্য অর্জন করিয়া নাটক লিখিতে যান, বড় জোর মাঝারি ধরনের ভালো লেখকের সম্মান তাঁহার জুটিয়াছে। মধুসূদন খুব বড় কবি কিন্তু তুলনায় অতি সাধারণ স্তরের নাট্যকার। গিরিশচন্দ্র বড় নাট্যকার। দীনবন্ধু, দ্বিজেন্দ্রলালও শ্রুতকীর্তি, কিন্তু মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের মত কবির সহিত ইঁহাদের তুলনা চলে কি? বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভার নৈকট্যও ইঁহারা দাবি করিতে পারেন কি?

বাংলা নাটকের এই অপেক্ষাকৃত অনগ্রসরতা এবং অপকর্ষের পশ্চাতে নিশ্চয়ই নানা কারণ আছে। তাহার কতকগুলি কারণ সামাজিক ঐতিহাসিক, কতকগুলি কারণ অবশ্য ব্যক্তিগত শক্তির সঙ্গে জড়িত ও তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

প্রথমেই একথা স্বীকার করিতে হয়, সাহিত্যসৃষ্টিতে সর্বোচ্চ স্তরের উৎকর্ষ-প্রাপ্তি সম্পূর্ণতঃ লেখকের ব্যক্তিগত প্রতিভার উপরে নির্ভরশীল। যদি বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব না ঘটিত বাংলা উপন্যাস সেই পরিমাণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিত কি? যদি মধুসূদনের এবং অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হইত তাঁহাদের প্রতিভার সুবর্ণস্পর্শ যদি বাংলার কাব্যকানন না পাইত, তাহা হইলে উহা অবশ্যই দ্বিতীয় স্তরে অবনমিত হইত। বাংলা নাটকের জগতে যদি গিরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বিজেন্দ্রলাল বা অপর কেহ অত্যুচ্চ নাট্যপ্রতিভা লইয়া দেখা দিতেন, অন্য সব কারণ—ঐতিহাসিক ধারা, জাতির স্বভাববৈশিষ্ট্য সব-কিছু—দলিত করিয়া উহাকে বিদ্যুৎবেগে মুক্ত করিতেন। বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য নাট্যসাহিত্যে এরূপ প্রতিভাধার আসেন নাই।

কবি হিসাবে যাঁহার প্রতিভা বড়, নাট্যকার হিসাবে তাঁহার প্রতিভা অত্যন্ত নিম্নস্তরের হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র বড় ঔপন্যাসিক কিন্তু কবি নন। মধুসূদন প্রথম শ্রেণীর কবি কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকার। কাজেই নাট্যপ্রতিভার অভাব অন্য কোনো উপায়ে পূর্ণ করার সম্ভাবনা ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, বাঙালীর জাতিগত স্বভাব এবং জীবন—দুইই খাঁটি নাট্যরচনার অনুকূল নয়। নাটক কর্মময় সংঘাতময় জীবনের রূপ। কিন্তু বাঙালীর বাস্তব জীবনে দুর্ধর্ষ কর্মের সুযোগ কোথায়? প্রচণ্ড সংঘর্ষ, বিপরীতকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা বাঙালীর বর্তমান জীবনে দুর্লভপ্রায়। উহা যেমন মলিন তেমনি মৃদু। উহার মধ্যে ভাবের উচ্ছ্বাস আছে। গীতি-লালিত্য এবং ভক্তিতারল্য আছে, নাই কঠিনকে জয় করার সাধনা। বাঙালীর জীবন যেমন সত্যকার নাটকীয় উপকরণ বহন করে না, তেমনি বাঙালীর জাতীয় চিত্ত অত্যন্ত তরল এবং গীতিপ্রবণ বলিয়া যথার্থ নাটকীয় নয়।

কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণটির জন্য আমাদের নাট্যসাহিত্য গৌরবহীন নয়। তাহা হইলে বাংলা উপন্যাসসাহিত্যও সম্ভাবনাহীন হইত। বাঙালীর জীবনে এমন উল্লাস ও বিস্তার নাই যাহা সার্থক উপন্যাসের রূপ লইতে পারে। বাঙালী মহৎ ঔপন্যাসিকেরা বাঙালীর কর্মজীবনের সংকোচনকে ভাবজীবনের বিপুল বীর্য ও যন্ত্রণার দ্বারা পূরণ করাইতে চাহিয়াছেন। আর সেদিক দিয়া আদর্শ যোগাইয়াছে ইংরেজি উপন্যাসসাহিত্য। বাংলা উপন্যাসের প্রথম উদ্যোক্তারা যদি এ বিষয়ে কিছুমাত্র দৌর্বল্য দেখাইতেন, যদি সংস্কৃত কথাসাহিত্য হইতে আদর্শ গ্রহণ করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে উহার ভবিষ্যৎও মেঘাচ্ছন্ন হইত। আধুনিক বাংলা কাব্য পুরাতন কাব্যের সহিত প্রায় সর্বাংশে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বসিল। ইংরেজি কাব্যকে আদর্শরূপে নিঃসংশয়ে গ্রহণ না করিলে নব্য বাংলা কাব্যের বহুমুখী বিস্ময়কর উন্নতি সম্ভব হইত না।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে প্রথমাবধিই উহা অনেকাংশে দিক্‌ভ্রান্ত। পথের নিশানা খুঁজিয়া পাইতে উহার সময় লাগিয়াছে। কিন্তু নূতন সমস্যার জালে জড়াইয়া পড়িয়া উহার ভবিষ্যৎ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। মধুসূদনপূর্ব যুগের নাট্যকারেরা অনেকেই সংস্কৃত নাট্যরীতির অন্ধ অনুকরণ করিয়া চলিলেন। উহার সহিত আধুনিক বাঙালীর জীবন ও মনের কোন সম্পর্কই ছিল না; দু-একজন নাট্যকার ইংরেজি আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন. কিন্তু তাঁহারা এই দুই রীতির বহিরঙ্গ পার্থক্যটিই বুঝিয়াছিলেন, অভ্যন্তরীণ গূঢ় পার্থক্যটি অনুধাবন করেন নাই। মধুসূদনও প্রথম দিকের নাটকে সংস্কৃতানুকারী একটা কৃত্রিম পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন, পরে তিনি নিঃসংশয়ে ইংরেজি নাট্যরীতি ও রসনিবেদনে অগ্রসর হন।

বাংলা দেশে এই সময়ে শখের রঙ্গমঞ্চের যুগ চলিতেছিল। এই সব মঞ্চে পারিপাট্য, সজ্জা প্রভৃতিতেও বিলাতী মঞ্চের অনুকরণ ছিল প্রবল। কিন্তু নাটক নির্বাচনে সংস্কৃতানুকারী কৃত্রিম রীতির প্রতিই তাহাদের আকর্ষণ ছিল বেশী। ১৮৭২ সালে ন্যাশন্যাল থিয়েটার বা পেশাদারী মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইলে এই দ্বন্দ্ব কতকটা দূর হইল।

মধুসূদন দীনবন্ধু প্রভৃতির চেষ্টায় ইংরেজি নাট্যাদর্শের আনুগত্য চলিতেছিল। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য মহলে এই মূল ধারাটির আরম্ভ এত বিলম্বিত এবং দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ হয় নাই। এবং আরম্ভ হইবার পরে উহা নিশ্চিতভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এইভাবে যে সব নব্য রূপরীতি আসিয়াছে, দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়াছে, তাহা বাঙালীর জাতীয়ত্বকে, বাস্তব জীবনরূপকে, সত্য চিত্তভাবকে বিকাইয়া দেয় নাই। নাট্যসাহিত্যে কিন্তু ইংরেজি রীতির প্রতিষ্ঠা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। মনোমোহন বসু এবং রাজকৃষ্ণ রায় লোকপ্রচলিত যাত্রারীতির পুনঃপ্রবর্তনের জন্য যত্ন দিতে লাগিলেন। জাতীয়তা, বাঙালীর স্বাভাবিকত্ব, জনপ্রিয়তা এবং ধর্মরক্ষার নামে তরল রূপহীন অমার্জিত রসপ্রবলতা ও উচ্ছ্বাসাতিরেক চলিতে লাগিল। গিরিশচন্দ্র যাত্রার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন না। তিনি নব্য রীতির রঙ্গমঞ্চের অধিনায়ক। যাত্রার আসরে ফিরিয়া যাইতে রাজী ছিলেন না। তাহা ছাড়া ইংরেজি রীতির বহিরঙ্গ এবং ভক্তিভাবনা তথা যাত্রাসুলভ তরল রসবিস্তারকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করিয়া তিনি জনপ্রিয়তা এবং ধর্মপ্রচারের যুগ্মতারে সুর বাঁধিলেন। গিরিশচন্দ্র পুরোপুরি পশ্চাৎমুখী হইলেন না। কিন্তু নবীনকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া সম্মুখপানে চলিলেন না। বরং ভাব-কল্পনার দিক হইতে তিনি মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অতিরিক্ত প্রবণতা দেখাইলেন। যে পথে চলিয়া আধুনিক বাংলা কবিতা এবং কথাসাহিত্য বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করিয়াছে, নাট্যসাহিত্যের ধারা দ্বিধাহীন ভাবে সেই পথে চলিতে পারিল না।

বরং সম্পূর্ণবিপরীত ধর্মীয় রূপসৌকর্যে দুর্বল একটি লোকপ্রচলিত নাট্যধারার সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলিল।

উপরিলিখিত তিনটি কারণ যুগপৎ সক্রিয় থাকিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়াছে।

নাট্যজগৎ এবং পাঠ্য সাহিত্যের জগৎ দুটি স্বতন্ত্র। নাট্যজগৎকে প্রত্যক্ষতঃ রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয়সাফল্যের উপরে নির্ভর করিতে হয়। বাঙালী জনমানসের সহজ প্রীতি ও উৎসাহ লাভ না করিলে কোনো নাট্যরচনাই দাঁড়াইতে পারে না। অথচ সমকালীন বাঙালী জনসাধারণ যাহারা রঙ্গমঞ্চগুলিকে সচল রাখিত, তাহাদের শিল্পরুচি বা শিক্ষা কোনোটাই খুব উচ্চস্তরের ছিল না। পাঠ্য সাহিত্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জনসমর্থনের কথা এতটা আসে না। সেকাল পর্যন্ত পুস্তক বিক্রয়ের উপর লেখকদের নির্ভরতা এতটা বাড়ে নাই। তুলনামূলকভাবে পাঠ্যগ্রন্থে নাটকের ন্যায় হাতে হাতে ফল চুকাইয়া লইবার প্রয়োজন হয় না। তাহা ছাড়া সবদেশে সর্বকালে পাঠক ও দর্শকদের মধ্যে রসবোধ, শিক্ষা ও রুচিগত পার্থক্য থাকেই। আমাদের দেশে শিক্ষাগত অনগ্রসরতার জন্য এই দূরত্ব আরও বেশী ছিল। তাই নাট্যসাহিত্যের উৎকর্ষের প্রশ্নে এই ব্যাপারটিও লক্ষ্য করিবার মত।

প্রশ্ন ৯। বাংলা উপন্যাসের জন্মকাহিনী বিবৃত কর। ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত (অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস রচনার কাল পর্যন্ত) উপন্যাসের ক্রমবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনুসরণ করিয়া দেখাও উপন্যাসের ভবিষ্যৎ মুখ্য ধারাগুলির বীজ এই পর্বের মধ্যে কতটা নিহিত রহিয়াছে?

উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের মধ্য দিয়াই বাংলা উপন্যাসসাহিত্য পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। উপন্যাসটি শিল্পগুণে, বিশেষ করিয়া বঙ্কিমের ন্যায় মহৎ স্রষ্টার রচনা হিসাবে, খুব উচ্চস্তরের নয়। তবে উপন্যাস হিসাবে ইহার রূপরীতি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্বেও বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসটি অনুসরণ করা যায়; অবশ্য সে সূত্রটি খুবই ক্ষীণ।

উপন্যাসসাহিত্য গল্প-সাহিত্যের একটা আধুনিক রূপ। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে উহার অনুপ্রবেশ। কিন্তু গল্প বলা ও শোনার উৎসাহ মানবসমাজের সর্বত্রই বহু পুরাতন ব্যাপার। আমাদের দেশেও উহা প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। রূপকথা-উপকথা সংকলনে উহার আদি নিদর্শনকে কতক পরিমাণে ধরিয়া রাখা হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও গল্পরসই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি আখ্যানধর্মী রচনায়। উপন্যাসের কিছু বীজ

উহার মধ্যে থাকা অসম্ভব নয়। কাহিনীকথন ও চরিত্রচিত্রণ অবশ্যই উপন্যাসের উপাদান এবং লক্ষ্য। কিন্তু উহা কাহিনী কাব্য মহাকাব্যেও থাকে, নাটকেরও প্রধান বিষয় উহাই। তাহা হইলে কোন্ বিশিষ্টতা দেখিয়া উপন্যাস বলিয়া কোনো রচনাকে চেনা যায়? (১) উপন্যাসের ভাষা হইবে গদ্য; আখ্যানকাব্য হইতে ইহার পার্থক্য অনেক। ইহা আবেগপ্রধান বর্ণনার মধ্য দিয়া কাহিনী ও চরিত্রগুলির হৃদয় উপস্থিত করিবে না। বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া উহা উদ্‌ঘাটন করিবে। (২) উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম যোগ থাকিবে। উহাদের একটি উপাদানকে বাদ দিয়া অন্যটির ক্রমবিকাশ ঘটিবে না। এখানেই সাধারণ গল্প হইতে উপন্যাসের পার্থক্য এবং মাহাত্ম্য। (৩) উপন্যাসের মধ্যে বাস্তবতা থাকিবে। এমন কি, রোম্যান্টিক ঔপন্যাসিককেও অলৌকিকত্ব বাদ দিতে হইবে, ঘটনার ক্রমবিকাশ এবং চরিত্রের অগ্রগতিকে যৌক্তিক কার্যকারণের সূত্রে বাঁধিতে হইবে, অন্ততঃ বাস্তবতার বিভ্রম সৃষ্টি করিতেই হইবে। এই সব দিক দিয়া বিচার করিয়া পুরাতন সাহিত্যে উপন্যাসের লক্ষণ খুঁজিতে হইবে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়া গদ্য সাহিত্যিক-রূপ পাইতে আরম্ভ করে। সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইলে গদ্যভাষা কতকটা জনসাধারণের বোধগম্য হইয়া উঠে। ১৮২২-২৩ সালে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "নববাবুবিলাস" এবং "নববিবিবিলাস" নামে দুইটি ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নকশা লিখিলেন। ইহাদের মধ্যে অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় হইলেও বাংলা উপন্যাসের আদিরূপের সন্ধান মিলে। রচনা দুইটিতে চরিত্রচিত্রণ বা গল্পগ্রন্থন দুইই খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। কারণ লেখক নকশাই লিখিতে চাহিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে আমূল পরিবর্তন সূচিত করিলেন। বিদ্যাসাগর গদ্যভাষাকে প্রয়োজনবহনের স্তর হইতে সমুন্নত করিয়া শিল্পসৌন্দর্য দান করিলেন। বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য যে শোভা ও সম্ভাবনা লইয়া দেখা দিল তাহাতে বলা যায় উপন্যাস রচনার সুযোগ আর দূরবর্তী রহিল না। এই গদ্য শুধুমাত্র প্রয়োজন নির্বাহ করে না। ইহার মধ্যে মানব-ভাবাবেগ প্রকাশের শক্তি রহিয়াছে, বিচিত্র রসকে প্রকাশ করিবার মত ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছে এই ভাষা। বিদ্যাসাগর উপন্যাস রচনা করেন নাই। কাহিনী নির্মাণ করিবার কোনরূপ চেষ্টাই তিনি করেন নাই। কিন্তু তাঁহার 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা' এবং 'ভ্রান্তিবিলাস' দেখিয়া বোঝা যায় উপন্যাস রচনার বহিরঙ্গ কৌশল উহাদের মধ্যে অনুসৃত হইয়াছে। নাটক হইতে মূল কাহিনী সংগ্রহ করিলেও উপস্থাপনের ভঙ্গিটি উপন্যাসেরই মত। পরবর্তী বাংলা ঔপন্যাসিকেরা এই আঙ্গিকের আদর্শটির দিকে যে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাহাতে সংশয় প্রকাশ করা চলে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে তিনখানি এমন পুস্তক রচিত হয়, যাহাতে উপন্যাসের লক্ষণ অনেক পরিমাণে বর্তমান। ইহাদের বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলিলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কিছু ভুল করা হয় না: (১) ১৮৫২ সালে হ্যানা ক্যাথারীন ম্যালেন্স নাম্নী জনৈকা খ্রীষ্টান মহিলা "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি উদ্দেশ্যমূলক। লেখিকা এক পাদ্রীর পত্নী ছিলেন। বইটিও আদ্যন্ত ধর্মীয় উদ্দেশ্যমূলক। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণই যে ধর্মনৈতিক জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, একটি পারিবারিক জীবনের চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়া তাহাই উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কিন্তু রচনাটি উদ্দেশ্যমূলক প্রচারপুস্তিকা অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের। কারণ ইহার মধ্যে পরিবারজীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অনেকখানি বাস্তবধর্মী। দেশীয় অন্তঃপুরের এইরূপ মনোরম ও অভিজ্ঞতাপুষ্ট ছবি সেকালের বাংলা সাহিত্যে বড় দেখা যায় না। বিশেষ করিয়া গ্রন্থটির সরল সাধুভাষা সে যুগের পক্ষে বেশ কিছুটা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। (২) ১৮৫৮ সালে "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হয়। ইহার লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র সেকালে বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালী সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। গ্রন্থটি নানা কারণে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ খুবই প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের বাঙালীসমাজ, বিশেষতঃ কলিকাতা সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার বর্ণনা ইহার মূল উদ্দেশ্য। বৈদ্যবাটীর বাবুরামবাবু নামক এক ধনাঢ্য জমিদারের আদরের সন্তান মতিলাল কুসঙ্গে মিশিয়া কিরূপ অধঃপতনে যাইতেছিল এবং পরে দারুণ দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়া আবার সৎপথে ফিরিয়া আসে, এই নৈতিক তত্ত্বকথাটি ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। নীতি-কথার জন্য ইহার মূল্য নহে। বরং নীতির প্রতীকচরিত্রগুলি (বরদাবাবু, রামলাল, বেণীবাবু) সৎচরিত্র হইলেও জীবন্ত হইতে পারে নাই। বাবুরামবাবু, মতিলাল ও তাহার কুসঙ্গীরা—ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম—এই সমস্ত অপদার্থ চরিত্র আশ্চর্য জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ ঠকচাচা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে একটি উজ্জ্বল চরিত্র। ঔপন্যাসিক লক্ষণ, বিশেষ করিয়া চরিত্রচিত্রণের দিক হইতে গ্রন্থটি যে অনেক উন্নত তাহাতে সন্দেহ নাই। (৩) ১৮৫৭ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রকাশিত হয়। ইংরেজি "Romance of History" নামক গ্রন্থের অনুকরণে ভূদেব দুইটি কাহিনী ইহার মধ্যে লিখিয়াছিলেন। উহার প্রথম কাহিনী ('সফল স্বপ্ন') সংক্ষিপ্ত গল্পমাত্র। কিন্তু দ্বিতীয় কাহিনীর পটভূমি-পরিবেশ ও চরিত্রগত কিছুটা বিকাশ আছে। শিবাজী এবং ঔরঙ্গজীবের কন্যার এক কাল্পনিক প্রণয়কাহিনী ইহার উপজীব্য। ইতিহাসের সহিত কল্পনার সংযোগে পরবর্তী ঐতিহাসিক রোম্যান্সের সূত্রপাত করা হইয়াছে এখানে।

কিন্তু সাধারণ পাঠকশ্রেণীর মধ্যে উপরি উক্ত গ্রন্থ তিনটির প্রথমটি খুব প্রচার লাভ করে নাই। অপর দুইটি গল্প শিক্ষিত পাঠকেরা আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিত। বিদ্যাসাগর রচিত ক্লাসিক কাহিনীগুলির প্রতিও তাঁহাদের আগ্রহ ছিল। তাহা ছাড়া খুব আগ্রহভরে জনসাধারণ আরব্যরজনী প্রভৃতির গল্পগুলি পাঠ করিত। ইহাই তাহাদের উপন্যাসপাঠের তৃষ্ণা মিটাইত। এমন সময়ে ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রকাশিত হইল। এতদিন ধরিয়া উপন্যাস রচনায় সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে বিভিন্ন লেখক যে সব চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার পূর্ণ সিদ্ধি ঘটিল বঙ্কিমচন্দ্রের এই সৃষ্টিতে। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস এক নবীন এবং আকর্ষণীয় শিল্পরূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই গ্রন্থপ্রকাশের গুরুত্বটি শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্বে 'বিজয়বসন্ত', 'কামিনীকুমার' প্রভৃতি কপিপয় সেকেলে কাদম্বরী ধরনের উপন্যাস, গার্হস্থ্য পুস্তকসভার প্রকাশিত 'হংসরূপী রাজপুত্র' 'চকমকির বাক্স' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প, এবং 'আরব্য উপন্যাস' প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথাগ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। 'আলালের ঘরের দুলাল' তাহার মধ্যে একটু নূতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।"

বাংলা উপন্যাসের জন্মপর্বের যে-বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের প্রধান প্রধান ধারার বীজ এই পর্বেই উপ্ত রহিয়াছে। আমাদের উপন্যাস প্রধানতঃ দুইটি ধারায় অগ্রসর হইয়াছে। একটি ধারা সামাজিক-পারিবারিক কাহিনী-কেন্দ্রিক। অপর ধারাটি কল্পনাপ্রধান, ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া, অতীত কালের কিছুটা স্পর্শ দিয়া কল্পনাজগতে পরিক্রমাই তাহার বৈশিষ্ট্য। এই দুই ধরনের উপন্যাসের রূপরীতি এবং আস্বাদন তথা জীবনবিশ্লেষণে বেশ পার্থক্য আছে। জন্মপর্বে এই দুই ধারারই সূত্রপাত ঘটিল। বাংলা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ কোন্ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবে তাহা মোটামুটি স্থিরীকৃত হইল।

প্রশ্ন ১০। বাংলা উপন্যাসের চারজন মুখ্য শিল্পীকে (বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র) অবলম্বন করিয়া অতি-আধুনিক

কালের পূর্ব পর্যন্ত ইহার রূপরীতির (বাচনভঙ্গী, কাহিনী-বিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণ-পদ্ধতি) ক্রমবিকাশের পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের সময় হইতেই বাংলা উপন্যাস অতি উচ্চ উৎকর্ষ লাভ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের সাধনার মধ্য দিয়া বাংলা উপন্যাস ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পরে রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভার স্পর্শে উহা বিশিষ্টরূপ ও জীবনবোধের প্রকাশ হইয়া দাঁড়াইল। আঙ্গিকের দিক হইতেও রবীন্দ্রনাথ অনেক-কিছু অভিনবত্ব বিধান করিলেন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যে তিনি সেতুবন্ধ রচনা করিলেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে শরৎচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি বিচিত্র নবীনতা আবদ্ধ করিল। চতুর্থ দশকের শেষ দিক হইতে বাংলা উপন্যাসে একেবারে নূতন হাওয়া বহিতে শুরু করিল। এই সময় হইতেই বাংলা কথাসাহিত্যে অতি-আধুনিকতার সূত্রপাত। এই কালের সীমায়ও কয়েকজন বড় ঔপন্যাসিক দেখা দিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত কালপর্বই বাংলা উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। এই অধ্যায়ের উপন্যাসে যেমন বিষয়-উপকরণ তথা জীবনাদর্শ প্রকাশের নানা বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, সেইরূপ রচনারীতি ও গঠন-ভঙ্গির ক্ষেত্রেও নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছে। একটি ক্রমবিকাশের ধারা ইহার মধ্য হইতে লক্ষ্য করা যাইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে :—(১) ইতিহাস-আশ্রিত রোম্যান্স (অবশ্য 'রাজসিংহ'কে রোম্যান্স না বলিয়া কল্পনা-উজ্জ্বল খাটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলাই সংগত) এবং (২ সামাজিক উপন্যাস। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আঙ্গিকঘটিত নানারূপ পার্থক্য থাকিলেও মূলে কতকগুলি স্থানে ঐক্য রহিয়াছে। এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলা উপন্যাসের গোড়ার রূপরীতিটি বাঁধিয়া দিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইহা অনুসৃত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণদেহ এবং সংহত কাহিনীগ্রন্থনার পক্ষপাতী ছিলেন। এই কাহিনীগুলিতে ঘটনা এবং চরিত্রের মধ্যে ঘনীভূত এবং গুরুতর সম্পর্ক থাকিত। ঘটনাস্রোত চরিত্রনিরপেক্ষভাবে আগাইতে পারে না, আবার চরিত্রবিকাশও ঘটনার তরঙ্গে তরঙ্গেই ঘটিয়া থাকে। ঘটনা ও চরিত্র দুইয়ে মিলিয়া সম্পর্ক অচ্ছেদ্য—ইহাই কাহিনীগ্রন্থনকে সাধারণ স্তরের গল্প হইতে অনেক উচ্চ শিল্পবৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র গল্পগঠনের সময়ে একটি সমস্যাকে কাহিনীকেন্দ্রে স্থাপন করিতেন। উপন্যাসের যাবতীয় ঘটনা এবং চরিত্রভাবনা সেই সমস্যাকেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তিত হইত। ঔপন্যাসিক সমস্যাটির আরম্ভে উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটিত; বিপরীতমুখী ঘটনা, চরিত্রভাবনা এবং জীবনাদর্শের সংঘাতে সমস্যাটি তীব্র হইয়া উঠিত; অবশেষে সমাধানে বা সর্বনাশে

উপন্যাসকাহিনীর উপরে যবনিকাপাত ঘটিত। 'বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ সংহত কেন্দ্রানুগ কাহিনীগঠন করিয়া উহার সহিত উপকাহিনী যুক্ত করিতেন। উপকাহিনীর সংস্পর্শে আসিবার ফলে মূল কাহিনীটি কিছুটা জটিল হইয়া উঠিত। উপকাহিনীগুলিকে তিনি কখনও ঘটনার সূত্রে মূলের অঙ্গীভূত করিলেন, কখনও দুইয়ে মিলিয়া যুগপৎ পরিবেশটি সত্য ও তীব্র করে। তুলনা, কখনও আবার ভাবগত কোনো তাৎপর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দুইটি বৈশিষ্ট্য ইহার ঘটনাপ্রাচুর্য এবং ঘটনার প্রবল তরঙ্গসংক্ষোভ। জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ নিস্তরঙ্গতায় বঙ্কিমচন্দ্র সন্তুষ্ট থাকিতেন না। তিনি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আনিয়া যেমন ঘটনার অভাব পূর্ণ করিয়াছেন, তেমনি সামাজিক উপন্যাসেও বেশ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী ব্যবহার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাচনভঙ্গির মধ্যে উপন্যাসোচিত বিশ্লেষণ খুব বেশী নাই। প্রায়ই সূক্ষ্ম এবং তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতে, ক্ষুদ্র ঘটনার ব্যঞ্জনায় তিনি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন নিপুণভাবে। চরিত্রের জটিলতা এবং গভীরতা অতিরিক্ত বিশ্লেষণ ছাড়াই সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ঘটনার বিবরণ এবং সংলাপকে নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন প্রায়ই। এই নাট্যভঙ্গি যতটা বহিরঙ্গ চমকের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আন্দোলিত করিয়াছে ব্যক্তিত্বের নিগূঢ়তম প্রদেশকে। আবার কাব্যসৌন্দর্য বর্ণনায়, আবেগগত পটভূমি রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। নাট্যরীতির সহিত গীতিকাব্যোচিত সৌন্দর্য যুক্ত হইয়া আস্বাদের ক্ষেত্রে যে অভিনবত্ব আনা হইয়াছিল তাহার প্রায় তুলনা নাই।

রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত। বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় তাঁহার শক্তির পরিমাণও অনেক কম। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতায়' বঙ্কিমানুকরণ অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাস "মাধবীকঙ্কণ" হইতেই রমেশচন্দ্র একটি নিজস্ব পথ বাছিয়া লইয়াছেন। উহার রীতিগত এই নবীনতা বঙ্কিম হইতে তাঁহার আপনার প্রতিভার পার্থক্য বুঝিবার ফল। বঙ্কিমের পথে চলিলে শুধু অনুকরণই হইবে। তাঁহার প্রতিভা ও ক্ষমতা কোনো দিক দিয়াই বঙ্কিমের সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে না। তিনি নিজের প্রাণের তাগিদ অনুযায়ী একটি আঙ্গিক নির্মাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রমেশচন্দ্র একটি সমস্যার কেন্দ্রে কাহিনীকে আবর্তিত না করাইয়া একটি দীর্ঘ-বিতানিত ভ্রমণশীল সরলরেখার মত উহাকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নানা ঘটনার মালা—কখনও উত্থান, কখনও পতন—একটা ব্যক্তির ব্যক্তিগত সমস্যার বন্ধন, একটা জাতির জীবনসাধনার একটা বৃহৎ পর্যায় তিনি ধরিবার চেষ্টা করিলেন। 'মাধবীকঙ্কণে' ভ্রমণরীতি উপন্যাস-আঙ্গিকের সহিত মিলিতে চাহিয়াছে। 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যায়' দুইটি জাতির ঐতিহাসিক উত্থান-পতন-

লীলা রূপায়িত হইয়াছে। উহার অভ্যন্তরে বর্তুলায়িত ব্যক্তিগত সমস্যাকেন্দ্রিক কাহিনী নির্মাণের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত এতখানি গৌণ হইয়া থাকিয়াছে যেন চোখেই পড়ে না। সামাজিক উপন্যাস লিখিতে গিয়াও প্রয়াস করিয়া সুনির্দিষ্ট সমস্যাকেন্দ্রিক কাহিনী গড়িয়া তোলার চেষ্টা রমেশচন্দ্রের নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে কাহিনী তীব্র ও ঘটনাবন্ধুর, সামাজিক উপন্যাসে তাহা পারিবারিক সামঞ্জস্যের সূত্রে বাঁধা।

রমেশচন্দ্র যে নূতন পথ দেখাইলেন তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের মত শক্তিমান হইলে পরবর্তী লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া এ আঙ্গিকের অনুশীলন তীব্রতর করিয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমী রীতির অনুসরণই দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাধনা মূলতঃ দুইটি স্তরে বিভক্ত। তিনি প্রথম দিকে মোটামুটিভাবে প্রচলিত রীতিতে ইতিহাসাশ্রিত রোম্যান্স এবং সমাজসমস্যামূলক উপন্যাস লিখিলেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নব্যরীতির প্রবর্তন করিলেন। তাঁহার ইতিহাসাশ্রিত রোম্যান্স দুইটি মোটেই বঙ্কিমী ধরনের নয়। বঙ্কিম ইতিহাসের সহযোগে প্রবৃত্তিকে প্রবল তরঙ্গ-চাঞ্চল্য দিতে চাহিতেন, বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া পরিবেশকে বিস্ময়কর নব্য আস্বাদে আস্বাদ্য করিয়া তুলিতেন। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্স দুটি বর্ণবিরল, প্রবৃত্তি সংক্ষুব্ধ নয়। দুটি রচনাই আদর্শঘেঁষা। নাটকীয় তীব্রতা ইহাদের মধ্যে নাই, চরিত্র বিশ্লেষণের ভূমিকা বঙ্কিম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যাপকতর হইয়াছে। সামাজিক উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কাহিনীগ্রন্থনের বঙ্কিমী পদ্ধতি মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন। তবে কাহিনীগত তীব্রতা অনেক পরিমাণে কমাইয়া আনিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক উপন্যাসই চরিত্রগত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিশ্লেষণকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়া আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সূচনা করিল। রবীন্দ্র-উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের আঙ্গিক-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নূতন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাংলা উপন্যাসে পূর্বে বা পরে ইহার বড় অনুকৃতি ঘটে নাই। এই পরিবর্তনটি ঘটিল 'গোরা'র পরে। তিনি উপন্যাসের এমন একটি শিল্পরীতি আবিষ্কার করিলেন যাহার মধ্যে কল্পনার অবকাশ প্রচুর, ঘটনার বন্ধন শিথিল; বর্ণনার ও ভাবোচ্ছ্বাসের অতিরেকে, তত্ত্বের প্রাধান্যে প্রচলিত উপন্যাস হইতে ইহার স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য সূচিত হইয়াছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পার্থক্যের সূত্রটিকে স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন: "ইহাদের অসম্পূর্ণতা, ইহাদের খণ্ডিত সংকীর্ণতা, ইহাদের শিথিলগ্রথিত আকস্মিকতা ও রিক্ততার মধ্যে অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য, ইহাদের জীবনের গ্রন্থিবহুল জটিলতার মধ্যে দুই একটি রঙিন ও সূক্ষ্ম সূত্রকে পৃথক করণের চেষ্টা খুব তীব্রভাবেই আমাদের চোখে পড়ে। ইহাদের মধ্যে জীবনের যে অংশটুকু আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমরা উপলব্ধি করি ধারাবাহিকতার অবিচ্ছিন্ন আলোকে নহে, সংক্ষিপ্ত সাংকেতিকতার চকিত

বিদ্যুদ্দীপ্তিতে।...কবি ঔপন্যাসিকের হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছেন, বিরল-সন্নিবেশ তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যের বাঁশি সাংকেতিকতার সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, স্থূল ঘটনার যবনিকা সরাইয়া রঙ্গমঞ্চে কবি-কল্পনা অধিষ্ঠিত হইয়াছে। Meredith-এর উপন্যাসের মত রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাস একপ্রকার তীক্ষ্ণ কবি-বুদ্ধির চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য (intellectual brilliance), দ্রুত অবসরহীন সংক্ষিপ্ততার মধ্যে গভীর অর্থগৌরবের দ্যোতনা (epigram) আমাদিগকে পাতায় পাতায় চমৎকৃত ও অভিভূত করে।”

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আঙ্গিকের দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। মোটামুটি বঙ্কিমী আঙ্গিকের অনুসরণ তিনি করিয়াছেন, তবুও বঙ্কিমচন্দ্র হইতে তাঁহার কত পার্থক্য! তিনি একখানিও ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক রোম্যান্স রচনা করেন নাই। শরৎচন্দ্রের হাতেই বাংলা উপন্যাসের রোম্যান্স কল্পনা-প্রধান যুগের অবসান হইল। তিনি সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসে বাংলার গ্রাম-সমাজের বাস্তব রূপটি যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি পরিবারজীবনের সহজ নিস্তরঙ্গ এবং অনুত্তেজিত সুরটি বাজিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে ঘটনার প্রাচুর্য নাই, তরঙ্গোদ্বেলতাও নাই। ঘটনাগুলি একেবারেই সাধারণ ধরনের। ফলে নাট্যরস বিস্তারে তাঁহার উপন্যাস বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। শরৎচন্দ্র কিন্তু কাহিনীগ্রন্থনে একাগ্র সংহত আঙ্গিক সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। একটি সমস্যাকে গ্রহণ করিয়া উহার কেন্দ্রে ঘটনাবলীকে সংহত ও সংবদ্ধ করিয়া তুলিয়া সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই রীতিটি বঙ্কিমানুমোদিত। কিন্তু বঙ্কিমের কবিত্ব শরৎচন্দ্রে নাই। অপরপক্ষে শরৎচন্দ্রে বিশ্লেষণ-রীতির আধিক্য লক্ষ্য করিবার মত। এখানেই অতি-আধুনিক ধারার সহিত তাঁহার যোগ।

শরৎচন্দ্রের “শ্রীকান্তের” গঠনরীতিতে স্বতন্ত্র এবং নব্য আঙ্গিকের পরিচয় আছে। ইহা বিশেষ সমস্যার কেন্দ্রে আবর্তিত না হইয়া একটি ব্যক্তিত্বের জীবনপথ পরিক্রমার রূপটি আয়ত্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহার বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার বহুমুখী সূত্র, ভিন্ন ভিন্ন নানা কাহিনীর অংশ, নানা চরিত্রের রূপ একটা ব্যাপক জীবনোপলব্ধির মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। অতি আধুনিক রীতিতে কেন্দ্রচ্যুত উপন্যাস-আঙ্গিকের দিকেই বিশেষ প্রবণতা দৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন ১১। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন এবং পরবর্তী উপন্যাসসাহিত্যে তাঁহার প্রভাবের স্বরূপ এবং বিস্তার লইয়া আলোচনা কর।

উত্তর: বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব প্রচণ্ড বিস্ময় লইয়া আসিল। তাঁহার পূর্বে যে ধরনের গল্পরসে বাঙালী পাঠক তৃপ্ত হইত, তাহা ছিল একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। এমন কি আধুনিক দৃষ্টিতে প্রাক্-বঙ্কিম যে সমস্ত রচনার

মধ্যে উপন্যাসের বীজ লক্ষ্য করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্বলতম প্রথম রচনা 'দুর্গেশনন্দিনী'র সহিতও তাহা তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না। (বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনায় বাংলা উপন্যাস একটা সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।) বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব না ঘটিলে আলাল-অঙ্গুরীয়বিনিময়ের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া বাংলা উপন্যাস হয়ত একটা ধারা সৃষ্টি করিত, কিন্তু তাহার ক্ষীণতা ও সামান্যতা করুণার বিষয় হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর লেখকের সাধনায় বাংলা উপন্যাস ইউরোপীয় উপন্যাসরীতিকে যেমন আত্মস্থ করিয়া প্রকাশ করিল, তেমনি মানবজীবন ও ভাগ্যের নিগূঢ়তম প্রদেশে অবতরণ করিয়া তাহার ব্যক্তিচরিত্র মূর্ত করিয়া তুলিল। বাংলা উপন্যাস কোন্ পথে কোন্ আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হইবে তাহার হদিশ ছিল না। উহার আঙ্গিক কিরূপ হইবে, জীবনচিত্রণ কিরূপ হইবে, চরিত্রকল্পনা কোন্ লক্ষ্যে চলিবে তাহার স্থির ছিল না। (বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ঠিক রূপটি ধরিয়া দিলেন।) ইউরোপীয় সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া ইংরেজি উপন্যাসের আদর্শ অনুসরণ করিতে চাহিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। স্কট বঙ্কিমের প্রিয় লেখক ছিলেন; তাঁহার আদর্শের কতকটা অনুসরণও তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্কট নন। শিল্পী হিসাবে তিনি অনেক বড়। বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবকে তিনি দেশীয় ভাবপ্রেরণা ও স্বভাবধর্মের সঙ্গে মিলাইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। (তিনি অতীতকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি রচনা করেন নাই।) বাঙালীর বর্তমান জীবনের নিস্তরঙ্গ পটভূমিতে ইতিহাসের সংস্পর্শে তরঙ্গমুখর কর্মমুখর প্রবলতা আনিতে চাহিয়াছিলেন তিনি। ইতিহাসের পটভূমিতে তিনি মানবহৃদয় ও ভাগ্যের যে সব সমস্যা ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন তাহা সমকালীন বাংলাদেশের এবং চিরকালীন মানুষের। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ইতিহাসরসেই মগ্ন হইয়া ছিলেন না, তিনি সামাজিক উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সামাজিক উপন্যাস-গুলি অতি উৎকৃষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি, কতকগুলি ব্যতিক্রম মাত্র নয়। বাঙালীর জীবনের বাস্তব রূপ, ঘরোয়া পরিবেশ, সমাজজীবনের তথ্যভূয়িষ্ঠ চিত্র বঙ্কিমের উপন্যাসে পাওয়া যাইবে না; কিন্তু ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া তাহার চিত্তের যে জাগরণ ঘটিল, তাহার মধ্যের সুপ্ত মনুষ্যত্ব যেভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল, নীতি সমাজ সব-কিছুকে ছাপাইয়া হৃদয়াবেগ যেমন তরঙ্গিত হইয়া চতুর্দিক উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল, তাহার ভাবসত্যটি বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে ধরিয়া দিতে চাহিয়াছেন। উহারই জন্য তিনি ইতিহাসের পটভূমিটি গ্রহণ করিয়া ঘটনাবহুল তরঙ্গমুখর এবং বহুবর্ণমণ্ডিত রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, কখনও সমকালীন সমাজজীবনের কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। (তাঁহার ইতিহাসাশ্রিত এবং সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে রূপ-রসগত পার্থক্য অবশ্যই আছে। কিন্তু বঙ্কিমের জীবন-ভাবনা এবং শিল্প-চেতনা উপন্যাসের এই দুই ধারার মধ্যেই সমভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।) বঙ্কিমের ইতিহাসচর্চা যে

বর্তমানকে অস্বীকার করা নয়, ইহা মনে রাখিতে হইবে। মানবাত্মার ভাবাবেগ-প্রবর্ণতার উপযুক্ত পীঠস্থান খুঁজিতেই তাঁহার অতীতপরিক্রমা, বর্তমান হইতে পলায়ন নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে তাঁহার উত্তরাধিকারীরা যে কয়েকটি জিনিস লাভ করিলেন তাহা সূত্রাকারে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। (বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসাশ্রিত রোম্যান্স এবং সামাজিক এই দুই জাতীয় উপন্যাস লিখিয়াছেন। খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস তিনি একখানা মাত্র লিখিয়াছেন।) বঙ্কিমোত্তর বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা অনেকেই এই দুই ধারায়ই আপনাদের লেখনী পরিচালিত করিয়াছেন। দামোদর মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, মশাররফ হোসেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনুজ ঔপন্যাসিকেরা অনেকেই এই দুই ধারায়ই অগ্রসর হইয়াছেন। অবশ্য তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্যায় এমন দুএকজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকও আছেন, যাঁহারা শুধুই সামাজিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তারকনাথের বঙ্কিমবিরোধী মনোভাব ইহার জন্য অনেকখানি দায়ী। যথেষ্ট পরিমাণ কল্পনাকুশলতা না থাকা সত্ত্বেও বাঙালী বিশিষ্ট ও অবিশিষ্ট, স্বল্পখ্যাত ও অখ্যাত ঔপন্যাসিকেরা সেকালে ইতিহাসের সামান্য পটভূমি মাত্র আশ্রয় করিয়া কল্পনার আরব্যরজনী গড়িয়া তুলিতেন। কাল্পনিক রোমাঞ্চকর প্রণয়মূলক উপন্যাসে এবং হারেমের গুপ্তকথায় সেকালের বাংলা সাহিত্য ভরিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক রোম্যান্স রচনার ধারাটি অত্যুচ্চ সাফল্য লাভ করার ফলেই সমকালীন এবং পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরা সোৎসাহে এই পথ ধরিয়া আগাইয়াছেন। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় লেখকও উপন্যাস লিখিতে গিয়া সর্বপ্রথম বঙ্কিমের প্রভাব এড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার প্রথম দুইটি উপন্যাস "বৌঠাকুরাণীর হাট" এবং "রাজর্ষি" ঐতিহাসিক রোম্যান্সের ঢঙে লেখা।

অবশ্য দু' একজন ঔপন্যাসিক তাঁহাদের ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠ অনুশীলনের ফলে রোম্যান্সের অতিকল্পনার হাত হইতে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে উদ্ধার করিয়া কিছু নূতন রূপ দিতে চাহিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' ইহাদের সামনেও প্রেরণা যোগাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত রোম্যান্সে প্রণয় ও বীরত্ব—এই যুগ্ম তারে সংগীত বাজিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া ব্যক্তিচরিত্রের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত। ইহার সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের সুর যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহা প্রায়ই পরোক্ষ। ব্যক্তিচরিত্রের ট্র্যাজিক হাহাকারই তাঁহার সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা বড় গুণ। পরবর্তী সব ঔপন্যাসিক ইতিহাসাশ্রিত রোম্যান্স অথবা খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রণয় ও দেশপ্রেমের সুরই বাজাইয়াছেন, ব্যক্তিচরিত্রের সুতীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্য, ট্র্যাজেডির গভীরতা তাঁহাদের রচনায় বড় প্রকাশ পায় নাই। বঙ্কিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেও বঙ্কিমের ভাবকল্পনার গভীরতা আয়ত্ত করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত ছিল।

সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমের প্রকৃত প্রভাবের পরিমাণ কম। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে পরিবারজীবনের কিংবা সমাজজীবনের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র বড় মিলে না। সমকালীন সমাজজীবনে সমাজসংস্কার বা শিক্ষাগত যে সব আন্দোলন উঠিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে স্থূলভাবে উপন্যাসের বিষয়ভুক্ত করেন নাই। উহাদের সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া মূল মানবপ্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, স্বর্ণকুমারী প্রভৃতির সমাজমূলক উপন্যাসে পরিবারজীবনের বাস্তব ছবি ধরা পড়িয়াছে। সমকালীন সমাজসমস্যা উপন্যাসকাহিনীর মধ্যে বিতর্ক বা মানবিক আবেগের তীব্র আলোড়ন জাগাইয়া তুলিয়াছে। অনেকের উপন্যাসে আবার সামাজিক নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নটি বিশেষভাবে আলোচিত। বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসেও যেরূপ উত্তেজনাকর ঘটনা, একটা উঁচুসুরে বাঁধা কাহিনীগ্রন্থন লক্ষণীয়, অধিকাংশ লেখক উহা পাশ কাটাইয়া গিয়া প্রাত্যহিক সংসারচিত্র আঁকিতে চাহিয়াছেন। তবে দামোদর মুখোপাধ্যায় এবং আপাতদৃষ্টিতে বঙ্কিমবিরোধী তারকনাথের সামাজিক উপন্যাসে এই রীতিরই প্রত্যক্ষ অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের যে প্রভাবটি সমকালে প্রবল এবং বহুপরবর্তী কাল পর্যন্ত প্রসারিত, তাহা হইল অবৈধ প্রণয় এবং নীতিবোধ সংক্রান্ত সমস্যা। বঙ্কিমচন্দ্র মানব-মনের গহন গভীরে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়বৃত্তির বিচিত্রমুখী গতি অনুধাবন করিয়াছেন। উহাকে যে শুধুমাত্র বাহির হইতে সমাজনীতির মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না, সহানুভূতি দিয়া উহার শক্তি ও সৌন্দর্য এবং উহার মধ্যে মানুষের মুক্তির সম্ভাবনাকে অনুভব করিতে হয়— বঙ্কিমচন্দ্রই তাহা প্রথম দেখাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য সমাজের শক্তিকে তিনি অবহেলা করিতে পারেন নাই এবং নীতিবোধের যে কোনো সামাজিক উপকারিতা নাই, ইহা তিনি মানিতেন না। সংযমের মর্যাদা তিনি সর্বদাই স্বীকার করিতেন। নীতি ও প্রেম এই দুইয়ের সংঘর্ষে বিক্ষত মানবচিত্তের কাতর ক্রন্দন বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পীর হৃদয় দিয়া দেখিয়াছেন। এই কারণে অনেকের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, অনেকের ব্যাখ্যায় তিনি নীতির বন্ধনে মনুষ্যহৃদয়কে অকারণ শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছেন।

বঙ্কিমপরবর্তী বহু ঔপন্যাসিকই এই সমস্যাকে কেন্দ্রে রাখিয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কেহ নীতিবোধকে আশ্রয় করিয়া মানবহৃদয়ের অবৈধ প্রণয়াকৃতিকে চরম আঘাত হানিয়াছেন, কেহ আবার সহানুভূতির সহিত করুণাধারা বর্ষণ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের ন্যায় লেখক বিধবাবিবাহ বা অসবর্ণবিবাহের বাহিরে পদার্পণ করেন নাই। দামোদর মুখোপাধ্যায়েরা রক্ষণশীলতাকেই বড় করিয়া তুলিয়াছেন। অনেকে অবশ্য পরিবারচিত্র, একান্নবর্তী পরিবারে ঐক্যের সমস্যা লইয়াই বাহিরমহলে ঘোরাফিরা করিয়াছেন, অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে সাহস পান নাই।

বঙ্কিমী উপন্যাসের এই দিকটির প্রভাব বহুপরবর্তী কাল পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ইহাই প্রধান সমস্যারূপে বারংবার চিত্রিত। শরৎ-উত্তর অতি-আধুনিকদের কেহ কেহ ইহাকেই উপন্যাসকেন্দ্রে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি বঙ্কিম হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু এই সমস্যাটিকে মানবচিত্তলোকের প্রধান সমস্যা বলিয়া অনুভব করা প্রথম বঙ্কিমেরই কীর্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের অপর দিকটি হইল রূপরীতিঘটিত। উপন্যাসে কাহিনী-গ্রন্থনের যে আদর্শটি তিনি ধরিয়া দিয়াছিলেন, সমকালীন সব ঔপন্যাসিকই প্রায় তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের কতকগুলি উপন্যাসে মাত্র ইহার ব্যতিক্রম আছে। বঙ্কিমের পদ্ধতিটি হইল সমস্যার কেন্দ্রে ঘটনা ও চরিত্রকে আবর্তিত করিয়া একটি বৃত্তাকার—আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত পূর্ণাঙ্গ কাহিনী গড়িয়া তোলা। দ্বিতীয়তঃ, ঘটনার বহুলতা ও প্রবলতা। তৃতীয়তঃ, উপস্থাপনরীতির নাটকীয়তা। বাচনভঙ্গির গীতিকাব্যোচিত লালিত্য ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নাটকীয়তার আশ্চর্য সমন্বয়। চতুর্থতঃ, চরিত্রচিত্রণে বিশ্লেষণের স্বল্পতা। ইহার মধ্যে অনুকারী লেখকবৃন্দ নাটকীয়তাকে প্রায়ই অতিনাটকীয়তায় পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন, কাব্যসৌরভকে সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি তাহারা অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প গঠনের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের উপন্যাসের উপর সক্রিয়। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', 'শেষ প্রশ্ন' ব্যতীত অন্যত্র কাহিনীগ্রন্থনে বঙ্কিমী ভঙ্গিই জয়যুক্ত।

প্রশ্ন ১২। "বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদনের প্রকৃত উত্তরসূরী কেহ নাই। কয়েকজন ছিলেন ব্যর্থ অনুকারক। মহাকাব্যের স্বল্পায়ু ধারাটির শবদেহই তাঁহারা বহন করিয়াছেন। প্রাণবন্ত নূতন গীতি-কবিতা স্বতন্ত্র উৎস হইতে নবীন পরিণতির দিকে চলিয়া গিয়াছে।" —এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচার কর।

উত্তরঃ বাংলা কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া মধুসূদনের প্রতিভার সমকক্ষতা করিবার শক্তি কাহারো ছিল না। কবি স্বল্পকালের মধ্যে বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুটি কাব্য যে উৎকর্ষের শীর্ষস্তর স্পর্শ করিয়াছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের তিনি নব ভগীরথ। নূতন মুক্তির মোহনায় তিনি তাহাকে বহন করিয়া আনিয়াছেন পুরাতন বদ্ধ জলাশয় হইতে। তিনি যেমন নিজে শিল্পগুণের দিক হইতে অত্যন্ত উচ্চমার্গের কবি, সেইরূপ আবার বাংলা কাব্যের সামনে বিচিত্র সব নব সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। কিন্তু তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুসরণ বাংলা সাহিত্যে কতটা হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখার মত।

মধুসূদন প্রধানতঃ মহাকাব্যের কবি বলিয়া খ্যাত। শুধুমাত্র বাহিরের লোক-খ্যাতির কথাই নয়, তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মেঘনাদবধকাব্য'। 'তিলোত্তমাসম্ভব' মহাকাব্য নয়। প্রস্তুতিকালীন নানা দুর্বলতা ইহার মধ্যে আছে। তবুও এই কাব্যেই তিনি নূতন ধরনের আখ্যানকাব্য রচনা করিলেন। মহাকাব্যের ভূমিকা রচিত হইল এই 'তিলোত্তমাসম্ভবে'ই। কিন্তু ১৮৬০-৬১ সালে যখন বাংলা দেশের নবযুগের প্রথম কবি মহাকাব্য রচনা করিতে লাগিলেন, তখন কিন্তু পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলির সাহিত্য-চর্চায় মহাকাব্যের স্থান বিচলিত হইয়াছে। গীতিকবিতার ধারা বহুপূর্বেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। তবুও মধুসূদনের মহাকাব্য রচনার প্রেরণা কৃত্রিম ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালী নব্যশিক্ষিত তরুণের দল যে উল্লাস অনুভব করিয়াছে, পুরাতন যুগের বন্ধনমুক্তির যে-শক্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহার মধ্যে মহাকাব্যিক উপলব্ধির আদৌ কোনো সম্ভাবনা ছিল না এমন মনে করা যায় না। কিন্তু জাতীয় জীবনে যুগগত বৈশিষ্ট্যের ফলে যে ভাববন্যা দেখা দেয়, তাহা অন্তরের মধ্যে কাব্যপ্রেরণার আকারে ঘনীভূত করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন অত্যুচ্চ কাব্যকল্পনার। মধুসূদন ব্যক্তিগত জীবনে যে ভাবোল্লাস অনুভব করিতেন, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙালী সব অভাব-অভিযোগ-পরাজয় সত্ত্বেও মুক্তির যে দুর্বার গতি ও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিল—এই দুইটি বিষয় মধুসূদনের কবিচিত্তে মহাকাব্যিক অনুপ্রেরণার রূপ পরিগ্রহ করিল কি উপায়ে? সে রহস্য লুকাইয়া রহিয়াছে মধুসূদনেরই কবিসত্তায়। প্রথম জীবনে মধুসূদন ইংরেজিতে কবিতা লিখিতেন, তাহা প্রধানতঃ লিরিক এবং সনেট। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবিরা ছিলেন তাঁহার আদর্শ। কিন্তু বিশপস্ কলেজে তাঁহার প্রাচীন ভাষাশিক্ষার যে আয়োজন শুরু হইয়াছিল, মাদ্রাজে তাহা পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করিল। মধুসূদনের অন্তরে উহা ক্লাসিকের প্রতি এক আশ্চর্য আকর্ষণ রূপে দেখা দিল। প্রাচীন ভাষা-শিক্ষা ও উহার সাহিত্যসম্পদের সঙ্গে পরিচয় মধুসূদনের উচ্ছ্বসিত গীতিপ্রবণ কবিচিত্তের অন্তরালের সান্দ্র গহন মহাকাব্যিক কাব্যকল্পনার উৎসটি উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। বাংলা দেশের সমাজজীবনে যে সম্ভাবনা ছিল, মধুসূদনের ব্যক্তিসত্তা তথা কবিচিত্ত উহা হইতে নির্যাস গ্রহণ করিয়া মহাকাব্যোচিত এক ভাবকেন্দ্র গড়িয়া তুলিল। উহা যেমন দেশকালের দান, তেমনি ব্যক্তিরহস্যের আকাঙ্ক্ষিতাও বটে! মধুসূদন 'তিলোত্তমা'য় ক্ষণিক হাত পাকাইয়া "মেঘনাদবধকাব্য" লিখিয়া ফেলিলেন। একাব্যে একটু বেশী পরিমাণ লিরিকপ্রবণতা আছে কিনা, রোম্যাণ্টিসিজম্ মাঝে মাঝে ক্ল্যাসিসিজমের সহিত মিশিয়াছে কিনা—এসব সমস্যা অবান্তর। হোমর হইতে মিল্টন পর্যন্ত ইউরোপখণ্ডে যাহারা মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও রূপরীতি ও আস্বাদগত নানারূপ বৈচিত্র্য আছে। "লিটারারি এপিক"গুলি কবির ব্যক্তিত্ব

অনুযায়ী কতকটা স্বতন্ত্র রসেরও আকর হইয়া ওঠে। (মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্য' যে খাঁটি মহাকাব্য, রসরূপের দিক হইতে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।)

মধুসূদনের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরীর মধ্যে দুইজন প্রধান। অপর যাহারা আছেন তাঁহারা কেহই উল্লেখযোগ্য নন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবারীতির আখ্যানকাব্য লিখিয়াছেন, সেখানে তাঁহার আদর্শ মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব', রঙ্গলালের কাব্য-গ্রন্থাবলী নয়। তিনি একখানি বিপুলাকৃতি মহাকাব্য লিখিলেন। উহাতে মেঘনাদ-বধে'র প্রত্যক্ষ প্রভাবই শুধু নাই, মধুসূদন-প্রবর্তিত নবাপন্থায় মহাকাব্য রচনার মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের মুক্তি এই বিশ্বাসও জড়িত আছে। হেমচন্দ্রের 'খণ্ড কবিতাবলী'তে ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব স্পষ্ট। দু-একটি ক্ষুদ্রাকৃতি লিরিক রচনার যে চেষ্টা আছে উহাতে মধুসূদনের ব্যক্তিগত কবিতা দুইটির ('আশার ছলনে' এবং 'রেখো মা দাসেরে মনে') প্রভাব আছে। নবীনচন্দ্র সেন মধুসূদন-হেমচন্দ্রের অনুসরণে মহাকাব্য লিখিলেন, আখ্যানকাব্য লিখিলেন। খণ্ড কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব আছে, তবে প্রণয়কবিতাগুলি নিজের উদ্ভাবিত বায়রনের কবিতার আদর্শে।

হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনা করিয়া মধুসূদনের কাব্যধারাকে অগ্রসর করিতে চাহিলেন। কিন্তু উভয়ের মহাকাব্য রচনার সে-চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। এই ব্যর্থতার কারণ নানাবিধ:—প্রথমতঃ, মধুসূদন নবজাগৃতির যে উল্লাস প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, নানা ভাবাদর্শের দ্বন্দ্বে তাহাতে ভাঁটার টান ধরিয়াছিল। অন্ততঃপক্ষে অতি-উচ্ছ্বসিত প্রগলভতা যে স্তিমিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। উৎসবরজনীর বাঁশী প্রত্যহের সংসারজীবনে শুনা যায় না। হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র চারিপাশের সমাজজীবনে সেই উৎসাহ উত্তেজনা মুক্তির উদ্বেগ প্রবলরূপে দেখিতে পান নাই। দ্বিতীয়তঃ, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্য' রচনার পর 'বৃত্রসংহার' রচনার পূর্বে ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। উহার মধ্যে মহাকাব্যিক পটভূমির বিস্তার, বাস্তবতা, চরিত্রবিশ্লেষণ, নাটকীয়তার সহিত মিশ্রিত হইয়া আশ্চর্য আস্বাদ লইয়া আসিয়াছে। বাংলা সাহিত্য-সংসারে মহাকাব্য রচনার অবকাশটুকু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নামধেয় এই গদ্যকাব্যগুলি আর অবশিষ্ট রাখিল না। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য রচনার পূর্বে বাংলা উপন্যাস এতদূর সমৃদ্ধ হইল যে, মহাকাব্য আখ্যানকাব্যের স্থানচ্যুতি অনিবার্য হইয়া পড়িল। বহুদেশেই গদ্য-উপন্যাসের আবির্ভাবে কাব্য কাহিনীকথনের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছে। কাহিনীর গতি এবং চরিত্রের বিশ্লেষণে গদ্যভাষার অধিকার অনেক বেশী, একথা আধুনিকেরা বিশ্বাস করেন। তৃতীয়তঃ, মহাকাব্য রচনার জন্য যে জাতীয় জীবনদৃষ্টি এবং কল্পনাভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র তাহা হইতে সম্পূর্ণই বঞ্চিত ছিলেন। নবীনচন্দ্রের প্রতিভা লিরিকঘেঁষা। তাহা ছাড়া একটু ভালো শিল্পীর মধ্যে অভিপ্রেত সংযমের লেশমাত্রও তাঁহার ছিল না।

হেমচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভা গদ্যাত্মক, ব্যঙ্গধর্মী। আসলে sublime-কে স্পর্শ করিতে পারে এমন কিছু তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। ফলে তাঁহারা মহাকাব্য বলিয়া যাহা লিখিলেন তাহা মহাকাব্য তো হইলই না, কাব্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্যতাও পাইল না। এইভাবে মধুসূদন প্রবর্তিত মুখ্য কাব্যধারাটি ইতিহাসের দিক দিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু এরূপ মন্তব্যও ঠিক নয়। যে সব দেশে literary epic রচিত হইয়াছে সেখানেও উহার সংখ্যাল্পতা লক্ষ্য করিবার মত। ইংরেজি সাহিত্যেও নাম-করা মহাকাব্য ঐ একখানাই—মিল্টনের Paradise Lost। কৃত্রিম অনুকরণের যাহা ফল হয়, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। আরও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেখক হইলে উহারা এই কঠিন এবং অনিবার্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতেনই না।

কিন্তু প্রকৃত মহাকাব্য আর রচিত হইল না বলিয়া মধুসূদনের কাব্যধারা ব্যর্থ হইয়া গেল, একথা বলা অনৈতিহাসিকতার সামিল। মহাকাব্য একজন দুইজনই লেখেন। উহা বড় বেশী অনুসৃত হয় না।

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনাকাব্যে'র প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী থাকিবার কথা নয়। ইহা একজন কবির উদ্ভাবিত নিজস্ব একটি একক অভিনব ভঙ্গি। কিন্তু ইহার মধ্যে নাট্যকাব্যের বিশেষ করিয়া dramatic monologue-এর যে রূপরীতিটি রহিয়াছে ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্যে তাহার প্রভাব বড় কম নয়। তাহা ছাড়া মধুসূদনই যে প্রকৃতপক্ষে খাঁটি আত্মভাবমূলক লিরিক এবং সনেটের পথিকৃৎ, ইহাও স্মরণ করিতে হইবে। বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট লেখেন তিনি। বিদেশী আঙ্গিকটি পুরোপুরি আত্মস্থ করিয়া তিনি যে পথ দেখাইলেন, অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যে নানা রূপে ও রসে তাহার অনুসরণ চলিয়াছে। বাংলা গীতিকবিতার যুগ ইহাই। রূপরীতির দিক হইতে সনেট খুব সংহত; এই সংহতি উহার আস্বাদেও বর্তাইয়াছে। কিন্তু সনেটেও কবির চিত্তলোকের অভিব্যক্তি, অন্তরের গূঢ়তম বেদনা ও বিস্ময়ের প্রকাশ। এই কারণে সনেটও লিরিকেরই একটি শাখা। মধুসূদন বাংলা সনেটের প্রথম লেখক। এই দাবিতেই বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসেও তাঁহার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য তিনি নিজে দুইটি পূর্ণদেহ গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন। "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়", "রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে" দেহভঙ্গি এবং ভাবাবেগ উভয় দিক হইতেই খাঁটি লিরিক। কাজেই বাংলা কাব্যের পূর্ণদেহ আধুনিক গীতিকবিতারও তিনিই প্রথম পুরোহিত।

অবশ্য একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বিহারীলাল চক্রবর্তীই তাঁহার কাব্যে রোম্যান্টিক লিরিক ধারাটিকে একাগ্র সাধনায় উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি কোনোরূপ আখ্যানকাব্য বা স্বদেশপ্রেমবিষয়ক খণ্ডকবিতা লেখেন নাই। তিনি শুধুই গীতিকবিতা লিখিয়াছেন, আপন হৃদয়ের গোপন কথাটি উহার মধ্যে উচ্চারণ

করিয়াছেন। উহার পর হইতে বাংলা গীতিকবিতায় এই রোম্যান্টিক সুরের চর্চাই দেখা যাইতে লাগিল।

বিহারীলালের ধারায় কবিতা লিখিয়া সাফল্যলাভ করিলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, কামিনী রায় প্রভৃতি। এবং এই পথ ধরিয়াই আমরা অত্যল্পকাল মধ্যে রবীন্দ্রনাথে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাংলা গীতিকবিতা সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিল।

প্রশ্ন ১৩। ঈশ্বরগুপ্ত ও রঙ্গলালকে অনেকে বলিয়াছেন যুগসন্ধির কবি, অনেকে আবার বলিয়াছেন নূতন যুগের কবি। এ বিষয়ে তোমার অভিমত যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে নূতন যুগের সূত্রপাত। ঈশ্বরগুপ্তের খণ্ড কবিতা এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখ্যানকাব্য এই শতাব্দীর চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ দশকের মধ্যে রচিত। কালপরিচয়ে ইঁহাদের কাব্যসাধনা নূতন যুগেই পড়ে। তাহা ছাড়া ভারতচন্দ্রকে পুরাতন যুগের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি হিসাবে অভিহিত করিয়া কবিওয়ালা, পাঁচালীকার, টপ্পাকার নিধুবাবুকে দুই যুগের সন্ধিকালের কবি বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সহিত তুলনায় ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলাল যে অনেক প্রগতিশীল কবি সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আবার যাঁহারা ঈশ্বগুপ্ত-রঙ্গলালের সঙ্গে মধুসূদনের কাব্যভাবনা এবং রূপায়ণ পদ্ধতির তুলনা করেন, তাঁহারা মধুসূদনের হাতেই বাংলা কাব্যে নবযুগের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে নিশ্চিতভাবে, এ সত্য অনুমোদন করেন। ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলাল তাঁহাদের দৃষ্টিতে পুরাতন ও নবীন এই দুই যুগের মধ্যে সংযোগসেতুর ন্যায়। এই দুই বিপরীত মতের তুলনামূলক বিচার করিয়া কাহার দাবি অধিক তাহা নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

ঈশ্বরগুপ্ত এবং রঙ্গলাল—এই দুইজন বাঙলা কবিতার যে পুরাতন ধারার সহিত সম্বন্ধচ্যুতি ঘটাইলেন তাহার প্রমাণ আছে। পুরাতন বাংলা কাব্যের প্রধান প্রধান লক্ষণ হইতে ঈশ্বরগুপ্ত এবং রঙ্গলালের কবিতা অনেকখানি করিয়া সরিয়া আসিয়াছে। নব্যযুগের কাব্যলক্ষণও কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। কিন্তু সমগ্রত: নূতন যুগের ভাবরূপ ইঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সাংবাদিক হিসাবে বাংলা দেশে নব ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া এবং সাংবাদিকতার মাধ্যমে নবযুগের অবধারণা এক বস্তু এবং শিল্পবোধের মধ্যে উহাকে সম্পূর্ণতঃ আত্মস্থ করা অন্য বস্তু: (১) ঈশ্বরগুপ্ত পুরাতন পদসংগীতের (যাহা গেয়) স্থানে পাঠ্য খণ্ড কবিতার সূত্রপাত

করিলেন। (২) তিনি সম্পূর্ণভাবে ঐহিক বিষয় হইয়া কবিতা লিখিলেন। ধর্ম-মূলক বিষয় কখনো কখনো থাকিলেও তাহা অন্য সব বিষয়ের ন্যায় একটা বিষয়মাত্র। যেমন তিনি "পাঁঠা" বা "পৌষপার্বণ" লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন সেইরূপ তিনি "নিগুর্ণ ঈশ্বর" লইয়াও কবিতা লিখিলেন। ইহার সহিত ধর্মীয় ভাবব্যাকুলতার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। চতুর্দিকের প্রত্যক্ষ বস্তু, বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন, দেশীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনবিবরণ, নীতি-উপদেশ তাঁহার খণ্ড কবিতার প্রধান বিষয়। বিষয়নির্বাচনে তিনি পুরাতনকে পশ্চাতে ফেলিয়া নবীনের পথ ধরিয়াছেন। (৩) পুরাতন কবিতায় সমাজচেতনা স্থান পায় নাই। সাংবাদিক ঈশ্বরগুপ্ত সমকালীন সমাজ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতা বহন করিতেন। তাঁহার কবিতায়ও সেই চেতনার পরিচয় আছে। (৪) ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাই প্রথম দেশাত্মবোধের কথা উচ্চারণ করিয়াছে। নব্য বাংলা সাহিত্যের একটি মূল সুর দেশাত্মবোধে। এ বিষয়ে পরবর্তী লেখকদের ভাবনা ও রূপরচনারীতিতে নানারূপ পরিবর্তন ঘটিলেও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব কিছু পরিমাণে রহিয়াছে—একথা মানিতেই হইবে। (৪) তাঁহার নারীপ্রেমমূলক কবিতাগুলি যেমন কৃত্রিম ও গতানুগতিক, তেমনি ভারতচন্দ্র কবিওয়ালাদের ভাব-কল্পনার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। (৫) তাঁহার রূপরচনারীতি কবিওয়ালা-সুলভ শব্দালংকারের অতিব্যবহারে কর্ণ পীড়িত হয়। তাঁহার হাস্যরসও বেশ স্থূল। এই সব বিষয়ে পুরাতনের সহিতই তাঁহার সম্বন্ধ।

তিনি নব্য বাংলা কাব্যের বাণীরূপ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। নব্য মানবতার যে বাণী এই যুগের প্রধান কথা তাহাও তিনি বুদ্ধি দিয়া বহিরঙ্গে মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কবির শিল্পীসত্তায় তাহার বিদ্রোহী-নবীনতা বিকশিত হইয়া উঠে নাই। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অগ্রগতিতে ঈশ্বরগুপ্তের ভূমিকা সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলিয়াছিলেন তাহার মূল্য অনুধাবনযোগ্য: "বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান অনন্যসাধারণ, নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুরাতন প্রবাহকে অব্যাহত রাখিয়াই তিনি নূতনের জন্য খাত খনন করিয়া তাহাতে নব নব ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।....কাব্যসাহিত্যে পুরাতন ধারার তিনি শেষ কবি এবং নূতন ধারার তিনি উদ্বোধক। নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষে যেখানে পথবিপর্যয় ঘটিয়াছে, ঠিক সেইখানেই তিনি আপনাকে মাইলষ্টোনের মত মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত রাখিয়া বিরাজ করিতেছেন; হয়ত কালের প্রবাহে ধূলিজালে সে দিনের সুস্পষ্ট পরিচয়চিহ্নটি ঢাকা পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে পরবর্তী যুগের বাঙালীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইলেও সবটাই তাহাদের অপরাধ নহে। মহাকালের ঊর্ধ্বে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতকে অবজ্ঞা করিয়া যে-প্রতিভা আপনাকে সমুন্নত রাখিতে পারে, ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক সেই জাতীয় প্রতিভাবান ছিলেন না।"

রঙ্গলালের নব্য আখ্যানকাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে—মধুসূদনের "তিলোত্তমাসম্ভব" প্রকাশিত হইবার এক বৎসর আগে। মধুসূদনের কাব্য সাহিত্যে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নবযুগসৃষ্টির মহোৎসব পড়িয়া গেল। অবশ্য রঙ্গলালের পরবর্তী কাব্যগুলির উপরেও মধুসূদনের নব্য সাহিত্যের রূপ ও রসের ছায়া পড়ে নাই। তাঁহার শিল্পীগণের সুর প্রাক্-মধুসূদন ধারায়ই বাঁধা ছিল।

রঙ্গলালের হাতে ধর্মভাবনিরপেক্ষ আখ্যানকাব্য প্রথম দেখা দিল। মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানকাব্যের সহিত ইহার পার্থক্যটি সুস্পষ্ট। তিনি টড প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক, আধা-ঐতিহাসিক কাহিনী সংকলন করিয়া তাহাকে কাব্যরূপ দান করিয়াছেন। বিষয়বস্তু চয়নে এই দৃষ্টিভঙ্গি নবযুগের লক্ষণ। ঈশ্বরগুপ্তের হাতে বাংলা কাব্য জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত হইলেও রঙ্গলালের কবিতায় সেই সুরটি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। স্বাদেশিকতার সুরটিকে তিনি আখ্যানকাব্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়া প্রকাশ করিলেন। এই দিক দিয়া পরবর্তী কবিদের উপরে তাঁহার কিছু প্রভাবও আছে। তাহা ছাড়া ঈশ্বরগুপ্তের ন্যায় কবিওয়ালাদের সহিত তাহার রচনার বিশেষ কোনোরূপ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না।

রঙ্গলাল বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের অনুসরণে বাংলা কাব্য নবজীবন লাভ করিবে। ইংরেজি কাব্যরীতি অনুসরণের চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা বহিরঙ্গ অতিক্রম করিয়া অন্তরসত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইংরেজি ভাব ও রীতি বাংলাদেশের ভাবভাষা ও জীবনের সহিত মিলাইয়া কাব্য রচনা করা অনেক উচ্চস্তরের প্রতিভার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল। তাহা ছাড়া রঙ্গলালের ভাষা ও বর্ণনারীতি পুরাতন ধারার দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত।

জনৈক বিশিষ্ট সমালোচকের মত এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য : "রঙ্গলালের এ কাব্য (অর্থাৎ পদ্মিনী) যুগসন্ধির চিহ্নবাহী, নবযুগের উল্লাস এতে পরিপূর্ণভাবে অনুভূত হয় নাই। নবযুগের প্রধানতম লক্ষণ যে মানবতাবাদ তার সুর পদ্মিনীকাব্যে বড় মেলে না। এবং যে স্বাজাত্যবোধের জন্য এ কাব্যের এত প্রশংসা তাও কাব্যটির মূল প্রত্যয় রূপে থাকেনি। প্রাসঙ্গিক ভাবে মাত্র স্থান পেয়েছে। ঈশ্বরগুপ্তের তুলনায় তা তীব্রতর হলেও পরবর্তী উল্লাসপর্বের স্পষ্টতা বা গভীরতার স্পর্শ তাতে লাগেনি। তিনি আখ্যানকাব্য রচনার কাঠামোটি মাত্র ধরতে চেয়েছেন। চরিত্রচিত্রণে, কাহিনী-গঠনে, বর্ণনায় সেকালীন গতানুগতিকতাকে তিনি অনুকরণ করেছেন একরূপ নির্বিচার ভাবে। ইংরেজি কাব্যের বহিরঙ্গ চেতনা মাত্র তিনি লাভ করেছিলেন, গভীরভাবে তাকে আত্মস্থ করতে পারেন নি। অথচ এই আত্মীকরণের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বাংলা কাব্যের নবজীবনের মন্ত্র।"

প্রশ্ন ১৪। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ঔপন্যাসিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই কালপর্বের বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রধান লক্ষণগুলি নির্ণয় কর।

উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার একটা জোয়ার দেখা দিল। তাঁহাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের ন্যায় শক্তিশালী ঔপন্যাসিক যেমন ছিলেন, তেমনি অনেক সাধারণ স্তরের লেখকও ছিলেন। অনেকে মূলতঃ বঙ্কিমী রীতির অনুসরণ করিতে চাহিতেন, অনেকে আবার স্বতন্ত্র পথ ধরিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে বাংলা উপন্যাসের যে দুইটি ধারা বঙ্কিমের হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদের প্রতি আনুগত্য বাঙালী ঔপন্যাসিককুল দেখাইতে লাগিলেন। ইতিহাসমিশ্রিত রোমান্স এবং সামাজিক উপন্যাসই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের বৈচিত্র্যের সীমা হইয়া দাড়াইয়াছিল।

বঙ্কিম-অনুজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় রমেশচন্দ্র দত্তের। রমেশচন্দ্র চারখানি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস এবং দুইখানি সামাজিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমের ন্যায় কল্পনাপ্রবণ চিত্তের অধিকারী তিনি ছিলেন না। পণ্ডিত গবেষক এবং নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র অনেক বেশী বাস্তবনিষ্ঠ ছিলেন। তাহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পপ্রতিভার মধ্যে মানবচরিত্র ও মানবভাগ্যের গভীরতম রহস্যপ্রদেশে অনুপ্রবেশের যে ক্ষমতা ছিল, রমেশচন্দ্র এবং এ-পর্বের অপর সকল ঔপন্যাসিকই অত্যন্ত সংগত কারণে তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। রমেশচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স দুইটিতে বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। তাঁহার 'বঙ্গবিজেতা' কাঁচা হাতের রচনা, উহাতে বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র সরাসরি অনুসরণ করা হইয়াছে। 'মাধবীকঙ্কণে' মোগল অন্তঃপুরের চিত্রাঙ্কনে, জেলেখার চরিত্রের প্রণয়-প্রবৃত্তির উদ্দামতা প্রদর্শনে বঙ্কিমী রোমান্সের ধারাই অনুসৃত হইয়াছে। এই উপন্যাসের ট্র্যাজেডি-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ট্র্যাজিক কল্পনার গভীরতা ও মর্মস্পর্শী হাহাকার কতকটা প্রতিফলিত হইয়াছে। রমেশচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস দুইখানি নানাদিক দিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' পূর্ণাঙ্গ হইয়া দেখা দেয় আরও বহুকাল পরে। রমেশচন্দ্রের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি এবং ইতিহাস বিষয়ে সুবিস্তৃত জ্ঞান তাঁহাকে এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। উপন্যাস দুইটিতে কল্পনাকে ইতিহাসের একান্ত অনুগামী করিয়া ফেলা হইয়াছে। উভয় উপন্যাসের ঘটনাবলীই ইতিহাসে সুপরিচিত। মুখ্য পাত্রপাত্রীরা ইতিহাসখ্যাত মানুষ। শিবাজী কিংবা প্রতাপসিংহের ন্যায় ইতিহাসবিখ্যাত দেশনায়কদের নায়কপদে বরণ করিতে রমেশচন্দ্র দ্বিধাবোধ

করেন নাই। তিনি ইঁহাদের ব্যক্তিত্বকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। ইতিহাসে ইঁহাদের যে পরিচয় আছে তাহাকেই প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন মনে হয়। ইতিহাসগ্রন্থে তথ্যবিন্যাসে যাহাদের চরিত্রের কাঠামো প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদেরই যেন রক্তমাংসের মানুষরূপে উপস্থিত করিয়াছেন রমেশচন্দ্র। সর্বোপরি দুইটি জাতির জীবনের সন্ধিকালের প্রবল আলোড়ন এবং সামগ্রিক তাৎপর্য উপন্যাস দুইটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া রাজপুত ও মারাঠা জাতির জাতীয় চরিত্রের পার্থক্যটি উপন্যাস দুইটির মধ্যে অনায়াসে রূপলাভ করিয়াছে। রমেশচন্দ্র দুইখানি সামাজিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সামাজিক উপন্যাস দুইটি জাতিগতভাবে বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাস হইতে পৃথক ধরনের। বঙ্কিমের উপন্যাসে পরিবারজীবনের বাস্তব দৈনন্দিন ছবি নাই। সেখানেও কল্পনায় বর্ণাঢ্যতা এবং ঘটনাবিন্যাসে নাটকীয়তা অত্যন্ত প্রকট। তাহা ছাড়া চরিত্রভাবনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গভীরতা ও তীব্র বেদনাও সেখানে প্রকাশিত। রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের মানুষেরা অত্যন্ত সাধারণ স্বভাবের পাত্রপাত্রী। ইহাতে মানবমনের একান্ত সহজ আবেগানুভূতিগুলি প্রকাশ পাইয়াছে। সমালোচকদের ভাষায় ইহাকে বলা যায় "Skindeep"। রমেশচন্দ্র 'সংসার' ও 'সমাজ' উপন্যাসে বাংলাদেশের গ্রামজীবনের বস্তুনিষ্ঠ ছবি আঁকিয়াছেন, সহরজীবনের চিত্রও ইহার মধ্যে কিছুটা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। 'সংসার' উপন্যাসে রমেশচন্দ্র বিধবা বিবাহের সমর্থন করিয়াছেন, 'সমাজ' উপন্যাসে তিনি অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে অভিমত দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে সামাজিক সমস্যাও ব্যক্তিগত জীবনসমস্যা, তথা চরিত্র-সংকটরূপে দেখা দিয়াছিল। রমেশচন্দ্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভাব থাকায় সামাজিক সমস্যা এবং কিছুটা সংস্কারবাসনা সহজেই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ "বঙ্গাধিপপরাজয়" নামে দুই খণ্ডে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। উহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে—বঙ্কিমের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরে। কল্পনামুখ্য রোম্যান্সরচনার যুগে তিনি কল্পনাব্যতিরেকে তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু এই চেষ্টার মূল্য আছে।

বঙ্কিমের পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠিয়াছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার 'স্বর্ণলতা" উপন্যাসটির খ্যাতি এখনও একেবারে ম্লান হয় নাই। তবে "ললিত সৌদামিনী", "হরিষে বিষাদ" প্রভৃতি উপন্যাসগুলি রচনা হিসাবে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। তারকনাথ একখানিও ঐতিহাসিক রোম্যান্স লেখেন নাই। তাঁহার 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটিও চরিত্রসৃষ্টির দিক হইতে উচ্চ শিল্পমূল্য দাবি করিতে পারে না। কিন্তু বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি বুঝিবার

দিক দিয়া তাঁহার চেষ্টার বিশিষ্ট মূল্য স্বীকার করিতে হয়। তিনি বঙ্কিমপ্রবর্তিত কল্পনাপ্রধান উপন্যাস রচনারীতির নিন্দা করিয়াছেন। সামাজিক উপন্যাসেও বাস্তবজীবনের প্রাত্যহিক চিত্রটি ধরিয়া রাখিবার দিকেই ছিল তাঁহার বিশেষ প্রবণতা। স্বর্ণলতা সম্বন্ধে সমালোচকদের যে মন্তব্য—"As a painter of real ordinary life, both in its comic and in its serious and tragic side Babu Taraknath is unrivalled among Bengali authors."—তাহা বঙ্কিমী আদর্শ হইতে একটি স্বতন্ত্র ধারার নির্দেশ করে।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "কণ্ঠমালা" "মাধবীলতা" প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এগুলি রোম্যান্সজাতীয় রচনা। ইতিহাসের স্পর্শ কোথাও কোথাও বর্তিয়াছে, কিন্তু উহা নাম মাত্র। প্রকৃত ইতিহাসের সহিত উহার যেমন সম্পর্ক নাই, বাস্তবতার প্রতিও লেখকের বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল না। কল্পনার লীলা সঞ্জীবচন্দ্রকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। বাস্তবকে অনুকরণ করিবার বাসনা তাঁহার ছিল না। এ বিষয়ে তিনি অনুজ বঙ্কিম অপেক্ষাও অনেক বেশী নিরঙ্কুশ।

শিবনাথ শাস্ত্রী পারিবারিক উপন্যাস লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস "মেজবৌ", "নয়নতারা", "যুগান্তর"। উপন্যাসগুলিতে বাংলাদেশের পল্লীজীবনের নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিক ছবি আছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমী আদর্শ অপেক্ষা রমেশচন্দ্রের রচনা ও জীবনবোধের অধিক প্রভাব পড়িয়াছে এরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বেনের মেয়ে", "কাঞ্চনমালা" ইতিহাসাশ্রিত সমাজচিত্র। এখানে অবলম্বিত ইতিহাসে তথ্যনিষ্ঠার সুযোগ কম। কারণ ইতিহাসের স্বল্পালোকিত স্থানকাল ও পাত্রপাত্রীই ইহাদের অবলম্বন। তবুও হরপ্রসাদ ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা ও দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া পুরাতন বাংলাদেশের জীবনযাত্রাকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। রোমান্সের বর্ণাতিরেক তাঁহার উপন্যাসেও প্রাধান্য লাভ করে নাই।

মীর মশার্‌রফ হোসেন "বিষাদসিন্ধু" নামে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কারবালা যুদ্ধের ঘটনাবলী এই উপন্যাসের বিষয়। মশার্‌রফ হোসেন বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত ছিলেন। ইতিহাসের শুষ্ক কাঠামো এবং চরিত্রগুলির সাধারণ পরিচয় তিনি কল্পনা-সহযোগে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

দামোদর মুখোপাধ্যায় "নবাবনন্দিনী", "মৃন্ময়ী", "প্রতাপসিংহ" প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস এবং "মা ও মেয়ে", যোগেশ্বরী", "শান্তি" প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমীরীতিকে স্থূলভাবে অনুসরণ করিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। উহার বহিরঙ্গের ঘটনাবাহুল্য, অতিলৌকিকের সমাবেশ, অসাধারণ চরিত্র-চিত্রণ, নৈতিক সমস্যা সবই দামোদরের উপন্যাসে আছে। কিন্তু

এইসব উপাদান বঙ্কিমের উপন্যাসে যে ভাবে 'গূঢ়তর জীবনসত্যের সহিত জড়িত হইয়াছে দামোদরে তাহার চিহ্নমাত্র মিলে না।

বঙ্কিমোত্তর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসে তৃতীয় অপর একটি শাখাও কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উহা ব্যঙ্গোপন্যাসের ধারা। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও "মুচিরাম-গুড়ের জীবনচরিত" নামে একটি ব্যঙ্গোপন্যাসের খসড়া লিখিয়াছিলেন। তবে এই ধারায় তাঁহার শিল্পপ্রাণের বিশেষ উৎসাহ ছিল এরূপ মনে হয় না। অবশ্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কল্পতরু", "ক্ষুদিরাম" প্রভৃতি ব্যঙ্গোপন্যাসে সমকালীন সহুরে আদব-কায়দাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করা হইয়াছে। যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু "মডেলভগিনী", "শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী" "কালাচাঁদ" প্রভৃতি ব্যঙ্গোপনাস লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে ছিলেন রক্ষণশীল, রচনারীতির দিক হইতে ছিলেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গধর্মী। বঙ্কিমপূর্ব "আলালের ঘরের দুলালে"র সহিত এই উপন্যাসধারার সম্পর্ক সহজে আবিষ্কার করা যায়।

প্রশ্ন ১৫। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ফলাফল আলোচনা কর। বর্তমান পেশাদারী রঙ্গালয়গুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনে কতটা সহায়ক হইতে পারে বলিয়া মনে কর?

উত্তর: ১৮৭৩ সালে যখন প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ পেশাদারী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন তাহার গুরুত্ব বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। বাগবাজারের যে যুবাসম্প্রদায় এই সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করিয়াছিলেন তাঁহারা এই রঙ্গমঞ্চের নাম দিয়াছিলেন 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার'। পূর্ববর্তী শখের থিয়েটারগুলির সহিত ইহার পার্থক্য দুটি:—(১) কোনো ধনীর সাময়িক খেয়ালের বশে এই রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা নয়। সেই খেয়ালের অবসানে এই রঙ্গমঞ্চ উঠিয়া যাইবার কথা নয়। তাহাদের ইচ্ছা ও রুচির দ্বারা ইহা পরিচালিত নয়। আমন্ত্রিত জনগোষ্ঠীও তাহাদের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার নয়। (২) যে কেহ পয়সা খরচ করিয়া টিকিট কিনিবে সেই এই রঙ্গালয়ে প্রবেশাধিকার পাইবে। দর্শকদের রুচির দ্বারা ইহা পরিচালিত হইবে। এইভাবে সর্বসাধারণের সম্মুখে রঙ্গালয়ের দ্বার খুলিয়া দিল প্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ।

শখের থিয়েটারে মঞ্চসজ্জা, অভিনয়, সংগীতাদির ব্যাপারে খরচ হইত অনেক; কিন্তু নাটক নির্বাচনের ব্যাপারে প্রায়ই তাহারা গতানুগতিককে অতিক্রম করিতে পারিল না। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় করিলেও উন্নততর নাটকগুলি বেলগাছিয়া কর্তৃপক্ষের মৌন অস্বীকৃতিই পাইয়াছিল। ফলে শখের থিয়েটারের

আনুকূল্যে বাংলা নাট্যরচনায় প্রবল স্রোত দেখা দিবার কোনোরূপ সম্ভাবনাই ছিল না। বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ খোলা হইলে জনসাধারণের নাট্যদর্শনের অধিকার স্বীকৃতি লাভ করিল। উহা একটি বিশিষ্ট অভিজাত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া ব্যাপার হইয়া রহিল না। তাহা ছাড়া নিত্য নিত্য নাটকের যোগান দিবার একটি তাগিদ রহিল; কাজেই নূতন নাটকের চাহিদা লাগিয়াই রহিল। নাট্যকারেরা উৎসাহের সঙ্গে নাটক লিখিতে লাগিলেন।

পাঠ্য সাহিত্যের সহিত নাটকের একটি বড় পার্থক্য এখানে যে, অভিনয়মাধ্যমে উপস্থাপিত হইবার সুযোগ না পাইলে নাটক লিখিবার কোনোরূপ সার্থকতা আছে বলিয়াই অধিকাংশ নাট্যকার মনে করেন না। মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না ঘটিলে যেমন উপন্যাসাদি রচনায় অনেক ভাঁটা পড়িত, সেইরূপ অভিনয়োপযোগী রঙ্গমঞ্চ না থাকিলে বাংলা নাট্যরচনার ধারা ক্ষীণভাবে অগ্রসর হইত।

ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হইবার অল্পকাল পরে অন্যান্য পেশাদারী মঞ্চও স্থাপিত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হইল। ইহার ফলে নূতন নূতন নাটকের এবং নাট্যকারের আবির্ভাব সম্ভাবিত হইল। অবশ্য পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রতিষ্ঠার ফলে যে শক্তিগুলি মুক্তি পাইল তাহার পাশে পাশে এই ব্যবস্থার সংকীর্ণতা এবং কুফলও আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলির মধ্যে ক্রমে প্রতিযোগিতার ফলে নানারূপ গ্লানিকর রেষারেষি দেখা দিতে লাগিল। বিভিন্ন মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নানারূপ দলাদলিতে লিপ্ত হইয়া পড়িল। সর্বোপরি এক একটি রঙ্গমঞ্চও অভিনেতৃগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি "প্যাটার্ন" প্রধান হইয়া উঠিল। ফলে নাট্যরচনার স্বাভাবিক বিকাশও ব্যাহত হইতে লাগিল।

দেশব্যাপী সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের গতি অত্যন্ত শিথিল হওয়ায় রঙ্গমঞ্চের দর্শককুলের প্রধান অংশ রুচি ও শিল্পবোধের এমন একটা স্তর হইতে আসিতে লাগিল, যাহাদের স্থূল আবেগকে তৃপ্ত করিতে গিয়া বাংলা নাটক উৎকর্ষের উচ্চতায় উঠিতে পারিল না। ব্যবসায়িক সাফল্যের উপরে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার জন্য বাংলা মঞ্চগুলি অতিমাত্রায় রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দিতে লাগিল। বাংলা পেশাদারী মঞ্চ প্রথম যুগের শখের থিয়েটারের হাত হইতে বাংলা নাটককে একদিন মুক্তি দিয়াছিল। তাহাই অল্পকালের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইল সর্ববিধ পরিবর্তন-বিরোধী।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কোনোকালেই স্থাপিত হয় নাই। ঐসব নাটক ঠাকুরবাড়িতে কিংবা শান্তিনিকেতনে এক ধরনের শখের থিয়েটারে অভিনীত হইত। বাংলা মঞ্চানুগ সাধারণ নাটকেরই প্রবাহ হইতে

রবীন্দ্রনাট্য প্রথমাবধিই একটি পৃথক ধারা সৃষ্টি করিয়া বহিতেছিল। মঞ্চরীতিতে যাহারা নাটক রচনা করিতেছিলেন, রবীন্দ্রপ্রভাব হইতে তাঁহারা সচেতন দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেন। কারণ ঐ অভিনব নাট্যরীতি ও রসের সহিত তাঁহাদের অনুসৃত ধারার সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার মত অবস্থা তাঁহাদের ছিল না। বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে সাফল্যমণ্ডিত হইবার কিছুমাত্র সুযোগ এই ধারার নাটকের ছিল না।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব হইতেই ইউরোপীয় সাহিত্যের আধুনিকতা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ১৯৩০-এর পরবর্তী নাট্যকারেরা বাংলা সাহিত্যের সমকালীন রীতি নীতি ও জীবনদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া পারেন নাই। ফলে বাংলা নাটকের আঙ্গিক এবং ভাবনায়ও কিছু কিছু আধুনিকতা দেখা দিতে লাগিল। রক্ষণশীল নাট্যমঞ্চে কিন্তু এই সব আধুনিকতা বিশেষ প্রশ্রয় পাইল না। কোনোরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়া ব্যবসায়িক ক্ষতির ঝুঁকি লইতে তাঁহারা রাজী ছিলেন না। বাংলাদেশের বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চগুলিতে ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটক এবং জাতীয়তাবাদমূলক ঐতিহাসিক নাটক জনপ্রিয়তা আকর্ষণ করিতে লাগিল। পৌরাণিক নাটকগুলিতে ভক্তিরসের সঙ্গে কিছু পরিমাণ জাতীয়তাবাদের মন্ত্রও প্রচারিত হইতে লাগিল পরোক্ষভাবে। সামাজিক নাটক যাহা অভিনীত হইতে লাগিল তাহা একান্ত মামুলী ধরনের। বাস্তবজীবনের সত্য, মানবচরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গভীরতা মঞ্চানুগ নাট্যধারায় প্রতিফলিত হইল না। এই সময় হইতে শখের থিয়েটারের এক নবসংস্করণ দেখা দিল। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে স্থায়ী মঞ্চে অভিনয় পরিচালনা না করিয়া তাঁহারা জীবনবাস্তবতাকে এবং আধুনিক সমাজজীবনের গভীর ও তীক্ষ্ণ সমস্যাকে নাটকে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

স্বাধীনতালাভের পরে বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে কিছু নূতন ধরনের প্রবণতা দেখা দিল। জাতীয়তাবাদী সুর প্রচারের চেষ্টা কিছু কমিয়া আসিল। পৌরাণিক নাটকের অভিনয় ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। এইবার তাহা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। পৌরাণিক নাটকরচনায় ভাঁটা দেখা দিয়াছিল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে। এবারে তাহার উপরে প্রায় যবনিকাপাত ঘটিল। ঐতিহাসিক নাটক বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে স্বাধীনতালাভের সময় পর্যন্ত বাংলা রঙ্গমঞ্চে রাজত্ব করিয়াছে। এবারে তাহাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া প্রায় রুদ্ধস্রোত হইল। বাংলা রঙ্গমঞ্চগুলিতে সামাজিক নাটকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু উহার কাহিনীও প্রায়ই অলীক ভাবনা কিংবা বিকলাঙ্গের কাহিনী অথবা জন্ম ও পরিচয়গত রহস্যের মধ্যে আবর্তিত হইতে লাগিল। কাহিনীর দুর্বলতা দূর করিবার জন্য

মঞ্চকৌশল ও আলোকসম্পাতে নানাবিধ নতুনত্বের সৃষ্টি করা হইল। অন্তরের দুর্বলতা বাহিরের কলাকৌশলে ঢাকিয়া দিবার চেষ্টা বর্তমান মঞ্চপ্রচলিত নাটকের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা।

কিন্তু পেশাদারী মঞ্চের বাহিরে বাংলা নাটক নূতন প্রাণ লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে নবনাট্য আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রভাব বাংলাদেশের নাট্যসৃষ্টিতেও বিস্তারিত হইল। আঙ্গিকের অভিনবত্ব এবং আধুনিক জীবনসমস্যা অবলম্বন করিয়া নাটক রচিত হইতে লাগিল। পুরাতন নাটকেরও নতুন রীতিতে উজ্জীবনের চেষ্টা চলিল। রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়া নব্য নাট্যকারদের সামনে নতুন আশা এবং নতুন সম্ভাবনা দেখা দিল। উৎকৃষ্ট বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও অভিনয় নবনাট্য আন্দোলনের অপর কীর্তি।

আধুনিক বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ রহিয়াছে নবনাট্য আন্দোলনে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ব্যবসায়িক বুদ্ধির মধ্যে নূতন কিছু গড়িবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

প্রশ্ন ১৬। বিহারীলাল চক্রবর্তীকে বাংলা লিরিক কবিতার আদি লেখক বলিয়া অভিহিত করা কি অর্থে কতটা সত্য বুঝাইয়া দাও। বিহারীলাল হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্র-আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা গীতিকবিতার প্রধান ধারাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর: বিহারীলাল চক্রবর্তীকে বাংলাভাষায় আধুনিক গীতিকবিতার জন্মদাতা বলিয়া অনেকেই অভিহিত করিয়া থাকেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এই অর্থেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের 'ভোরের পাখি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টি ঐতিহাসিক বিচারের অপেক্ষা রাখে।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিহিসাবে আবির্ভাবের পূর্বে আধুনিক বাংলায় গীতিকবিতা রচিত হইয়াছে। স্বয়ং মধুসূদন দত্ত মহাকাব্য আখ্যানকাব্য রচনা করিতে করিতে গীতিকবিতার ধারাটির উন্মোচন করিয়াছেন। মধুসূদনের মধ্যে ক্লাসিক্যাল ও লিরিক্যাল মন একটা আশ্চর্য সমন্বয় লাভ করিয়াছিল। ইহারই ফলে একদিকে তিনি মহাকাব্য-আখ্যানকাব্যের মধ্যে বহুল পরিমাণে অনপেক্ষিত গীতিরস ঢালিয়া দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু কিছু কবিতা লিখিয়াছেন যেখানে আপনার ব্যক্তিহৃদয় শতধারায় উৎসারিত হইয়া উঠে। মধুসূদনের "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যকে আধুনিক রীতির গীতিকবিতা বলিয়া চিহ্নিত করা যায় না। কারণ ইহার রূপরীতি ও রসাবেদন উৎকৃষ্ট না হইলেও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে বৈষ্ণব পদাবলীর সগোত্র। কিন্তু মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী আধুনিক রীতির কবিতা। 'সনেট' ইউরোপীয় সাহিত্যে স্বতন্ত্র আঙ্গিকের ও আস্বাদের জন্য বিশিষ্ট বলিয়া চিহ্নিত হইলেও গীতিকবিতার ব্যাপকতর শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গণ্য হয়।

কারণ সনেটেও কবির প্রাণ আপনাকে আবেগ-বেদনার মধ্যে প্রকাশ করে। অবশ্য সনেটের আঙ্গিকে এমন একটা কঠিন সংহতি আছে যাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস সম্পূর্ণ তরল হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় না। কিন্তু আঙ্গিকের তরল প্রবাহে এবং ভাবাবেগের উচ্ছ্বসিত কম্পনে মধুসূদনের "রেখো মা দাসেরে মনে" এবং "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়" খাটি গীতিকবিতা ইতিহাসের বিচারে মধুসূদন দত্তকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকবি বলিয়া অভিনন্দন জানাইতে হয়।

কিন্তু এ বিষয়ে বিহারীলালেরও কিছু দাবি আছে। "মধুসূদনের কবিপ্রতিভা ছিল ক্লাসিসিজম্-রোমান্টিসিজ্‌মের বিচিত্র মিশ্রণে গড়া। তাই আধুনিক রোমান্টিক গীতিকবিতার কতকগুলি লক্ষণ—যেমন কল্পনার সুদূরাভিসার, অকারণ বিরহবিষণ্ণতা, রহস্যময় অস্পষ্টতা তাঁর কবিতায় বড় লক্ষ্য করা যায় না। তদুপরি তিনি গীতিকবিতা রচনার ব্যাপারে কখনই একাগ্র হতে পারেন নি। এই দুটি দিক থেকে বিহারীলাল গীতিকবিতাকে নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজের ব্যক্তিভাবনাকে সর্বনিরপেক্ষভাবে উপস্থিত করায় তিনি যে নির্দ্বন্দ্ব মনের পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ পথটিকে তা পরিষ্কার নির্দেশ করেছে। তিনি গীতিকবিতা ছাড়া অন্যবিধ কবিতা রচনার কথা ভাবেন নি। অথচ পাশাপাশি ব্যর্থ মহাকাব্য ও বীররসাত্মক আখ্যানকাব্য লিখে হেম-নবীন খ্যাতির শীর্ষে উঠে গিয়েছেন। বিহারীলাল সেদিক ভ্রূক্ষেপমাত্র না করায় বাংলা গীতিকবিতার স্বাভাবিক বিকাশ দ্রুততর হয়েছে।"

বিহারীলাল অতিমাত্রায় subjectiveধর্মী কবি। বাহিরের বিশ্বকে আপনার অন্তরের মধ্যে তিনি সংহরণ করিয়া লন। তাঁহার অন্তরে গভীর সৌন্দর্যের একটি আদর্শ মূর্তি আছে। কবি তাঁহার নাম দিয়াছেন সারদা। বিশ্বজগতে সৌন্দর্যের যে বিচিত্র তরঙ্গলীলা নিত্য প্রবাহিত তাহা সেই পরম আদর্শের খণ্ড খণ্ড অজস্র প্রতিফলন। বিহারীলালের "সারদামঙ্গল", "সাধের আসন" প্রভৃতি কাব্যে সারদাকে পাইবার এক আশ্চর্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। বিরহের করুণ সুর তাঁহার কবিতাকে বিশিষ্ট আস্বাদে মণ্ডিত করিয়াছে।

বিহারীলালের উত্তরসূরীদের মধ্যে নামোল্লেখ করিতে হয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের। তাঁহার "মহিলা" কাব্যের উপরে বিহারীলালের "বঙ্গসুন্দরী" কাব্যের কিছু প্রভাব পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের রোমান্টিক ভাবকল্পনার প্রকাশ-ভঙ্গিটি যেমন সংহত তেমনি ঘনপিনদ্ধ। তাহা ছাড়া প্রজ্ঞার দীপ্তি তাঁহার কবিতাকে অতি 'তারল্য' হইতে রক্ষা করিয়াছে। মোহিতলাল তাঁহার প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, "সুরেন্দ্রনাথের প্রেমের আদর্শে তথা নারীপূজায় পূর্বতন কবিগণের আদিরস বা দেহসম্ভোগের নীতি পূর্ণমাত্রায় আছে। …অত্যন্ত প্রাকৃত প্রেমের

সংস্কারকেই অবলম্বন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ দার্শনিক যুক্তি দ্বারা তাহাকে শোভন ও বুদ্ধিসম্মত করিয়া তুলিয়াছেন।"

দেবেন্দ্রনাথ সেন রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিগণের অন্যতম। কিন্তু তিনি রবীন্দ্র-প্রভাব-পূর্ব যুগের কবি। তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে "অশোকগুচ্ছ", "শেফালিগুচ্ছ", "পারিজাতগুচ্ছ", "গোলাপগুচ্ছ" প্রভৃতি বিখ্যাত। তাহার উপরে বিহারীলালের প্রভাব আছে। তবে বিহারীলালের ন্যায় স্খলিতবাক্ শিথিল রূপরীতির কবি তিনি নন। সমকালীন কবিদের অচেতন রূপসিদ্ধির দিক হইতে দেবেন্দ্রনাথের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কবিতার গাঢ়বদ্ধ আবেগ এবং ইন্দ্রিয়ানুগ বা sensuous আবেদন চিত্রকল্পে চমৎকার বিধৃত হইয়াছে। সনেটের সুসংহত আধার রচনায় দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ বাস্তব-অতীত ধ্যানলোকের কবি নন। তাঁহার কল্পনায় বস্তুকে ছুঁইয়া রূপরসপানের মত্ততা অনুভব করা যায়। সনেটের আঙ্গিক সাধনায় তাঁহার সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার মত। সনেটের সংহত ও ঘনপিনদ্ধ পাত্রে গাঢ় আবেগের রস তিনি পাঠকমনে সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার কবিতার একটি প্রধান অংশ ফুল সম্পর্কে লেখা। শেষজীবনে দেবেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। এই পর্বের কবিতার শিল্পোৎকর্ষ ইহার ফলে অনেকটা কমিয়া যায়।

অক্ষয়কুমার বড়াল "প্রদীপ", "কনকাঞ্জলি", "ভুল", "শঙ্খ", "এষা" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বিহারীলালের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তবে বিহারীলালের সহিত তাঁহার কবিপ্রাণের গুরুতর পার্থক্য ছিল। বিহারীলালের মিষ্টিক রহস্যময়তা তাঁহার মধ্যে নাই। অক্ষয়কুমারের কবিতার কেন্দ্রীয় subjective ভাবনা তাঁহার প্রেম। এই প্রেমের একদিকে এই পৃথিবীর বাস্তব নারীপ্রেয়সী, অপরদিকে আদর্শ সৌন্দর্যলক্ষ্মী। বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধনে তাঁহার প্রথম দিকের কবিতা কিছুটা দ্বিধাদীর্ণ। এ বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদারের উক্তি উদ্ধারযোগ্য: "তৃপ্তির মধ্যেও তিনি অতৃপ্তির উপাসক, কিন্তু প্রাণের গভীরতর চেতনায় তৃপ্তিই তাঁহার প্রকৃতিসুলভ। তিনি শেলীর মত 'অমূরতি কামনার সমূরতি অধিষ্ঠান' কামনা করেন, কিন্তু তাঁহার কামনা আদৌ অমূরতি নহে—সারাজীবন তাহা সশরীরে তাঁহার অতি নিকটে অবস্থান করিয়াছে। তিনি তাহাকে একটি অমূরতি মহিমায় মণ্ডিত করিয়া নিজের ভাবাভিমান তৃপ্ত করিতে চাহিয়াছেন।" অবশেষে কবির মর্ত্যপ্রণয়িনীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। ফলে গৃহের গৃহিণী এবং কল্পনার সৌন্দর্যলক্ষ্মী প্রেয়সীর মধ্যে দ্বিধার অবসান ঘটিয়াছে। তাঁহার শোককাব্য "এষা"য় মৃত্যুর আলোকে জীবনযৌবন ও কল্পনাবিষয়ে সংশয়োত্তীর্ণ হইয়াছেন কবি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বমূলক দার্শনিক নিবন্ধের লেখক। তবে তাঁহার "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যটির বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান আছে।

কাহিনীর ক্ষীণসূত্র থাকিলেও আসলে ইহা একটি গীতিকবিতা-সংকলন। রোমান্টিক রহস্যের আলোছায়ায় কাব্যটি অভিনব আস্বাদ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলি বিচিত্র, তাহার চারিদিকে বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে।"

গোবিন্দচন্দ্র দাস "কুঙ্কুম", "কস্তুরী", "ফুলরেণু" প্রভৃতি কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের ভাবকল্পনায় এবং ভাষায় এক ধরনের বলিষ্ঠ ভোগবাদ ও অসংযম ছিল। তাঁহার কবিতায় নারীদেহকামনার তীব্র প্রত্যক্ষতা লক্ষ্য করিবার মত। রূপনির্মিতির দুর্বলতা তাঁহাকে বড় কবি হইয়া উঠিবার সুযোগ দেয় নাই।

হাসির গান ও কবিতা রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। গভীর রসের কাব্যসংকলন হিসাবে তাঁহার "মন্দ্র", "আলেখ্য" প্রভৃতির নাম করা চলে। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধার করিলেই তাঁহার কবিপ্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে: "কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষ্যান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্র তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্যকরুণা মাধুর্যবিস্ময় কখন কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই। ইঁহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইঁহার হাস্য বিষাদ বিদ্রূপ বিস্ময় সমস্তই পুরুষের—তাহার চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সরলতা আছে। তাহাতে হাবভাব ও সাজসজ্জার প্রতি কোনো নজর নাই। ...দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা কাব্যভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গম্ভীর ভাষায় ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে—ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদুমন্থর আবেশভারাক্রান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।"

সমকালীন মহিলাকবিদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতা অকৃত্রিম আন্তরিকতায় এবং করুণরসের স্পর্শে সমুজ্জ্বল। মানকুমারী বসু সহজ সরল ভাষায় সুললিত ছন্দে নিজের মনের কথা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। তবে কামিনী রায় মহিলা কবিগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার "আলো ও ছায়া", "নির্মাল্য", "দীপ ও ধূপ" উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। কামিনী রায়ের কবিতা প্রত্যক্ষ ও সুবোধ্য। তাঁহার কবিতায় বর্ণবাহুল্য না থাকিলেও বিবর্ণতা নাই। তাঁহার কল্পনা সুদূরের যাত্রী নয়, রহস্যলোকেরও সঙ্গী নয়। তবে সমকালীন অপরাপর মহিলাকবিদের ন্যায় তিনি পারিবারিক অনুভূতির সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আপনাকে বদ্ধ রাখেন নাই।

ইহার পরে রবীন্দ্রপ্রভাবযুগের সূচনা। বাংলা গীতিকবিতায় ইহার ফলে কালান্তর সূচিত হয়।

বাংলা ভাষার ইতিহাস

প্রশ্ন ১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা হইতে নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষায় পরিবর্তনের মুখ্য স্তরগুলি নির্দেশ কর। প্রত্যেকটি স্তরের মুখ্য লক্ষণগুলি বিবৃত কর।

উত্তর: ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খাইবার গিরিপথ দিয়া আনুমানিক ৩৫০০—৩০০০ বছর আগে আর্যরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ভারতে আসেন। সম্ভবতঃ ইরান হইতে তাঁহারা ভারতে প্রবেশ করেন এবং ক্রমে পাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁহাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কালসীমা খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ – খ্রীঃ পূঃ ৬০০। ভারতে প্রবেশকালে আর্যদের ভাষা ছিল বৈদিক বা ছান্দস্। ক্রমে ইহার পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। নানাবিধ লৌকিক বিকৃতি হইতে বৈদিক আর্যভাষাকে রক্ষা করিবার জন্য, প্রাচীন আদর্শে প্রচলিত রূপের যে সংস্কার সাধিত হয় তাহাই 'সংস্কৃত' নামে অভিহিত হইতে থাকে। তবুও বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় নানাদিক হইতে প্রভূত পার্থক্য রহিয়া গেল। সেই পার্থক্য রূপগত—ব্যাকরণগত। মূল ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে ঐক্যই বেশি। বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এক বিপুল সাহিত্য ভারতে রহিয়াছে। লোকের মুখের ব্যবহারের ভাষা অনেক পরিবর্তিত হইয়া পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্যের স্তরে প্রবেশ করিলেও বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত প্রাচীন ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার উল্লেখযোগ্য চর্চা অদ্যাবধি ভারতে প্রচলিত।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রধান লক্ষণগুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হইল:

১। **ধ্বনিগত বিশিষ্টতা:** (ক) স্বরবর্ণ—ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ সমেত সব স্বরবর্ণের ব্যবহার। স্বরবর্ণের গুণ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ প্রচলিত। (খ) ব্যঞ্জনবর্ণ—সব ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার। 'শ' 'ষ' ও 'স'—এই তিনই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য লইয়া প্রযুক্ত। দুই বা ততোধিক যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহারে অত্যধিক প্রবণতা—যেমন ক্ল, ক্ত, ক্ষ্ম, র্দ্ধ, স্থ্য, ত্র্য প্রভৃতি। (গ) সন্ধি—স্বর ও ব্যঞ্জনসন্ধির পুরামাত্রায় ব্যবহার।

২। **রূপগত বিশিষ্টতা:** (ক) শব্দরূপ—ইহার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার মত। বচন তিনটি, লিঙ্গ তিনটি, কারক সাতটি এবং সম্বোধন পদ—এদের সব রূপই বর্তমান।

(খ) ধাতুরূপ—ধাতুরূপে তিন পুরুষ, আত্মনেপদ-পরস্মৈপদ এই দুই পদ, কর্তা-কর্ম-ভাব—এই দুই বাচ্য, ক্রিয়ার পাঁচটি কাল এবং পাঁচটি ভাব। বহু অসমাপিকার প্রয়োগে এখানে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। (গ) পদগঠন—ধাতু ও শব্দ হইতে বিভিন্ন কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দগঠনের অসীম ক্ষমতা রহিয়াছে এই ভাষার। (ঘ) পদবিন্যাস—বাক্যে পদবিন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। (ঙ) সমাস—বিচিত্র ধরনের সমাসের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করিবার মত।

৩। **ছন্দ:** অক্ষরমূলক ছন্দ-পদ্ধতি।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা

আর্যরা ক্রমে ক্রমে ভারতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। অনার্যরা ক্রমে আর্যভাষা গ্রহণ করিতে থাকে। এই সব অনার্য ভাষাও নানাভাবে আর্যভাষার মধ্যে প্রবেশ করে। অনার্যদের উচ্চারণে আর্যভাষার মধ্যে অনেকরূপ বৈকৃব্য আসে। অনার্যদের বাক্‌ভঙ্গিমা আর্যভাষার লৌকিক মৌখিক রূপের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাহা ছাড়া সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণের সীমায় আবদ্ধ হইয়া প্রাচীন আর্যভাষা যখন সংস্কৃতের বদ্ধরূপ ধারণ করিল, তখন লোকসাধারণের মুখের বৈদিক ভাষা স্বাভাবিক জীবনপ্রভাবে বিভিন্নরূপ পরিবর্তনের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। এইভাবে ভারতীয় আর্যভাষা যে নবরূপ ধারণ করিল তাহাই হইল মধ্যভারতীয় আর্যভাষা।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর। প্রথম স্তরের বিস্তার খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ—খ্রীষ্টীয় ১ম শতক পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তর হইল খ্রীষ্টীয় ১ম হইতে ৬ষ্ঠ শতক এবং তৃতীয় স্তর খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ—১০ম শতক। এই তিনটি স্তরের নিদর্শন রহিয়াছে বিভিন্ন সাহিত্যগ্রন্থে। উহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অশোক ও অন্যান্য প্রত্নলিপির ভাষা, পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তরের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য থাকিলেও মোটামুটি বিষয়ে ঐক্য আছে। ইহাদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল:

১। **ধ্বনিগত:** (ক) স্বর—স্বরধ্বনির সংখ্যাহ্রাস। ঋ, ৠ, ঌ প্রভৃতি স্বরধ্বনিতে নানারূপ পরিবর্তন দেখা গেল। ঐ, ঔ ধ্বনি যথাক্রমে এ, ও ধ্বনিতে রূপান্তরিত হইল; যুগ্ম ব্যঞ্জনের আগে এ, ও ধ্বনি হ্রস্ব হইল। সংবৃত অক্ষরে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইল। (খ) ব্যঞ্জন—পদের শেষে অনুস্বার ছাড়া অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি থাকিলে তাহা লুপ্ত হইল। শ, ষ ও স-কারের স্থানে শুধু স বা শ-য়ের ব্যবহার দেখা গেল। দুই স্বরধ্বনির মধ্যের একক ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হইলে লোপ পাইল এবং মহাপ্রাণ হইলে হ-য়ে পরিণত হইল। যুক্ত ব্যঞ্জনের নানারূপ পরিবর্তন ঘটিল। উহা

পদের আদিতে থাকিলে সরল হইল। কখনও স্বরভক্তির সাহায্যে বিশ্লেষিত হইল, আবার কখনও সমীভবনের দ্বারা যুগ্মধ্বনিতে রূপান্তরিত হইল।

২। **রূপগত :** (ক) শব্দরূপ—শব্দরূপে নানাবিধ সরলতা বিধান করা হইল। ব্যঞ্জনান্ত শব্দ লোপ পাইল। ঋকারান্ত শব্দরূপের লোপ হইল, দ্বিবচনের লোপ হইল। নামরূপে সর্বনাম বিভক্তির ব্যবহার হইতে লাগিল। ই-কারান্ত উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ পদে অ-কারান্ত শব্দরূপের প্রভাব পড়িল। চতুর্থী বিভক্তির রূপ লোপ পাইল। বহুবচনে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তিতে কোনো ভেদ রহিল না। (খ) ধাতুরূপ—আত্মনেপদ এবং দ্বিবচন লুপ্ত হইল। ক্রিয়ার দুইটি ভাব—অভিপ্রায় এবং নির্বন্ধ লোপ পাইল। ক্রিয়ার কালের মধ্যে লিট্ সম্পূর্ণ লুপ্ত হইল; লঙ্ এবং লুঙ্ এই দুই কাল মিলিয়া এক হইল। অসমাপিকার বৈচিত্র্য কমিয়া গেল। (গ) পদবিন্যাস—বিভক্তিলোপের ফলে বাক্যে পদবিন্যাসরীতিতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল।

৩। **ছন্দ :** মাত্রামূলক ছন্দঃরীতির অনুসরণ।

নব্যভারতীয় আর্যভাষা

অর্বাচীন অপভ্রংশ (মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তর) স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। এই নূতন ভাষাগুলিই নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা নামে পরিচিত। বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি এই স্তরের অন্তর্গত। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উদ্ভব দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। এই ভাষাগুলি প্রতিটি স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকের নিজের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কিছু সাধারণ মূল লক্ষণ আছে। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির সেই সাধারণ লক্ষণগুলি নিম্নে বিবৃত হইল:

১। **ধ্বনিগত :** (ক) স্বর—দুইটি অসম স্বরের সন্ধিভবন ঘটিল। ঘৃত > ঘিঅ > ঘী। (খ) ব্যঞ্জন—নাসিক্যধ্বনি স্থান পরিবর্তন করিয়া পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনকে আনুনাসিক করিল: সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ। যুগ্মব্যঞ্জন একবর্ণে পরিণত হইল এবং পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হইল: পক্ব > পক্ক > পাকা।

২। **রূপগত :** (ক) শব্দরূপ—শব্দরূপের নূতন চেহারা হইল। পুরাতন কারক-বিভক্তির কয়েকটি রহিল; অধিকাংশই লোপ পাইল। লুপ্ত বিভক্তির স্থানে নূতন বিভক্তি দেখা দিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুসর্গ পদ দিয়া বিভক্তির কাজ সম্পন্ন হইতে লাগিল। (খ) ধাতুরূপ—অসমাপিকা হইতে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সৃষ্টি হইল। যৌগিক কালের ব্যবহার (যেমন 'গয়া হৈ' হিন্দী, 'জানিতেছিল'

বাংলা)। প্রাচীন কাল ও ভাবের মধ্যে অন্য সবগুলি লোপ পাইয়া শুধু রহিল বর্তমান এবং অনুজ্ঞা (কচিৎ ভবিষ্যৎ)। (গ) পদবিন্যাস—বাক্যগঠন সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী।

৪। **ছন্দ ঃ** ছন্দের পদ্ধতি অক্ষরমূলক এবং মাত্রামূলক।

প্রশ্ন ২। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা কিরূপে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া আধুনিক হইয়া উঠিল তাহার বিবরণ দাও। ইহার প্রতিটি স্তরের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ বাংলা ভাষার বিবর্তন-পরীক্ষা করিলে তিনটি ক্রমবিকশমান স্তরের অস্তিত্ব চোখে পড়িবে। (১) প্রাচীন বাংলা—ইহার কালসীমা ৯৫০-১৩৫০খ্রীঃ। (২) মধ্য বাংলা (১৩৫০-১৮০০ খ্রীঃ)—(ক) আদি-মধ্য, (খ) অন্ত্য-মধ্য। (৩) আধুনিক বাংলা (১৮০০ খ্রীঃ হইতে আধুনিক কাল)।

প্রাচীন বাংলাভাষা

প্রাচীন বাংলা ভাষার মুখ্য নিদর্শন চর্যাপদের ভাষা। ইহা বাংলা ভাষায় লেখা কবিতার আদি সংকলন। অন্যত্রও আদি বাংলা ভাষার কিছু কিছু শব্দ মিলিয়াছে তবে মুখ্যত: চর্যাপদের ভাষা অবলম্বন করিয়া ভাষাতাত্ত্বিকেরা বাংলা ভাষার আদিরূপের পরিচয় দিয়াছেন। উহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে লিখিত হইল ঃ

১। **ধ্বনিগত ঃ** (ক) স্বর—পদান্তের স্বরধ্বনি সাধারণতঃ অপরিবর্তিত রহিল ঃ ভণতি>ভণই। অনেক সময়ে যুক্ত স্বর -'ইঅ'>ই (ঈ)-কার ঃ উত্থিত>উট্‌ঠিঅ> উঠি।

(খ) ব্যঞ্জন—যুগ্ম ব্যঞ্জন সরল হইল, পূর্ববর্তী হ্রস্বধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ হইল ঃ ধর্ম>ধম্ম>ধাম। নাসিক্য ব্যঞ্জন ক্ষীণ হইয়া সানুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হইল ঃ মধ্যেন>মাঝেঁ।

(গ) শ্রুতিধ্বনি—য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল ঃ নিকটে> নিয়ড়ি।

২। **রূপগত ঃ** (ক) শব্দরূপ—গৌণকর্ম-সম্প্রদানের পদে প্রযুক্ত বিভক্তিঃ (১)—ক (<কৃত); (২)—ক+-এ (তৃতীয়া-সপ্তমীর বিভক্তি)=—কে; (৩)—এর, —অর, -র (ষষ্ঠীর বিভক্তিসমূহ) + -এ (তৃতীয়া-সপ্তমীর বিভক্তি)=—এরে, -অরে, -রে। যেমন,—মতিএ 'ঠাকুরক' পরিনিবিত্তা। 'রসানেরে' কঙ্কা।

তৃতীয়া বিভক্তি ঃ -এঁ (<-এন) ঃ যেমন,—বোধেন>বোহেঁ। -তেঁ, -তে, -এতেঁ প্রভৃতি বিভক্তি আসিয়াছে সপ্তমীর প্রভাবে।

পঞ্চমী বিভক্তি : -হুঁ (অপভ্রংশ হইতে আগত)। ইহার ব্যবহার ক্বচিৎ দেখা যায় : যেমন,—খেপহুঁ।

ষষ্ঠী বিভক্তি—-এর, -অর, -র (কর, কের শব্দ হইতে উৎপন্ন) : যেমন,—'রুখের' তেন্তলি।

সপ্তমী বিভক্তি : (১)-ই (<-এ) ; (২)-এ (<-অকে) ; (৩)-হি (<-ভিস্); (৪)-ত (<-অন্তঃ) প্রভৃতি : যেমন,—নিয়ড়ি, হিঅহি, সাঙ্কমত। অপাদানের অর্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয় : যেমন,—জামে কাম কি কামে জাম।

কর্তা ছাড়া অন্যান্য কারকের অর্থে বিবিধ পদ অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হইত : যেমন,—বিনু, ভর, লইআ, দিআঁ।

(খ) সর্বনাম পদ—উত্তম পুরুষে অহ্মে, তুহ্মের প্রয়োগ বেশি। ইহারা সংস্কৃত বহুবচন শব্দ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় একবচনেও ইহাদের ব্যবহার ছিল সুপ্রচুর : মো (<মম) পদও কর্তৃকারকে চলিত। করণ কারকের পদ মই, তই প্রাচীন বাংলার স্তরে শুধুমাত্র কর্ম-ভাববাচ্যের কর্তারূপে প্রযুক্ত হইত

(গ) ধাতুরূপ—ক্রিয়াপদে অতীতকালে -ই, -ইল বিভক্তি এবং ভবিষ্যৎকালে -ইব বিভক্তির ব্যবহার চলিত কর্ম-ভাববাচ্যে। বাংলা ভাষার ইহা একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য : যেমন,—'চলিল' কাহ্ন। মই 'ভাইব'। অসমাপিকা ক্রিয়ায় -এ,-আ বা-ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার : যেমন,—চড়িলে, বুঝিঅ, চাহন্তে।

(ঘ) বিশিষ্টার্থক শব্দসমষ্টির ব্যবহার—এই প্রয়োগগুলি বাংলা ভাষার একেবারে নিজস্ব সম্পদ : যেমন,—থির করি, ধরণ ণ জাই, আহার কএলা, নিদ গেল, সরি পড়িআঁ, গুণিআ লেহুঁ।

মধ্য বাংলাভাষা

মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় দুইটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। ইহার প্রথমটির নাম দেওয়া হইয়াছে আদি মধ্যস্তর, ইহার কালসীমা ১৩৫০-১৫০০ খ্রীঃ। দ্বিতীয়টির নাম অন্ত্য মধ্যস্তর, ইহার ব্যাপ্তিকাল ১৬০০—১৮০০ খ্রীঃ। প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি মিলিতেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী ও মধ্যযুগের অনুবাদকাব্যগুলিতে অন্ত্য মধ্যস্তরের ভাষার লক্ষণগুলি মিলিতেছে।

আদি মধ্যস্তরের বাংলাভাষার লক্ষণ—

১। **ধ্বনিগত :** (ক) স্বর—অ-কারের পর ই-কার বা উ-কার থাকিলে পরের ধ্বনিগুলির ক্ষীণতাপ্রাপ্তি এবং পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির দ্বিস্বরতাপ্রাপ্তি : যেমন,—কে না বাঁশী বাএ বড়াই (উচ্চারণ বড়াই) কালিনী নই কুলে।

(খ) ব্যঞ্জন— ন্‌হ>ন ; ম্হ>ম : যেমন,—কান্‌হ>কান, আহ্মি>আমি। অবশ্য আহ্মি, তুহ্মি, আহ্মারা, তোহ্মারা প্রভৃতি শব্দও থাকিয়া গেল।

২। **রূপগত :** (ক) ধাতুরূপ—ক্রিয়াপদে অতীতকালে -ইল এবং ভবিষ্যৎ কালে -ইব প্রত্যয় যোগ : যেমন,—কালীয় 'দলিল' দামোদর যমুনাজলের ভীতর। কখনো কখনো -ইলা এবং -লুঁ প্রত্যয়যোগে অতীতকালের পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্ম-ভাববাচ্যে -ইঅ্ প্রত্যয়ের ব্যবহার ক্রমে অপ্রচলিত হইতে থাকে। উহা প্রাচীন বাংলার বৈশিষ্ট্য ছিল। আদি মধ্যস্তর হইতে যা ও ভূ ধাতুর যোগে যৌগিক কর্মভাববাচ্যের প্রচলন হইল।

অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে আছ্‌ ধাতু যুক্ত হইয়া যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হইল : যেমন.—কর্য্যাছে। ক্রিয়াপদের অনুসর্গ হিসাবে 'গিয়া', 'সিয়া' এই দুই অসমাপিকার ব্যবহার প্রচলিত হইল : যেমন,—দেখসিয়া।

৩। **ছন্দ :** চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারছন্দের এবং ত্রিপদীর ব্যবহার।

অন্ত্য মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার লক্ষণ—

১। **ধ্বনিগত :** (ক) স্বর—ই-কারের এবং উ-কারের অপিনিহিতি। অপিনিহিত উ-কারের ই-কারে পরিবর্তন। এই ই-কারের সহিত পূর্বস্বরের সন্ধি। এবং অভিশ্রুতির মত স্বরপরিবর্তন। এক কথায় বলা যায়, বাংলাভাষার এই স্তরে অপিনিহিতি দেখা দিল এবং অভিশ্রুতির প্রবণতাও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

পদান্ত অ-কারের লোপ হইল : যেমন,—ভাত>ভাৎ (উচ্চারণে)।

স্বরবর্ণের উচ্চারণে কতকগুলি বিশিষ্ট পরিবর্তন—ইআ>-এ ; -উআ>-ও। যেমন,—বানিয়া>বেনে।

(খ) ব্যঞ্জন—উচ্চারণে নাসিক্যবাহুল্য কমিয়া গিয়াছে।

ঢ়-কারের এবং ন্‌হ, ম্‌হ—এই দুই নাসিক্য মহাপ্রাণের মহাপ্রাণতার লোপ ঘটিল : বুঢ়>বুড় ; আহ্মার>আমার।

২। **রূপগত :** (ক) শব্দরূপ—বহুবচনবিভক্তি—কর্তায় -রা, নির্দেশক হিসাবে -গুলা, -গুলি এবং তির্যক কারকে -দি, -দিগ প্রভৃতির প্রচলন।

বিদেশী শব্দ—বহু আরবী, ফার্সী এবং কিছু পর্তুগীস শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

(খ) ধাতুরূপ—অতীতকালে -ইল-অন্তক এবং ভবিষ্যতে -ইব-অন্তক ক্রিয়াপদের কর্তৃবাচ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রচলন দেখা দিল।

যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়ার বহুল ব্যবহার প্রচলিত হইল।

৩। বাংলা সাহিত্যে ব্রজবুলি ভাষার বিশেষ অনুশীলন দেখা গেল।

আধুনিক বাংলা ভাষা

আধুনিক বাংলাভাষার মোটামুটি সূচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ হইতে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পা দিতে দিতে ইহার রূপ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট হইয়া উঠিল। আধুনিক বাংলাভাষার প্রধান লক্ষণগুলি নিম্নে বিবৃত হইল—

১। **ধ্বনিগত ঃ** পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনি সন্ধিবদ্ধ হইল এবং পদের শেষের স্বরটির পরিবর্তন ঘটিল ঃ যেমন,—দেখিয়া>দেখে। স্বরসংগতির ব্যাপক প্রচলন ঘটিল ঃ যেমন,—পড়ুয়া>পোড়ো, পটুয়া>পোটো।

২। **রূপগত ঃ** অসমাপিকা— -ইয়াযুক্ত অসমাপিকার স্থানে কখনো কখনো 'পূর্বক' শব্দটি যোগ করিয়া অসমাপিকার ভাব বোঝানো হইতে লাগিল ঃ যেমন,— 'আসিয়া'র স্থলে 'আগমনপূর্বক'।

অসমাপিকা ক্রিয়াপদের বহুল ব্যবহার, ফলে অনেক বাক্যের একটি বাক্যে সংহতিলাভ ঃ যেমন,—সে তাকে দেখে আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

যুক্ত ক্রিয়াপদ—সংস্কৃত বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে কর্ ধাতু যোগ করিয়া যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত হইল ঃ যেমন,—শ্রবণ করা, দান করা, ভোজন করা ইত্যাদি। নামধাতুর বহুল প্রয়োগ চলিল।

'না'-এর প্রয়োগ—আগে ছিল ধাতুর পূর্বে, এখন হইল ধাতুর পরে ঃ যেমন,— আগে—"না পোড়াও রাধা-অঙ্গ না ভাসাও জলে"; এখন—"আমায় বোলো না, গাহিতে বোলো না"।

সংযোজক অব্যয়রূপে 'এবং'-এর স্থানে 'ও' (ফার্সী 'ব' জাত) বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

বিদেশী শব্দ—ইংরেজী এবং উহার মধ্য দিয়া কিছু কিছু ইউরোপীয় ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিল।

৩। গদ্য রচনার সৃষ্টি হইল এবং ক্রমে গদ্যসাহিত্য পুষ্ট হইয়া উঠিল। কবিতা ও গদ্যের বাক্‌রীতির পার্থক্যটিও বিশেষভাবে অনুভূত হইল।

বাংলা সাধুগদ্য ও চলিত গদ্যের দুইটি স্বতন্ত্র রীতি দাঁড়াইয়া গেল। বাংলা কথ্যভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে কতকটা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য লইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু সংস্কৃতিকেন্দ্র কলিকাতার ভাষাকে মোটামুটিভাবে আশ্রয় করিয়া লেখ্যরীতির অনুসরণ চলিল।

প্রশ্ন ৩। বাংলা ভাষার নিজস্ব লক্ষণগুলি কি কি যেখানে অন্যান্য নব্যভারতীয় ভাষাগুলি হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য? চর্যাপদের

ভাষা যে বাংলা তাহার প্রমাণ কি ? চর্যাপদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

উত্তর : কতকগুলি বিশিষ্টতা বাংলা ভাষাকে অপরাপর নব্যভারতীয় ভাষা হইতে পৃথক করিয়াছে। এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হইল :—(১) -ইল যোগে অতীত এবং -ইব যোগে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ গঠন। (২) অসমাপিকা পদসৃষ্টিতে—-ইয়া,-ইলে, -ইতে বিভক্তির ব্যবহার। (৩) সম্বন্ধ পদের পদগঠনে -এর বিভক্তির প্রয়োগ। (৪) -রে, -কে, ক বিভক্তিযোগে গৌণকর্ম সম্পদান কারকের পদগঠন। (৫) অধিকরণ কারকের পদগঠনে -এ,-ত বিভক্তির যোগ। (৬) কর্তৃকারকে বহুবচনে -রা বিভক্তির প্রয়োগ। (৭) অনুসর্গ পদের বিভক্তিরূপে ব্যবহার-প্রাচুর্য। এই জাতীয় কতকগুলি বিশিষ্ট অনুসর্গ-শব্দ—দিয়া, করিয়া, থাকিয়া, হইতে মাঝ সঙ্গে, তরে, কাছে, পাশে ঠাই প্রভৃতি। (৮) বাংলার নিজস্ব 'idiom'-এর ব্যবহার।

চর্যাপদের ভাষা বিশ্লেষণ করিলে উল্লিখিত বিশিষ্ট লক্ষণগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। চর্যাপদের ভাষায় অবশ্য অর্বাচীন অপভ্রংশের কিছু কিছু চিহ্ন আছে। কিন্তু মূলতঃ এই ভাষা যে বাংলা তাহাতে সন্দেহ নাই।

[২নং প্রশ্নোত্তরের প্রথমাংশে "প্রাচীন বাংলাভাষার" লক্ষণ দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ৪। আধুনিক বাংলাভাষার প্রধান উপভাষাগুলির পরিচয় দাও।

অথবা, রাঢ়ী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী ও কামরূপী এই পাঁচটি উপভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর : আধুনিক বাংলাভাষা বাঙলাদেশের পাঁচটি বৃহৎ অঞ্চলের কথ্যভাষায় নানারূপ স্বাতন্ত্র্য লইয়া দেখা দেয়। অঞ্চল হিসাবে ইহাদের পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয় : যেমন,—(১) রাঢ়ী পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা), (২) ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের উপভাষা), (৩ বরেন্দ্রী (উত্তরবঙ্গের উপভাষা), (৩) বঙ্গালী (পূর্ব-বঙ্গের উপভাষা—ময়মনসিংহ হইতে বরিশাল পর্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত) (৫) কামরূপী (জলপাইগুড়ি-দিনাজপুর হইতে গোটা উত্তর পূর্ব বঙ্গের উপভাষা,- কাছাড় শ্রীহট্টসহ) নিম্নে এই উপভাষাগুলির ভাষাগত বিশিষ্টতা নির্দেশিত হইল।

রাঢ়ী উপভাষা

১। **ধ্বনিগত :** (ক) উচ্চারণে অভিশ্রুতির ব্যাপক প্রয়োগ : যেমন,—রাখিয়া>রেখে। (খ) স্বরসংগতিজনিত স্বর পরিবর্তন। যেমন,—দেশি>দিশি। (গ) অ-কারের ও-কারের মত উচ্চারণ : যেমন,—অতুল>ওতুল। (ঘ) আনুনাসিক

স্বরের উচ্চারণ প্রচলিত : যেমন,—চাঁদ, কাঁটা। কোনো কোনো অঞ্চলে অস্থানে আনুনাসিক স্বর দেখা যায়। (ঙ) শ্বাসাঘাত সুনির্দিষ্ট। উহা সর্বদা প্রথম স্বরধ্বনিতে বসে। ফলে পদের শেষের মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা লোপ পায়, ঘোষবত্তাও থাকে না : যেমন,—দুধ>দুদ্ (উচ্চারণে); লর্ড>লাট।

২। **রূপগত :** (ক) তির্যককারকে বহুবচনে -দের বিভক্তির প্রয়োগ। (খ) গৌণকর্ম—সম্প্রদান কারকে -কে বিভক্তি। (গ) অধিকরণ কারকে -তে, -এ এবং -য় বিভক্তির ব্যবহার। (ঘ) অতীতকালে প্রথমপুরুষে অকর্মক ক্রিয়াপদে -ল এবং সকর্মক ক্রিয়াপদে -লে যুক্ত হয় : যেমন,—সে বইটা 'দিলে'; সে বাড়ী 'গেল'। (ঙ) উত্তম পুরুষের অতীতকালের ক্রিয়াপদ গঠনে ব্যবহার হয় -লুম, -নু, -লম্, -লাম বিভক্তি। করলুম, করলম্, করনু সব রকম ব্যবহারই পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। (চ) যৌগিক ক্রিয়াপদে সম্পন্নকালের পদগঠন করিতে -ইয়া এবং অসম্পন্ন কালের পদগঠন করিতে -ই-অন্ত অসমাপিকার ব্যবহার।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষা

১। **ধ্বনিগত :** (ক) আনুনাসিকের অস্থানে আগম এবং প্রচুর প্রয়োগ লক্ষণীয় : যেমন,—সাঁবুন, চাঁ প্রভৃতি। (খ) পদমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতাপ্রাপ্তি : যেমন,—পুকুর>পুখুর, বিকেল>বিখেল।

২। **রূপগত :** (ক) অনুসর্গহীন গৌণকর্মে -কে বিভক্তি : যেমন,—'জলকে' গেল্‌ছে। (খ) নামধাতুর বিচিত্র প্রয়োগ : যেমন, দিনকে বড় 'দপ্নাছে'। (গ) যুক্ত ক্রিয়াপদে 'আছ্' ধাতুর জায়গায় 'বট্' ধাতুর ব্যবহার : যেমন,—করছি>করিবটি।

বরেন্দ্রী উপভাষা

রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী দুইটি উপভাষাই মূলে একরূপ ছিল। পরে একদিকে বিহারী ভাষা অন্যদিকে বঙ্গালী উপভাষার প্রভাবে বরেন্দ্রী রাঢ়ী হইতে পৃথক হইয়া যায়। বরেন্দ্রী উপভাষায় তাই রাঢ়ী উপভাষার নানা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

১। **ধ্বনিগত :** (ক) বরেন্দ্রীতে স্বরধ্বনি অনেকটা অপরিবর্তিত। সানুনাসিক স্বরধ্বনিও প্রায়ই দেখা যায়। (খ) ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণ পদের আদিতে শুধু বজায় থাকে। (গ) শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নাই। (ঘ) উচ্চারণে জ>জ(z)। (ঙ) পদের গোড়ায় র-কারের লোপ ও আগম একটি বিশিষ্ট লক্ষণ : যেমন,—আমের রস>রামের অস।

২। **রূপগত :** শব্দ ও ধাতুরূপে বরেন্দ্রী মোটামুটি রাঢ়ীরই মত। অবশ্য সামান্য কিছু পার্থক্যও আছে। (ক) সপ্তমীতে -ত বিভক্তিও দেখা যায়। (ইহা অনেকটা কামরূপীর মত)। (খ) অতীতকালে উত্তমপুরুষে -লাম্ বিভক্তি।

বঙ্গালী উপভাষা

১। **ধ্বনিগত :** (ক) বঙ্গালীতে অপনিহিতি বহুল প্রযুক্ত : যেমন,—রাখিয়া> রাইখ্যা। (খ) বঙ্গালী উপভাষায় অভিশ্রুতি-স্বরসংগতির অনুপস্থিতি রাঢ়ী উপভাষা হইতে উহার সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত করিতেছে। (গ) অপিনিহিত উচ্চারণের দিকে অতিরিক্ত প্রবণতার ফলে কখনও কখনও য-ফলা এবং যুক্তব্যঞ্জনেও অপনিহিতির মত স্বরধ্বনির আগম হয় : যেমন,— কাব্য>কাইব্ব, সত্য>সইত্য, লক্ষ>লইক্‌খো। (ঘ) এ-কার>অ্যা : যেমন,—তেল>ত্যাল, বেল>ব্যাল। (ঙ) কোনো কোনো অঞ্চলে ও>উ : যেমন,—বোতাম>বুতাম, চোর>চুর। (চ) আনুনাসিক স্বরধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত : যেমন,—বাঁশ>বাশ, চাঁদ>চাদ। (ছ) শ্বাসাঘাতের স্থান সুনির্দিষ্ট নয়। (জ) কতকগুলি মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণ বর্ণে পরিবর্তনপ্রবণতা : যেমন,—ভ>ব, ঘ>গ, ফ>প, ঢ>র, ড>র : যেমন,—ভয়>বয়, মূঢ়>মূর, বিড়ি>বিরি। (ঝ) চ>ৎস্, ছ>স, জ>z : যেমন,—চলে>ৎস্‌লে, কাজ>কাz। (ঞ) পদের মধ্যস্থিত হ-কারের লোপপ্রবণতা : যেমন,—ফলাহার>ফলার, পুরোহিত>পুরুইত। (ট) শ, স>হ : যেমন,—সে>হে, আসে>আহে।

২। **রূপগত :** (ক) কর্তায় বহুক্ষেত্রে -এ বিভক্তি যুক্ত হয় : যেমন,—'মায়ে' ডাকে। 'রামে' কইছে। (খ) -রে,-গো,-গোর,-র প্রভৃতি বিভক্তির চতুর্থীতে প্রয়োগ : যেমন,—'আমারে' মারছে। 'তাগো' দাও। (গ) সপ্তমীতে -তে বিভক্তির ব্যাপক ব্যবহার : যেমন,—বাসাতে, জলেতে। (ঘ) উত্তমপুরুষের অতীত-কালের বিশিষ্ট বিভক্তিগুলি (যথা -লুম্,-লম্,-নু) বঙ্গালী উপভাষায় নাই। কেবল -লাম্ -এর প্রয়োগ দেখা যায় : যেমন,—কর্‌লাম, খাইলাম্ প্রভৃতি। (ঙ) সম্পন্নকালের পদগঠনে -ই এবং অসম্পন্ন কালের পদগঠনে -ইতে অসমাপিকার ব্যবহার : যেমন,—কর্‌ছি, করতে আছি। (চ) সামান্য বর্তমানে কখনো কখনো ঘটমান বর্তমানের পদ ব্যবহৃত হয় : যেমন,—মা ডাকেন>মায়ে ডাকৃতেছেন।

কামরূপী উপভাষা

এই উপভাষা বরেন্দ্রী ও বঙ্গালীর মাঝামাঝি। দুই উপভাষারই লক্ষণ ইহাতে আছে।

১। **ধ্বনিগত :** (ক) আনুনাসিক বর্ণের লোপপ্রবণতা। (খ) অপিনিহিত উচ্চারণের আধিক্য। (গ) উচ্চারণে অভিশ্রুতি, স্বরসংগতি প্রভৃতির অভাব। (ঘ) পদের আদিতে মাত্র ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণের অস্তিত্ব। (ঙ) শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নাই। (চ) পদের আদি ছাড়া অন্যত্র কতকগুলি বর্ণের উচ্চারণে নিম্নরূপ

পরিবর্তন ঘটে : ঘ>গ, ঝ>জ, ট>ড, ধ>দ, ভ>ব : যেমন,—মেঘ>মেগ, মাঝামাঝি>মাজামাজি, বাঁধন>বাদন। (ছ) ড়>র ; জ>z, চ>ৎস, শ, স>হ : যেমন,—জল>zল, চামড়া>ৎসামরা, বসে>বহে।

২। রূপগত : (ক) গৌণকর্ম-সম্প্রদানে -কে বিভক্তির ব্যবহার : যেমন,—ঘরকে গেলাম। (খ) অধিকরণে -ত বিভক্তির ব্যবহার : যেমন,—কোটোত্ যান্ (কোর্টে যাব)।

প্রশ্ন ৫। বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিস্তৃত পরিচয় দাও। দেশী, বিদেশী সূত্র হইতে সংগৃহীত সর্ববিধ শব্দের শ্রেণীবদ্ধ বিবরণ লিখ।

উত্তর : শব্দভাণ্ডারই একটি ভাষার প্রধান সম্পদ। শব্দসম্পদ সমৃদ্ধ না হইলে কোনো ভাষাই উন্নত হইতে পারে না। শব্দভাণ্ডার দুইভাবে সমৃদ্ধ হয় : (ক) অপর ভাষার শব্দ আত্মসাৎ করিয়া এবং (খ) ধাতু বা শব্দে প্রত্যয় যোগ করিয়া নূতন শব্দ তৈয়ারী করিয়া। এই শক্তি যে ভাষায় আছে তাহার উৎকর্ষ অবশ্যস্বীকার্য। আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার এই শক্তি আছে।

বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার প্রধানতঃ দুই জাতের :—(১) মৌলিক ; (২) আগন্তুক। ভারতীয় আর্য-ভাষার ক্রমবিবর্তনের পথেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি। তাই এই শাখার অন্তর্গত শব্দগুলি 'মৌলিক' বলিয়া কথিত। বাংলা শব্দভাণ্ডারের তিনটি শ্রেণী—তদ্ভব, তৎসম এবং অর্ধতৎসম মৌলিক শব্দরূপে অভিহিত হইবে। 'আগন্তুক' শব্দ হইল ভারতীয় আর্যশাখা ভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের অন্য শাখা অথবা অষ্ট্রিক-দ্রবিড় ভাষাবর্গ হইতে গৃহীত শব্দ। বিদেশী শব্দগুলি এবং অনেক দেশী শব্দও মূলতঃ আগন্তুক শ্রেণীর।

বাংলা শব্দভাণ্ডারকে পাঁচটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ; (১) তদ্ভব শব্দ ; (২) তৎসম শব্দ ; (৩) অর্ধতৎসম শব্দ ; (৪) দেশী শব্দ ; (৫) বিদেশী শব্দ।

(১) তদ্ভব শব্দ

অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্যজাতি যে ভাষায় কথা বলিতেন, ভারতীয় সেই আদি আর্যভাষা বংশপরম্পরায় লোকমুখে, আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রভাবে, উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে, অন্য ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীকে নিজ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পূর্ণতঃ গ্রহণ করায় ক্রমে প্রাকৃত রূপ ধারণ করিল। ফলে আদি আর্যভাষা তাহার পূর্ব পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারিয়া পরিবর্তিত হইল। এইরূপ পরিবর্তিত শব্দকে বলে 'তদ্ভব শব্দ'। তৎ অর্থাৎ প্রাচীন আর্যভাষা—তাহা হইতে ভব বা জাত। এই শব্দগুলিই বাংলা শব্দভাণ্ডারের আদি মূলধন। ইহা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি : যেমন,—সংস্কৃত

অর্ধ>প্রাকৃত অদ্ধ>বাংলা আধ। সং হস্ত>প্রা হত্থ>বাং হাত। খাদ্য>খজ্জ> খাজা। ইন্দ্রাগার>ইন্দাআর>ইঁদারা। রাজ্ঞিকা>রণ্ণিআ>রানী। ষোড়শ> সোলহ>ষোল। আবিশতি>আবিসই>আইসে।

দ্রবিড়, অষ্ট্রিক, মোঙ্গল প্রভৃতি বর্গ হইতে গৃহীত অনেক শব্দও বহু পূর্বে ভারতীয় ভাষায় গৃহীত হইয়া যুগগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাংলায় আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের তদ্ভব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের নানা ভাষার কিছু শব্দ এইভাবে সংস্কৃতের মধ্য দিয়া বাংলায় আসিয়াছে।

অষ্ট্রিক বর্গ হইতে গৃহীত তদ্ভব শব্দ :—

সং ঢক্ক>প্রা>ঢক্ক>বাং ঢাক। সং তাম্বূল>বাং তাঁবোলা। সং টঙ্ক>প্রা টঙ্ক>বাং টঙ্গ।

দ্রবিড় বর্গ হইতে গৃহীত তদ্ভব শব্দ :—

তামিল মুটই>সং মুটক>প্রাকৃত মুডঅ>বাংলা মোট।

তামিল কাল>সং খল্ল>প্রা খল্ল>বাং খাল।

তামিল পিল্লৈ>সং পিল্লিক>প্রা পিলুঅ>বাং পিলে বা পুলে (ছেলে-পিলে বা ছেলে-পুলে)।

কানাড়ী কোড>সং ঘট>প্রাকৃত ঘড>বাং ঘড়া।

মোঙ্গল বর্গ হইতে গৃহীত তদ্ভব শব্দ :—

তুর্কি তুর্ক> প্রাকৃত তুরক্ক>বাং তুরুক।

তুর্কি তিগির>সং ঠক্কর>প্রাকৃত ঠক্কুর>বাংলা ঠাকুর।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গ হইতে গৃহীত তদ্ভব শব্দ :—

গ্রীক দ্রাখ্মে>সং দ্রম্য>প্রাকৃত দম্ম>বাংলা দাম।

গ্রীক সুরিংক্স্>সং সুরুঙ্গ>প্রাকৃত সুরঙ্গ>বাং সুড়ঙ্গ।

পহ্লবী পোস্ত্ (লিখিবার চর্ম)>সংস্কৃত পুস্তিকা>প্রাকৃত পুত্থিঅ>বাংলা পুথি বা পোথা।

তৎসম শব্দ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা হইতে পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ এবং তাহার মধ্য হইতে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলি জন্মগ্রহণ করিলেও সংস্কৃত ভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডার এবং সুবিপুল শব্দকোষ সম্পর্কে বাঙালী লেখকেরা কোনো কালেই উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডার হইতে বহু শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে নানা প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য। তদ্ভব শব্দের সহিত এই শব্দগুলির পার্থক্য লক্ষ্য করিবার মত। প্রাচীন

ভারতীয় আর্য হইতে লোকমুখে দীর্ঘকালব্যাপী স্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলে এই শব্দগুলি বাংলা ভাষায় আসিয়াছে। মূল সংস্কৃত শব্দগুলির সহিত ইহাদের অনেক পার্থক্য। ইহারা বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ। তৎসম শব্দগুলি কিন্তু অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ। ঐগুলি মূল ভাষার রূপ ও উচ্চারণ যথাসম্ভব রক্ষা করিয়াছে। উহারা তৎ অর্থাৎ মূল প্রাচীন আর্যভাষার সম বা সমান।

সাধু-বাংলায় তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয় শতকরা ৭৫ ভাগ এবং চলিত বাংলায় শতকরা ৪০ ভাগ।

অর্ধ-তৎসম শব্দ

সংস্কৃত হইতে তৎসম রূপে আগত শব্দ বাংলা ভাষায় সর্বত্র অবিকৃত থাকে নাই। বাংলা উচ্চারণে উহাদের মধ্যে নানা ধরনের বিকৃতি ঘটিয়াছে। এইগুলিই অর্ধ-তৎসম শব্দ। কথ্য ভাষায় অর্ধ-তৎসম শব্দের ব্যবহার যথেষ্টই আছে। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় তৎসম, অর্ধতৎসম এবং তদ্ভব রূপে একই শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে। কখনো কখনো তদ্ভব এবং অর্ধতৎসম রূপের মধ্যে অর্থঘটিত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়: যেমন,—

তৎসম	তদ্ভব	অর্ধ-তৎসম	তৎসম	তদ্ভব	অর্ধ-তৎসম
কৃষ্ণ	কানু	কেষ্ট	সিংহ	সা (উপাধি)	সিঙ্গী
শ্রদ্ধা	সাধ	ছেদ্দা	রাত্রি	রাতি	রাত্তির
চিত্র	চিতা	চিত্তির	জ্যোৎস্না	জোনা (জোনা-কি)	জোছনা

দেশী শব্দ

আর্য ভাষা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে এ অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার কিছু শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে স্থান পাইয়াছে। ইহার অনেকগুলিই অস্ট্রিক-দ্রবিড়বর্গের শব্দ; কিন্তু ঐসব বর্গের কিছু শব্দ প্রথমে প্রাচীন আর্য ভাষায় গৃহীত হইয়া পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলায় আসিয়াছে। উহারা তদ্ভব শ্রেণীভুক্ত। দেশী শব্দগুলির কোনো প্রাচীন সংস্কৃত রূপ মেলে নাই। উহারা সরাসরি বাংলা ভাষায় স্থান পাইয়াছে। বলা যাইতে পারে প্রাক্-আর্য বাংলা দেশের অধিবাসীদের ভাষার উহাই অবশেষ। এইরূপ শব্দের মধ্যে ঝাঁটা, ঝোল, ডিঙা, ডিঙি, ঢিল, ঢেউ, ডাব প্রভৃতি প্রধান। বাংলা দেশের অনেক গ্রামের নামে এই অস্ট্রিক বা দ্রবিড়বর্গের ভাষার ছাপ আছে: যেমন,—বেতড়, বালুটে, মুড়াগাছা, কুড়ুম্বা প্রভৃতি।

বিদেশী শব্দ

বাংলা ভাষা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিবার পরে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ছাড়া অপরাপর (বিশেষতঃ অভারতীয়) ভাষাগোষ্ঠী হইতে যে সব শব্দ এই ভাষায় গৃহীত

হইয়াছে তাহাদের বিদেশী শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। বাংলা ভাষায় ফার্সী শব্দের সংখ্যা বহু; দীর্ঘকাল মুসলমান রাজত্ব চলিবার ফলে, মুসলমান দরবারে রাজকার্য ও শিক্ষাপ্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইত এরূপ বহু পরিচয়জ্ঞাপক নানা শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। মধ্যযুগে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কারণে যেমন বাংলা ভাষায় ফার্সী শব্দের সংখ্যাবাহুল্য ঘটিয়াছে, সেইরূপ ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কারণে ইংরেজী শব্দ বহুলপরিমাণে অবিকৃত অথবা বিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় স্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া শ' খানেক পর্তুগীজ শব্দ, কিছু ফরাসী এবং ওলন্দাজ শব্দও বাংলা শব্দভাণ্ডারকে পুষ্ট করিয়াছে।

ফার্সী শব্দ—আদমশুমারী, খাজনা, গোমস্তা, খারিজ, জমি, জমা, তালুক, দপ্তর, দারোগা, জবানবন্দী, আইন, হাকিম, আল্লা, খোদা, গাজী, জবাই, শহীদ, দরগা, মসজিদ, আমীর, উজির, দরবার, দরবেশ, সিপাই, তোপ, শিকার, কাবু, আয়না, আচকান, কিশমিশ, বাগিচা, পোলাও, দালান, হালুয়া, হুঁকা, চশমা, আদব, কায়দা, সেতার, হরফ, আওয়াজ, ওজন, কম, তাজা, দরকার, নগদ, নমুনা, পরী, জাহাজ, ইহুদী, হাবশী, হিন্দু প্রভৃতি।

ফার্সী-মারফৎ তুর্কি এবং আরবী শব্দও কিছু আসিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে ফার্সী শব্দ একই অর্থের তদ্ভব শব্দকে সরাইয়া স্থান দখল করিয়াছে।

পর্তুগীজ শব্দ—গরাদ, জানালা, নোনা, বালতি, পেপে, পাউরুটি, তোয়ালে, সাবান, বোতাম, মিস্ত্রী, সেমিজ, কামিজ, আলমারী, পেয়ারা, চেহারা, বারান্দা প্রভৃতি।

ফরাসী শব্দ—কার্তুজ, কুপন, কাফে, রেস্তোরাঁ, আঁতাত প্রভৃতি।

ওলন্দাজ শব্দ—ইস্ক্রুপ, তুরুপ, হরতন, রুইতন, ইশকাপন প্রভৃতি।

ইংরেজী শব্দ - টোস্ট, কফি, চেয়ার, টিকিট, ট্রেন, রেল, মেল, সিনেমা, হোটেল, শার্ট, কোট, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি।

ইংরেজী শব্দ (বিকৃত উচ্চারণে)—লণ্ঠন (lantern), গেলাস (glass), বাক্স, (box), পুলিস (police), লাট (lord), টেবিল (table), সান্ত্রী (sentry) গারদ (guard) প্রভৃতি।

প্রশ্ন ৬। নিম্নলিখিত ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষাগুলির উদাহরণ-যোগে সংজ্ঞা লেখ:—(ক) শ্রুতিধ্বনি—য়-শ্রুতি, ব-শ্রুতি; (খ) সমীভবন; (গ) স্বরাগম; (ঘ) অপিনিহিতি; (ঙ) অভিশ্রুতি; (চ) স্বরসংগতি; (ছ) বিপর্যয়; (জ) বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি; (ঝ) স্বরলোপ; (ঞ) নাসিক্যীভবন; (ট) মূর্ধণ্যীভবন।

উত্তর ঃ (ক) **শ্রুতিধ্বনি**—কখনো কখনো দ্রুত উচ্চারণ করিতে গিয়া জিহ্বা এক ধ্বনি হইতে অন্য ধ্বনির উচ্চারণস্থানে যাইবার সময়ে অসতর্কভাবে মধ্যবর্তী

কোনো ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া ফেলে। এই নূতন ধ্বনিকে শ্রুতিধ্বনি বলে : যেমন, —অনেক সময়ে ন ও র কারের মধ্যে একটি দ-কার শ্রুতিধ্বনি হিসাবে আসিয়া দেখা দেয় : যেমন,—সংস্কৃত বানর > প্রাচীন বাংলা বান্দর > আধুনিক বাংলা বাঁদর।

য় শ্রুতি—দুই স্বরের মধ্যবর্তী স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন প্রাকৃতে লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু উচ্চারণের সময়ে সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি দুইটির মধ্যে একটি য-কার কখনো কখনো আসিয়া যাইত। ইহাই য়-শ্রুতি : যেমন,—সাগর > সাঅর > সায়র সেইরূপ বাংলায় কে + এ.লা = কেয়েলে (উচ্চারণে)।

ব-শ্রুতি—কখনো কখনো দুই স্বরধ্বনির মধ্যে একটি অতিরিক্ত ব-কার (ওয় উচ্চারণে) আসিয়া যাইত ইহাকে ব শ্রুতি বলে : যেমন,—যা + আ = যাআ, কিন্তু মধ্যে একটি ব কার আসায় দাড়াইল 'যাওয়া'; এইরূপ খাওয়া, দেওয়া, শোওয়া প্রভৃতি।

(খ) **সমীভবন**—পদের উচ্চারণের সময়ে নিকটবর্তী দুইটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পাধিক সাম্যলাভ করে। ইহাকে ধ্বনিবিজ্ঞানে বলা হয় সমীভবন। সমীভবন তিনরকম : (১) প্রগত—যেখানে পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তীটিকে বদলাইয়া দেয় : যথা—সং যুক্ত > প্র যুত্ত পক্ক > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ প্রভৃতি। (২) পরাগত—যেখানে পরবর্তী ধ্বনি পূর্বেরটিকে বদলাইয়া দেয় : যথা,—তৎ + জন্য > তজ্জন্য, উৎ + মুখ > উন্মুখ। (৩) অন্যোন্য - পরস্পরের প্রভাবে যেখানে দুইটি ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় : যথা,—উৎ + শ্বাস > উচ্ছ্বাস, সং সত্য > প্রা সচ্চ ষট্ক > ছক্ক।

(গ) **স্বরাগম**—পদের আদিতে যুক্ত অথবা একক ব্যঞ্জনের পূর্বে স্বরধ্বনির আগম হইলে তাহাকে বলে স্বরাগম : যেমন সং স্ত্রী > প্রা ইত্থী। ইং stable > বাং আস্তাবল, ইং station > ইষ্টেশান।

(ঘ) **অপিনিহিতি**—পদের মধ্যস্থিত ই-কার অথবা উ-কার যদি স্বস্থানে থাকিয়াও ঠিক আগের ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে অতিরিক্ত উচ্চারিত হয়, তবে ইহাকে বলে অপিনিহিতি। মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় অপিনিহিতি ছিল একটি প্রধান বিশেষত্ব। এখনও পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে ইহার প্রচলন আছে : যেমন,—করিয়া > কইরিয়া > কইর‍্যা; কাঁচি > কাঁইচি; গাতি > গাইতি।

(ঙ) **অভিশ্রুতি**—অভিশ্রুতি অপিনিহিতির পরবর্তী একটি অবস্থা। অপিনিহিত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সহিত মিলিত হইলে এবং উহার প্রভাবে পরের স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটিলে অভিশ্রুতি বলে : যথা,—করিয়া > কইরিয়া > কইর‍্যা > করে, যাইয়া > যেয়ে, হাটুয়া > হেটো, শুনিয়া > শুনে ইত্যাদি।

(চ) **স্বরসংগতি**—স্বরসংগতিতে একবর্ণের স্বরধ্বনির প্রভাবে অপর স্বরধ্বনি বদলাইয়া যায়। উচ্চ স্বরধ্বনির প্রভাবে নিম্নে অবস্থিত স্বরধ্বনির উচ্চারণে পরিবর্তন

ঘটে। উহা উচ্চাবস্থিত স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। উচ্চে অবস্থিত স্বরধ্বনি ই এবং উ; মধ্যে অবস্থিত এ এবং ও; নিম্নে অবস্থিত অ, আ। দেশি>দিশি। এ, ই-এর অপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত—তাই উহা ই-কারের প্রভাবে ই-কারে রূপান্তরিত হইল। বিলাতি>বিলেতি>বিলিতি—দুইটি ই-কারের প্রভাবে নিম্নে অবস্থিত আ-কার, মধ্যে অবস্থিত এ-কারে পরিণত হইল, পরে আরও পরিবর্তিত হইয়া উচ্চে অবস্থিত ই-কার হইয়া সম্পূর্ণ সংগতি রক্ষা করিল। এইরূপ মূলা>মূলো, নিরামিষ>নিরিমিষ্যি।

(ছ) **বিপর্যয়**—পদমধ্যস্থিত দুইটি ধ্বনির স্থানপরিবর্তনকে বলে বিপর্যয়: যেমন,—সং জ্যোৎস্না>প্রা জোন্‌হা, ইংরেজী বক্‌স্>বাংলা বাক্স। সেইরূপ রিক্স>রিস্ক, ট্যাক্সি>ট্যাস্‌কি।

(জ) **বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি**—উচ্চারণের ক্লেশ দূর করিবার জন্য বা ছন্দের সৌষম্যবিধানের উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে দুইটি যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি স্বরধ্বনির আগম হয়, ইহাকে বলে বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি: যেমন,—সং স্নেহ>প্রা সিণেহ। বাংলা ভক্তি>ভকতি, রত্ন>রতন, ক্লেশ>কেলেশ।

(ঝ) **স্বরলোপ**—পদের কোনো বর্ণে শ্বাসাঘাত প্রবল থাকিলে অনেক সময়ে শ্বাসাঘাতহীন অক্ষরের স্বরধ্বনি ক্ষীণ হইয়া লোপ পায়। এইরূপে স্বরলোপ তিনভাবে ঘটিতে পারে: (১) আদিস্বরলোপ—যেমন, সং উদক>পালি দক, সং অলাবু>বাংলা লাউ। অভ্যন্তর>ভিতর, এরণ্ড>রেড়ী, উপানৎ>পানই, উদ্ধার>ধার। (২) মধ্যস্বরলোপ—যেমন, সুবর্ণ>স্বর্ণ, রাঁধনা>রান্না, গৃহিণী> গিন্নী। (৩) অন্ত্যস্বরলোপ—যেমন, সং আকাশ >বাং আকাশ্, জল>জল্, অগ্নি> আগুন্, বৃদ্ধি>বাড়্।

(ঞ) **নাসিক্যীভবন**—নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হইয়া যদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করিয়া দেয় তবে হয় নাসিক্যীভবন: যেমন,—সন্ধ্যা>সঞ্ঝা >সাঁঝ, চন্দ্র>চাঁদ, মাংস>মাঁস।

স্বতোনাসিক্যীভবন—অনেক সময়ে নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংশ্রব ব্যতিরেকে স্বরধ্বনি আপনিই আনুনাসিক হইয়া যায়। তখন হয় স্বতোনাসিক্যীভবন: যেমন,— পুথি>পুঁথি।

(ট) **মূর্ধন্যীভবন**—ঋ, র্, ষ্ প্রভৃতি স্বর ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শে দন্ত্যব্যঞ্জন মূর্ধন্য হইয়া গেলে মূর্ধন্যীভবন বলে: যেমন,—কৃত>কট, বর্দ্ধ>বড্ঢ>বাড়। অস্থি>আঁঠি।

স্বতোমূর্ধন্যীভবন—ঋ, র্, ষ্ প্রভৃতি ধ্বনির সংস্পর্শ ব্যতিরেকে দন্ত্যব্যঞ্জন মূর্ধন্য হইলে স্বতোমূর্ধন্যীভবন হয়: যেমন,—উৎ+দীন>উড্ডীন। পততি>পড়ই> পড়ে।

প্রশ্ন ৭। শব্দের অর্থ পরিবর্তনের পশ্চাতে নানা কারণ বর্তমান থাকে। সংক্ষেপে এই কারণগুলি বুঝাইয়া বল। শব্দার্থের কত বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয় সে বিষয়েও সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর: অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টিই শব্দ। অর্থ না থাকিলে ধ্বনিসমষ্টি শব্দ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। শব্দের অর্থ দুইরকম হইতে পারে:— (১) মুখ্যার্থ বা আভিধানিক অর্থ। ইহাই শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ। ইহার সাহায্যেই ভাষায় শব্দের স্থান, ইহার বলেই শব্দ-দ্বারা সামাজিক প্রয়োজনাদি যথারীতি নির্বাহ হয়। (২) গৌণার্থ বা লাক্ষণিক অর্থ। লাক্ষণিক অর্থ বক্তা শ্রোতা পরিবেশ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। যেখানে শব্দের মুখ্য অর্থবোধে বাধা জন্মায় সেখানে লাক্ষণিক অর্থের সাহায্য গ্রহণ করার রীতি আছে। পৃথিবীর সব উন্নত ভাষায়ই এইরূপ শব্দ সুপ্রচুর যাহার মুখ্যার্থের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ গৌণ অর্থ রহিয়াছে।

একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে এইরূপ উদাহরণও প্রচুর পাওয়া যায়। যেমন—পাকা (আঙুরের জন্য না তাকিয়ে আছি পাকা কলার রান্না করে খাও)। জমিটা সম্পত্তি একজনকে সে পাকা করে দেয় (শেষ সম্মতি)। পাকা মাষ্টার পড়াচ্ছেন, চিন্তার আর কারণ নাই (সুদক্ষ)। গ্রামের রাস্তাগুলো এবারে পাকা করবে শুনছি (বাঁধানো)। পাঁচ টাকা হাতে এসেছে, তাই পাকা বাড়ি তুলেছে (ইটের বাড়ি)। ফলটা পাকা, চিন্তার কারণ নেই (অপরিবর্তনীয়)। এত অল্প বয়সে এরকম পাকা কথা শিখেছ (পরিণত বয়সের উপযুক্ত)।

বিশেষ্যপদেরও এইরূপ বিভিন্নার্থক ব্যবহার পাওয়া যায়।

জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা, রুচি ও চিন্তাধারার সহিত ভাষার যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শব্দের অর্থ এবং অর্থের পরিবর্তন ইহার উপরে বিশেষভাবে নির্ভর করে। কখনো কখনো অন্ধ সংস্কারও শব্দার্থের উপরে ক্রিয়াশীল হয়। এইভাবে মেয়েদের নাম "আন্নাকালী" (আর-না-কালী) "চায়না" (চাই না) দাঁড়াইয়াছে। মৃতবৎসা জননী "এককড়ি" "পাঁচকড়ি" দিয়া সন্তান ধাত্রীর নিকটে কিনিয়া লয়। এই কারণেই "যাই" কথার বদলে 'আসি' বলা হয়।

প্রতিষ্ঠাবান লেখকেরা ব্যাকরণের অননুমোদিত পদও ভাষায় ব্যবহার করেন। তথাকথিত অশুদ্ধ পদও বিশেষ বিশেষ অর্থে চলিয়া যায়। মধুসূদন দত্ত 'বরুণপত্নী' অর্থে "বারুণী" ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'মদ্য'।

মনের সহিত বাক্যের সম্বন্ধ যে কিরূপ প্রগাঢ় তাহা অনুধাবন করিলে অর্থ-পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণাবলীর অনুসরণ করা সহজ হইবে। দেখা যায়, দেশ কাল পাত্র ও পারিপার্শ্বিকতা মনের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, শব্দার্থও সেইরূপ

পরিবর্তিত হয়। অর্থপরিবর্তনের মোটামুটি তিনটি ধারা আছে : (১) সম্প্রসারণ ; (২) সংকোচন ; (৩) আরোপন।

(১) **সম্প্রসারণ**—যে শব্দের যখন উৎপত্তি হয় তখন তাহার একটি স্বতন্ত্র অর্থ থাকে। সেই শব্দটি তখন বিশেষ কোনো ব্যক্তি বস্তু বা ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নিয়োজিত হয়। কালক্রমে দেখা যায়, সেই শব্দ পুরাতন অর্থের বন্ধন না মানিয়া সঙ্গে সঙ্গে আরও নূতন অর্থ অধিকার করিয়া বসে। ইহাকে অর্থসম্প্রসারণ বলা হয়।

'কপাল' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'ললাট'; হিন্দুদের সংস্কারের সহিত জড়িত হইয়া তাহা এখন 'অদৃষ্ট' এই অপর অর্থও প্রকাশ করে। 'পরশু' শব্দের মূল অর্থ 'আগামী কালের পরের দিন'। বাংলায় ইহার অপর অর্থ হইল 'গতকালের আগের দিন'। গঙ্গা একটি প্রসিদ্ধ নদীর নাম। 'গাঙ' শব্দের অপর অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'নদী'। নঞ্ শব্দের মূল অর্থ 'না'। কিন্তু অর্থসম্প্রসারণের ফলে, ঐ সঙ্গে অভাব, অল্পতা, অন্যত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে উহা ব্যবহৃত হইতে লাগিল। অভাব মূল অর্থ 'না-এর ভাব', সম্প্রসারিত অর্থ 'দারিদ্র্য'। অসুখ—মূল অর্থ 'সুখের অভাব', সম্প্রসারিত অর্থ 'রোগ'।

(২) **সংকোচন**—শব্দবিশেষের মূল অর্থের ব্যাপকতা কখনও কখনও কমিয়া যায়। ইহাকেই অর্থসংকোচন বলে। 'অন্ন' শব্দের মূল অর্থ 'খাদ্য', এখন ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'ভাত'। অনেক বিদেশী শব্দের এইরূপ অর্থসংকোচ বাংলায় ঘটিয়াছে। 'Station' বলিতে প্রধানতঃ 'রেলের ইষ্টিশন' এবং 'পিওন' বলিলে শুধুই 'ডাক-হরকরা' বোঝায়। 'Doctor' শব্দের মূল অর্থ 'পণ্ডিত'। এখন ডাক্তার বলিলে সাধারণতঃ 'চিকিৎসক' বুঝায়। ফার্সী 'মুর্গ' শব্দের অর্থ 'পক্ষী', বাংলা মোরগ, মুরগী<মুর্গ। বাংলায় উহার অর্থ একটা 'বিশেষ পক্ষী', সাধারণ পক্ষীজাতি নয়। আবার 'কাগজ' বলিলে শুধু 'খবরের কাগজ', 'পাউডার' বলিলে শুধু 'প্রসাধনচূর্ণ', 'চাকর' বলিলে শুধু 'গৃহভৃত্য' (কর্মচারী উহার আসল অর্থ) বোঝায়। এইগুলি সব অর্থসংকোচনের উদাহরণ।

(৩) **আরোপন**—কখনো কখনো মূল অর্থ পরিবর্তিত হইয়া নূতন অর্থ দেখা দেয়। ইহাকে বলে অর্থ আরোপন। এক অর্থের স্থানে অন্য অর্থ আরোপিত হয় বলিয়াই এইরূপ নামকরণ। ফারসী 'বুজুর্গ' শব্দের অর্থ 'বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানী'। উহা হইতে বাংলায় আসিয়াছে 'বুজরুক্'। ইহার অর্থ 'ভণ্ড, কুটিল, ছলনাকারী'। 'হঠাৎ' শব্দটি সংস্কৃতে বোঝায় 'অবিমৃষ্যকারিতাবশতঃ', বাংলায় শব্দটির অর্থ হইল 'অকস্মাৎ'। সংস্কৃতে '[illegible]' শব্দের অর্থ 'কৃপার পাত্র', বাংলায় শব্দটির অর্থ 'ব্যয়কুণ্ঠ'।

অর্থপরিবর্তনের কারণ

শব্দের অর্থ যে সব ভিন্ন ভিন্ন কারণে পরিবর্তিত হয়, তাহার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই পর্যন্ত বলা যায় যে, ভাবসংসর্গই (association of ideas) সকল কারণের মূলে ক্রিয়া করে। প্রত্যেক শব্দের মধ্যে পরস্পরসংশ্লিষ্ট কতকগুলি ভাবের আভাস থাকে। কিন্তু শব্দটি শুনিলে প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই যে একরূপ ভাবের উদয় হইবে, এমন নয়। কেহ শব্দটি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সব কয়টি ভাবই গ্রহণ করিল, কেহবা কতকগুলি মাত্র বুঝিতে পারিল, কাহার মনে আবার অনুরূপ অন্য ভাবের উদয় হইল। এইগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে অর্থপরিবর্তনের মূলসূত্র কি, তাহা সহজ হইবে।

নিম্নে কতকগুলি সম্ভাব্য কারণের মাত্র উল্লেখ করা হইল :—

(১) **আলংকারিক প্রয়োগ**—'উথলিল সুন্দরের সুখ-পারাবার"। "যাঁর নামে পার করে ভব-পারাবার। ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে করে পার॥" 'হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।'' এই তিনটি উদাহরণেই পারাবার কথাটির ব্যবহার আছে। কথাটির অর্থ 'সমুদ্র'। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমুদ্রের এক একটি বিশেষ গুণই মুখ্য রূপে গণ্য হইয়াছে। প্রথম উদাহরণে পারাবার বলিতে 'আধিক্য' বুঝান হইয়াছে। সমুদ্রের জলাধিক্য। এই আধিক্যের প্রতিই কবির এখানে লক্ষ্য। দ্বিতীয় অর্থে শব্দটি 'দুস্তর' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সমুদ্রের অপরাপর গুণ লক্ষ্য নয়, এই বিশেষ গুণটিই কবির লক্ষ্য। তৃতীয় দৃষ্টান্তে, পারাবারের 'গভীরতা এবং তারল্য'ই কবির লক্ষ্য। দেখা যাইতেছে উপমার দ্বারা একই পারাবার শব্দ তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ক। **উপমান ও উপমেয়**—উপমার দ্বারা উপমেয়ের যেমন অর্থ পরিবর্তন ঘটে, উপমানের অর্থও তেমনি বদলাইয়া যায়। "নুন খাই যার গুণ গাই তার"—এই প্রবাদবাক্যে 'নুন' উপমান। উপমেয় ক্ষুদ্র উপকার এখানে 'উহ্য'। কিন্তু ঐ উহ্য উপমেয়ের দ্বারা নুনের বাচ্যার্থ এইখানে বদলাইয়া গিয়াছে। 'নুনের' অর্থ 'ক্ষুদ্র উপকার বা তুচ্ছ সাহায্য'

খ। **লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ**—বাচ্যার্থ ব্যতীতও অন্যান্য যে সব অর্থ প্রতি-শব্দে প্রচ্ছন্ন থাকে, আলংকারিক প্রয়োগের দ্বারা সেগুলি প্রকাশিত হয় : যেমন,—আমের মুকুলের ভারে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িল। এখানে 'ডাল' শব্দের অর্থ 'গাছের ডাল'। আমি যে ডাল ধরি সে ডাল ভাঙ্গিয়া যায়। এখানে ডালের বাচ্যার্থ দ্বারা কোনো সংগত অর্থ বোঝায় না। ব্যঞ্জনার দ্বারা বোঝা যায় 'ডাল' অর্থ 'আশ্রয়'।

(২) **সৌজন্য ও শিষ্টাচার**—বয়স্ক বা মান্য ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপে অনেক সময় শব্দের মূল অর্থ বদলাইয়া যায়। "পত্রের পাঠে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত

হয়, তাহা অধিকাংশ স্থলেই কেবল রীতিরক্ষার জন্ম। মুখোমুখি দেখা হইলে যাঁহাকে একটি মাত্র প্রণাম কবি, চিঠিতে তাঁহাকে 'শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম' জানাই। যাঁহাকে 'মাননীয' বা 'মান্যবর' বলিযা সম্বোধন করি তিনি যে প্রকৃতই সম্মানের অধিকারী একথা আমরা ভাবি না। এই সকল শব্দ সম্ভ্রম, সৌজন্য, বিনয় এবং শিষ্টাচারবশতঃ অর্থ পরিবর্তন করিয়াছে। ক্রিযা-কর্ম উপলক্ষে আমরা যখন কাহাকেও আহারের নিমন্ত্রণ জানাই তখন 'শাকান্নে'র আযোজন হইয়াছে এই কথাই বলি। কিন্তু মুখ ফুটিযা যাহাই বলা হউক না কেন, শ্রোতার কাছে তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। তাহা না হইলে আহ্বানকারীর গৃহে অতিথি সমাগম হইত না, ইহা নিঃসন্দেহ। আজকাল আমরা যখন 'চা'-এর নিমন্ত্রণ করি তখন শুধু চাযের ব্যবস্থা করিযাই নিরস্ত হই না।"
(—ডঃ বিজন ভট্টাচার্য বাগর্থ)

(৩) **বক্রোক্তিঃ** সাদাসিদেভাবে না বলিযা প্রকারান্তরে যে কথা বলা হয় তাহাকেই বক্রোক্তি বলা হইতেছে "এসো" শব্দ "যাও" অর্থ সূচনা করে। "হরিজন" "দরিদ্রনারায়ণ" কথাগুলি লক্ষণীয। অপ্রিযতা নিবারণ এইরূপ অর্থ পরিবর্তনের কারণ। বড়বাবুকে 'ভেট" দেওযা, কর্মচারীকে "পান" খাইতে দেওযা—এখানে "ঘুষ" কথাটিকে কিছু নরম করিযা বোঝানো হইযাছে ঐ দুইটি শব্দ-দ্বারা। কখনো অপ্রিয়তা নিবারণের জন্য, কখনো আবার অন্ধসংস্কারবশে শব্দার্থ পরিবর্তন ঘটানো হয।

(৪) **ব্যাজোক্তি**—কোনো ভাব শ্রোতার মনে ভালোরূপে প্রবেশ করাইবার জন্য আমরা অনেক সময এমন শব্দ ব্যবহার করি যাহার আক্ষরিক অর্থ লক্ষ্যার্থের ঠিক বিপরীত। যে বোকা তাহাকে "অতিবুদ্ধি" বলা হয। "বুদ্ধির ডিপো" (অর্থাৎ বোকা) "ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির" (অত্যন্ত অসাধু), "শ্রীঘর" (জেলখানা), "অর্ধচন্দ্র" (গলাধাক্কা) প্রভৃতি শব্দের প্রত্যক্ষ অর্থ ও লক্ষ্যার্থের পার্থক্য অনুধাবনযোগ্য।

(৫) **পরিবেশগত অনৈক্য**—পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের সহিত শব্দার্থ পরিবর্তনের সম্বন্ধ খুব নিকট। স্থান-কাল, রীতি-নীতি প্রভৃতি বদলাইলেই শব্দের অর্থও বদলাইয়া যায়।

ক। **স্থানগত**—হিন্দীতে "শাক" শব্দের অর্থ রান্না-করা ব্যঞ্জন, বাংলায রান্না-না-করা পাতা। উত্তর-পশ্চিম ভারতে "বিছা" মানে 'কাঁকড়া বিছে', বাংলায় "বিছা" অর্থে 'তেঁতুলে বিছে'।

খ। **কালগত**—এককালে কড়ির দ্বারাই ক্রয়-বিক্রয় চলিত। তখন কড়ি শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল ধন। "নির্ধন" অর্থে "নিকড়ে" শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করিবার মত। আমার "টাকাকড়ি" নাই—এরূপ ব্যবহারও কালগত অর্থপরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে।

গ। **পাত্রগত**—একই শব্দ সকলের নিকট সমান অর্থ বহন করে না। বিদ্যা, বুদ্ধি, সংস্কার, সভ্যতা অনুসারে শব্দের অর্থান্তর ঘটে। "ধর্ম" শব্দ শুনিলে কৃষক তাহার এক অর্থ করিবে, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের নিকট তাহার অর্থ অন্যরকম, ব্রহ্মবাদীর নিকট এই একই শব্দের তৃতীয় অর্থ পাওয়া যাইবে।

ঘ। **সমাজগত**—সামাজিক আচারব্যবহার সর্বদেশে ও সর্বকালে একই রূপ নয়। সেইজন্য সম্বন্ধবাচক শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকম। আমাদের সামাজিক অবস্থায় "মা" "ভাই" বলিলে শুধুই প্রকৃত মাতা বা ভ্রাতা বুঝায় না। 'বর' শব্দের অর্থ 'স্বামী'। কিন্তু এককালে কন্যা নিজেই পাত্র পছন্দ করিয়া বরণ করিয়া লইত, এই অর্থে "বর" শব্দ প্রচলিত ছিল। এখন সামাজিক প্রথা বদলাইয়াছে, শব্দটির অর্থেরও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

ঙ। **বস্তুগত**—আমরা প্রতিনিয়ত যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করি তাহাদের আক্ষরিক এবং উদ্দিষ্ট অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে শব্দপরিবর্তনের আর একটি বিশেষ কারণ দেখা যাইবে। কাপড়=আদি অর্থ 'কার্পাসজাত বস্ত্র'; প্রচলিত অর্থ 'যে কোনো ধরণের বস্ত্র'। পোলাও=আদি অর্থ 'মাংসমিশ্রিত অন্ন'; প্রচলিত অর্থ "এক ধরনের খাদ্য', যেমন ছানার পোলাও, নিরামিষ শুধু ঘিয়ের পোলাও।

(৬) **ভাবাবেগ**—'মারাত্মক' অপরাধ, 'অসম্ভব' কথা, 'অদ্ভুত' আচরণ, 'ভীষণ' সমস্যা, 'ভয়ংকর' গোলমাল প্রভৃতি কথার বিশেষণগুলি আক্ষরিক অর্থে যত ভয়ানক, ব্যবহারিক অর্থে ততটা নয়, ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, বিরক্তি প্রভৃতি ভাবের আতিশয্য ঘটিলে এইরূপ অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। তাহারই ফলে বহু শব্দের অর্থে পরিবর্তন ঘটে।

(৭) **ব্যষ্টি স্থলে সমষ্টি, সমষ্টি স্থলে ব্যষ্টি**—'কালি' শব্দের উৎপত্তি 'কালো রঙের বস্তু' এই অর্থে। কিন্তু লাল কালি, সবুজ কালিও হয়। যখন কাহারও 'শ্রীচরণ' দর্শনের কথা বলা হয়, কাহারও 'পাণি' গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়, তখন এক অঙ্গের দ্বারা গোটা মানুষটাকে বোঝানো হয়। 'পান খাওয়া'র অর্থ 'পান চুন খয়ের খাওয়া'। 'ভাত' খাওয়ার অর্থ 'ভাত, ডাল, মাছ ইত্যাদি খাওয়া'। একটি বস্তু দ্বারা এখানে বহু বস্তু বুঝানো হইয়াছে।

(৮) **অনবধানতা**— অজ্ঞতা ও অনবধানতা-হেতু শব্দের নানাবিধ অপপ্রয়োগ এবং অর্থান্তর ঘটে। ঔদাসীন্য অথবা প্রয়োগকারীর প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ জনসাধারণ অনেক সময়ে তাহা মানিয়া লয়। 'ম্লেচ্ছ' শব্দের মূল অর্থ 'জাতিবিশেষ', প্রচলিত অর্থ 'কদাচারী পাষণ্ড এক শ্রেণীর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী' বুঝাইত, প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'নিষ্ঠুর'। ইংরেজি 'arm-chair' বাংলায় হইয়াছে 'আরাম-কেদারা'—'arm' ব্যাপারটি একেবারে নিঃসম্পর্কিত হইয়া পড়িয়াছে।

(৯) **অর্থস্সৃষ্টি**—শুধু অনবধানতা বা অজ্ঞতা নয়, অর্থের বা প্রয়োগকর্তার স্বেচ্ছাচারিতাও অনেক সময় অর্থ পরিবর্তনের জন্য দায়ী হয়। ‘প্রদোষ’ শব্দের অর্থ ‘সন্ধ্যা—রাত্রির প্রাক্কাল’; রবীন্দ্রনাথ ‘ঊষাকাল’ অর্থেও শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত ‘জাগরণ, ক্রন্দসী, বনানী’—মধুসূদন ব্যবহৃত ‘বারুণী’ প্রভৃতি বহু শব্দের উল্লেখ করা চলে।

(১০) **গৌণার্থ প্রাধান্য**—শব্দের প্রধান অর্থের সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো এক বা একাধিক গৌণ অর্থও দেখা দেয় এবং সেই গৌণ অর্থ ভাষায় চলিত হইয়া যায়। ‘মন্দিরে’র মূল অর্থ ‘গৃহ’, প্রচলিত অর্থ শুধুমাত্র ‘দেবগৃহ’; ‘বাসর’ শব্দের মূল অর্থ ‘বাসগৃহ’, প্রচলিত অর্থে ‘বিবাহরাত্রে বরবধূর নিশযাপনের গৃহ’।

প্রশ্ন ৮। বাংলা ভাষার উপরে অনার্য-ভাষার বিশেষ করিয়া দ্রবিড় ভাষাগুলির প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ।

উত্তর ঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশে ও বাঙালীদের সম্বন্ধে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের আর্যরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করিত। ইহার মূলে কতকটা ভীতি এবং কতকটা সংশয় ছিল। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের কোনো কোনো গ্রন্থে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যাহাতে মনে হয় বাঙালীদের আর্য সংস্কৃতির বাহিরের লোক বলিয়া মনে করিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বঙ্গদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের লোককে দস্যু বলা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের পরবর্তী বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হইয়াছে উত্তর-ভারতের আর্যরা বাংলাদেশ হইতে ফিরিয়া গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। এইসব নানা কারণে মনে হয় বাংলাদেশে আর্য আগমনের পূর্বে দ্রবিড় ও অষ্ট্রিক প্রভাবান্বিত ভাষাভাষী ছিল। এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তারের পরেও বহুকাল পর্যন্ত তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে চাহিয়াছে।

বাংলায় আর্য আগমনের পূর্বে বাংলা ভাষা ছিল দ্রবিড় ও অষ্ট্রিক প্রভাবান্বিত। সেইজন্য বাংলাভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যাহার কোনরূপ পূর্বসূত্র সংস্কৃত-প্রাকৃতে মিলে না। তাহার বাক্যগঠনরীতির মধ্যে এমন কিছু বিশিষ্টতা আছে যাহা সংস্কৃতের সদৃশ নয়। অথচ এইসব ক্ষেত্রে দ্রবিড়-অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর সহিত তাহাদের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষার উপরে দ্রবিড়-অষ্ট্রিক অনার্য ভাষার প্রভাবের যে অবশেষ এখনও রহিয়াছে তাহাকে ধ্বনি, রূপ এবং বাক্যরীতি—এই তিনদিক হইতে বিচার করা প্রয়োজন।

১। **ধ্বনিগত**—(ক) বাংলা ভাষায় উষ্মধ্বনির (spirant) অভাব আছে। ইহার কারণ দ্রবিড়-অষ্ট্রিক ভাষার প্রভাব। (খ) ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে

আর্যদের ভাষায় মূর্ধন্যধ্বনি (অর্থাৎ ট্, ঠ্, ড, ঢ, ণ, ষ) ছিল না। উহারা দ্রবিড়-অষ্ট্রিক ভাষার প্রভাবে বৈদিক-সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেখান হইতে ক্রম-বিকাশের মধ্য দিয়া বাংলাভাষায় আসিয়াছে। ইহা অবশ্য বাংলার উপরে প্রত্যক্ষ অনার্য প্রভাব নয়। ইহা বৈদিক-সংস্কৃতের উপরে পতিত অনার্য প্রভাবের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ফলশ্রুতি। (গ) বাংলায় স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ—ধ্বনিপরিবর্তনের রীতি—দ্রবিড় ভাষার প্রভাবে আসিয়াছে। (ঘ) পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় চ, স প্রভৃতি কতকগুলি ধ্বনির হ-কারে পরিণতি লক্ষ্য করা যায় ; সেখানে শব্দের মধ্যস্থিত অঘোষ বর্ণ ঘোষবৎ উচ্চারিত হয়। ইহা দ্রবিড় প্রভাবের ফল বলিয়া অনুমিত হয়।

২। **রূপগত**—দেশী শব্দগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এই দেশী শব্দগুলি বাহিরের কোনো ভাষা হইতে আসে নাই, এগুলি আসিয়াছে বাংলাদেশের প্রাচীন অধিবাসী দ্রবিড়-অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর বাসিন্দাদের নিকট হইতে। (ক) বাংলার বহুগ্রামের নামে অষ্ট্রিক-দ্রবিড় গোষ্ঠীর প্রভাব আছে : যেমন, কলামৈত্তিক>কালামুড়ি, রোহিতবাড়ি>রুইবাড়ি, চবটিগ্রাম>চাটিগাঁ, হড্ডগাঙ্গ>হাড়িগাং। (খ) বহু অনুকার শব্দ—যেমন জলটল, ঘোড়াটোড়া, দেশটেশ, বসেটসে, দেখেটেখে প্রভৃতি—দ্রবিড় ভাষার প্রভাবে আসিয়াছে। (গ) বহু দ্রবিড় শব্দ বাংলাভাষায় নিত্য ব্যবহৃত। এগুলি দেশী শব্দ নামে পরিচিত। সংস্কৃতে প্রাকৃতে ইহাদের কোনো পূর্বরূপ মিলে না ; যেমন,—**চাউল**, লাঠি, ঢেঁকি, কুকুর, বাদুড়, গাড়ি, লেওড়া, ঝিঙা, ডিঙি, ডাব, ঢাক, ঢোল ঝাঁটা, চাল, চিল, ঢেউ, ডাহা ডাগা প্রভৃতি।

৩। **ব্যাকরণগত**—(ক) বাংলা অব্যয়ধর্মী অনুসর্গগুলির কারকবিভক্তিরূপে প্রয়োগের রীতি দ্রবিড়-প্রভাবের ফল বলিয়া অনুমিত হয়। এইগুলি হইতেছে থাকিয়া, লাগিয়া, হইতে, সব, সকল ইত্যাদি। (খ) বাংলা ভাষার সংকারী ক্রিয়াপদও দ্রবিড় ভাষার মত, সংস্কৃতে এরূপ ব্যবহার ছিল না। 'বসা' এবং 'পড়া' উভয় ধাতু-রূপ মিশাইয়া সৃষ্ট 'বসিয়া পড়া' জাতীয় ক্রিয়াপদ সংস্কৃতে নাই। সম্ভবতঃ ইহা দ্রবিড় প্রভাবজাত। (গ) বিশেষণের তারতম্য বুঝাইতে সংস্কৃতে তর, তম প্রত্যয় যোগ করা হয়। বাংলায় তর, তম যোগ না করিয়া মাকে, চেয়ে ইত্যাদি যোগ করিয়া বিশেষণের তারতম্য প্রকাশ করার রীতি আছে। ইহা দ্রবিড় প্রভাবের ফল। (ঘ) বাংলা ক্রিয়াপদের সরলতা সম্পাদনেও দ্রাবিড়ী প্রভাব আছে। (ঙ) বাক্যে সংযোগ-বিধায়ক শব্দের লোপও দ্রবিড়ী-রীতি : যেমন, মানুষটি হয় ভাল। এখানে 'হয়'-এর লোপ।

অষ্ট্রিকগোষ্ঠীর প্রভাব মোটামুটি শব্দগত। ব্যাকরণের ক্ষেত্রে উহার কোনো প্রভাব আছে কিনা, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। ভোটচীনীয় অনার্য শাখার কয়েকটি শব্দ বাংলায় আসিয়াছে : যেমন,—ভাপ্পি, ফুঙ্গী, লুঙ্গি, চঙ্ প্রভৃতি। (৯) এই শাখার অন্য কোনোরূপ প্রভাব বাংলা ভাষার উপর পড়ে নাই।

প্রশ্ন ৯। বাংলা চলিত ও সাধুভাষার মধ্যের পার্থক্যগুলি ভাষা-তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ কর।

উত্তর: উন্নত জাতির ভাষার দুইটি রূপ—লেখ্য ও কথ্য। কথ্যভাষা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন হইতে পারে। যেমন পূর্ববঙ্গে 'খাইছি', রাঢ়ের প্রান্তে 'খাঞেছি', কলকাতার নিকটে 'খেয়েছি'। কিন্তু লেখ্যভাষার মূল কাঠামো সমগ্র দেশে একরূপ। এই লেখ্যভাষা আবার দুইভাগে বিভক্ত সাধুভাষা ও চলিত ভাষা। লেখ্যভাষা সর্বদাই কোনো একটি আঞ্চলিক ভাষার উপরে নির্ভর করিয়া গড়িয়া ওঠে। সাধুভাষাও পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই বিষয়ে বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত ডক্টর সুকুমার সেনের অভিমত স্মরণযোগ্য: "যেখানে একাধিক উপভাষার চলন আছে সেখানে ভাষার অর্থাৎ শিষ্ট ভাষার, সাধুভাষার বা লেখাপড়ার ভাষার মূলে থাকে একটি বিশেষ উপভাষা, তবে তাহার মধ্যে অন্য উপভাষার শব্দ ও ইডিয়ম কমবেশি থাকে। সব উপভাষা হইতে কিছু কিছু লইয়া ভাষার তিলোত্তমা উদ্ভূত হয় না; বিশেষ উপভাষাই প্রধান হইয়া অপর উপভাষাগুলিকে আওতায় ফেলিয়া একচ্ছত্র হইয়া উঠে। যে সব কারণে কোনো বিশিষ্ট উপভাষা ভাষার পদবী পাইতে পারে তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে উন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি। বড় কবির কাব্য যাহাতে রচিত হইয়াছে, পাঠক শ্রোতা, এবং পরবর্তী কবিদের উপর সে উপভাষার প্রভাব প্রবলতর হয় এবং তাহার রীতি লেখকদের আদর্শ হয়। আর একটি কারণ উপভাষা-অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য। দেশের রাজধানীতে ও ব্যবসায়-কেন্দ্রে সব অঞ্চলের লোক আসিয়া ভিড় জমায়। তাই সেই স্থানের উপভাষা অপর উপভাষাগুলিকে কোণঠাসা করিতে থাকে। সভাশোভন বলিয়াও লোকে রাজধানীর উপভাষা আগ্রহ ও যত্ন করিয়া শিখে এবং রাজধানী অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় সেখাকার উপভাষাকে মাতৃভাষার উপরে স্থান দেয়। এইভাবে ব্যবসায়-কেন্দ্রের উপভাষা চারিদিকে প্রসারিত হয়। এমনি করিয়াই পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা বাঙ্গালী সাধুভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই সূত্রে কলিকাতার উপভাষা আজ সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর কথ্য ভাষা। প্রাচীন বাঙ্গলার অনেক কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক ছিলেন, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাই সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গদ্যরচনার শুরু এবং বাঙ্গালা আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখকগণ প্রায় সকলেই কলিকাতায় শিক্ষিত, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা সহজেই সাধুভাষায় পরিণত হইয়াছে।" (—ভাষার ইতিবৃত্ত)

আধুনিক কালে সাধুভাষার পাশাপাশি চলিত গদ্যের ব্যবহারও বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে, সম্প্রতি লেখকেরা সাধু-গদ্যকে প্রায় সরাইয়া দিয়া চলিত গদ্যকে বরণ

করিয়াছে। অবশ্য ইহার পশ্চাতে সাধু ও চলিত গদ্যের প্রায়-দেড়শত বৎসরের ইতিহাস আছে। উহা সংক্ষেপে আলোচনার যোগ্য।

বাংলাগদ্যের সাধুরীতি সুনির্দিষ্টভাবে রূপ পাইল মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের হাতে। এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা গেল সংস্কৃতানুসরণে—সংস্কৃত রীতির আদর্শ সমাসবদ্ধ দীর্ঘপদের ব্যবহারে এবং তৎসম শব্দ ব্যবহারের আধিক্যে। বিদ্যাসাগর কথ্যরীতির নিকট হইতে বাংলা গদ্যভাষার পদবিন্যাসের আদর্শটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। দূরান্বয় প্রভৃতি যে সব ত্রুটি সংস্কৃত বাক্‌বিন্যাস অনুসরণের ফলে কোনো কোন লেখকের গদ্য দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছিল, বিদ্যাসাগরে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। সাধুগদ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিল সবসাধারণের বোধগম্যতার অসুবিধা লইয়া। বাংলাভাষাকে সরল এবং কথ্যরীতির নিকটবর্তী করিয়া তুলিলে উহা বোধগম্য হইবে, এই ধারণা হইতে প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখিলেন। অবশ্য বাংলা কথ্য রীতির প্রথম রচনা স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র কোনো কোনো অংশে মিলিতেছে। উহার সরল ভাষা-শৈলী বাঙ্গালী কৃষকের জীবনপরিবেশ প্রকাশ করিবার জন্যই আমন্ত্রিত হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ সরল, বোধগম্য ও কথ্যরীতির বাংলাকে সর্ববিধ ভাবপ্রকাশের জন্য ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ কলিকাতায় প্রচলিত কথ্যরীতির বাংলার উচ্চারণসমেত একটি গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিলেন। 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'র ভাষার শক্তি দেখিয়া বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা বিস্মিত হইল। এই যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী গদ্যলেখক বঙ্কিমচন্দ্র সাধু ও চলিত রীতির মধ্যে একটি রফা করিবার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু তাহার ব্যবহৃত গদ্যের মূল কাঠামোটি সাধুরীতির তো বটেই, মাঝে মাঝে বেশ সংস্কৃত-ঘেষা বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, নানা লেখক নানা রীতির অনুসরণ করিলেও মোটামুটিভাবে গতি হইল ভাষারীতিকে সহজতর করিবার দিকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত লেখকদের গদ্যে সাধুরীতির বহিরঙ্গ রক্ষিত হইলেও প্রাণধর্মের দিক হইতে চলিত রীতির সাদৃশ্যই অধিক। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' প্রভৃতি বহুগ্রন্থে আধুনিক রীতির কাঠামোয় চলিত রীতির অনুসরণই লক্ষ্য করি।

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল হইতে চলিত রীতির ক্রমবিজয় সূচিত হইল। প্রথমতঃ, উপন্যাস ও গল্পের সংলাপাংশে চলিতরীতির ভাষা প্রায় সব লেখকই ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বর্ণনা ও বিবৃতি-অংশের ভাষা আরও কিছুকাল সাধুরীতি অনুসরণ করিয়া চলিল। দ্বিতীয়তঃ, নাট্যসংলাপের বাহিরের কাঠামো মধুসূদনের সময় হইতেই চলিত রীতির ছিল, এখন উহা সর্বাংশে চলিত ভাষা হইয়া উঠিল। তৃতীয়তঃ, সাধুগদ্যও বাচনভঙ্গীতে কথ্যরীতির এত নিকটবর্তী হইল যে বাহিরের কাঠামো ছাড়া ইহার "সাধুতা" আর বড় বজায় রহিল না।

এই সময়ে প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে চলিত ভাষার পক্ষে এক আন্দোলন দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পাইয়া সে-আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। বাংলা গদ্যে সর্ববিধ ভাবাবেগ প্রকাশ করিবার জন্য চলিত রীতির ব্যবহার করা উচিত—নানা যুক্তি দিয়া প্রমথবাবু এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন "আমার ইচ্ছে, বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই লেখা হয়।......মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সে ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়।......আমার এক এক সময়ে সন্দেহ হয় যে, হয়ত বিদেশের ভাব ও পুরাকালের ভাষা, এই দুইয়ের আওতার ভিতর পড়ে বাংলা সাহিত্য ফুটে উঠতে পারছে না।...... বিচার না করে একরাশ সংস্কৃত শব্দ জড় করলেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হবে না। সাহিত্যের গৌরবও বাড়বে না, মনোভাবও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করা হবে না। ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। যে কথাটি নিতান্ত না হলে নয়, সেটি সেখান থেকে ধার নিয়ে এস, যদি নিজের ভাষার ভিতরে তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশি ভিক্ষে করে, ধার কিংবা চুরি করে এনো না।"

খানিকটা সবুজপত্রগোষ্ঠীর আন্দোলনের ফলেও বটে, অনেকটা স্বাভাবিক ঐতিহাসিক কারণে এবং প্রধান লেখকদের সচেতনভাবে ভাষাকে সরল করিবার চেষ্টায় চলিত ভাষাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়াছে। এই চলিত ভাষার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ হইল :

(১) সাধুভাষায় ষষ্ঠীর বহুবচনান্ত বিভক্তি -দিগের ; চলিত ভাষায় -দের।

(২) মুখ্যতঃ উভয় ভাষার প্রধান পার্থক্য সর্বনামের ও ক্রিয়াপদের। সাধুভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়ার প্রাচীন রূপ, চলিত ভাষায় তাহার কলিকাতা অঞ্চল-প্রচলিত আধুনিক ও সংক্ষিপ্ত রূপের প্রয়োগ হয় : যথা,—তাহার>তার, যাহার>যার, করিব>করব, যাইতেছি>যাচ্ছি।

(৩) সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য—প্রাচীন ও তৎসম শব্দের অধিক ব্যবহার, ব্যাকরণ-রীতি, পদস্থাপন পদ্ধতি ইত্যাদির অনুসরণ। চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য—প্রাচীন শব্দ-রীতির বর্জন, তদ্ভব ও দেশী-বিদেশী শব্দের অধিক ব্যবহার এবং ব্যাকরণ ও পদস্থাপন-রীতির সরলতা।

(৪) চলিত ভাষায় অভিশ্রুতি ও স্বরসংগতিজাত উচ্চারণরীতি বিশেষভাবে অনুসৃত। স্বরভক্তির প্রয়োগও লক্ষণীয়।

(৫) আসলে রাঢ়ী উপভাষার কলিকাতাকেন্দ্রিক অঞ্চলের বাক্‌ভঙ্গির উপরে ভিত্তি করিয়াই চলিত রীতিটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ঠিক যে কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এতদঞ্চলের উপভাষার ভিত্তিতে সংস্কৃত আদর্শে সাধু গদ্যরীতির পত্তন হইয়াছিল, একই

কারণে বিংশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলের উপভাষার ভিত্তিতে সংস্কৃতরীতি যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলিত রীতি নির্দিষ্ট লেখ্যরূপ লাভ করিয়াছে। কাজেই রাঢ়ী উপভাষার নানাবিধ বৈশিষ্ট্য এই ভাষায় মিলিবে।

(৬) চলিত ভাষার অপর প্রধান বিশিষ্টতা হইল বাংলা ভাষার নিজস্ব চাল— যাহা প্রয়োজনমত দ্রুত এবং ধীর দুইই হইতে পারে, তাহা রক্ষা করা। সংস্কৃতানুগ সাধুভাষায় একটা মন্থরতা প্রকাশ পায়। একটা জীবন্ত এবং উন্নতশীল ভাষার পক্ষে এরূপ সদামন্থরতা বর্জনীয়।

(৭) বাংলা ভাষার প্রাণশক্তি অনেকখানি প্রকাশ পায় উহার Idiom-এ। ইডিয়মের যথাযোগ্য প্রয়োগ সাধুভাষার কাঠামোর মধ্যে [illegible] চলিত ভাষা প্রবাদ-প্রবচন, বিশিষ্টার্থক শব্দসমষ্টিকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাইয়া ভাষার শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারে।

(৮) বিদেশী শব্দ আত্মসাৎ করিয়া বাংলা [illegible] একটি ভাষার প্রাণসম্পদ বাড়িয়া যায়। সাধুভাষায় এই জাতীয় শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটা রক্ষণশীল মনোভাব প্রকাশ পায়। চলিত ভাষা আরবী, ফারসী, ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী শব্দ ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে।

সাধু-চলিত রীতির সংঘর্ষে [illegible] হইয়াছে। এখনও যে স্বল্পসংখ্যক বিশিষ্ট লেখক বা সংবাদপত্রগুলি প্রথানুগ পন্থায় সাধু রীতির ব্যবহার করেন এরূপ ছন্নচলিত বাহিরে লিখিয়া সবশেষে সাধুর ভঙ্গীটি মাত্র আছে, প্রাণধর্মের দিক দিয়া উহা সম্পূর্ণতঃ চলিত রীতির। চলিত রীতির জয়ের কারণ উহার প্রগতিশীলতা, যুগের সহিত উহার অগ্রসর হইবার ক্ষমতা।

প্রশ্ন ১০। বাংলা সংখ্যাশব্দগুলি আবির্ভাবের ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাস লেখ।

উত্তর ঃ বাংলার বিশুদ্ধ সংখ্যাগুলির অধিকাংশই তদ্ভব। কয়েকটি মাত্র দেশী কিংবা বিদেশী, ১ হইতে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাশব্দগুলির ক্রমবিবর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাস নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(১) **এক** প্রাকৃত এক্ক < সংস্কৃত একঃ। (২) **দুই** < প্রাকৃত দুবি, দুবে < সংস্কৃত দ্বে, দ্বি। **দো** (ব্যবহার দোনা), দোসর < প্রা দো < সং দ্বা, দ্বৌ। (৩) **তিন**—প্রাচীন বাংলা তিনি তিন্নি < প্রাকৃত তিণ্ণি < সং ত্রীণি। **তে** (ব্যবহার তেমাথা, তেসরা) সং ত্রয়ঃ। (৪) **চারি** < অর্বাচীন অপভ্রংশ চারি < প্রা চত্তারি < সং চত্বারি। **চৌ** (ব্যবহার চৌঠা, চৌদ্দ) < প্রা চউ < সং চতুঃ। (৫) **পাঁচ** < প্রা বাং পঞ্চ, পাঞ্চ < সং, প্রা পঞ্চ। (৬) **ছয়** < অপ ছহ্ < প্রা ছ < সং ষট্। (৭) **সাত** < প্রা সত্ত < সং সপ্ত। (৮) **আট** < প্রা অট্‌ঠ < সং অষ্ট। (৯) **ন, নয়** < প্রা নো, নঅ < সং নব। (১০) **দশ** < অপ, প্রা দস < সং দশ। (১১) **এগার** < অপ

এগ্‌গারহ<সং একাদশ। (১২) **বার**<প্রাচীন, আদি-মধ্য বাংলা বারহ<প্রা বারহ সং দ্বাদশ। (১৩) **তের**<অপ তেরহ<প্রা তেরস<সং ত্রয়োদশ। (১৪) **চৌদ্দ, চোদ্দ**<অপ চউদ্দহ<প্রা চউদ্দস, চোদ্দশ<সং চতুর্দশ। (১৫) **পনর, পনের**<অপ পন্নরহ<প্রা পন্নরস<সং পঞ্চদশ। (১৬) **ষোল**<অপ সোলহ<প্রা সোলস<সং ষোড়শ। (১৭) **সতর, সতের**<প্রা সত্তরস<সং সপ্তদশ। (১৮) **আঠার**< অপ অট্‌ঠারহ<প্রা অট্‌ঠারস<সং অষ্টাদশ। (১৯) **উনিশ**<অউনবীস<এগুণবীস <সং একোনবিংশ। (২০) **বিশ**<প্রা বীস<সং বিংশ [**কুড়ি** শব্দটি অনার্যবর্গ হইতে আগত] (২১) **একুশ**<অপ এক্কুবীস<প্রা এক্কবীস<সং একবিংশ। (২২) **বাইশ**<অপ বাইস<প্রা বাবীস<সং দ্বাবিংশ। (২৩) **তেইশ**<অপ তেইস<প্রা তেবীস<সং ত্রয়োবিংশ। (২৪) **চব্বিশ**<প্রা চউব্বীস<সং চতুর্বিংশ। (২৫) **পঁচিশ**<অপ পচীস<সং পঞ্চবিংশ। (২৬) **ছাব্বিশ**<অপ, প্রা ছব্বীস< সং ষড়বিংশ। (২৭) **সাতাইশ, সাতাশ**<প্রা সত্তবীস<সং সপ্তবিংশ। (২৮) **আঠাইশ, আঠাশ**<অপ অট্‌ঠাইস<প্রা অট্‌ঠবীস<সং অষ্টাবিংশ। (২৯) **উনত্রিশ**<অপ উনতীস্<প্রা এগুণতীস্<সং একোনত্রিংশ। (৩০) **ত্রিশ**< প্রাচীন বাং তিস, তীস<প্রা. তীস্<সং ত্রিংশ। (৩১) **একত্রিশ**<প্রাঃ একতীস <সং একত্রিংশ। (৩২) **বত্রিশ**<প্রাচীন বাং বত্তিস্<প্রা বত্তিস<সং দ্বাত্রিংশ। (৩৩) **তেত্রিশ**<প্রাচীন বাং তেত্তিস<প্রা তেত্তীস্<সং ত্রয়স্ত্রিংশ। (৩৪) **চৌত্রিশ** <সং চতুস্ত্রিংশ। (৩৫) **পঁয়ত্রিশ**<প্রা পঞ্চতীস্<সং পঞ্চত্রিংশ। (৩৬) **ছত্রিশ**<প্রাচীন বাং ছত্তিস<সং ষট্‌ত্রিংশ। (৩৭) **সাইত্রিশ**<সং সপ্তত্রিংশ। (৩৮) **আটত্রিশ**<সং অষ্টাত্রিংশ। (৩৯) **উনচল্লিশ**<সং একোনচত্বারিংশ। (৪০) **চল্লিশ**<অপ চালীস<প্রা চত্তারীস<সং চত্বারিংশ। (৪১) **একচল্লিশ**< অপ একচালীস<প্রা একচত্তারীস্<সং একচত্বারিংশ। (৪২) **বেয়াল্লিশ**<অপ বায়ালীস<বাত্তারীস<প্রা দুবাত্তারীস<সং দ্বাচত্বারিংশ। (৪৩) **তেতাল্লিশ**< সং ত্রিচত্বারিংশ। (৪৪) **চুয়াল্লিশ**<সং চতুশ্চত্বারিংশ। (৪৫) **পঁয়তাল্লিশ**< সং পঞ্চচত্বারিংশ। (৪৬) **ছেচল্লিশ, ছচল্লিশ**<সং ষট্‌চত্বারিংশ। (৪৭) **সাতচল্লিশ** <সং সপ্তচত্বারিংশ। (৪৮) **আটচল্লিশ**<সং অষ্টচত্বারিংশ। (৪৯) **উনপঞ্চাশ**< সং একোনপঞ্চাশৎ। (৫০) **পঞ্চাশ**<সং পঞ্চাশৎ। (৫১) **একান্ন**<অপ একান্নহ<প্রা. একণ্ণাহ্<সং একপঞ্চাশৎ। (৫২) **বাহান্ন**<প্রা. বাবণ্ণাহ্<সং দ্বাপঞ্চাশৎ। (৫৩) **তিপ্পান্ন**<সং ত্রিপঞ্চাশৎ। (৫৪) **চুয়ান্ন**<সং চতুঃপঞ্চাশৎ। (৫৫) **পঞ্চান্ন**<সং পঞ্চপঞ্চাশৎ। (৫৬) **ছাপ্পান্ন**<পালি ছপ্‌পঞ্ঞাস্<সং ষট্‌পঞ্চাশৎ। (৫৭) **সাতান্ন**<সং সপ্তপঞ্চাশৎ। (৫৮) **আটান্ন**<সং অষ্টপঞ্চাশৎ। (৫৯) **উনষাট**<অপ উনসট্‌ঠি<প্রা. এগুণষট্‌ঠি<সং একোনষষ্টি। (৬০) **ষাট**<

প্রা সট্‌ঠি<সং ষষ্টি (৬১) **একষট্টি**<প্রা একসট্‌ঠি<সং একষষ্টি (৬২) **বাষট্টি**<প্রা. বাসসট্‌ঠি<সং দ্বাষষ্টি। (৬৩) **তেষট্টি**<সং ত্রিষষ্টি। (৬৪) **চৌষট্টি**<প্রাচীন বাং চউসট্‌ঠি<প্রা চউসট্‌ঠি<সং চতুঃষষ্টি। (৬৫) **পঁয়ষট্টি**<সং পঞ্চষষ্টি। (৬৬) **ছেষট্টি**<প্রা ছসট্‌ঠি<সং ষট্‌ষষ্টি। (৬৭) **সাতষট্টি**<সং সপ্তষষ্টি। (৬৮) **আটষট্টি**<সং অষ্টষষ্টি। (৬৯) **উনসত্তর**<প্রা উনসত্তরি<সং একোনসপ্ততি। (৭০) **সত্তর**<প্রা সত্তরি<সং সপ্ততি। (৭১) **একাত্তর**<অপ একহত্তরি<প্রা একসত্তরি<একসপ্ততি। (৭২) **বাহাত্তর**<সং দ্বাসপ্ততি। (৭৩) **তিয়াত্তর, তেয়াত্তর**<সং ত্রিসপ্ততি। (৭৪) **চুয়াত্তর**<সং চতুঃসপ্ততি। (৭৫) **পঁচাত্তর**<সং পঞ্চসপ্ততি। (৭৬) **ছিয়াত্তর, ছেয়াত্তর**<সং ষট্‌সপ্ততি। (৭৭) **সাতাত্তর**<প্রা সত্তসত্তরি<সং সপ্তসপ্ততি। (৭৮) **আটাত্তর**<প্রা অট্‌ঠসত্তরি<সং অষ্টসপ্ততি। (৭৯) **উনআশি**<অপ. উনঅসি<প্রা একূণঅসীই<সং একোনঅশীতি। (৮০) **আশি**<অপ অসি<প্রা অসীই<সং অশীতি। (৮১) **একাশি**<সং একঅশীতি। (৮২) **বিরাশি**<সং দ্বিঅশীতি। (৮৩) **তিরাশি**<সং ত্রিঅশীতি। (৮৪) **চুরাশি**<প্রা চৌআসি<সং চতুঃঅশীতি। (৮৫) **পঁচাশি**<সং পঞ্চঅশীতি। (৮৬) **ছিয়াশি**<সং ষট্‌অশীতি। (৮৭) **সাতাশি**<সং সপ্তঅশীতি। (৮৮) **অষ্টাশি, অষ্টআশি**<সং অষ্টঅশীতি। (৮৯) **উননব্বই**<প্রা উননবতি<সং একোননবতি। (৯০) **নব্বই**<প্রা [illegible]<সং নবতি। (৯১) **একানব্বই**<সং একনবতি। (৯২) **বিরানব্বই**<সং দ্বি-নবতি। (৯৩) **তিরানব্বই**<সং ত্রি-নবতি। (৯৪) **চুরানব্বই**<সং চতুঃনবতি। (৯৫) **পঁচানব্বই**<সং পঞ্চনবতি। (৯৬) **ছিয়ানব্বই**<সং ষট্‌-নবতি। (৯৭) **সাতানব্বই**<সং সপ্তনবতি। (৯৮) **আটানব্বই**<সং অষ্ট-নবতি। (৯৯) **নিরানব্বই**<সং নবনবতি। (১০০) **একশো**<মধ্য বাংলা শ, শয়<প্রাকৃত সঅ<সং একশত। (১০০০) **হাজার**—ফার্সী শব্দ। **সহস্র**—তৎসম শব্দ।

পুরণবাচক সংখ্যাশব্দ

পয়লা, পহেলা<প্রাচীন বাংলা পহিলে<পহিল<প্রহিল্ল<সং প্রথম+ইল্ল। **দোসরা**<সং দ্বি-সর। **তেসরা**<সং ত্রি-সর। **চৌঠা**<প্রাচীন বাং চৌঠ<প্রা চউট্‌ঠ<সং চতুর্থ। **পাঁচই**<সং পঞ্চমিক। **ছয়ই**<সং ষষ্ঠ+ইক। **সাতই**<সংসপ্ত+ইক। **আটই**<সংঅষ্ট+ইক। **নয়ই**<সং নব+ইক। **দশই**<সং দশম্‌+ইক। **দোজ** (ব্যবহার দোজবর)<মধ্য বাংলা দুঅজ<প্রা দুইজ্জ<সং দ্বিত্য। **মেজ**<মধ্যক।

ভগ্নাংশ শব্দ

দুয়ের এক, তিনের এক—এইভাবে বাংলায় বলা হয়। কতকগুলি তদ্ভব শব্দও ব্যবহৃত হয়।

আধ (½)<প্রা অড্ঢ<সং অর্ধ। **সাড়ে**<প্রা সড্ঢ<সং সার্ধ। **দেড়**<(১½)<প্রা দি-অড্ঢ<সং দ্বি-অর্ধ। **আড়াই** (২½)<প্রা অড্ঢতীঅ<সং অর্ধ-তৃতীয়। **তেহাই** (⅓)<তেহাইঅ<সং ত্রিভাগিক। **চৌঠা** (¼)<প্রা চউত্থ<সং চতুর্থ। **সওয়া**<সং সপাদ। **পৌনে**<সং পাদোন।

প্রশ্ন ১১। বাংলা স্বরধ্বনির ইতিহাস লেখ।

অথবা, বাংলাভাষায় আদিস্বর, মধ্যস্বর (ব্যঞ্জনঅব্যবহিত এবং সন্নিকৃষ্ট) এবং অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন কিভাবে ঘটিয়াছে উদাহরণ-সহ বুঝাইয়া দাও।

উত্তর ঃ ১। আদিস্বর ঃ—আদিস্বর বলিতে প্রথম অক্ষরে (Vowel in initial syllable) বুঝায়।

(ক) কতকগুলি ক্ষেত্রে আদিস্বর লুপ্ত হইয়াছে : যেমন,—

অ।—মোটামুটিভাবে রক্ষিত। কখনো কখনো মধ্যস্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে **লুপ্ত :** যেমন,—অতসী>তিসি। অপিনদ্ধ>পিনদ্ধ। উদ্ধার>ধার। **উ**।—লুপ্ত : যেমন,—উড়ুম্বর>ডুমুর। উপবিশতি>বইস, বসে। উপানহ্>পানই। **এ**।—ক্বচিৎ লুপ্ত।

(খ) আদিস্বর অনেকগুলি ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হইয়াছে : যেমন,—

অ>আ।—অশীতি>আশি। অপর>আর। অপমান>আপমান। অস্মাকম্>আমার। অক্ষ>আক। অদ্য>আজ। **অ>ও**।—বন, মন, জন-এর উচ্চারণ হয় বোন, মোন, জোন। **আ>অ**।—প্রাকার>পগার, থালা>থলা। **ই>ইঁ**।—ইন্দুর>ইঁদুর। ইষ্টক>ইঁট। **ঋ>ঈ, ই**।—ভৃঙ্গরোল>ভীমরুল>ভিংরুল। **এ>অ্যা**।—চেলা>চ্যালা। ভেড়া>ভ্যাড়া। **অই>এ**।—চৈতন্য>চেতন। তৈল>তেল। **অউ>ও**।—চৌর>চোর। **উব>ও**।—সুবর্ণ>সোনা।

(গ) আদিস্বর বহুক্ষেত্রে রক্ষিত হইয়াছে : যেমন,—

ই, ঈ।—এক ব্যঞ্জনের পূর্বে বাংলায় রক্ষিত। কি, কী, কিল, খীর। **আ**।—এক ব্যঞ্জনের পূর্বে রক্ষিত। আইল, কাউআ, খায়। **উ, ঊ**—এক ব্যঞ্জনের পূর্বে **রক্ষিত**। উরুবস্ত>উরু। **এ**।—রক্ষিত। কেয়ারী, কেহ, দেউল। **ও**। **রক্ষিত**। কোল, ঘোড়া, দোলা।

২। **মধ্যস্বর ঃ**—(ক) ব্যঞ্জনব্যবহিত স্বরধ্বনি (Vowels not in contact)

অ।—লোপ। ওড়না>ওড়্না। বলিব>বল্ব। অপরাজিতা>অপ্‌রাজিতা।

অ>ই।—পতঙ্গ>ফড়িং। অঙ্গন>আঙ্গিনা।

আ ।—লোপ। গোয়ালা>গয়লা। গোপাল>গোপ্‌লা। উৎপাটয়তি> উপ্‌ড়ে।

ই, ঈ>অ ।—গৃহিণী>ঘরণী। পিঁপিড়া>পিঁপড়া। চাঁদিনী>চাঁদনী।

ই, ঈ ।—লোপ। ফটিক>ফট্‌কে। চলিল>চল্‌ল। পানি-কৌড়ী> পান্‌কৌড়ী।

উ, ঊ ।—লোপ। কুক্কুট>কুঁকড়া। বিদ্যুৎ> বিজুলী>বিজ্‌লী। উঁচু-কপালী>উঁচ্‌কপালী।

এ>ই, অ ।—সন্দেহ>সন্দ। প্রতিবেশী>পড়্‌শী।

ও>উ ।—গালোনী>আলুনী। **ও** ।—লোপ। গামোছা>গামছা।

মধ্যস্বর রক্ষিত হইবার দৃষ্টান্তও অনেক পাওয়া যায়: যেমন,—**অঞ্চল>আঁচল**; ক্রন্দন>কাঁদন, নিকট>নিয়ড়, সাগর>সায়র।

খ। সন্নিবিষ্ট স্বরধ্বনি (Vowels in contact)

অ+ই>ঐ ।—সখী>সই>সে। পইঠা>পৈঠা।

অ+উ>ঔ ।—বধূ>বউ>বৌ। মুকুট>মউড়>মৌড়।

অ+উ>ও ।—বউল>বোল>বোল। চলতু>চলউ>চলু (-ক)।

অ+ই>এ ।—গতইল্ল>গইল্ল>গেল।

আ+ই>এ ।—নাইর>নেরে। আইহ>এয়ো। **আমিষ>আঁইষ>আঁষ।**

অ+অ>অ, আ ।—কদলক>কঅলঅ>কলা।

ই, ঈ+অ>ঈ, ই ।—চলিত>চলিঅ>চলী, চলি।

উ, ঊ+অ>ঊ, উ ।—গোরূপ>গোরূঅ>গোরু।

এ+অ>এ ।—দেবকুল>দেউল

ও+অ>ও ।—যোগ>যোঅ>যো, জো।

ও+ই>ওই, উই ।—গোমিন>গোমিঁঅ>গুঁই।

ও+উ>ও, অ ।—গোধূম>গোম>গম।

৩। **অন্ত্যস্বর:**

অ—লুপ্ত ।—অভ্র>আব>আব্‌। আম্র>আম্‌। **হস্ত>হাত্‌।**

অ, অ>অ, ও ।—চলহ>চল, চলো।

আ, অ>আ ।—কটাহ>কড়া। ঘাত>ঘাঅ>ঘা।

ইঅ, ইআ>ই ।—করিয়া>করি। ঘৃত>ঘিঅ>ঘি।

উঅ, ঊঅ>ঊ, উ ।—মুখ>মু। গোরূপ>গোরূঅ>গোরু।

এঅ>এ ।—দেব>দে।

ওঅ>ও ।—যোগ>যোঅ>যো। রোম>রোঁ।

আ>অ—লুপ্ত।—আশা>আশ্। গঙ্গা>গাং। ভিক্ষা>ভিখ্। হরিদ্রা> হলুদ্।

ইকা>ইআ, ইঅ>ই, ঈ।—চৌযিকা>চুরি। কথিনিকা>কহিনিআ> কাহিনী।

ই, ঈ>ই—লুপ্ত।—অক্ষি>আঁখি>আঁখ্। কালি>কাল্। চারি> চার। রাতি>রাত।

উ, ঊ—লুপ্ত।—তন্তু>তাঁত্, ধাতু>ধাত্।

এ>অ—লুপ্ত।—পরে>পর্, ঘরেঘরে>ঘরঘর।

প্রশ্ন ১২। বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত কর।

উত্তর ঃ ক্—(১) পদের আদিতে ক্ ধ্বনি বজায় রহিল। একক ও যুক্ত ব্যঞ্জন উভয় ক্ষেত্রেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। করোতি>করই>করে। কাথ>কাঢ> কাই। স্কন্ধ>কন্ধ>কাঁধ। (২) ক+ব্যঞ্জন (পদের আদিতে ছাড়া)>ক। পক্ব> পক্ক>পাকা। চক্র>চক্ক>চাকা। মর্কট>মক্কট>মাকড়। (৩) পদান্তে প্রত্যয়-স্থানীয় -ক্ বাংলায় কখনো কখনো নূতন দেখা দিয়াছে। দয়তু>দেউ>দেউক।

খ্—(১) পদের আদিতে স্থিত খ্ বজায় রহিল। সং খাদতি>প্রা খাঅই> বাং খাই। সং খড্গ>বাং খাঁড়া। সং খাদ্য>বাং খাজা। (২) পদের আদিতে ষ-কার বা স-কার যুক্ত ক্>খ্। এই পরিবর্তন প্রাকৃতযুগেই ঘটিয়া বাংলায় বজায় রহিয়াছে। সং ক্ষুদ্র>প্রা ক্ষুদ্দ>বাং খুদ। সং স্কন্ধাগার>প্রা খন্ধাআর>বাং খামার। (৩) পদের আদিতে ক্র>খ্। এইরূপ পরিবর্তন কচিৎ ঘটিয়াছে। সং ক্রীড়তি> প্রা খেলই>বাং খেলে। পদমধ্যে ব্যঞ্জনযুক্ত ক্ ও-খ্ প্রাকৃতে ক্ খ্ হইয়াছে। সং রক্ষতি>প্রা রক্খই>বাং রাখে। সং শঙ্খ>শাঁখ।

গ্—(১) পদের আদিতে একক অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত গ্ রহিয়া গিয়াছে। সং গোরূপ>প্রা গোরূঅ>বাং গোরু। সং গ্রামিক>প্রা গ্রামিঅ>বাং গাঁই, গেঁয়ো। (২) পদের মধ্যে ব্যঞ্জনযুক্ত গ্>প্রাকৃত গ্ গ্>বাংলায় গ্। সং মুদ্গ>প্রা মুগ্গ> বাং মুগ। সং বল্গা>প্রা বগ্গা>বাং বাগ্।

ঘ্—(১) পদের আদিতে ঘ্ বজায় রহিল। সং ঘর্ম>প্রা ঘম্ম>বাং ঘাম। সং ঘাত>প্রা ঘাঅ>বাং ঘা। (২) অনেক সময়ে গ্>ঘ্। গৃহ>ঘর। গ্রথক> ঘটক। (৩) পদের মধ্যে ব্যঞ্জনযুক্ত ঘ্>প্রা গ্ঘ্>বাং ঘ্। সং ব্যাঘ্র>প্রা বগ্ঘ >বাং বাঘ। সং দীর্ঘ>প্রা দিগ্ঘ>বাং দীঘ।

ঙ্—(১) ঙ্+ক্, ঙ্+খ্ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি নাসিক্য করিয়া ঙ্-এর বিলোপ। প্রাচীন বাংলায় এই ঙ্-কারের অস্তিত্ব ছিল: সং সঙ্ক্রম>বাং সাঁকো। ঙ্+খ্ (প্রা বাং সাঙ্কম)। সং অঙ্ক>প্রা অঙ্ক>বাং আঁক। সং শঙ্খ>প্রা সঙ্খ>বাং শাঁখ।

(২) ঙ্+গ, ঙ্+ঘ>ঙ্। সং সঙ্গ>প্রা সঙ্গ>বাং সঙ্। সং রঙ্গ>প্রা রঙ্গ>বাং রঙ্। সং গঙ্গা>বাং গাঙ্।

চ্—(১) পদের আদিতে ও মধ্যে একক চ্ বজায় আছে। সং চন্দ্র>প্রা চন্দ>বাং চাঁদ। সং পেচক>প্রা পেচঅ>বাং পেঁচা। (২) পদের মধ্যে-চ্চ্, -ঞ্চ> একক চ্। সং ক্রৌঞ্চ>প্রা কোঞ্চ>বাং কোঁচ। সং উচ্চ>প্রা উচ্চ>বাং উচ। সং পঞ্চ>প্রা পঞ্চ>বাং পাঁচ।

ছ্—(১) পদের আদিতে ছ্ বজায় আছে। সং ছত্র>প্রা ছত্ত>বাং ছাত। সং ছেদনিকা>প্রা ছেঅণিআ>বাং ছেনী। সং ছন্ন>প্রা ছন্ন>বাং ছানা। (২) পদের আদিতে শ্, ষ্, স্>ছ্—এইরূপ পরিবর্তন কদাচিৎ দেখা যায়। সং শাবক>প্রা সাবঅ>বাং ছা। (৩) কখনো কখনো পদের আদিতে বা মধ্যে ক্ষ>ছ্। সং ক্ষুরিকা>প্রা ছুরিআ>বাং ছুরি। (৪) ছ-সংযুক্ত ব্যঞ্জন>প্রা চ্ছ>বাংলা ছ। সং বৎস>প্রা বচ্ছ>বাং বাছা। সং মৎস্য>প্রা মচ্ছ>বাং মাছ।

জ্—(১) পদের আদিতে একক জ্ রহিয়া গেল। অন্য ব্যঞ্জনযুক্ত জ্ও বজায় আছে। জাগ্রতি>জগ্গই>জাগে জ্বলতি>জ্বলই>জ্বলে। (২) পদমধ্যস্থিত জ্ কখনো কখনো রহিয়া গিয়াছে। সং ভ্রাতৃজায়া>বাং ভাজ। (৩) পদমধ্যে সংস্কৃত জ্জ>জ। সংস্কৃত জ-যুক্ত ব্যঞ্জন>প্রা জ্জ>বাং জ্। সং লজ্জা>বাং লাজ। সং অদ্য>প্রা অজ্জ>বাং আজ।

ঝ—(১) বাংলা পদের আদিতে ঝ-কারযুক্ত শব্দগুলি অধিকাংশই দেশী বা ধ্বন্যাত্মক। (২) কাচৎ পদের আদিতে সংস্কৃত বা প্রাকৃত জ, য, ধ>ঝ। সং জুষ্ট>প্রা জুট্‌ঠ>বাং ঝুট। সং জুর্ণ> প্রা জুন্ন>বাং ঝুন। সং দুহিতা>প্রা ধীতা>ঝিঅ>ঝি। (৩) পদের মধ্যে সং ধ্>প্রা ঝ>বাং ঝ। সং সন্ধ্যা>প্রা সঞ্ঝা>সাঁঝ। সং উপাধ্যায>প্রা উঅজ্ঝাঅ>বাং ওঝা।

ঞ্—(১) আধুনিক বাংলায় এই ধ্বনি প্রায় নাই। পুরানো বাংলায় ইহার ব্যবহার ছিল: যেমন, গোসাঞি। (২) সং ঞ্+কোনো ব্যঞ্জন>প্রা ণ্ণ্>বাং সং সংজ্ঞা>প্রা সণ্ণা>বাং সান। সং রাজ্ঞী>প্রা রণ্ণিআ>বা রানী।

ঞ্+চ্ বর্গ ধ্বনি>বাংলায় নাসিক্য স্বর+চ্ বর্গধ্বনি। সং সং পঞ্জিকা>প্রা পঞ্জিআ>বাং পাঁজি। সং অঞ্জলি ... আঁজল

ট্—(১) পদের আ...

ব্যঞ্জন>প্রাকৃত ট্ট

>প্রা মট্টিআ>বা

বাংলায় পদের

ট-রে রূপান্তরি

সা .জী.

আ-বাং আংটি। (৪) সংস্কৃত ষ্ণ অর্ধতৎসম বাংলা শব্দে ষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণ>কেষ্ট। বিষ্ণু>বিষ্টু।

ঠ্‌—(১) দেশী এবং আগন্তুক শব্দে পদের আদিস্থিত ঠ্‌ বজায় আছে। ঠাকুর, ঠোঙা। (২) পদের মধ্যে সংস্ত, স্থ>প্রাকৃত ট্‌ঠ>বাং ঠ। সং অস্থিক>প্রা প্রা অট্‌ঠিঅ>বাং আঁঠি। সং প্রস্থ>প্রা পট্‌ঠ>বাং পাঠ>পাট। (৩) পদের মধ্যে —ষ্ট, ষ্ঠ, স্থ>প্রাকৃতে ট্‌ঠ, ণ্ঠ>বাং ঠ। সং গোষ্ঠ>প্রা গোট্‌ঠ>বাং গোঠ। গ্রন্থি> প্রা গণ্‌ঠি>গাঁঠি।

ড্‌—(১) পদের আদিতে ক্বচিৎ ড্‌-কার থাকিয়া গিয়াছে। উহা সংস্কৃত দ-জাত। সং দংশ>প্রা ডংস>বাং ডাঁশ। সং ডিম্ব>বাং ডিম। (২) দেশী শব্দে পদের আদিতে ড্‌ বজায় রহিল: ডাব, ডিঙ্গি। (৩) পদের মধ্যে সং ত্‌> প্রা ড্‌>বাং ড়্‌। সং পততি>প্রা পডই>বাং পড়ে। সং চততি>প্রা চডই> বাং চড়ে। (৪) সংস্কৃত পদের মধ্যে যুক্ত অথবা একক ড্‌>প্রা ড, ড্‌ড, ণ্‌ড> বাং ড়্‌। সং নাডিকা>প্রা ণাডিআ>বাং নাড়ি। সং উড্‌ডয়তি>প্রা উড্‌ডেই> বাং উড়ে।

ঢ্‌—(১) দেশী শব্দে পদের আদিতে ঢ বজায় রহিল। যেমন ঢাল, ঢঙ, ঢেঁড়স। (২) কখনো কখনো পদের আদিতে অবস্থিত ধ্‌ প্রাকৃত ও বাংলায় ঢ হইয়াছে। সং ধাবয়তি>বাং ঢালে। (৩) সং ড>বাং ঢ—ইহা কদাচিৎ ঘটিয়াছে।

ণ্‌—(১) ণ্‌-কার বাংলায় লুপ্ত। (২) পদের মধ্যে ণ্‌+ট বর্গ ধ্বনি >বাংলা নাসিক্য স্বর+ট বর্গধ্বনি। কণ্টক>কাঁটা। সং গ্রন্থ>প্রা ঘণ্ট>বা ঘাঁটি।

ত্‌—(১) পদের আদিতে একক ত্‌ বা ব্যঞ্জনযুক্ত ত>ত্‌ রহিল। সং তাপ>প্রা তাব>বাং তা। সং ত্রোটয়তি>প্রা তোড়েই>বাং তোড়ে। (২) প্রাকৃত ত্ত, ক্ত>বাং ত্‌। সং মৌক্তিক>প্রা মোত্তিঅ>বাং মোতি। সং বর্তিকা>প্রা বত্তি-আ>বাং বাতি। সং নপ্তৃক>প্রা ণত্তিঅ>বাং নাতি।

থ্‌—(১) পদের আদিতে স্ত, স্থ>প্রাকৃত থ্‌>বাং থ্‌। সং স্তম্ভ>প্রা থম্ভ ম্ম। সং স্তর>বাং থর। (২) পদের মধ্যবর্তী স্থ, স্ত, স্থ, ষ্ট, র্থ>প্রাকৃত মস্তক>প্রা মত্থঅ>বাং মাথা। সং স্বার্থ>প্রা সত্থ>বাং সাথ।

পদের [illegible] দ রহিয়া গেল। দ্র>দ্‌। সং দীর্ঘ>প্রা দিগ্‌ঘ>

[illegible] র-কারযুক্ত ব্যঞ্জন>প্রাকৃত

[illegible] ম>বাং কাদা। সং

[illegible] বল>বাং ধল।

। (২) পদের

বাংলা কর্মকারকের বিভক্তি

(১) সংস্কৃত ম্>প্রাচীন বাংলায় লুপ্ত : যেমন,—'গুরু' পুচ্ছিঅ (গুরুকে ... মধ্য-
আধুনিক বাংলায় যেখানে মুখ্যকর্ম অনির্দিষ্ট সেখানে বিভক্তিহীন কর্মপদ হয় : যে.
—বাঘে 'হরিণ' মারে। সে 'মাছ' খায়।

(২) সংস্কৃত -কৃতম্>-কঅঁ>-ক। যেমন প্রা-বাংলা—মন্তিএঁ 'ঠাকুরক'
প'রনির্বিত্তা (মন্ত্রীর দ্বারা ঠাকুরকে নিবৃত্ত করা হইল)। মধ্যবাংলা—'মোক' নিবুঝি
পাগিল (আমাকে নিবুঁদ্ধিতে পাইল)

(৩) বাংলা গৌণকর্মে -রে বিভক্তির ব্যবহার আছে। উহার উৎপত্তি
বিভক্তি + তৃতীয়া-সপ্তমীর —এ বিভক্তি/হইতে : যেমন,—প্রা-বাংলা 'কাহেরে'
ভণি (কাহাকে কি বলিয়া)।

(৪) সপ্তমী বিভক্তির -এ, -তে যুক্ত পদও মধ্যবাংলায় গৌণকর্মের বিভক্তি
রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে : যেমন,—'কাতে' নিবেদিবোঁ মোএঁ (কাহাকে নিবেদন করি
আমি)।

বাংলা করণকারকের বিভক্তি

(১) সংস্কৃত এন>-এঁ, -এ। যেমন,—বেগেন>প্রা-বাং বেগেঁ। হস্তেন—
হাথেঁ>হাতে।

(২) অধিকরণ ও করণের বিভক্তি এক হওয়াতে অধিকরণের বিভক্তি করণে
ব্যবহৃত হইয়াছে প্রাচীন বাংলায় : যেমন, সুখদুখেতেঁ।

বাংলা অধিকরণ কারকের বিভক্তি

(১) সংস্কৃত অধিকরণের বিভক্তি -ই বাংলায় লুপ্ত। ফলে বাংলা অধিকরণকারক
প্রায়ই বিভক্তিহীন। আমি 'বাড়ী' যাই।

(২) প্রা-বাংলা -হি, -হিঁ বিভক্তি<সংস্কৃত -ক প্রত্যয়ান্ত শব্দে -ই বিভক্তি
অথবা সং-ভিস বিভক্তি : যেমন,—ঘরহি<গৃহকে।

(৩) মধ্যবাংলা -এ বিভক্তি<সংস্কৃত -ক প্রত্যয়ান্ত শব্দে -ই বিভক্তি, অথবা
সং-ভিস্ বিভক্তি : যেমন,—ঘরে<গৃহকে।

(৪) সপ্তমীর -এ বিভক্তির সহিত ষষ্ঠীর -র বিভক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা
যায় : যেমন,—প্রা-বাংলায় 'চান্দরে' চান্দকান্তি জিম পড়িহাসঅ।

(৫) সংস্কৃত অন্তঃ>ত। ইহা বাংলা অধিকরণের বিশিষ্ট বিভক্তি। ইহার নানাবিধ
রূপান্তর বাংলা অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত। -ত+-এ (সপ্তমীর)=-তে; -ত+-এঁ
(তৃতীয়া)=-তেঁ; -এ (সপ্তমীর)+-ত=-এত; -এ (সপ্তমীর)+-ত+-এ (সপ্তমী)
=-এতে; -এঁ (তৃতীয়া)+-ত+-এ (সপ্তমী)=-এঁতে। এই সব রূপে ...

আ-বাংলা অধিকরণ প্রযুক্ত হয়। প্রা-বাং সঙ্কমত, গঅণত ; আ-বাং নদীতে, বিষ্ণু প্রভৃতি।

॥ সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

(১) -র<সংস্কৃত কর ; -আর<কার ; -এর<কের। বাংলা ষষ্ঠী বিভক্তির বাঁপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যবহার -র, -আর, -এর।

(২) বাংলায় সংস্কৃত অনুসর্গপদ কর, কার, কেরও ষষ্ঠীর বিভক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে : যেমন—সবাকার (সবার), মধ্যবাংলা রূপাকর>রূপার।

(৩) প্রাচীন বাংলায় সম্বন্ধপদ ছিল বিশেষণ। তাই -র বিভক্তি হইয়া যাইত দুঃস্থ যেমন.—'কাহেরি' শঙ্কা।

(৪) পুরানো ষষ্ঠী বিভক্তির পদ অপভ্রংশ হইতে বাংলায় আসিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা অবশ্য বেশী নয়। প্রাচীন বাংলার স্তর পর্যন্ত ইহা প্রচলিত ছিল দেখা যায়।

বাংলা অপাদান কারকের বিভক্তি

(১) বাংলায় বিশিষ্ট পঞ্চমীর বিভক্তি নাই

(২) প্রাচীন বাংলায় অপভ্রংশের হুঁ বা হু বিভক্তি দেখা যায়। অবশ্য খুবই কম। খেপহুঁ <সং ক্ষেপাৎ ; রঅণহু <সং রত্নাৎ পরবর্তী কালে এই বিভক্তি একেবারেই লোপ পায়।

(৩) প্রাচীন বাংলায় প্রায়ই এবং মধ্যবাংলায় সর্বদা তৃতীয়া, সপ্তমী, বা ষষ্ঠী বিভক্তি পঞ্চমীর কাজ চালাইত। যেমন—প্রা-বা দশবল-রঅণ হরিঅ দশদিসেঁ। এখানে 'দশদিসেঁ' তৃতীয়া বিভক্তি পঞ্চমীর কাজ করিয়াছে। মধ্যবাংলা—ঘরত বাহির। 'ঘরত' সপ্তমী বিভক্তি-অন্ত পদ পঞ্চমীর অর্থ প্রকাশ করিয়াছে।

কারকবাচক অনুসর্গ

কর্তা এবং মুখ্য কর্ম ছাড়া অন্য কারকের অর্থে নানা অনুসর্গ চলিত আছে বাংলায়। এই ধরনের প্রায় সব অনুসর্গই ষষ্ঠী বিভক্তির পরে বসে। বাংলা অনুসর্গগুলি দুই প্রধান শ্রেণীতে পড়ে : (১) নাম-অনুসর্গ অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণ ; অসমাপিকা।

নাম-অনুসর্গ : তদ্ভব

অগ্র (চতুর্থী-পঞ্চমী)—যেমন, আয়িলা কংসের 'আগক' নারদমুণী। (মধ্যবাংলা)

অন্তর (চতুর্থী-গৌণকর্ম)—যেমন, তোহোর 'অন্তরে'। (প্রা-বাংলা)

কার্য (চতুর্থী)—যেমন, লাগিবে কোণ 'কাজে'। দেখিবার 'কাজে' হেথা প্রচুর আহ্বান (অনুঅর্থে)।

পদ, পাদ (চতুর্থী-পঞ্চমী)—রোলেঁ। তোর 'পাএ'। (মধ্যবাংলা)

পশ্চাৎ (দ্বিতীয়া-পঞ্চমী)—তার 'পাছে' সরস্বতী লজ্ঘিয়া হয়রে (মধ্যবাংলা)

পার্শ্ব (চতুর্থী-পঞ্চমী-গৌণকর্ম)—মল্লিকাকলিকা 'পাশে' ভ্রমর ঐ পাএ বসে। (মধ্যবাংলা)

মধ্য (সপ্তমী)—বন'মাঝেঁ' পাইল তরাসে। (মধ্যবাংলা)

সম (তৃতীয়া)—হালো ডোম্বী তোএ 'সম করিব মো সাঙ্গ। (প্রা-বাংলা)

হস্ত (তৃতীয়া-চতুর্থী)—তাহার 'হাতে' হইবে কংসের বিনাশ। (মধ্যবাংলা)

(খ) নাম-অনুসর্গ : তৎসম

অর্থ (চতুর্থী) 'ধাম্মার্থে' চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই। (প্রা-বাংলা)

কারণ (চতুর্থী)—কংসের 'কারণে' হয় সৃষ্টির বিনাশে। (মধ্যবাংলা)

চরণ (চতুর্থী)—পিতার 'চরণে' নিবেদন করলাম।

নিকট (চতুর্থী-পঞ্চমী)—সাধুর 'নিকটে' যত অপরাধ করে (মধ্যবাংলা)

বিদ্যমান (চতুর্থী-গৌণকর্ম)—তাহার 'বিদ্যমানে' জিজ্ঞাসা করিল।

সঙ্গ (তৃতীয়া)—কার 'সঙ্গে' যাচ্ছ?

সমীপ (তৃতীয়া)—তাহার 'সমীপে' নিবেদন করিলাম।

অপেক্ষা (পঞ্চমী)—আমার 'অপেক্ষা' সে কষ্টসহিষ্ণু।

কর্তৃক, দ্বারা (তৃতীয়া)—রাম 'কর্তৃক শ্যাম প্রহৃত হইল। আমার 'দ্বারা' একাজ হইবে না।

জন্য (চতুর্থী)—তোমার 'জন্য' এক থা লাম কেন?

নিমিত্ত (চতুর্থী)—বন্ধুর 'নিমিত্ত' সবাই প্রাণপণ করে

(গ) নাম-অনুসর্গ : বিদেশী

বিদেশী যে দুই একটি নাম-অনুসর্গ বাংলায় পাওয়া যায় তাহা ফারসী ভাষা হইতে আগত।

বদল (তৃতীয়া)—যশোদাকন্যা গুপ্তবেশে কৃষ্ণের 'বদলে' আনি দিল বসুদেবে। (মধ্যবাংলা)

বরাবর (চতুর্থী-গৌণকর্ম)—কংস'বরাবরে' বার্তা জানাইল নির্ভয়ে। (মধ্যবাংলা)

(ঘ) অসমাপিকা : অনুসর্গ

কর্ ধাতু জাত (দ্বিতীয়া-তৃতীয়া)—দৃঢ় 'করিঅ' (প্রাচীন বাংলা) : ভালো 'করিয়া' (আধুনিক বাংলা)।

গম্ ধাতু জাত (চতুর্থী-সপ্তমী) —ঝাড়ি 'গিয়া' রহিলাম (আধুনিক) কহি 'গই' পইঠা (প্রা-বাংলা) ।

চাহ্ ধাতু জাত (তুলনায়)—রামের 'চেয়ে' (চাইতে) আমি ছোট কিসে ?

থাক্ ধাতু জাত (পঞ্চমী)—গাছ 'থেকে' ফলটা পড়ল।

দা ধাতু জাত (তৃতীয়া)—হাত 'দিয়া' দেখ। 'দিআঁ' চঞ্চালী (প্রা-বাংলা)।

লগ্ ধাতু জাত (চতুর্থী)—গঅণ টাকলি 'লাগি'রে চিত্ত পইঠ নিবাণা। (প্রা-বাংলা)

প্রশ্ন ১৪। বাংলা শ্বাসাঘাত বা বলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ কর। ইহা বাংলা ছন্দের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা বল।

উত্তর : ১। বৈদিক সাহিত্যে স্বররীতি বা Intonation-এর প্রয়োগ দেখা যায়। সেক্ষেত্রে উচ্চারণের বিচার হইয়াছে "উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত"—এই পার্থক্যের সূত্রে। বৈদিক ভাষায় শ্বাসাঘাত প্রচলিত ছিল না। যে স্বরধ্বনিতে প্রধান স্বর পড়িত তাহার নাম ছিল উদাত্ত, তাহার পরবর্তী স্বরধ্বনিতে উৎপন্ন অপ্রধান স্বরের নাম ছিল অনুদাত্ত, এবং যে স্বরের স্বর উঠিয়াই নামিয়া আসিত তাহার স্বর ছিল স্বরিত। স্বরের পরিবর্তনে বৈদিক শব্দে অর্থের পরিবর্তন ঘটিত : যথা 'ব্রহ্মণ' শব্দে আদি স্বরধ্বনি উদাত্ত হইলে শব্দটি হইত ক্লীবলিঙ্গ। অর্থ দাঁড়াইত 'প্রার্থনা, স্তব' প্রভৃতি। অন্ত্য স্বরধ্বনি উদাত্ত হইলে শব্দটি হইত পুংলিঙ্গ। অর্থ দাঁড়াইত 'প্রার্থনাকারী, স্তোতা'। এইরূপ—'রাজপুত্র' শব্দটির প্রথম স্বরধ্বনি উদাত্ত হইলে বহুব্রীহি সমাস; অর্থ হইত 'রাজা হইয়াছে পুত্র যাহার'। আবার অন্ত্য স্বরধ্বনি উদাত্ত হইলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস; অর্থ হইত 'রাজার পুত্র'।

২। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্তর শেষ হইবার পূর্বেই স্বরের পরিবর্তে বলের আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। স্বর ও বলের পার্থক্য হইল এই যে, স্বরে স্বরধ্বনির তীব্রতা থাকে, বলে থাকে শ্বাসাঘাত বা শ্বাসের ঝোঁক। সংস্কৃতে আদি ছাড়া অন্ত্য অক্ষরে যে বল ছিল তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে আদি স্বর লোপ পাইয়াছে। কারণ এই বল।

৩। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় বলের অস্তিত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই বল পড়িত শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে। ফলে আদি স্বরলোপের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। সং অপি > পি, বি। সং খলু > খু। আদি অক্ষরেও কচিৎ বলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

প্রা. ভা. আ. ভাষার শব্দগুলি মধ্যভারতীয় স্তরে যে ভাবে পরিবর্তিত হইল তাহার পিছনে বলের স্থান একটি বিশিষ্ট কারণ। একই শব্দের বিভিন্ন স্থানে বল

থাকায় ধ্বনিপরিবর্তন ভিন্ন খাতে ঘটিয়াছে এইরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। সং দ্বিপদ (আদিতে বল)>পালি দিপদ। সং দ্বিপদ (অনাদি অক্ষরে বল)>পালি দ্বুপদ।

(৪) প্রাচীন বাংলা ভাষায় অনাদ্য শ্বাসাঘাতরীতি প্রচলিত। আবার আদ্যস্বরে শ্বাসাঘাতও চলিত। অনেক ভাষাতাত্ত্বিক ইহার প্রথম রীতিটিকে বলিয়াছেন সর্বভারতীয় রীতি এবং দ্বিতীয় রীতিটিকে বলিয়াছেন গৌড়ী রীতি। প্রাচীন বাংলায়, অবশ্য আদ্য শ্বাসাঘাতের রীতি অনন্য হইয়া ওঠে নাই। তখনও অপর রীতি অর্থাৎ অনাদ্য শ্বাসাঘাতের রীতি পাশাপাশি প্রচলিত দেখা যায়। যেমন হড়িগাঙ্গ, কপাস অন্ধারা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনাদ্য শ্বাসাঘাত / অনাদ্য শ্বাসাঘাতের ফলে অনেক সময়ে আদি স্বরলোপ পাইয়াছে : যেমন, অলাবু>লাউ, অভ্যন্তর>ভিতর। আদ্য শ্বাসাঘাতের উদাহরণ মেলে—সাঙ্কম, কান্তি, বাসর, কাঠোআল।

(৫) মধ্যবাংলা পর্যন্ত উভয় রীতি পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল : যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—আদ্য—আসুখ, আইহন, আবুধি, আযুধি ; অনাদ্য—পালাএ, বাজাএ, পাঠাএ। অবশ্য মধ্য বাংলায় আদ্য শ্বাসাঘাতরীতিই অধিক প্রচলিত হইয়া পড়ে।

(৬) নব্য বাংলা স্তরে আদ্য শ্বাসাঘাতরীতি জয়যুক্ত হইল :

প্রাচীন বাংলা	মধ্য বাংলা	আধুনিক বাংলা
অখাড়া	আখড়া	আখ্‌ড়া
কুম্‌হাড়া	কুমড়া	কুম্‌ড়া
তাম্বোলী	তামূলী	তাম্‌লী
বাসহর	বাসঅর	বাসর

দীর্ঘ উপান্ত স্বরে শ্বাসাঘাত নিখিল ভারতীয় রীতি। বাংলা ন. ভা. আর্য ভাষার অন্যতম হইয়াও আদ্যক্ষরী শ্বাসাঘাতের রীতি অনুসরণ করিয়াছে। ইহার কারণ অনার্য প্রভাব বলিয়া মনে হয়। আর্যপূর্ব বাংলাদেশে দ্রবিড় অষ্ট্রীক ও ভোট-চীনা গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত ছিল। উহার প্রভাবে বাংলা আদ্য শ্বাসাঘাতের প্রচলন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

(৭) শ্বাসাঘাতের ফলে ধ্বনিপরিবর্তনের ক্ষেত্রে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :—(ক) যে-স্বরে শ্বাসাঘাত পড়ে তাহার ঘনিষ্ঠ ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। কখনো না>কক্‌খনো না। (খ) আদ্য শ্বাসাঘাতের ফলে মধ্যবর্তী স্বরের লোপ এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের সৃষ্টি হয় : অপরাজিতা>অপ্‌রাজিতা। ভাগিনেয়>ভাগ্‌নে। আঙুটি >আঙ্‌টি। (গ) অন্ত্যস্বরের লোপ বা ক্ষীণতা : হাত>হাত্‌। রীতি>রীত্‌।

(৮) ইংরেজীতেও আদ্য শ্বাসাঘাতের রীতি প্রচলিত। কিন্তু সেখানে বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি পদে স্বতন্ত্র ভাবে আদ্য শ্বাসাঘাত থাকে। বাংলা শব্দে স্বতন্ত্র ভাবে আদ্য শ্বাসাঘাত থাকিলেও বাক্যে ব্যবহৃত হইলে উহার প্রতিটি শ্বাসপর্বের প্রথম পদে আদ্যাক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। দুই ভাষার উচ্চারণের এই পার্থক্যটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত।

(৯) বাংলা ছন্দের উপরে আদ্যাক্ষরী শ্বাসাঘাতরীতির বেশ কিছু প্রভাব পড়িয়াছে। শ্বাসাঘাতের জন্যই পয়ার হইতে ধামালীর সৃষ্টি হইয়াছে : যেমন,—

বৃন্দাবনে রূপনগরে রসের নদী বয়।

ঢেউ আসিয়া তীর বহিয়া লাগল গোরার গায়।

ছড়ার ছন্দ শ্বাসাঘাতপ্রধান এবং এই ছড়ার ছন্দ হইতে আধুনিক শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ নির্মিত হইয়াছে।

ছড়ার ছন্দ—বিস্‌টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান।

শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ—গরীব গোরে দীপ জ্বেলো না ফুল দিও না কেউ ভুলে।

প্রশ্ন ১৫। বাংলা সর্বনাম পদগুলির প্রকৃতি এবং উহাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর। সর্বনাম পদের মূলভাগ দুইটি : (১) পুরুষবাচক সর্বনাম (Personal pronouns) এবং (২) নির্দেশক সর্বনাম (Demonstrative pronouns)। বাংলা সর্বনাম পদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : "বাংলা ভাষায় সর্বনামের খুব ঘটা। নানা শ্রেণীর সর্বনাম, যথা ব্যক্তিবাচক, স্থানবাচক, কালবাচক, পরিমাণবাচক, তুলনাবাচক, প্রশ্নবাচক।" (—রবীন্দ্রনাথ)

সংস্কৃতে পুরুষবাচক সর্বনাম দুইটি—'অস্মদ্' এবং 'যুস্মদ্'। ইহাদের কোনো লিঙ্গভেদ নেই। বিশেষণ রূপেও ইহাদের ব্যবহার নাই। নির্দেশক সর্বনামের লিঙ্গভেদ আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলি বিশেষণ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। আবার পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে ইহাদের সাধারণ এবং সম্ভ্রমসূচক দুইটি করিয়া রূপ আছে।

বাংলায় সর্বনামে লিঙ্গ-অনুসারে রূপভেদ হয় না। বাংলা সর্বনামের শব্দরূপ বিশেষ্যপদের শব্দরূপের মতই হয়। বিশেষ্যের সঙ্গে যেসব বিভক্তি বা অনুসর্গপদের যোগ হয়, সর্বনামের শব্দরূপে সেইগুলিই যুক্ত হয়।

॥ ক ॥ পুরুষবাচক সর্বনাম : উত্তম পুরুষ

(১) প্রা-বাংলায় হাঁউ, হঁউ কর্তৃকারকে ব্যবহৃত। হাঁউ, হঁউ <অপ হউ <প্রা হকং<সং অহকম্।

(২) প্রা-বাংলায় ম, মই<অপ মই<প্রা মএ<সং ময়া। যেমন, ভবঙ্গ ম শুনিআ, স্বপনে মই দেখিল।

অতীত কাল : নির্দেশক ভাব (কৃদন্ত)

প্রাচীন বাংলা	মধ্য বাংলা	আধুনিক বাংলা
সং -ত, -ইত প্রত্যয়জাত অথচ ল-প্রত্যয়হীন কৃদন্ত অতীত কালের রূপ প্রাচীন বাংলায় কিছু কিছু পাওয়া যায়।। সং প্র-বিশ্ +ক্ত=প্রবিষ্ট>প্রা পইট্ঠ>প্রা-বাং পইঠা। সং নষ্ট>প্রা-বাং ণঠা। সং চলিত>চলিঅ।	**-ত, -ইত** অন্ত্যমধ্য স্তরে কখনো কখনো নিত্যবৃত্ত অতীতের অর্থ প্রকাশ করিত। [আসিত,কহিত]	উত্তম পুং-**ইতাম**। [খেলিতাম] মধ্যম পুং-**ইতে**। সাধারণ। [খেলিতে] **-ইতেন**। সম্ভ্রম। [খেলিতেন]
সং ক্ত প্রত্যযান্ত পদ অপভ্রংশে হইত -ইল্ল। যেমন পূরিত> পুরইল্ল। অপভ্রংশের শেষ স্তরে ইল্ল>ল। যেমন পুরইল্ল>পুরল। এই 'ল' পূর্বমাগধী ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে অতীত ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিতে বিশেষ-ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাংলায় প্রাচীন স্তর হইতেই এই 'ল'-জাত 'ইল'-এর ব্যবহার রহিয়াছে। প্রাচীন বাংলায় কর্তা-কর্ম স্ত্রীলিঙ্গ হইলে ক্রিয়া-পদটিও স্ত্রীলিঙ্গ হইত। তবে কর্তৃ-বাচ্যে ইহার প্রয়োগ ছিল কম।	মধ্যস্তর হইতে কর্তৃবাচ্যে —ইল বিভক্তি-অন্তক ক্রিয়াপদের ব্যাপক প্রচলন ঘটে।	আধুনিক স্তরে ইল-বিভক্তি-অন্তক ক্রিয়াপদ সার্বজনীন হইয়া উঠে।
উত্তম পুং— **-ইল+-এসু, -ই**। [ফিটলেসু, ভইলি, হোইলি]	**-ইল+-ওঁ,** **-আহোঁ, -আও**। [দেখিলোঁ, দেখিলাহোঁ, দেখিলাঙ]	**-ইল+-উম্ -আম্,** **-অম্, -এম্**। [দেখলুম, দেখলাম, দেখলম, দেখলেম]

অতীত কাল : নির্দেশক ভাব (কৃদন্ত)

প্রাচীন বাংলা	মধ্য বাংলা	আধুনিক বাংলা
মধ্যম পুরুষ— **ইল + -এসি, -ই।** [অছিলেসি]	**-ইল + আ, -এ, —ই.** [দেখিলা, দেখিলে]	**-ইল + -ই, -আ, -এ, -এল।** [দিলি, (তুচ্ছার্থে), দিলা, দিলে (সাধারণ), দিলেন (সম্ভ্রমার্থে)]
প্রথম পুরুষ— **ইল + -এসি, -আ, -ই।** [হোইলেসি, পড়িলা]	**-ইল + -এঁ (-এ), -অন্ত, -আন্ত + -এন।** [কইলে, কৈলেঁ, গেলান্ত, করিলেন্ত, গেলেন, করিলেন।]	**-ইল + -এ, -এন।** [দিল, দিলে (সাধারণ দিলেন (সম্ভ্রম)]

নিত্যবৃত্ত কাল : নির্দেশক ভাব (কৃদন্ত)

আধুনিক বাংলায় নিত্যবৃত্ত কালের উৎপত্তি সংস্কৃত শতৃপ্রত্যয়ান্ত পদ হইতে।

প্রাচীন বাংলায় শতৃ-অন্ত সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার প্রায় ছিল না। কচিৎ শতৃ-অন্ত পদ দ্বারা অতীতের অর্থ বোঝানো হইত। [পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তে। পড়ন্তে অর্থে 'পড়িত'।]	মধ্য বাংলায় শতৃ-অন্ত পদের ব্যবহার আছে। যেমন জানিতোঁ, চাহিতেঁ। এখানেও সামান্য অতীতের অর্থ স্পষ্ট বুঝাইত না।	আধুনিক বাংলায় পুরুষ-ভেদে নিত্যবৃত্তে বিভক্তি-ভেদ আছে। উত্তম পুং **-ইতাম, -ইতেম।** [করিতাম, করতেম] মধ্যম পুং-**ইতে** (সাধারণ) [করিতে] **-তিস** (তুচ্ছার্থে) [করতিস] **-ইতেন** (সম্ভ্রমে) [করিতেন] প্রথম পুং-**তো** (সাধারণ) [করতো] **-তেন** (সম্ভ্রমে) [করতেন]

প্রশ্ন ১৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ভাষাতাত্ত্বিক ক্রমবিবর্তন বুঝাইয়া টীকা লিখ।

উত্তর : (১) **আইচ**। সং আদিত্য>আইচ্চ (ম. ভা. আ.)। পরিবর্তনের কারণ—দুইস্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন 'দ'-এর লোপ, এবং দন্ত্যবর্ণ ত-এর তালব্যীভবন। ত্য>চ্য। সমীভবন। চ্য>চ্চ। আইচ্চ>আইচ (বাংলা)। সমাক্ষর লোপ এবং অন্ত্য স্বরলোপ।

(২) **আজ**। সং অদ্য>প্রা অজ্জ (সমীভবনের ফল)>বাং আজ (সমাক্ষর লোপ, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্বস্বরের দৈর্ঘ্য)।

(৩) **আমড়া**। সং আম্রাতক>প্রা অম্বাডঅ। আদিস্বরের হ্রস্বত্ব। ম্র>ম্ব। ত>ড। অন্ত্যব্যঞ্জনের লোপ।)>বাং আমড়া (পূর্বস্বরের দৈর্ঘ্য। ব-লোপ)।

(৪) **আরশি**। সং আদর্শিকা>প্রা আধঅরসিআ>বাং আরশি।

(৫) **আলতা**। সং অলক্তক>প্রা অলত্ত (সমীভবন, অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ) >বাং আলতা (পূর্বস্বরের দীর্ঘতা, সমাক্ষর লোপ, অন্ত্যস্বরের দীর্ঘতা)।

(৬) **আঁক**। সং অঙ্ক>প্রা আঙ্ক (পূর্বস্বরের দীর্ঘীকরণ)>বাং আঁক (নাসিক্যীভবন, অন্ত্যস্বরের লোপ)।

(৭) **আঁশ**। সং অংশু>প্রা আঁসু (পূর্বস্বরের দৈর্ঘ্য, নাসিক্যীভবন) >বাং আঁশ (অন্ত্যস্বর লোপ)।

(৮) **ইঁদারা**। সং ইন্দ্রাগার>প্রা ইন্দাআর (স্বরমধ্যস্থ ব্যঞ্জনের লোপ) >বাং ইঁদারা (নাসিক্যীভবন, অন্ত্যস্বরের দৈর্ঘ্য)।

(৯) **উট**। সং উষ্ট্র>প্রা উট্‌ঠ (সমীভবন। র-ফলা>অ)>বাং উট (সমাক্ষর লোপ, অন্ত্যস্বর লোপ)।

(১০) **উনান**। সং উষ্ণাপন (এই সংস্কৃত শব্দটির লিখিত রূপ বৈয়াকরণেরা কল্পনা করিয়াছেন, প্রত্যক্ষতঃ পাওয়া যায় নাই।)>প্রা উণ্‌হাবণ (ষ্ণ>ষ্‌ণ>ন্‌হ। 'প' লোপ এবং ব-শ্রুতি)>বাং উনান।

(১১) **ওঝা**। সং উপাধ্যায়>প্রা উবঝ্‌ঝাঅ (প>ব। ধ্য>ঝ্‌ঝ। সমীভবন ও তালব্যীভবনের ফল)>বাং ওঝা (স্বরসংগতি)।

(১২) **কাঁকুই**। সং কঙ্কতিকা>প্রা কঙ্কইআ (ব্যঞ্জনলোপ)>বাং কাঁকুই (নাসিক্যীভবন, পূর্বস্বরের দৈর্ঘ্য, অন্ত্যস্বর লোপ এবং স্বরসংগতি)।

(১৩) **কাঁঠাল**। সং কণ্টকাল>প্রা কণ্ঠআল (মধ্যব্যঞ্জনলোপ)>বাং কাঁঠাল (নাসিক্যীভবন, পূর্বস্বরের দৈর্ঘ্য)।

(১৪) **কুমীর**। সং কুম্ভীর>প্রা কুম্‌হীর (ভ>হ)>বাং কুমীর (হ-লোপ)।

(১৫) **কেয়া**। সং কেতক>প্রা কেঅঅ (মধ্যব্যঞ্জনলোপ)>বাং কেয়া (য়-শ্রুতি)।

(১৬) **খন্তা**। সং খনিত্র>প্রা খনিত্ত>বাং খন্তা।

(১৭) **গাজন**। সং গর্জন>প্রা গজ্জন (সমীভবন)>বাং গাজন (সমাক্ষর লোপ এবং পূর্বস্বরের দৈর্ঘ্য)

(১৮) **গাঁঠ**। সং গ্রন্থি>প্রা গণ্ঠি (আদি ব্যঞ্জনের র-ফলা লোপ। মূর্ধণ্যীভবন) >বা গাঁঠ (নাসিক্যীভবন)।

(১৯) **ঘুঁটে**। সং গোবিষ্ঠা>প্রা গোইট্‌ঠা (মধ্যব্যঞ্জন লোপ। অন্ত্য ব্যঞ্জনে সমীভবন)>বাং ঘুঁটে (গ>ঘ। স্বতঃনাসিক্যীভবন, সমাক্ষর লোপ, স্বরসংগতি)।

(২০) **চাকা**। সং চক্র>প্রা চক্ক (সমীভবন)>বাং চাকা (সমাক্ষরলোপ, ক্ষতিপূরণস্বরূপ পূর্বস্বরের দৈর্ঘ্য)।

(২১) **চৌকা**। সং চতুষ্ক>প্রা চঅউক (ব্যঞ্জনলোপ)>বাং চৌকা (অন্ত্যস্বর দীর্ঘ)।

(২২) **জুয়া**। সং দ্যূত>প্রা জ্যুঅ (তালব্যীভবন, অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ) >বাং জুয়া (সমাক্ষরলোপ, য়-শ্রুতি, অন্ত্যস্বরের দৈর্ঘ্য)।

(২৩) **জ্যেঠা**। সং জ্যেষ্ঠতাত>প্রা জেট্‌ঠআঅ (য-কার লোপ। ষ্ঠ> ট্‌ঠ-এর সমীভবন। অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ)>বাং জেঠা।

(২৪) **ঝি**। সং দুহিতা>প্রা ধীতা (দুহ্>ধ। মধ্যস্বর লোপ)>মধ্য বাং ঝিআ (তালব্যীভবন, স্বরের হ্রস্বতা, অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ)>আ-বাং ঝি (অন্ত্যস্বর লোপ)।

(২৫) **টাকা**। সং টঙ্ক>প্রা টক্ক (সমীভবন)>বাং টাকা (সমাক্ষর লোপ এবং ক্ষতিপূরণমূলক স্বরদৈর্ঘ্য)।

(২৬) **তাঁত**। সং তন্ত্র>প্রা তন্ত (র্-লোপ)>বাং তাঁত (সমাক্ষর লোপ এবং নাসিক্যীভবন)।

(২৭) **তুরুক**। মোগলবর্গের বিদেশী শব্দ তুর্ক>অপভ্রংশ তুরুক্ক (স্বরভক্তি এবং সমীভবন)>বাং তুরুক (সমাক্ষর লোপ)

(২৮) **থান**। সং স্থান>প্রা থান>বাং থান (সমীভবন এবং সমাক্ষর লোপ)।

(২৯) **দাঁ**। সং দামন>প্রা দাম (পদান্ত ব্যঞ্জনলোপ)>বাং দাঁ (নাসিক্যীভবন)।

(৩০) **দিঘি**। সং দীর্ঘিকা>প্রা দিগ্‌ঘিআ (স্বরহ্রস্বতা, মধ্যব্যঞ্জনে সমীভবন, অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ)>বাং দিঘি (সমাক্ষর লোপ, অন্ত্যস্বর লোপ)

(৩১) **দিয়াসালাই**। সং দীপশলাকা>প্রা দীবশলাআ (স্বরমধ্যস্থ ব্যঞ্জন-লোপ, ব-শ্রুতি, অন্ত্যব্যঞ্জন ক-লোপ)>বাং দিয়াসালাই। (স্বরের হ্রস্বতা, য়-শ্রুতি। শ>স। স্বরসংগতি)

(৩২) **দেউটি**। সং দীপবর্তিকা>প্রা দীববট্টিআ (মধ্যব্যঞ্জন প-লোপ এবং ব-শ্রুতি। ত>ট। সমীভবন, মধ্যব্যঞ্জন ক-লোপ)>দীববটিআ (সমাক্ষর লোপ) >বাং দেউটি (স্বরসংগতি)।

(৩৩) **দেউল**। সং দেবকুল>প্রা দেঅউল (মধ্যব্যঞ্জন লোপ)>বাং দেউল (মধ্যস্বর লোপ)।

(৩৪) **দেরখো**। সং দীপবৃক্ষ>প্রা দীবরুক্‌খ (প>ব্যঞ্জনলোপ>ব-শ্রুতি। বৃ>রু। ক্ষ>ক্‌খ-সমীভবন)>দীঅউর্‌খ (ব>অ। রু>উর্‌-বিপর্যয়। সমাক্ষর ক্‌ লোপ)>বাং দেরখো। (স্বরসংগতি)

(৩৫) **ধার**। সং উদ্ধার>প্রা উধার (সমাক্ষর লোপ)>বাং ধার (আদিস্বর লোপ, কারণ অনাদ্য শ্বাসাঘাত)।

(৩৬) **নধর**। সং নবধর>প্রা ণঅধর (ন>ণ, মূর্ধণ্যীভবন। ব-ব্যঞ্জন লোপ) >বাং নধর (ণ>ন, দন্ত্যীভবন, মধ্যস্বর লোপ)।

(৩৭) **ননী**। সং নবনীত>প্রা নবনীঅ (অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ)>বাং ননী (মধ্যব্যঞ্জন ব-লোপ)

(৩৮) **নাতি**। সং নপ্তৃক>প্রা নত্তিঅ (ঋ>ই। অন্ত্যব্যঞ্জন ক-লুপ্ত। সমীভবন)>বাং নাতি (সমাক্ষর লোপ, পূর্বস্বর দীর্ঘ, অন্ত্যস্বর লোপ)

(৩৯) **নেওটা**। সং স্নেহবৃত্ত>প্রা নেহবট্ট (স-লোপ। বৃত্ত>বট্ট : ঋ>অ ; ত>ট-মূর্ধণ্যীভবন)>বাং নেওটা (অন্তর্হতি)

(৪০) **পালকি**। সং পর্যঙ্ক>প্রা পালঙ্ক (মধ্যস্বর দীর্ঘ, লকারীভবন)> বাং পাল্‌কি (আনুনাসিক বর্ণের লোপ, স্বরসংগতি)

(৪১) **পুথি**। পহ্লবী শব্দ পোস্ত>সং পুস্তিকা>প্রা পুত্থিঅ (সমীভবন, অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ, অন্ত্যস্বরের হ্রস্বতা)>বাং পুথি (সমাক্ষর লোপ, অন্ত্যস্বর লোপ)।

(৪২) **পৈতা**। সং উপবীত>প্রা পঅইত (আদিস্বর লোপ, কারণ অনাদ্য শ্বাসাঘাত। ব-লোপ। স্বরভক্তি)>বাং পৈতা (স্বরসংগতি)

(৪৩) **ফাগ**। সং ফল্গু>প্রা ফগ্‌গু (সমীভবন)>বাং ফাগ (সমাক্ষর লোপ, অন্ত্যস্বর লোপ, পূর্বস্বর দীর্ঘ)।

(৪৪) **ভাপ**। সং বাষ্প>প্রা ভপ্প (ব>ভ। সমীভবন, মধ্যস্বরের হ্রস্বতা)>বাং ভাপ (সমাক্ষর লোপ, পূর্বস্বর দীর্ঘ)।

(৪৫) **ভালো**। সং ভদ্রক>প্রা ভল্লঅ (দ্র>ল্ল, বর্ণবিকৃতি ও সমীভবন। অন্ত্যব্যঞ্জন লুপ্ত)>বাং ভালো (সমাক্ষর লোপ, পূর্বস্বরের ক্ষতিপূরণমূলক দৈর্ঘ্য ও স্বরসংগতি)

(৪৬) **ভিমরুল**। সং ভৃঙ্গরোল>প্রা ভিঙ্গরুল (ঋ>ই। স্বরসংগতি)> বাং ভিমরুল (ঙ্গ>ম—বর্ণবিকৃতি। রূ>রু—স্বরের হ্রস্বতা)।

(৪৭) **ভেক**। সং ভৈক্ষ্য>প্রা ভেখ (ঐ>এ। যুক্তব্যঞ্জনের সরলতা)> বাং ভেক (মহাপ্রাণ>অল্পপ্রাণ)

(৪৮) **মুচি**। পহ্লবী শব্দ মোচক>প্রা মোচিঅ (স্বরসংগতি, অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ)>বাং মুচি (স্বরসংগতি, অন্ত্যস্বর লোপ)।

(৪৯) **মোজা**। পহ্লবী শব্দ মোচক>পারসিক মোজঅ (মধ্যব্যঞ্জনের ঘোষীভবন ও অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ)>বাং মোজা (বিদেশী শব্দ)।

(৫০) **রাই**। সং রাধিকা>প্রা রাহিআ (মহাপ্রাণ ধ>হ। অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ)>বাং রাই (অন্তর্হিতি)।

(৫১) **রাখাল**। সং রক্ষাপাল>প্রা রক্‌খপাল (ক্ষ> ক্‌ খ—সমীভবন)> বাং রাখাল (মধ্যব্যঞ্জন প-লোপ এবং অন্তর্হিতি।)

(৫২) **রানী**। সং রাজ্ঞিকা>প্রা রণ্ণিআ (জ্ঞ>ণ্ণ—সমীভবন)>বাং রানী (সমাক্ষর লোপ, স্বরদৈর্ঘ্য)

(৫৩) **রুই**। সং রোহিত>প্রা রোহিঅ (অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ)>বাং রুই (অন্তর্হিতি)।

(৫৪) **বাট**। সং বর্ত্ম>প্রা বট্ট (রেফ্‌ লোপ, সমীভবন)>বাং বাট (সমাক্ষরলোপ এবং স্বরদৈর্ঘ্য)।

(৫৫) **বান**। সং বন্যা>প্রা বণ্ণা (সমীভবন)>বাং বান (সমাক্ষর লোপ ও স্বরদৈর্ঘ্য)

(৫৬) **বিছা**। বৃশ্চিক>প্রা বিচ্ছঅ (ঋ>ই। সমীভবন, স্বরসংগতি > বাং বিছা (সমাক্ষর লোপ ও স্বরসংগতি)।

(৫৭) **শাশুড়ি**। সং শ্বশ্রূটিকা>প্রা সস্সুড়িআ (দন্ত্যীভবন ও সমীভবন। ট>ড—ঘোষীভবন। অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ)>বাং শাশুড়ি (পুনঃ তালব্যীভবন, অন্তর্হিতি)।

(৫৮) **শিউলি**। সং শেফালিকা>প্রা সেহালিআ (শ>স। মহাপ্রাণ ফ>হ অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ) >বাং শিউলী (অন্তর্হিতি)।

(৫৯) **শিঙ্গাড়া**। সং শৃঙ্গাতক>প্রা শিঙ্গাদক (ঋ>ই। ত>দ)> শিঙ্গাডঅ (দ>ড। ব্যঞ্জন লোপ।)>বাং শিঙ্গাড়া (স্বরসংগতি)

(৬০) **সই**। সং সখী>প্রা সহী (খ>হ—বর্ণবিকৃতি)>বাং সই (হ-লোপ ও স্বরের হ্রস্বতা)

(৬১) **সতিন**। সং সপত্নী>প্রা সবত্তী (প>ব। ত্ন>ত্ত সমীভবন)>বাং সতিন (ব-লোপ। সমাক্ষর লোপ। মূল শব্দ স্ত্রী-র সাদৃশ্যে আনুনাসিক বর্ণ ন-এর আগম।

(৬২) **সর্ষে**। সং সর্ষপ>প্রা সরিসব‍ং (বিপ্রকর্ষ। ষ>স। প>ব)>বাং সর্ষে (পুনঃ মূর্ধণ্যীভবন, স্বরভক্তি, সম্প্রকর্ষ)।

(৬৩) **সাঁওতাল**। সং সামন্তপাল>প্রা সাবন্তআল (ব্যঞ্জন ম ও প লুপ্ত। ম-এর স্থলে ব-শ্রুতি)>বাং সাঁওতাল। (মূল শব্দের ম-এর সাহায্যে নাসিক্যীভবন। অন্তর্হিতি)।

(৬৪) **সাঁকো**। সং সংক্রম>প্রা সংকম (র-ফলা লোপ)>বাং সাঁকো (নাসিক্যীভবন, অন্ত্যব্যঞ্জনলোপ, স্বরদৈর্ঘ্য)।

(৬৫) **সাঁড়াশি**। সং সংদংশিকা>প্রা সণ্ডংসিআ (ং>ণ। দ>ড। শ> স। অন্ত্যব্যঞ্জন লুপ্ত।)>বাং সাঁড়াশি (নাসিক্যীভবন, অন্তর্হিতি)।

(৬৬) **সুড়ঙ্গ, সুড়ং**। গ্রীক শব্দ সুরিংক্স>সুরঙ্গ>সুড়ঙ্গ, সুড়ং।

(৬৭) **হিয়া**। সং হৃদয়>প্রা হিঅঅ (ঋ>ই ; মধ্যব্যঞ্জনলোপ)>বাং হিয়া (য়-শ্রুতি; স্বরসংগতি)।

(৬৮) **হীরা**। সং হীরক>প্রা হীরঅ (অন্ত্যব্যঞ্জন লুপ্ত)>বাং হীরা (স্বরসংগতি)।

✓ (৬৯) **সাঁঝ**। সং সন্ধ্যা>প্রা সঞ্ঝা (তালব্যীভবন, য-লোপ)>বাং সাঁঝ (নাসিক্যীভবন, অন্ত্যস্বর লোপ, পূর্বস্বরের দৈর্ঘ্য)।

প্রশ্ন ১৮। (ক) বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়াপদের গঠন; (খ) বাংলা ভাবকর্মবাচ্য ; (গ) যৌগিক ক্রিয়া বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা কর।

উত্তর ঃ (ক) বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়াপদ।

বাংলা ভাষায় পদের শেষে তিনটি অসমাপিকা ব্যবহৃত হয় : (১) ই, ইয়া ; (২) ইলে ; (৩) ইতে।

(১) ই, ইয়া-অন্তক বাংলা অসমাপিকা সংস্কৃত ক্ত্বাচ্-ল্যপ-এর অর্থ প্রকাশ করে। ই-অন্তক অসমাপিকা সংস্কৃতে ক্ত, ক্তবতু-অন্তক পদের বিধেয়-বিশেষণ হিসাবে প্রথমে প্রযুক্ত হইত। ক্রমে উহা অতীত কালের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। অপভ্রংশের শেষ স্তরে এবং প্রাচীন বাংলায় এই ই-অন্তক অসমাপিকা সংস্কৃত হইতে আসে ঃ যেমন, প্রা-বাং "সহজে নলিনীবন পইসি (প্রবিষ্টঃ) নিবিত্তা"।

প্রাচীন বাংলায় 'ইঅ' আসিয়াছে সংস্কৃত -ইত প্রত্যয়ান্ত পদ হইতে : যেমন দিঢ় করিঅ (<দৃঢ়ং কৃতং)। খাইঅ<খাদিতম্; ইঅ>ইআ (ইয়া)। দেখইআ> আ-বাং দেখিয়া।

আধুনিক বাংলায় প্রাচীন বাংলার ই-অন্তক অসমাপিকার ব্যবহার আছে। আর আছে ইআ (ইয়া)-অন্তক অসমাপিকা। তবে ই-অন্তক অসমাপিকা প্রাদেশিক

কথ্যভাষা এবং কবিতায় ছাড়া চলে না : " যেমন, 'ধরি' 'ধরি' খাও। গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা 'রটি' গেল ক্রমে।

ইআ (ইয়া)-অন্তক অসমাপিকা সাধু ভাষায় এবং কবিতায় চলে : যেমন, আজি আসিয়াছ ভুবন 'ভরিয়া'। চলিত ভাষায় ইয়া>এ ; করিয়া>করে ; দেখিয়া>দেখে। প্রাচীন বাংলায় ইয়া-অন্তক অসমাপিকা শতৃপদের অর্থেও ব্যবহৃত হইত : যেমন, ছোই ছোই যাই। আধুনিক বাংলাতেও এই রকম প্রয়োগ আছে। হেসে হেসে সারা হও। বাংলা-ইয়া -অন্তক অসমাপিকা কখনও কখনও কর্তার বা ক্রিয়ার বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় : যেমন, 'কান্দিয়া কান্দিয়া' শিশু পড়ে ধরাতলে।

(২) ইলে-অন্তক অসমাপিকা আসিয়াছে সংস্কৃত ভাবে-সপ্তমী, ভাবে-তৃতীয়া হইতে। প্রাচীন বাংলা—সাঙ্কমত 'চড়িলে' দাহিন বাম·মা হোহী। মধ্যবাংলা—হাথ 'বাঢায়িলে' কি চান্দের লাগ পাই। আধুনিক বাংলা—পাপ 'করলে' ফল পেতে হবে।

আধুনিক বাংলায় ইলে-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা, বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া হইতে পৃথক হইতে পারে এবং ইহার দ্বারা সূচিত ঘটনার পূর্বত্ব বোঝায় : 'আমি বাড়ি 'গেলে' সে আসিবে।

(৩) বাংলা ইতে-অন্তক অসমাপিকা তৃতীয়া-সপ্তমীযুক্ত শতৃপদ হইতে আসিয়াছে : যেমন, প্রাচীন বাংলা—দুধ মাঝে লড় 'অচ্ছন্তে' ণ দেখই (দুধের থাকতেও দেখতে পায় না)। আধুনিক বাংলায়—দাঁত 'থাকতে' কেউ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।

কর্তা যখন অন্য ব্যাপারে লিপ্ত থাকার অবস্থায় কিছু করে, তখন ইতে-অন্তক অসমাপিকাকে দ্বিত্ব করিয়া প্রয়োগ করা হয়। প্রাচীন বাংলায়—'চাহন্তে চাহন্তে' (চাহিতে চাহিতে) সুণ বিআর। আধুনিক বাংলায়—আনন্দে সে 'নাচতে নাচতে' চলে গেল।

Infinitive বুঝাইতে প্রাচীন বাংলায় ছিল ইব-অন্তক পদ। যেমন 'বাহবকে' পারই। মধ্য বাংলায় ইব-অন্তক, ইলে-অন্তক, ইতে-অন্তক তিন রকম পদই ছিল : যেমন, পরাণ 'দিবাক' ; তোহ্মার 'কাটিলে' লাগে মাথা ; পসার 'সাঁজিতে'। আধুনিক বাংলায় কেবল 'ইতে'-অন্তক পদ : মশা 'মারতে' কামান দাগা।

(খ) বাংলা ভাব-কর্মবাচ্য

সংস্কৃতে কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে ধাতু আত্মনেপদী হয়। সাধারণতঃ—য-বিকরণের পরে এই আত্মনেপদ বিভক্তি হয়। প্রাকৃতে আত্মনেপদের স্থানে পরস্মৈপদ বসিল। বিকরণ -য>-ইঅ বা য-ফলা। যেমন সং লভ্যতে>প্রা লভিঅই, লব্‌ভই। প্রাকৃতের -ইঅ-যুক্ত কর্মভাববাচ্য প্রাচীন বাংলা এবং মধ্য বাংলা

পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। প্রা-বাং : 'সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই।' মধ্য-বাং : 'হেন কাম না করিএ।' আধুনিক সাধু বাংলায় এইরূপ ব্যবহার কর্তৃবাচ্যের সহিত মিলিয়া গিয়াছে : যেমন—'এমন কাজ করে না'।

প্রাকৃতের য-ফলা উদ্ভূত কর্মভাববাচ্য অপভ্রংশ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। প্রাচীন বাংলা হইতে এই পদগুলি কর্তৃবাচ্যে চলিয়া আসে। অবশ্য অপভ্রংশের প্রভাবে প্রাচীন বাংলায় কিছু কিছু কর্মভাববাচ্যের পদ গঠিত হইয়াছে : সং ছিদ্যতু> অপ ছিজ্জউ> প্রা-বাং ছিজউ। সং দৃশ্যতে> অপ দিশ্শই> প্রা-বাং দিশঅ।

যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে ভাবকর্মবাচ্যের অর্থপ্রকাশ প্রাচীন বাংলা হইতেই চলিত ছিল। ভাববচন অথবা কৃদন্ত বিশেষণের সঙ্গে 'যা', 'লভ্' প্রভৃতি ধাতু যোগ করিয়া ভাবকর্মবাচ্যের অর্থ বোঝানো হয়। প্রাচীন বাংলা—ঢুলি ঢুহি পিটা ধরণ ন জাই। মধ্য বাংলা—ললাট লিখিত খণ্ডন ন জাএ। আধুনিক বাংলায় এই জাতীয় প্রয়োগ শুধুমাত্র পূর্ব বাংলার উপভাষায়ই মেলে : যেমন—আর কি করন যায়।

আধুনিক সাধুভাষায় নিষ্ঠান্ত পদের সঙ্গে 'আছ্', 'হো', 'যা', 'পড়্' প্রভৃতি ধাতুর যোগে ভাবকর্মবাচ্যের পদ নিষ্পন্ন হয় : যেমন—বইটা আমার 'পড়া' আছে। কোথায় যাওয়া' হচ্ছে। নিষ্ঠান্ত তৎসম শব্দদ্বারা লেখ্য ভাষার ভাবকর্মবাচ্য নিষ্পন্ন হয় : যেমন—একটি অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইল।

(গ) যৌগিক ক্রিয়া

যেখানে একাধিক ক্রিয়াপদের সাহায্যে একটিমাত্র ক্রিয়াপদের ভাব প্রকাশ পায় তাহাকে যৌগিক ক্রিয়াপদ বলে। যৌগিক ক্রিয়াপদগুলি ধাতুর সহিত 'ইতে' বা 'ইয়া' যোগের পরে 'আছ্' ধাতুর যোগে সাধারণতঃ নিষ্পন্ন হয়। কখনো কখনো 'ইয়া'-অন্তক পদের পরে 'দা' এবং 'লভ্' ধাতুর যোগেও যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। লভ্ ধাতুযোগে কর্তার ক্রিয়াফললাভ এবং দা ধাতুযোগে কর্তার ক্রিয়াফলহীনতা বোঝায় : যেমন—আধুনিক বাংলায় : 'কবিতাটি লিখে নাও' অর্থাৎ কবিতাটি যে লিখবে সে ফলভোগ করবে। এবং 'কবিতাটি লিখে দাও' অর্থাৎ কবিতাটি যে লিখবে সে ফলভোগ করবে না। প্রাচীন বাংলায়ও এরূপ দু-একটি ব্যবহার আছে।

বৈদিক-সংস্কৃত ভাষার ধাতুকোষ ছিল অত্যন্ত পুষ্ট। মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার স্তরে তাহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া গেল। তখন গম্, যা, লভ্ প্রভৃতির সহযোগে যৌগিক ক্রিয়া গঠনের প্রথা আসে। বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। প্রাচীন বাংলা হইতেই এই জাতীয় ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে।

গঠনের বিচারে বাংলা যৌগিক ক্রিয়াপদের পাঁচ ভাগ :—

(১) সমাপিকা + সমাপিকা। পড়ে শোনে, যায় আসে, বলে কহে ইত্যাদি।

(২) সমাপিকা + অসমাপিকা। দেখ গিয়া (দেখ গে), বল গিয়া (বল গে)।

(৩) সমাপিকা + অসমাপিকা + সমাপিকা। নাও গিয়া যাও (নাও গে যাও)।

(৪) অসমাপিকা + সমাপিকা। দিয়ে দিল, বলে যাও, করে নাও। (৫) বিশেষ্য বা বিশেষণ + সমাপিকা। দর্শন করে, ভালোবাসে, লজ্জা করে।

প্রশ্ন ১৯। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় লেখ :—(ক) বাংলা বচন। (খ) বাংলা লিঙ্গ। (গ) বাংলা প্রত্যয়।

উত্তর : (ক) বাংলা বচন :—বৈদিক ও সংস্কৃতে বচন ছিল তিনটি। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার স্তরে আসিয়া দ্বিবচন লুপ্ত হইয়া গেল, রহিল শুধু একবচন এবং বহুবচন। বাংলা ভাষায়ও দ্বিবচনের ব্যবহার নাই। তাহা ছাড়া বাংলায় একবচন বুঝাইবার জন্য কোনো বিশেষ প্রত্যয় নাই। শব্দটি নিজেই একবচন রূপে ব্যবহৃত। কেবল বহুবচনের জন্য শব্দের সঙ্গে কতকগুলি প্রত্যয় যুক্ত হয়। বাংলায় বহুত্ব বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলির প্রয়োগ করা হয় :—

(১) শব্দের আগে বা পরে সকল, সব, যত, কত প্রভৃতি বহুবচনজ্ঞাপক বিশেষণ যোগ করিয়া বহুত্ব বোঝানো হয় : যেমন, প্রা-বাংলা—"**মণ্ডল সঅল**" (**মণ্ডল সকল**); মধ্য বাংলা—"আহ্মে **সব**"; আধুনিক বাংলা—"**সব** লোক চলে গেল।"

(২) বিশেষ্যের আগে সংখ্যাবাচক বিশেষণ বসাইয়া : যেমন, প্রা. বাংলা—"কায়া তরুবর **পঞ্চ** বিডাল।" আ বাংলা—**তিন** কন্যা, **ছয়** রিপু। কখনও আবার সংখ্যাবাচক শব্দটি বিশেষ্যের পরে বসে।

(৩) প্রাচীন বাংলায় নির্ধারক বহুবচন বুঝাইতে কখনও কখনও পূর্ববর্তী বিশেষণ, সর্বনাম বা বিশেষ্য পদটিরই দ্বিত্ব করা হইত : যেমন, **উঁচা উঁচা** পাবত; **জো জো** আইলা **তে তে** গেলা। কখনও কখনও অসমাপিকা পদের দ্বিত্ব করা হইত : যেমন, "তুলা **ধুনি ধুনি**"। আধুনিক বাংলায়ও কখনও কখনও এইরূপ পদ্ধতিতে বহুবচন বোঝানো হইয়া থাকে। যেমন **বড় বড়** বানরের **বড় বড়** পেট। (বিশেষণের দ্বিত্ব)॥ **যে যে** এসেছে **সে সে** পাবে। (সর্বনামের দ্বিত্ব)॥ **ছুঁয়ে ছুঁয়ে** যাও বনতল। (অসমাপিকার দ্বিত্ব)॥

(৪) কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইতে আগত "রা" (এরা) যোগ করিয়া বহুবচন বোঝানো প্রাচীন বাংলায় ছিল না। মধ্য বাংলায় "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" ইহার প্রথম নিদর্শন মিলিল : যেমন—**আহ্মারা তোহ্মারা**। পরে ইহাই বাংলা বহুবচন বুঝাইবার প্রধান উপায় হইয়া উঠিল। চলিত ভাষায় এই প্রয়োগ সর্বব্যাপক হইয়া

উঠিয়াছে। প্রথম দিকে প্রাণীবাচক শব্দেই এই প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিল: যেমন **পণ্ডিতেরা, পাখিরা, পশুরা** প্রভৃতি। অপ্রাণীবাচক শব্দে প্রয়োগ ঘটিত কদাচিৎ—এখন অপ্রাণীবাচক শব্দেও সুপ্রচুর: যেমন, "**তৃণেরা** স্পন্দিত হয় বৃষ্টির প্রথম চুম্বনে"। লক্ষণীয়: এক্ষেত্রে যেসব স্থানে শব্দ ব্যঞ্জনান্ত, সেখানে "এরা" যোগ হয়, স্বরান্ত শব্দে যোগ হয় "রা"।

(৫) বহুবচন বুঝাইতে "গুলা" "গুলি" শব্দগুলিও বিভক্তিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অন্ত্য মধ্য স্তর হইতেই ইহাদের প্রয়োগ পাওয়া যাইতেছে। যেমন—**বাণগুলা, বামুনগুলা**। আধুনিক বাংলায় গুলা > গুলো

(৬) "দি," "দিগ" ইত্যাদির সহযোগে বহুবচন গঠনের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে সপ্তদশ শতাব্দী হইতে। ইহাদের ভাষাতাত্ত্বিক উৎস—দি < আদি দিগ্ < ফারসী দিগর। দি, দিগ—ইহাদের সহিত কারক-বিভক্তি যুক্ত হয়: যেমন, বালক**দিগকে**, আমা**দের**, আমা**দিগের** ইত্যাদি।

(৭) বাংলা তৎসম শব্দগুলির সঙ্গে কতকগুলি তৎসম বহুত্ববোধক শব্দ যুক্ত হইতে দেখা যায়। এইরূপ প্রচলিত শব্দ হইল—কুল, সমূহ, গ্রাম, নিচয়, মালা, সভা, সমুচ্চয়, মণ্ডলী, নিকর প্রভৃতি।

(খ) বাংলা লিঙ্গ—বস্তু, জাতি, প্রাণী ইত্যাদির লিঙ্গভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে পুরুষজাতীয়কে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীজাতীয়কে স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবজাতীয়কে ক্লীবলিঙ্গ বলা হয়। বাংলা ভাষাতেও এই তিনটি লিঙ্গ স্বীকৃত। সংস্কৃত-প্রাকৃতেও তাহাই। কিন্তু সংস্কৃতের সহিত বাংলার এ বিষয়ে মূলে পার্থক্য রহিয়াছে। বাংলায় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী কোনো প্রাণীর বা বস্তুর লিঙ্গ ঠিক হইয়া থাকে। পুরুষপ্রাণী—পুংলিঙ্গ; স্ত্রীপ্রাণী—স্ত্রীলিঙ্গ; প্রাণহীন সংজ্ঞাহীন স্থাবর বস্তু বা ভাব—ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু সংস্কৃতে প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া লিঙ্গ নির্ণয় করা হয় না। সেখানে শব্দের প্রত্যয় অনুসরণ করিয়া জিনিসের লিঙ্গ ঠিক হয়, সেজন্য পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক বিশেষ্যপদও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে বহুক্ষেত্রে ক্লীবলিঙ্গ হয়। সংস্কৃতে বৃক্ষ, প্রস্তর, রাগ প্রভৃতি পুংলিঙ্গ, কিন্তু ইহারা বাংলায় ক্লীবলিঙ্গ। আবার মিত্র বা কলত্র সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গ; পক্ষান্তরে লজ্জা, নিদ্রা প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। সংস্কৃত প্রয়োগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণও স্ত্রীলিঙ্গ; পুংলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে পুংলিঙ্গ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত। প্রাচীন বাংলাভাষায় কখনও কখনও স্ত্রীলিঙ্গ-বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আধুনিক বাংলায় বিশেষণের লিঙ্গভেদ হাস্যকর শোনায়। যেমন, সুন্দর ছেলে, সুন্দর মেয়ে, সুন্দর ফুল। তবে পুরাতন স্টাইলে এবং তৎসম শব্দের প্রয়োগক্ষেত্রে বিশেষণে লিঙ্গভেদের চিহ্ন কিছু কিছু পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষায় (১) পুংলিঙ্গবাচক শব্দগুলির সঙ্গে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গশব্দ গঠন করা হয়; (২) উভয়লিঙ্গবাচক শব্দে পুং বা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করিয়া তাহাদের লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয়।

বাংলায় পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীরূপ দুই রকমের[1]—(১) যে শ্রেণীর পুরুষ সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোক বোঝানো ; (২) কোন শ্রেণী বা জাতির পুরুষের পত্নীকে বোঝানো। এই দুই রকমের স্ত্রীলিঙ্গ তিনটি উপায়ে করা হইয়া থাকে :—

(১) পৃথক শব্দ দিয়া পুংলিঙ্গের স্ত্রীলিঙ্গ প্রদর্শন। যেমন—বাবা—মা ; ভাশুর, দেওর—ননদ, জা ; ছেলে—মেয়ে। সংস্কৃতেও এইরূপ পৃথক শব্দদ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ বুঝাইবার রীতি প্রচলিত।

(২) সাধারণ শব্দের সঙ্গে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ জুড়িয়া দিয়া লিঙ্গ নির্দেশ : যেমন, পুরুষ-মানুষ—মেয়ে-মানুষ , এঁড়ে-বাছুর—বক্‌না-বাছুর ; মদ্দা হাঁস-মাদী-হাঁস।

(৩) পুংলিঙ্গ-বাচক বিশেষ্যপদের শেষে প্রত্যয় যোগ করিয়া স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। বিশিষ্ট বাংলা স্ত্রী প্রত্যয় দুইটি : ই (ঈ) এবং -নী (-নি,-আনী,-ইনি, -উনি) (ক) -ই (-ঈ) যোগে প্রধানতঃ জাতি বোঝানো হয় : মামা—মামী, দাদা—দিদি, বুড়া—বুড়ী। (খ) -নী (নি, -আনী, -ইনি, -উনি) যোগে—প্রধানতঃ ব্যবসায় বা জীবিকাগত স্ত্রীত্ববোধক বিশেষ্যপদ বোঝানো হয় :—কামার—কামারনী, নাপিত—নাপিতানী, গয়লা—গয়লানী।

বাংলা লিঙ্গের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :—

(১) প্রাচীন বাংলায় সংস্কৃতের প্রভাবে -আ, -ই এবং -ইনী যোগে স্ত্রীলিঙ্গগঠন দেখিতে পাওয়া যায়। চর্যাপদে কখনো কখনো পুরুষবাচক শব্দেও আ-যোগ করা হইয়াছে : যেমন হরিণা , আধু বাংলায়ও পাই—হাঁসা। (পুং হাঁস)। পরবর্তী কালে এই প্রথা স্থায়ী হইয়াছে : যেমন, পটল—পট্‌লা। বড় বুঝাইতে কখনও কখনও -আ প্রত্যয় যুক্ত হয় : যেমন—হাড়ি—হাঁড়া (বড় হাঁড়ি)।

(২) প্রাচীন বাংলার স্ত্রীত্বসূচক -ইনী প্রত্যয় মধ্য বাংলায় অপরিবর্তিত থাকিয়া আধুনিক বাংলা কথ্যভাষায় কখনও কখনও ইন্ হইয়াছে : যেমন,—সং সপত্নী>সতিনী>সতীন্। ডাকিনী>ডাইনি>ডাইন্।

(৩) কতকগুলি বাংলা পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গের কাঠামোর উপরে তৈরী হইয়াছে : যেমন,—ননদের স্বামী>নন্দাই। মাসী>মেসো।

(৪) বিদেশী প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গগঠন—বাড়ি-উয়ালী>বাড়িউলী। সেইরূপ বাসনউলী, মুড়িউলী।

(খ) বাংলা প্রত্যয়—সংস্কৃত প্রত্যয় দুই শ্রেণীর—ধাতুর সহিত যুক্ত কৃৎ-প্রত্যয়, এবং শব্দের সঙ্গে যুক্ত তদ্ধিত প্রত্যয়। আধুনিক বাংলায় এই দুই শ্রেণীর প্রত্যয় আছে আরও আছে কিছু বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়।

(১) কৃৎপ্রত্যয়—বাংলায় ব্যবহৃত কৃৎপ্রত্যয়গুলি সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাংলায় আসিয়াছে। ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের অনেকগুলি বাংলায় লুপ্ত।

সংস্কৃত -অ,-ক্ত,-ষৎ,-ণ্যৎ>বাংলায় লুপ্ত। যেমন,—বর্ধ>বড্ঢ>বাড়। নৃত্য>ণচ্চ>নাচ।

সংস্কৃত -ইত>প্রাকৃত -ইঅ>প্রা. বাংলা-ই,-উ>আ-বাং লুপ্ত: যেমন, বাহিত<বাহিঅ>বাহিউ (প্রা. বাং)। জ্ঞাত (জানিত)>জানিঅ>জানি।

সংস্কৃত -অন্ত>বাংলা-অন্ত, -অৎ। যেমন,—জীবন্ত>জীয়ন্ত। ফিরন্ত>ফেরৎ।

সংস্কৃত-অন্ত+ইক>বাংলা -তি। যেমন,—চলন্তিক>চলতি।

বাংলা অন্, অনা, উনি, আনি, আনো, আ, আই<সংস্কৃত অন্, অন্+আক্, অন্+ইক্, আপয়+অন্+ইক্, আপয+অন্+ক্, আপয+অক্, আপয়+ইক্ (যথাক্রমে)। এইগুলি বাংলার বহুল ব্যবহৃত কৃৎ-প্রত্যয়: যেমন,—দৃক্ষণ>দেখন। রন্ধন+আক্>রাঁধনা>রান্না ইত্যাদি।

(২) **তদ্ধিত প্রত্যয়**—(ক) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি খুবই বিশিষ্ট। উহাদের সংস্কৃত উৎস নির্দেশ করা হইল।

—আ<সং -আক। গৌরাক>গোরা।

—আর<সং -কার, -কারক। কুম্ভকার>কুমার; চর্মকারক>চামার।

—আল (-এল)<সং-পালক। গোপাল>গোয়াল।

—ই (-ঈ)<সং -ইক্,-ইকা। ছুরিকা>ছুরি।

—ল<সং-ল। দীর্ঘল>দাঘল।

—ডি<সং -টি, -টিকা। বাটিকা>বাড়ি।

—উড়ে<সং বৃত্তিক। সপবৃত্তিক>সাপুড়ে।

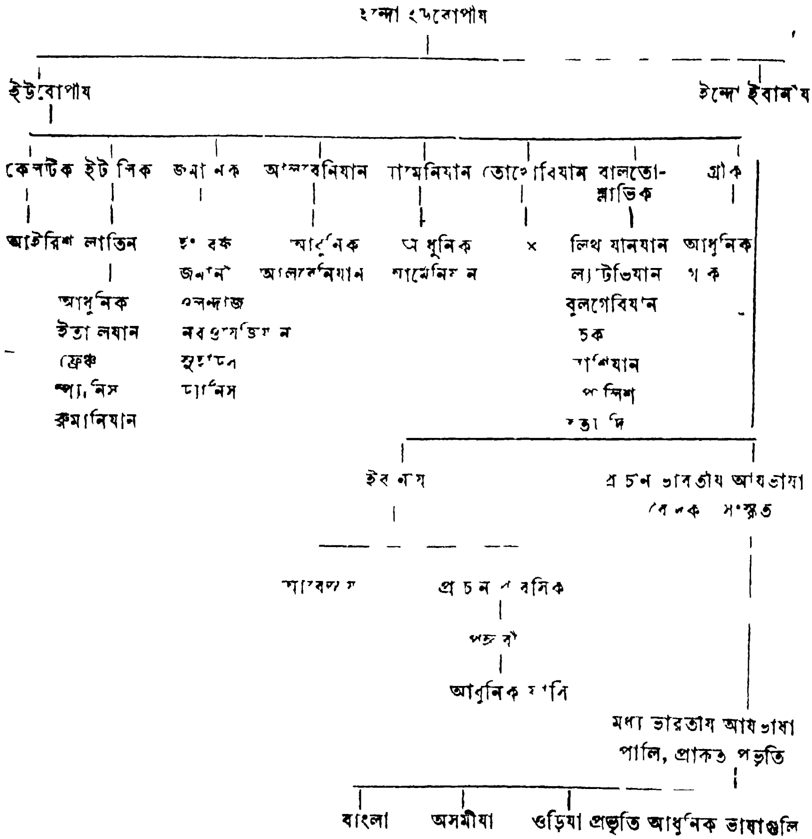
(খ) বাংলার নিজস্ব তদ্ধিত প্রত্যয় -টা,-টি,-টে,-এ। ইহারা মধ্যবাংলা হইতে আসিয়াছে।

(গ) বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে বিশিষ্ট—ফার্সী ওয়ান (যেমন, গাড়োয়ান); -খোর (চশমখোর); -গিরি (বাবুগিরি); -দার (চৌকিদার); -বাজ (ধাপ্পাবাজ); -সই (জুৎসই) ইত্যাদি। এগুলি সবই ফার্সী হইতে আসিয়াছে।

প্রশ্ন ২০। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির সাধারণ পরিচয় দাও এবং ইহার মধ্যে ভারতীয় আর্যভাষার স্থান নির্দেশ কর।

উত্তর। ভারত, ইরান এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষার মধ্যে এমন অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে যাহা দ্বারা ভাষাতাত্ত্বিকেরা উহাদের মূলে একটি ভাষার অস্তিত্ব আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই আদি মূল ভাষাটির কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। যে আর্য জনগোষ্ঠী এই ভাষাভাষী ছিল, তাহাদের বাসস্থান বা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও প্রায় কিছুই জানা যায় নাই। কাহারও মতে, ইহারা মধ্য-এশিয়ায় বাস করিতেন; কাহারও মতে, পূর্ব-ইউরোপে ইহাদের বাসভূমি ছিল। ইহারা যে ভাষায় কথা কহিত তাহাই মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে ইহাদের দুইটি

মূল ধারা ইউরোপ এবং ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কালক্রমে ইহাদের ভাষায় নানারূপ পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে, নূতন নূতন ভাষার জন্ম হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের এই শাখায়িত রূপটি নীচে দেখানো হইল :



ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির অন্তর্ভুক্ত প্রধান শাখাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে প্রদত্ত হইল :

কেলটিক। এই শাখার ভাষা বহুকাল পূর্বে মধ্য-পশ্চিম ইউরোপে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পরে ইটালিক ও জর্মানিক শাখার প্রসার ঘটায় কেলটিক বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়ে। ক্রমে এই ভাষা লুপ্ত হয়। এই শাখার ভাষার মধ্যে আধুনিক কালে একমাত্র আইরিশ ভাষাই টিকিয়া আছে। উহা আয়ার্লণ্ডের ভাষা। প্রায় পনেরশত বৎসর আগে উহার উদ্ভব ঘটে।

ইটালিক। ইটালিক শাখার একটি উপশাখা লাতিন খুব শক্তিশালী হইয়া ওঠে এবং খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে সারা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। রোমসাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লাতিন ভাষারও বিস্তার ঘটে। গোটা ইউরোপে এককালে লাতিন ভাষার এত সমৃদ্ধি ঘটিযাছিল যে, অদ্যাবধি এই ভাষার পঠন-পাঠন পণ্ডিতমহলে সুপ্রচলিত। লাতিন ভাষা স্থান-বৈচিত্র্যে এবং উচ্চারণ-ভেদে ইতালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিস, রুমানিয়ান প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম দিয়াছে।

জর্মানিক। জর্মানিক শাখা হইতে একদিকে যেমন জর্মানী ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ভাষাগুলির উদ্ভব, তেমনি ইংরেজী ভাষারও জন্ম। ইংলণ্ডে আগে ছিল কেলটিক শাখার ভাষা। পরে এখন হইতে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে জার্মানীর অ্যাঙ্গল, স্যাকসন, জুটেরা। একশত বৎসরের মধ্যেই জর্মানিক ভাষা ইংলণ্ডে ইংরেজী ভাষার জন্ম দেয়।

আলবেনিয়ান। আলবেনিয়ার আধুনিক ভাষা এই শাখা হইতে উৎপন্ন। অবশ্য আধুনিক আলবেনিয়ার ভাষা নানা ভাষার মিশ্রণে অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

আর্মেনিয়ান। আধুনিক আর্মেনিয়ান ভাষাই এই শাখার উত্তরাধিকারী। আশেপাশে দুএকটি অঞ্চলে এই ভাষার কিঞ্চিৎ প্রভাব আছে।

তোখারিয়ান। আধুনিক যুগে প্রবেশ করিবার পূর্বেই এই ভাষা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মধ্য-এসিয়ার চীনা তুর্কিস্তানের বালকাস্তূপে এই ভাষার কিছু প্রত্নলিপি ও পুঁথিপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বালতো শ্লাভিক। ইহাতে দুইটি মুখ্য উপশাখা আছে—বালতিক ও শ্লাভিক। প্রথমট হইতে লিথুয়েনিয়ান, লাটভিয়ান প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি ঘটিয়াছে। শ্লাভিক শাখা হইতে আধুনিক সার্বিয়ান, বুলগেরিয়ান, চেক, রাশিয়ান, পোলিশ প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব ঘটিয়াছে।

গ্রীক। প্রাচীন গ্রীক ভাষা হইতে আধুনিক গ্রীকের জন্ম।

ইন্দো-ইরানীয়। আর্যদের যে শাখাটি পূর্বদিকে আসিতে থাকে তাহাদের ইন্দো ইরানীয় বা ইন্দো-আর্যভাষাভাষী বলা হয়। ইহারা প্রথমে ইরানে বসতি বিস্তার করে এবং একদল আরও পূর্বদিকে ভারতে প্রবেশ করে। ইরানে বসবাসকারী আর্যদের ভাষা ছিল অঞ্চলভেদে দুইরূপ—প্রাচীন পারসিক এবং আবেস্তীয়। প্রাচীন পারসিকই ইরানে প্রভাবশীল ভাষা হইয়া ওঠে। অগ্নি-উপাসক জরাথুস্ত্রসম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা যে প্রাচীন ইরানীয় ভাষায় সংকলিত হইয়াছিল তাহার কোনোরূপ আধুনিক রূপান্তর ঘটে নাই। অপর পক্ষে প্রাচীন পারসিক কালক্রমে পহ্লবী বা মধ্য-পারসিকে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর বারোশত বৎসর পূর্বে আধুনিক ফার্সি ভাষার জন্ম হয়।

ভারতে যে আর্যরা প্রবেশ করেন, তাঁহারা ভারতীয় আর্যভাষা এদেশে লইয়া আসেন। এই ভাষার তিনটি ঐতিহাসিক স্তর। প্রথম স্তরে বৈদিক-সংস্কৃত—ইহাকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্তর। দ্বিতীয়টিতে পালি প্রাকৃত প্রভৃতি মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষাগুলির স্থান। অবশেষে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাংলা হিন্দি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উদ্ভব ঘটে।

গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট.

(২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডক্টর সুকুমার সেন, এম. এ., পি-এইচ ডি

(৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম ও ২য় খণ্ড)
—ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায, এম. এ, ডি. ফিল

(৪) বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা
—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, পি-এইচ ডি.

(৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম ও ২য় খণ্ড)
—ডক্টর ভূদেব চৌধুরী, এম এ., ডি ফিল

(৬) বাংলা সাহিত্যে গদ্য—ডক্টর সুকুমার সেন, এম. এ, পি-এইচ ডি

(৭) বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ
—ডক্টর শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম এ, ডি. ফিল.

**(৮) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
—অধ্যাপক বিনয় সরকার, এম এ, নাট্যবিশারদ

[এই প্রশ্নোত্তর-সংবলিত পুস্তকখানি পরীক্ষার জন্য অবশ্যই সংগ্রহ করিতে হইবে]

(৯) Origin and Development of Bengali Language
—Dr. Suniti Kumar Chatterjee, M. A, D Litt.

(১০) ভাষার ইতিবৃত্ত—ডক্টর সুকুমার সেন, এম. এ., পি-এইচ. ডি.

(১১) বাগর্থ—ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম. এ., ডি. ফিল.

প্রবন্ধ-রচনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

ভূমিকা

বাঙালী জাতির চরিত্রের একদিকে যেমন ভাবোচ্ছ্বাস এবং আবেগপ্রবণতা রহিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ আছে রহস্যকৌতুকের একটি সুর। বাঙালী হাসিতে জানে, ইহা তাহার স্বভাবধর্মের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। একালের কবি বলিয়াছেন, "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা"। একথা পুরাতন এবং মধ্যযুগীয় বাঙালীর জীবন সম্পর্কেও সহজেই বলা চলিত। জীবনে নানাবিধ বিপর্যয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনাচার থাকা সত্ত্বেও বাঙালীর রসিকতার স্রোত কখনো শুকাইয়া যায় নাই। সে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছে জীবনে, এবং তাহারই প্রতিফলন পড়িয়াছে বাঙালীর সেকালীন সাহিত্যে।

লিরিকে হাস্যরস

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা হইল তিনটি—(১) মঙ্গলকাব্যের ধারা; (২) কৃষ্ণলীলা-পদাবলীর ধারা; (৩) অনুবাদসাহিত্যের ধারা। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণবপদাবলীতে হাস্যরস বিশেষ প্রাধান্য পায় নাই। কারণ রোমান্টিক প্রণয়লীলার সুর যেখানে প্রধান, কবিদের সৃষ্টিতে যেখানে হৃদয়ের বিচিত্র ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়, সেখানে কৌতুকরস সৃষ্ট হইবার সুযোগ বড় পাওয়া যায় না। রাধার মানবিষয়ক পদে কোথাও কোথাও বক্র ভাষাসহযোগে কৃষ্ণের প্রতি ভর্ৎসনাবাণ নিক্ষেপ করায় কিছু কৌতুকের যোগান লক্ষ্য করা যায় এই মাত্র। বিদ্যাপতির কবিতায় ভাষার এমন একটা তীব্র ঔজ্জ্বল্য আছে, এমন একটা চতুর নাগর তির্যকতা আছে, যাহাতে বুদ্ধিদৃপ্ত স্মিতহাস্যের আমেজ অনুভব করা যায়। কিন্তু এরূপ নিদর্শনের পরিমাণ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে খুবই সামান্য।

হাস্যরসের মেজাজ

আসলে লিরিকের মেজাজ এবং রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের মেজাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের বস্তু। একজন আত্মগত ভাবব্যাকুলতার মধ্য দিয়া জীবনকে দেখেন। সে-জীবন আবেগতরঙ্গিত, হৃদয়রসের স্পর্শে বহুবর্ণরঞ্জিত। অপরজন অনেকখানি বাস্তবভঙ্গিতে, কিছুটা বাঁকা চোখে জগৎ ও জীবনের প্রতি দৃক্‌পাত করেন। তাই যেখানেই যাহা কিছু ভাঙ্গাচোরা অসংগতি আছে, তাহাই তাঁহার চোখের সামনে স্পষ্ট হইয়া ওঠে। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমরসঘন পরিবেশে কৌতুকদৃষ্টি প্রশ্রয় পাইতে পারে না। সেইরূপ শাক্ত আগমনী-বিজয়া-সংগীতেও বাৎসল্য রসের ভাসমান স্রোতে চিত্ত প্রবাহিত হইয়া যায়। যিনি স্রোতে ভাসমান

তিনি ভাবুক, কিন্তু হাস্যরসিক নন। হাস্যরসিক তটস্থ। তাই তিনি সব-কিছু ঘটনার মধ্য হইতে হাসিটুকু ছাঁকিয়া গ্রহণ করিতে পারেন।

পদাবলী সাহিত্যের তুলনায় কৃষ্ণলীলা-কাব্যগুলিতে হাস্যরস প্রকাশের কতকগুলি সুযোগ করিয়া লন কবিরা। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের গাঢ়তার পরিবেশেও সেখানে কলহ, মতান্তর ও বিতর্কে কিছু কিছু তীক্ষ্ণ বাক্যবিনিময় কখনো কখনো হাস্য-রসের যোগান দেয়। পদাবলীর তুলনায় কৃষ্ণলীলাকাব্যের এই সুযোগের কারণ হইল কাহিনী ও চরিত্রপ্রাধান্য। বিশুদ্ধ ভাব-মূলক কবিতা অপেক্ষা ঘটনার মাধ্যমে, চরিত্রের বিকৃতিতে হাস্যরস প্রকাশের সুযোগ থাকে অনেক বেশী। তাহা ছাড়া দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে নানারসের সৃষ্টি করিয়া বৈচিত্র্য আনিতে চাহিতেন কবিরা। তাই প্রণয়ের সঙ্গে কিছুটা হাস্যরসিকতার অবকাশও সৃষ্টি করিয়া লইতেন।

কৃষ্ণলীলাকাব্যে হাস্যরস

অনুবাদশাখায়ও হাস্যরস সৃষ্টির সুযোগ সীমাবদ্ধ। যা আছে তাও বিশেষ মৌলিক নয়। রামায়ণ মহাভারত হইতেই অনুবাদ করা হইয়াছে বেশী। এই দুইটি মহাকাব্যের বিপুল অবয়বে, কথনও কথোপকথনের মধ্যে, কখনো কোনো কোনো চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে কৌতুকসৃষ্টি করিয়াছিলেন ব্যাস ও বাল্মীকি। রামায়ণে প্রধানতঃ হনুমানের কাণ্ডকারখানা কৌতুক সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার বীরত্বের সঙ্গে স্বল্পবুদ্ধিতার কিঞ্চিৎ মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বাঙালী কবিদের হাতে ইহা আরও পল্লবিত হইয়া প্রগলভ উচ্চহাস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বিশল্যকরণী আনিতে গিয়া তাহার গন্ধমাদন আনয়ন, উহার সহিত সূর্যকে বগলদাবা করিয়া রাখিবার কাহিনী, লেজের আগুনে লঙ্কা পোড়ানো প্রভৃতি প্রসঙ্গে উদ্ভট ঘটনার সহযোগে হাস্যরস জমিয়া উঠিয়াছে। মহাভারতে মহাবীর ভীমসেনের ভোজনরসিকতা, ঘটোৎকচের রাক্ষসী যুদ্ধভঙ্গি কৌতুকের কারণ স্বরূপ দেখা দিয়াছে। ভাগবত পুরাণের অনুবাদে যুদ্ধঘটনার আধিক্য হাস্যরসের জন্য বিশেষ অবকাশ রাখে নাই। রামায়ণ অনুবাদে বিষ্ণুপুরের কবি শংকর কবিচন্দ্রের বিশেষ অবদান "অঙ্গদ রায়বার" নামক মৌলিক পালার উদ্ভাবনে। মূল রামায়ণে এই পালা নাই। রাবণ অঙ্গদের কথোপকথনে, বিশেষ করিয়া রাবণের প্রতি অঙ্গদের তীব্র ভর্ৎসনায় ঝাঁজালো ব্যঙ্গরস প্রকাশ পাইয়াছে। 'অঙ্গদ-রায়বারে'র বিরুদ্ধে রুচিদুষ্টতার অভিযোগ করা চলে; কিন্তু হাস্যরসের ক্ষেত্রে রুচির সীমানা সর্বদা সঠিকভাবে রক্ষিত হয় না। 'অঙ্গদ-রায়বারে'র জনপ্রিয়তা সেকালে এত ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল, যাহাতে অনুকরণাত্মক সমজাতীয় অনেকগুলি পালাও উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত রামায়ণে উদ্ভট ঘটনার সাহায্যে হাস্যরসসৃষ্টি পাঠকদের মুহুর্মুহুঃ চমকিত করে। ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস-প্রাচুর্য, কবির হাস্যকৌতুককে সীমাবদ্ধ করে নাই। কুম্ভকর্ণের ন্যায়

অনুবাদে হাস্যরস

ভয়ানক চরিত্র লইয়াও কবি রসিকতা করিয়াছেন। তাহার নিদ্রা, তাহার যুদ্ধ, এমন কি তাহার মৃত্যুও হাস্যের খোরাক যোগাইয়াছে। অবশ্য কবি হাস্যরস সৃষ্টি করিতে গিয়া কাব্যের বিষয়গত আনুগত্য সর্বদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মেঘনাদের মৃত্যুকালে হনুমানকে দিয়া তিনি যে চাপল্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বিষয়গুরুত্বের হানি ঘটাইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যে হাস্যরস

মঙ্গলকাব্য মৌলিক কাহিনীকাব্যের শাখা। অধিকাংশ মঙ্গলকবিই বস্তুনিষ্ঠ, কল্পনার ডানায় ভর করিয়া বহুদূরে উড়িয়া যাইবার প্রবণতা বা ক্ষমতা তাঁহাদের অনেকেরই ছিল না। তাঁহারা জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে হাস্যরস সৃষ্টির জন্যও তাঁহারা কতকগুলি সুযোগ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গগুলি ক্রমে কতকগুলি বাঁধাধরা প্যাটার্ণে পরিণত হইয়া যায়। নারীগণের পতিনিন্দা প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের একটি অবশ্য বর্ণিতব্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নারীদের পতিনিন্দার সাহায্যে স্থূল ধরনের কৌতুকরস সৃষ্ট হইত। কিন্তু এই প্রসঙ্গটি যে সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল—তাহাতে সন্দেহ নাই। না হইলে প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেন না কবিরা। মহাদেবের চরিত্র, ইন্দ্রিয়শিথিলতা অথবা দারিদ্র্য এবং শিব-পার্বতীর কলহ অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যেই একটি আকর্ষণীয় বিষয়রূপে চিত্রিত হইত। তাহা ছাড়া নারদের চরিত্র এবং ভাবভঙ্গিও প্রচুর হাস্যরসের উপকরণ যোগাইত। এই সব প্রসঙ্গে যে হাস্যরস প্রকাশ পাইত তাহার মধ্যে কবিদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অথবা রুচির তীক্ষ্ণতার পরিচয় বিশেষ মিলিত না। মনসামঙ্গলের কবিরা চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়াও হাসির পরিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছেন। মর্ত্য রাজাকে প্রতারণা করিবার প্রসঙ্গটি হাস্যরসের উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ রূপে বহু কবিই ব্যবহার করিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের 'ভিলেন' ভাঁড়ু দত্তের বর্ণনা দিতে গিয়াও কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছেন কবিরা। মুকুন্দমাধব ভাঁড়ুর চরিত্রসৃষ্টিতে বিশেষ সার্থকতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার শয়তানি ষড়যন্ত্রের প্রতি ঘৃণার সহিত হাস্যরসকেই শুধু মিশ্রিত করেন নাই, উহার পশ্চাতে করুণার অশ্রুবিন্দুরও স্পর্শ আনিয়াছেন। খল ভাঁড়ু দত্তের সমস্ত অপকীর্তির পিছনে তাহার ব্যক্তিজীবনের এই একান্ত বাস্তব পরিচয় নিঃসন্দেহে মর্মস্পর্শী :

ভাঁড়ু দত্ত বোলে শুন তপনদত্তের মা।
ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সব গা ॥ ··
যেন মাত্র ভাঁড়ু দত্ত কৈল হেন বাণী।
ক্রোধ করিয়া তারে কহিছে রমণী ॥

যেমত কথা কহ তুহ্মি লোকে বোলে আউল।
কালু কৈলা উপবাস আজু কথা চাউল॥
স্ত্রীর বচনে ভাঁড়ু ভাবে মনে মন।
আজুকার অন্ন আমার মিলিব কেমন॥
ভাঙা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বাঁধিয়া।
চাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া॥

এইভাবে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবিরা হাস্যরসসৃষ্টির উপযোগী কতকগুলি প্রসঙ্গের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু এগুলিও প্রথাবদ্ধ কতকগুলি মামুলী ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। কবিরা কাব্যকাহিনী বর্ণনার মধ্যে রসবৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই প্রধানতঃ এই প্রসঙ্গগুলির সুযোগ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্ততঃ চারিজন কবির নামোল্লেখ করা যায় যাঁহারা কৌতুক-দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের জীবনকে দেখিবার ভঙ্গির মধ্যেই ছিল তির্যকতা। তাঁহাদের শিল্পবোধ ভাবাবেগের স্রোতে ভাসমান না হইয়া তটস্থ দর্শকের ন্যায় জীবনকে দেখিয়াছে এবং উহার মধ্য হইতে ব্যঙ্গ, কৌতুক ও উচ্চকণ্ঠ হাস্যের রস দোহন করিয়া লইয়াছে। এই চারিজন হইলেন—বড়ু চণ্ডীদাস, বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র। ইঁহাদের শিল্পী-চরিত্রের কিছুটা বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

মঙ্গলকাব্যে বিশেষ বিশেষ কৌতুকপ্রসঙ্গ

বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যকাহিনীর বিষয়বস্তু প্রেম। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বিশেষ করিয়া রাধার চরিত্রবিবর্তন প্রদর্শনই কবির উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে বস্তুনিষ্ঠ তীক্ষ্ণতা ছিল। রাধার চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁহার যতটা প্রবণতা, ভাবব্যাকুলতা চিত্রণে ততটা নয়। কবি প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রে কল্পলোকের অনির্বচনীয়তার অভিমুখী হইতে চাহেন নাই। যে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি হাস্যরসাত্মক সৃষ্টির বিঘ্নস্বরূপ, বড়ু চণ্ডীদাস প্রণয়কাহিনীর কবি হইয়াও তাহা হইতে দূরে ছিলেন। তাঁহার প্রণয়ভাবনাও একান্ত বাস্তব দেহভাবনার চারিপাশেই আবর্তন করিয়াছে। বড়ু যাত্রাপালার রচয়িতা। দর্শকমনোরঞ্জনের উপযোগী একান্ত স্থূল হাস্যের উপাদান আছে তাঁহার কাব্যে। এই প্রসঙ্গে নারদমুনির কংসসভায় উৎকট নৃত্যের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। কবি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "রাম কাড়ে যেন বোকা ছাগ"। নারদ চিরকালই বাংলা পালাগানে এবং পৌরাণিক কাহিনীতে হাস্যোদ্দীপক চরিত্র। এক্ষেত্রে বড়ু প্রথার অনুকারী মাত্র। বড়ু বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন রাধাকৃষ্ণের রসকলহের চিত্র আঁকিতে গিয়া। সেখানে বক্রবাচনে, তীব্র কটাক্ষে, দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাতে, বিদ্রূপের আঘাতে নাট্যরস ও ব্যঙ্গরস জমিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি সর্বাধিক সাফল্য লাভ

রঙ্গরসিক বড়ু চণ্ডীদাস

করিয়াছেন কৃষ্ণের চরিত্র-কল্পনায়। তাঁহার কাব্যের নায়ক যেমন পৌরাণিক কংসারি কৃষ্ণ নন, তেমনি পদাবলীর প্রেমময় ধীরললিত পুরুষও নন। তাঁহার চরিত্রের কাম-প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং গ্রাম্যতার সঙ্গে মিলিয়াছে কৌতুকরসাত্মক দুইটি উপাদান—বালসুলভতা এবং লঘু রসিকতা। কৌতুকরসের সহযোগেই কৃষ্ণের কামলোলুপতাকে অনেকখানি আবৃত করিয়া উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন কবি। তাঁহার বালক-স্বভাব এবং বীরদম্ভ প্রণয়ভাবের সঙ্গে মিলিয়া বিশেষ স্বাদুতার কারণ হইয়াছে। বংশীখণ্ডে বাঁশী হারাইয়া তিনি কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন। কি কৈফিয়ৎ দিবেন তিনি ভাই বলরামকে! মায়ের নিষেধ না শুনিয়া গোঠে গিয়া বাঁশিটি হারাইয়া তাঁহার দুঃখের আর শেষ নাই। এই বালকস্বভাব তরুণই প্রণয়পাত্রী রাধাকে বশ করিবার জন্য নানাভাবে ভয় দেখাইয়াছেন, এমন কি বাঁধিয়া রাখা, মারিয়া ফেলার কথাও বলিয়াছেন। তিনি যে দেবরাজ বনমালী, কংসধ্বংসের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব, একথা বলিয়াও গর্ব অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু "ঘোড়াচুলা কাহ্নাই"-এর এসব কথা শুধু হাসিরই উদ্রেক করিয়াছে। কবি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই কৃষ্ণের বীরত্ব-অহংকারের পরেই তিনি বলিয়াছেন, "এহা শুণী বড়ায়িত উপজিল হাস।" কিন্তু হাস্যরস উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে যখন অবৈধ দেহলোলুপতার চরম নিদর্শন দেখাইবার পরে কাব্যশেষে ভণ্ডযোগীর বেশে গম্ভীর হইয়া অবৈধ প্রেমের বিরুদ্ধে তিনি ধর্ম উপদেশ দিতে থাকেন—

তোরে বোলোঁ চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী
কেহ্নে বোল হেন পাপবাণী।
মাঅ যশোদা মোর মামী আইহন জ
তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী॥

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলকাব্যে উচ্চহাস্য সৃষ্টি করিয়াছেন কবি সার্থকভাবে। তাঁহার কাব্যে ব্যঙ্গ অপেক্ষা রঙ্গই অধিক। সেই রঙ্গ ফুটিয়া উঠিয়াছে ঘটনা-বিন্যাসে, মুহূর্ত-নির্বাচনে এবং 'সিচুয়েসন'-নির্মাণে, কখনো-বা কোনো চরিত্রের প্রতি সামান্য ইঙ্গিতে। উদাহরণ হিসাবে চাঁদের বাণিজ্যের উল্লেখ করা চলে। এক্ষেত্রে মুখের কথাকে মাত্র সম্বল করিয়া বাণিজ্যলক্ষ্মীকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করার নিপুণ কৌশল এই চরিত্রটির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। চাঁদ যে ভাষায় মূলার গুণ-পরিচিতি করিয়াছেন তাহাতে ইহাকে পরম দুর্লভ রাজভোগ্য বস্তু বলিয়া বর্ণনা করানো হইয়াছে। নারিকেল লইয়া যে গল্প জুড়িয়াছেন বিজয়গুপ্ত, তাহা অতিশয়োক্তি তো বটেই আজগুবিও। উঁচু গাছের মাথায় যে ফল জন্মে তাহার মধ্যে এত জল আসিল কোথা হইতে সে সমস্যায় চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন রাজার পারিষদবর্গ:

বিজয়গুপ্ত—উদ্ভট কল্পনাজাত হাস্য

বিষম বাঙালী লোকে   প্রকারে মারিতে তোকে
তার লাগি আনিছে বিষফল।
বুঝিনু কপট যত   বায়ু যেতে নাহি পথ
তাতে জল গেলেক কেমনে।

টিয়া নামক দ্বারবানকে নারিকেল জল খাওয়াইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা, উহার নারিকেল জলপানে স্বর্গগমনের আনন্দলাভ ও মূর্ছা, অবশেষে পাত্রীপুত্রের জন্য ছোবড়া সরাইয়া রাখার ঘটনাটি উচ্চহাস্যের জন্য দিয়াছে। কিন্তু আরও প্রগল্‌ভ, আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে চাঁদের বস্ত্রের প্রসঙ্গে। চাঁদ কথার মারপ্যাঁচে বুঝাইয়া দিয়াছে এরূপ বস্ত্র রাজারই যোগ্য—কারণ ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সুন্দর। দক্ষিণ পাটনের রাজা রাজবেশ দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তিনখানা চট লইয়া –

একখানা কাছিয়া পিন্ধে   আর খান মাথায় বান্ধে
আর খান দিল সর্বগায়।

হাস্য আরও উদ্দাম হইয়া ওঠে যখন রানী এই অনুপম চাঁদের বস্ত্রের লোভে রাজাপাট ছাড়িয়া চাঁদের দেশে গিয়া বসবাস করিতে চায়।

হিউমার – বিজয়গুপ্তের শিব

বিজয়গুপ্ত শুধু উদ্ভট ঘটনার সাহায্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেন নাই তিনি শিব চরিত্রকে একটি "হিউমারাস" চরিত্ররূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন শিবের ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য, বালসুলভ আনন্দ ও বেদনার আধিক্য, লোকাপবাদ হইয়া কড়ি না দেবার চেষ্টা, স্ত্রীর তাঁহাদের বন্ধন খুলিয়া পুষ্পবনে পলায়ন সব মিলাইয়া তাঁহাকে "entertaining character" বলিয়াই মনে হয়। মনে পড়ে সমালোচকের মন্তব্য "Humour is the exhibition of individual peculiarities of an entertaining character." —Adam Fox।

মুকুন্দরামের উচ্চাঙ্গের হিউমার

মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানধারার শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের রসসত্তা তুলনামূলক-ভাবে অনেক মৃদুকণ্ঠ এবং মার্জিত। এ বিষয়ে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : "অতি পল্লবিত, অলংকৃত বিস্তারের স্থলে মিতভাষিতা ও তীব্র ভাস্বরত্ব, নির্বিচার পদানুবর্তনের স্থলে বাস্তব স্বীকৃতির প্রখর মৌলিকতা, অর্ধযান্ত্রিক পূর্বরোমন্থনের স্থলে নূতন অনুভূতির দীপ্ত ঝলক—এই সমস্তই তাঁহার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচনার উপর এক সচেতন সমগ্র প্রসারিত মননশক্তির পরিচয় দীপ্যমান। তাঁহার শিল্পবোধ মার্জিত, জীবনবাদসম্ভূত রসিকতা তাঁহার পূর্ববর্তীদের গ্রাম্য ভাঁড়ামো হইতে স্বতন্ত্র জাতীয়। তাঁহার কৌতুকরস কেবল কথায় সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার বঙ্কিম কটাক্ষ, অর্থগূঢ় মন্তব্য ও সমগ্র মনোভাব ও জীবনদর্শনের বহুমুখী বিস্তার হইতে তির্যক রেখায় ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে।" মুকুন্দরাম বাস্তববাদী। তাঁহার সরসতা বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া

প্রকাশ পায় নাই, তাহার মধ্য হইতেই দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া চরিত্র-চিত্রণে মুকুন্দরাম কৌতুকরসকে একটি সাধারণ উপাদান হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন; বলা উচিত ব্যক্তিগত কিংবা 'টাইপ'গত স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও কবির কৌতুকদৃষ্টিপাতে প্রায় সব কয়টি উল্লেখযোগ্য চরিত্রে সরসতা একটা অতিরিক্ত আস্বাদের কারণ হইয়াছে। ভাঁড়ুর 'ফিচলেমি', মুরারির শাঠ্য, কালকেতু বা ফুল্লরার স্বল্পবুদ্ধি অন্ত্যজ আচরণ, শিবের ভোজন-লোলুপতা ও কর্মে আলস্য—সব-কিছুই কবির কৌতুকের অংশীদার হইয়াছে। গুজরাটের নবাগত বৈদ্যসম্প্রদায়ের বর্ণনায় কবির ভাষায় সামাজিক ব্যঙ্গবোধের স্পর্শ লাগিয়াছে—

কাক দেখি সাধ্য রোগ ঔষধ করয়ে যোগ
রোগে হয় মারয়ে সদায়
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে মাগয়ে বিদায়।

বিপ্রদের প্রতি ব্যঙ্গও বেশ তীব্র—

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেবপূজা ঘরে ঘরে
চাউলের কোচড়া বান্ধে টান॥

তবে মুকুন্দরাম ব্যঙ্গ অপেক্ষা চরিত্র-ভিত্তিক কৌতুক এবং সরস সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণেই অধিকতর দক্ষ।

ভারতচন্দ্রের কবিতায় ব্যঙ্গের অতিতীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়। অষ্টাদশ শতকের সমাজ-অবক্ষয়, আদর্শবিচ্যুতি ও জীবন-অস্থিরতার পরিবেশ এবং ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন ও কবিসত্তার বিশিষ্টতার সমন্বয়ে এই ব্যঙ্গদৃষ্টি গঠিত। বুদ্ধির মার্জিত বিচ্ছুরণ এবং ভাষার উজ্জ্বল বক্রতা ব্যঙ্গরসের আস্বাদে বিচিত্রতা আনিয়াছে। ভারতচন্দ্র জগৎ ও জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ও আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। মধ্যযুগের ধর্মচেতনা ও ভক্তিপ্লাবন তাঁহাকে আপ্লুত করিতে পারে নাই। মঙ্গলকাব্যের আদ্যাশক্তি দেবীকে তিনি অবৈধ প্রণয়ের রক্ষাকর্ত্রীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। শিব তাঁহার কাছে দেখা দিয়াছে বেদের বেশ ধরিয়া। বেদব্যাসকে লইয়া তিনি সরব বিদ্রূপ এবং সরস কৌতুক

ব্যঙ্গরসিক ভারতচন্দ্র

করিয়াছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। নারীরূপ বর্ণনায় প্রাচীন কাব্যের পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করিয়াই তিনি তাঁহার নায়িকার কটিদেশকে চুলের সঙ্গে এবং বক্ষদেশকে পর্বতশৃঙ্গের সঙ্গে উপমিত করিয়াছেন। কবির কাব্যের আদ্যন্ত সমাজব্যঙ্গের তীব্র কটাক্ষপাত ঘটিয়াছে। দক্ষসভায় যজ্ঞ বিনষ্ট হইবার প্রচণ্ড দুর্ঘটনা ও জীবনরক্ষার আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ব্রাহ্মণদের "কেহ কেহ

ভোজ্যবস্তু সারিছে" দেখিয়া তিনি উচ্চহাস্য করিয়াছেন। তিনি চারিপাশের সমাজকে, ধর্মব্যবস্থাকে, কাব্যরীতিকে, এমন কি তাঁহার মুরুব্বী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে পর্যন্ত ব্যঙ্গের আঘাত হানিয়াছেন। আবার আপনার দারিদ্র্যের প্রতিও জনৈক কবিপত্নীর মুখ দিয়া বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে ছাড়েন নাই—

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥···
খড়ো-চাল বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
শাঁখা চুড়ি বাউটী শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণ প্রমোদের প্রভু॥

—এখানেই ব্যঙ্গ-শিল্পী হিসাবে তাঁহার মাহাত্ম্য।

উপসংহার

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের হাস্যরস-সৃজনের ঐতিহ্য অবহেলার যোগ্য নয়। সাধারণ কবিদের হাতে ইহার মামুলী ও স্থূলরূপ প্রকাশ পাইলেও এমন কয়েকজন বড় শিল্পীকে আমরা পাইয়াছি, যাঁহাদের ঐতিহ্য লইয়া সংগত কারণেই গর্ব অনুভব করা যায়।

সাহিত্য : উদ্দেশ্যমূলকতা বনাম উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষতা

ভূমিকা

সাহিত্যের স্বরূপ আর লক্ষ্য লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে প্রাচীন কাল হইতে। একদল বলিতেছেন সাহিত্যের উদ্দেশ্য আছে, সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্ধন সে অস্বীকার করিতে পারে না। অপর দলের মতে, কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের বন্ধনে বাঁধিলেই সাহিত্যের প্রাণ হনন করা হইবে, সাহিত্য তখন আর সাহিত্য থাকিবে না—অন্য কিছু হইয়া দাঁড়াইবে। এ বিষয়ে সুস্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন। কারণ এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক এবং সৌন্দর্যতত্ত্বঘটিত নানা জিজ্ঞাসা। তাহা ছাড়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়াছে। এইসব মতবাদ কখনো কখনো যুগের সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে, এমন কি নিয়ন্ত্রিতও করিয়াছে। কখনো আবার নব্য সাহিত্যের জোয়ারে ভাসিয়া গিয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকেরা সাহিত্যকে সর্ব প্রয়োজনের বন্ধন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া অনুভব করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরবময় যুগ রাজসভার অবকাশের মধ্যে কুসুমিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ মানুষের কঠিন

জীবনসংগ্রামের সহিত ইহার সম্পর্ক ছিল না। নৃপতি ও অমাত্যবর্গ তথা শিক্ষিত অভিজাতশ্রেণী রাজ্যজয় ও রাজ্যশাসনের দুষ্কর কর্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রামের সঙ্গীরূপেই কাব্যচর্চার পরিপোষণ করিতেন। এক বিচিত্র সৌন্দর্যবিহ্বল রসজগৎ তাই গড়িয়া উঠিয়াছিল ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে। সেই রস তাঁহারা আকণ্ঠ পান করিতেন এবং তৃপ্ত হইতেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রীরা তাই বলিয়াছিলেন, রস অলৌকিক। বাস্তব জীবন-চেতনা এবং ব্যক্তিভাবনা তথা স্বার্থবোধ রসস্বর্গের পৌঁছুবার পথে বাধা ঘটায়। রসের উপভোগ করার ক্ষমতা বিদগ্ধজনেরই। জন্মজন্মান্তরের বাসনাই এই "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর"-রসোপলব্ধির রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দেয়।

ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্র

প্রাচীন গ্রীকসাহিত্য ছিল অনেক বেশী গণতান্ত্রিক। গ্রীক্ নাটকাভিনয়ে জনগণের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত ছিল। জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষতর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ তাই অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। আরিস্তোতল প্রমুখের সাহিত্যতত্ত্বে ইহার প্রতিফলন ঘটিয়াছিল। সাহিত্যকে তাঁহারা জীবনের প্রতিফলন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আরিস্তোতলও সাহিত্য এবং সর্ববিধ ললিতকলার লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন বিশুদ্ধ ভাবসৌন্দর্যসৃষ্টিকে—"The object of poetry, as of all the fine arts, is to produce an emotional delight, a pure and elevated pleasure." (বুচারকৃত আরিস্তোতলের ভাষ্য)।

প্রাচীন গ্রীক মত

মধ্যযুগে সৌন্দর্যদৃষ্টি তুলনামূলকভাবে অনেকটা ক্ষীণ ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ইউরোপে খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস সহজ স্বাভাবিক রূপোপভোগের পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মাচরণ এবং ধর্মকেন্দ্রিক সমাজদৃষ্টি প্রাধান্য পায়। আমাদের দেশেও মুসলমান আক্রমণের পরবর্তীকালে ধর্মকেন্দ্রিক রক্ষণশীলতা এক সর্বগ্রাসী মূর্তি ধরিয়া দেখা দেয়। দর্শন, শিল্পবোধ সব কিছুই ধর্মভাবনার নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়ে। মধ্যযুগের সাহিত্যস্রষ্টারা এবং ব্যাখ্যাতারা সাহিত্যকে ধর্মসাধনার সহায়ক একটি উপশাখারূপেই গ্রহণ করেন। ভক্তিরস নামক একটি নব্য আস্বাদের কল্পনা করা হয়। উহা পুরাতন সাহিত্যাস্বাদের রাজ্যে ছিল একান্ত অপরিচিত। এইভাবে সাহিত্য ধর্মীয় উদ্দেশ্যের বাহন হইয়া পড়ে। কোথাও কোথাও এই উদ্দেশ্যমূলকতা এত বড় হইয়া উঠে যে, শুদ্ধ সৌন্দর্য-সৃজন যে-কোনো শ্রেণীর সাহিত্যের ধর্ম হইতে পারে, লেখকগণ তাহাও ভুলিয়া যান। উদাহরণ হিসাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। সাহিত্যের উৎকর্ষের পক্ষে এইরূপ ধ্যানধারণা বিশেষ সহায়ক নয়। ইহার পরে শিল্পরূপের নিষ্ঠা কমিয়া যায়, গতানুগতিকতা এবং প্রথানুবর্তন প্রধান হইয়া উঠে। ইউরোপে অথবা আমাদের দেশে উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ প্রাচীন সাহিত্যের তুলনায় ধর্মীয়

মধ্যযুগ—ধর্মীয় উদ্দেশ্য-মূলকতা

উদ্দেশ্যমূলক মধ্যযুগের সাহিত্য যে গুণের দিক হইতে অনেক নিম্নমানের তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

রেনেসাঁর ফলে ইউরোপীয় ভাবাকাশ নূতন মুক্তির আবেগ অনুভব করিতে লাগিল। মধ্যযুগীয় বন্ধন হইতে, ধর্মীয় ধ্যানধারণা হইতে মনুষ্যত্বের মুক্তি এই কালের প্রধান প্রত্যয় হইয়া দাঁড়াইল। মানবমুক্তির সহিত শিল্প-সাহিত্যের বন্ধনমোচনেরও সূত্রপাত হইল। ইহার মূল কথাটিই হইল বহিরাগত কোনো প্রভাবের নিকটে নতি স্বীকার না করা। মানুষ যেমন মানুষ বলিয়াই শ্রদ্ধেয়, তাহার অতল জীবন ও হৃদয়রহস্য অনুধাবনীয়, সেইরূপ সাহিত্য সাহিত্যরূপেই মহার্ঘ্য, ধর্ম বা দর্শনের বাহনরূপে নয়। সাহিত্যকে নিজের সত্য-স্বরূপে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিল নব ভাবনা। আমাদের দেশেও উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পের মুক্তি সূচিত হইল। মধুসূদন বন্ধুকে চিঠিতে লিখিলেন, সাহিত্যপাঠের সময় সর্বপ্রকার ধর্মীয় কুসংস্কার (Religious bias) দূরে সরাইয়া রাখ। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা নয়, সৌন্দর্যসৃষ্টি।

নবজাগৃতি ও সাহিত্যের মুক্তি

সাহিত্যজিজ্ঞাসায় আধুনিককালে কতকগুলি গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহাদের আলোচনার মধ্যেই উহার লক্ষ্যসম্পর্কিত একটি গ্রহণযোগ্য উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা বাস্তববাদী তাঁহারা সাহিত্যকে সমাজজীবনের একটি ঘনিষ্ঠ শাখা বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে, সাহিত্যের মুক্তি লইয়া যত কথা বলা হয়, উহার অধিকাংশই বাক্যবাগীশের শব্দের খেলামাত্র। মুক্তি আসলে স্বপ্ন। মানুষ নিজেই মুক্ত নয়, সাহিত্য মুক্ত হইবে কি করিয়া? মানুষ তাহার সামাজিক অস্তিত্বের বন্ধনে বাঁধা। তাঁহার মন এই বন্ধনের সূত্রগুলি ছিঁড়িতে পারে না। উহার সাহায্যেই একটি উর্ণনাভ রচনা করিয়া তাহার শিল্পকৌশলে আপনাকে এবং অপরকে প্রতারণা করে। মানুষের প্রতিটি চিন্তাধারা, তাহার দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস-ভাবনা যেমন সমাজজীবনের ভিত্তিতে জাত এবং সমাজকে প্রভাবিত করে, সাহিত্যও সেইরূপ। উহাকে দায়িত্বহীন রঙীন ফানুস করিয়া তুলিবার চেষ্টা অপচেষ্টা মাত্র। সাহিত্যকে সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতেই হইবে। উহা উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। সাহিত্য যে ভাষার বর্ণাঢ্য মায়াজাল সৃষ্টি করে তাহা মনের উপরে সহজে গভীর প্রভাব ফেলে। দর্শন ও সমাজ-চিন্তা সোজাসুজি যাহা প্রচার করে, সাহিত্য অনেক অলংকৃত করিয়া তাহা বলে এবং গভীরতর ফলশ্রুতি লাভ করে। সাহিত্যের এই সম্ভাবনার দিকটি মনে করিয়াই মধ্যযুগের সংস্কৃত অলংকারবিদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী "কান্তাসম্মত" উপদেশের তত্ত্বটি দাঁড় করাইয়াছিলেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য দর্শনাদির ন্যায় প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ ["প্রভুসম্মত"] উপদেশ দান নহে, অথবা বন্ধুর ন্যায় মধুর করিয়া উপদেশ দেওয়াও ["বন্ধুসম্মত"] নহে। মনোরঞ্জনের মধ্য হইতে পরোক্ষভাবে,

সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব আছে—মধ্যপন্থীর আপোস.

আপনার অজ্ঞাতসারে প্রিয়তমা পত্নীর ন্যায় সাহিত্যের শিক্ষা হৃদয়ের গভীরে আসন পাতিয়া বসে। এই অভিমত প্রাচীন আলংকারিকদের সিদ্ধান্ত হইতে অনেক দূরবর্তী। কিন্তু সমাজ-সচেতন ব্যক্তিদের নিকট ইহার যুক্তি খুবই শক্তিশালী। বঙ্কিমের ন্যায় সৌন্দর্যপ্রাণ লেখকও এইরূপ মধ্যপন্থার সহিত কতকটা সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই সাহিত্যের মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াও গৌণতঃ মানবচিত্তের উৎকর্ষ বিধানকেও কতকটা স্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন।

আধুনিক বাস্তববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিটি খুবই আক্রমণাত্মক। মার্ক্সবাদী বস্তুতন্ত্রে বিশ্বাসীদের মতে—"Art is a class 'weapon"। তাঁহারা শিল্প সাহিত্যকে সম্পূর্ণতঃ একটি দার্শনিক মতবাদের বাহনে পরিণত করিতে চান। "Every proletarian artist must be a dialectical materialist The method of creative art is a method of dialectical materialism." এই মতবাদ সাহিত্যকে পরিপূর্ণভাবে উদ্দেশ্যবাদী করিয়া তুলিতে চায়। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের ভাবিত উদ্দেশ্যটিও সুনির্দিষ্ট—পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। সাহিত্য সেই সংগ্রামের একটি অস্ত্র মাত্র। উহার মূল্য সাহিত্য বলিয়া নহে, সাহিত্যের আকর্ষণী শক্তিকে কাজে লাগাইয়া, মানবমনে নিজেদের দার্শনিক-রাজনৈতিক প্রভাবটি মুদ্রিত করা সহজ বলিয়াই ইঁহারা সাহিত্যের আদর করেন। এ বিষয়ে ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্তের ভাবনা উদ্ধার করা যাইতে পারে : "আর্টকে যদি একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক বা সামাজিক মতবাদের অচ্ছেদ্য লৌহ-নিগড়ে শৃঙ্খলিত করা হয়, তবে তাহা হইবে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভীষণতম দুর্দিন, সভ্যতার ট্র্যাজিডির শেষ হয়। ইহা মানবমনকে এবং বায়ুপ্রবাহকে বাঁধিবার চেষ্টা! মানবমনের স্বাধীনতা ও মর্যাদাবোধ ঘুচাইয়া তাহাকে যদি কলুর চোখঢাকা বলদের মত কেবল মার্ক্সীয় অথবা যে কোন নির্দিষ্ট মতবাদের ঘানিতেই ঘুরানো হয়, তবে সে মনের নব নব উন্মেষ—অপূর্ব বস্তু দর্শন ও নির্মাণের ক্ষমতা চিরতরে ঘুচিয়া যাইবে।"

মার্ক্সীয় ভাবধারা—সাহিত্যের প্রাণনাশ

ইউরোপীয় সাহিত্যে ও শিল্পচেতনা সুইনবার্ণ অস্কার ওয়াইল্ড প্রমুখ সাহিত্যিকগণ "Art for Art's sake" মতবাদের প্রবক্তারূপে দেখা দেন। সামাজিক সুনীতি দুর্নীতি ভাবনার ঊর্ধ্বে শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে চান তাঁহারা। তাঁহাদের মতে শিল্পের সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। শিল্পেই শিল্পের শেষ। ফলে কোনোরূপ শিক্ষা ও নীতি-প্রচারগত দায়িত্ব শিল্প বহন করে না। "Art for Art's sake" মতবাদীরা জীবন ও শিল্পকে পৃথক করিয়া ফেলেন। এই মতবাদটি তাই গ্রহণযোগ্য নয়। একদিকে যাহারা সাহিত্য-শিল্পকে জীবনের একটা অংশ বলিয়া মনে করেন, জীবনের বাস্তব

Art for Art's sake

প্রয়োজনে তাহাকে লাগাইতে চান, তাঁহারা যেমন ভ্রান্ত, অপরদিকে তেমনি যাঁহারা শিল্পকে জীবনের সহিত একেবারে সম্পর্কচ্যুত করিতে চান তাঁহারাও শিল্পের স্বরূপ বিকৃত করিয়া ফেলেন।

শিল্প ও সাহিত্য যে নীতিশিক্ষার কোনোরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করে না, শিল্পবোধের ঊর্ধ্ব ও সার্থক স্তরে আরোহণ করিলে নীতিবোধের—সুনীতি-দুর্নীতি-বিচারের ক্ষুদ্রতা হইতে চিত্ত যে মুক্ত হয়, এ-বিষয়ে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: "সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে সুনীতি-দুর্নীতির ভেদ টেনে আনা শিল্পের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। কারণ, সামাজিক সংস্কারে যা নিন্দনীয় তাই হয়তো শিল্পীকে রসবোধে উদ্বোধিত ক'রে, এমন কিছু রচনা করাতে পারে যা শিল্প হিসাবে অন্য হাজার হাজার লোককে সংস্কারবদ্ধ খণ্ড ধারণার ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ রসোপলব্ধিতে নিয়ে যাবে। বিষয়-বিশেষকে লোকে বলবে দুষ্ট, কিন্তু মায়াবী তুলির স্পর্শে তাতে বিষয়াতীত এমন কিছু ফুটে উঠবে যা অভিনব। যে দেখে বা যে অনুভব করে সেই বিষয়ীর দৃষ্টিভঙ্গির ইতর-বিশেষে ও চেতনার তারতম্যেই নির্ভর করে বিষয়টি সুনীতি-দুর্নীতির স্তরেই থেকে যাবে, না তার ঊর্ধ্বে উঠবে।"

সাহিত্য ও নীতিশিক্ষা

সাহিত্যরসকে কেহ বলিয়াছেন "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর," কেহ বলিয়াছেন একান্ত বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেহ সামাজিক কল্যাণবোধের কাজে ইহাকে লাগাইতে চাহিয়াছেন, কেহ ইহাকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্টের জীবনচেতনার পরিচয় লওয়া যাইতে পারে। কাণ্ট মানবের ভাবনাজগৎকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন:—(১) Pure reason, (২) Practical reason, (৩) Æsthetic Judgment। বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান, যাহার সঙ্গে বাস্তব জীবনচর্যার কোনো সম্পর্ক নাই, যে জীবন ও নিখিলের রহস্য ভেদ করিতে চায়, যে চিন্তা জগৎ ও জীবনের উৎস ও অন্ত ও অস্তিত্বের মধ্যে চলিয়া যাইতে চায়, তাহাকে Pure reason বলা হয়। ইহাকে Cosmic consciousness নামেও অভিহিত করা যায়। Practical reason হইল সামাজিক জ্ঞান। ইহারই সহায়তায় আমাদের ব্যবহারিক জীবনচর্যা। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতিরূপে ইহা প্রকাশ পায়। ইহাকে বলা যায় Social consciousness। তৃতীয় প্রত্যয়টির সহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ বা সমাজসম্পৃক্ত কর্মমার্গের কোনটিরই যোগ নাই। উহার নাম সৌন্দর্যচেতনা। বঙ্কিম "ধর্মতত্ত্ব" আলোচনাপ্রসঙ্গে "চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি" বলিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছেন। ইহা নিখিলের রহস্যের সন্ধানে ধ্যানস্থ নয়, ইহা ব্যবহারিক জীবনচর্যার বিষয়ে উৎসাহী নয়। ইহা একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি, ইহা মানুষের মধ্যে আছে। এই 'বৃত্তির

মানবজীবনে সৌন্দর্যচেতনা: কাণ্টের ভাষ্য

জন্যই মানুষ সৌন্দর্যপিপাসু। সাহিত্য-শিল্পের প্রতি তাহার আকর্ষণ এই Æsthetic Judgment থাকার জন্যই। যাঁহার মধ্যে প্রথমটি প্রবল হইয়া অপরগুলিকে আচ্ছন্ন করে, তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, অথবা নিভৃতচারী দার্শনিক। যাঁহার দ্বিতীয় বৃত্তিটির আধিক্য তিনি কর্মীপুরুষ। যাঁহার মধ্যে তৃতীয় বৃত্তিটির প্রাধান্য তিনি সাহিত্যশিল্পের স্রষ্টা অথবা ভোক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এই তিনটি বৃত্তিই নানা অনুপাতে জড়িয়ে থাকে, কোনোটিরই অতিরিক্ত বিকাশ যেমন হয় না, অপরগুলি একেবারেই গৌণও হইয়া যায় না। এই ব্যাখ্যান প্রমাণ করে সৌন্দর্য-চেতনা মানুষের একটি বৃত্তি। উহা কর্ম ও জ্ঞানমার্গ হইতে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। এই বৃত্তির নিকটেই সাহিত্য ও শিল্প আবেদন করে, ইহাকে জাগাইয়া তুলিতে চায়। জীবন মানে শুধুই ব্যবহারিক কর্ম এবং তৎসংশ্লিষ্ট ভাবনা নয়। সৌন্দর্যতৃষ্ণা এবং শিল্প-সাহিত্যের দ্বারা তাহার নিবৃত্তিও জীবনধর্মেরই অনুগত। তাই সাহিত্য-সৌন্দর্য সৃষ্টিকে যদি সাহিত্যের মুখ্য এবং একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করা হয় তবে তাহাকে জীবন-বিচ্যুত উক্ত বলা যায় না।

জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রভাষ্যও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্যের কাজ সুপ্ত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। ইহারই অপর নাম সৌন্দর্যসৃষ্টি। সৌন্দর্য কাহাকে বলে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, লৌকিক সুখদুঃখের ঊর্ধ্বচারী আত্মার আলোড়নজাত আনন্দ-বিধান করে যে সে-ই সুন্দর। রবীন্দ্র-ব্যাখ্যাত সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ানুগ সৌন্দর্য অপেক্ষা উন্নততর, ব্যাপকতর প্রত্যয়। সাহিত্যের আনন্দ হইল প্রয়োজনের অতিরিক্ত। যেখানে প্রয়োজনের সীমানা, সেখান হইতেই সাহিত্যের জগতের আরম্ভ। কিন্তু তাহা হইলে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কিরূপ দাঁড়ায়? এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মানবজীবনকে আমরা একটা প্রয়োজন-ঘেরা, ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ, জীববৃত্তে আবর্তিত ব্যাপার বলিয়াই মনে করি। আমাদের যে-সব চেষ্টা ও চিন্তা উহার সহিত সম্পৃক্ত নয়, তাহাকেই আমরা জীবনবিচ্যুত বলিয়া নিন্দা করি। কিন্তু মানবজীবন একটা মহত্তর সত্য। মানুষের যে পরিচয়টুকু তাহার কাজে ধরা পড়ে উহা তাহার সমগ্র পরিচয় নয়, মুখ্য পরিচয়ও নয়। উহা পরিমাণে অধিক হইতে পারে, কিন্তু পরিমাণেই মনুষ্যত্বের বিচার নয়। মানুষের মধ্যে যে সত্য আছে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে কর্ম ও প্রয়োজনের মধ্যে তাহা ঢাকা পড়িয়া থাকে। সাহিত্য সেই সুপ্ত মনুষ্যত্বকে মুক্ত করে। তখন হরিপদ কেরানীও নিজেকে আকবর বাদশাহ বলিয়া অনুভব করিতে আরম্ভ করে, সেদিন ক্ষুদ্রতার উপরে আত্মার বিজয় ঘোষিত হয়। সাহিত্য মানুষের এই চিরকালীন পরিচয়ের কাছে সৌন্দর্যের পাত্রে আনন্দের উপহার লইয়া আসে। উহাকে তাই জীবনবিচ্যুত মনে করিবার কারণ নাই।

সাহিত্য, সৌন্দর্য ও জীবন—রবীন্দ্রভাষ্য

কিন্তু এই সব আলোচনার পরেও একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন থাকিয়া যায়। সাহিত্যের চিরন্তন মূল্য উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ, সুনীতি-দুর্নীতির ঊর্ধ্বলোকের, লোকশিক্ষার দায়িত্বের সাহিত সম্পর্কহীন। কিন্তু এই মূল্য সবদাই মুষ্টিমেয় রসিক মানুষের নিকটে সত্য হইয়া দেখা দেয়। সাধারণ মানুষ এই উচ্চ মার্গে আরোহণ করিতে পারে না, সাহিত্যাস্বাদের এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-চেতনা হইতে তাহারা বঞ্চিত। কিন্তু ইহাদেরও সাহিত্যের ভোজ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। তাহা হইলে সাহিত্যের চিরন্তন মূল্যের পাশাপাশি উহার অপেক্ষিক মূল্যের কথাও ভাবিতে হইবে। সেখানেই শিল্পীর নিকট সমাজের দাবি আছে, কল্যাণ-বোধের দাবি আছে। সাধারণ পাঠক শিল্প-সৌন্দর্যের মহিমা উপলব্ধি না করিয়া উহার বস্তুগত অংশের বশবর্তী হয়। সে-ক্ষেত্রে এই বস্তু-অংশের সম্পর্কেও কতকটা সতর্ক হইবার দাবি সমাজ সাহিত্যের নিকট করিতে পারে। তবে সেই দাবি যেন খুবই ব্যাপক ধরনের হয়। মানবকল্যাণের নামে সাহিত্যিককে প্রচারে নামাইতে চাহিবে না সমাজ; সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সাহিত্যিককে নীতিবাগীশ হইতেও বলিবে না। সমাজ শুধু চাহিবে একটা ব্যাপক সুস্থ মানবিক দৃষ্টি। যদি কোনো শিল্পী আপনার প্রাণের গভীর প্রেরণায় অসুস্থ বিকৃতির শিল্পরূপ দেন, তাহার বিরুদ্ধে অবশ্যই নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করা চলিবে না। সাহিত্যের স্বাধীনতার উপরে কিছুতেই আঘাত করা যাইবে না। কিন্তু সুস্থতার, মানবতার আদর্শে সাড়া দিবার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত কল্যাণ-বুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিক চিরকালই থাকিবে।

শাশ্বত লক্ষ্য এবং আপেক্ষিক লক্ষ্য

বাংলা উপন্যাসের রূপবৈচিত্র্য

উপন্যাসের জনপ্রিয়তা আধুনিক সাহিত্যসংসারে সর্বাধিক। কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার সাহায্যে ইহার সাধারণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ইহার রূপরীতির ক্ষেত্রে যুগে যুগে যেমন বিচিত্র পরিবর্তন ঘটিতেছে, সেইরূপ শিল্পীতে শিল্পীতেও পার্থক্যের পরিমাণ বড় অল্প নয়। "কপালকুণ্ডলা"র ন্যায় কাব্যধর্মী রচনা, "পুতুলনাচের ইতিকথা"র ন্যায় চিত্তলোকের অবচেতনাশ্রয়ী বিশ্লেষণ, "গোরা"র ন্যায় সমাজ-ইতিহাসের দর্পণ, "শ্রীকান্তে"র ন্যায় ব্যক্তি অভিজ্ঞতার মালা—এইরূপ ভাব ও রূপের দিক হইতে একেবারে ভিন্ন জাতের রচনাকে আমরা উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকি। এমন একটি সংজ্ঞা আবিষ্কৃত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে এই দূরতম ক্ষেত্রের মধ্যেও ঐক্যের সূত্র অনুভব করা যায়। পৃথিবীর নানা দেশের উপন্যাস-সাহিত্যের নিদর্শনগুলি মিলাইয়া খুব ব্যাপক ধরনের একটি সংজ্ঞা দাঁড় করাইতে হইবে। বলা যাইতে পারে, গদ্যভাষায় মানবজীবনের কাহিনী এবং মানবচরিত্রের রূপায়নই উপন্যাসের মুখ্যলক্ষণ। কাহিনীগঠনের রীতিতে, চরিত্রচিত্রণের পদ্ধতিতে, কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে সম্পর্কনির্ণয়ে যতবিধ বৈচিত্র্যই প্রকাশ পাক না কেন, এই দুইটি মেরুর মধ্যেই উপন্যাসের রূপের বিভিন্নতা

উপন্যাসের রূপলক্ষণ

আন্দোলিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কাহিনীকাব্যের সহিত ইহার অন্তরঙ্গ পার্থক্য কোথায়? গদ্য ও কাব্য—ভাষাগত এই পার্থক্য ছাড়া আর কি কোনোরূপ দূরত্ব নাই? এই ভাষার পার্থক্য উহাদের রূপে ও স্বাদে স্বাতন্ত্র্য আনিয়া দিয়াছে। কাব্যভাষায় বর্ণনার প্রাধান্য, আবেগ-উচ্ছ্বাসের অতিরেক। বাস্তবজীবনের জটিলতাকে কাব্যভাষায় ধরা যায় না। কাব্যভাষার নাই বিশ্লেষণের ক্ষমতা। গদ্য-ভাষা বাহন বলিয়াই উপন্যাস-সাহিত্যের এই সুবিধাগুলি রহিয়াছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। নাটক হইতে উপন্যাসের পার্থক্যও শুধুমাত্র বাহিরের উপস্থাপনভঙ্গির পার্থক্যেই নয়। উপন্যাস মানব-অন্তরের অপ্রকাশিত স্তর পর্যন্ত প্রবেশ করে, নাটক প্রকাশিত ঘটনা ও আচরণের উপরেই নির্ভর করিয়া অবগুণ্ঠিত চক্তের পরিচয় দিতে চায়। উপন্যাস অনেক নবীন শিল্পরূপ বলিয়া নাট্যরীতির সুযোগটুকু সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া নিজের বৈশিষ্ট্যজনিত অতিরিক্ত প্রকাশক্ষমতাকে ও স্বাধীনতাকে কাজে লাগাইতেছে।

উপন্যাসের এই বিশিষ্ট ধর্মের কথা মনে রাখিয়া, ইহার রূপ-বিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বাংলা উপন্যাসের রূপ-বৈচিত্র্যের পরিচয় লওয়া যাইতে পারে।

বাংলা উপন্যাসগঠনে বঙ্কিমচন্দ্র এক রূপদী আদর্শের পত্তন করিয়াছিলেন। এই রূপরীতি যেমন শিল্পী বঙ্কিমের মনোলোকের বিশিষ্ট প্রবণতার ফল, সেইরূপ আদর্শ রূপেও অনুসরণযোগ্য। বস্তুত: বাংলা উপন্যাসে এই কাঠামো দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছে এবং একালেও একেবারে বাতিল হইয়া যায় নাই। উপন্যাসের কাহিনী মনোবাঞ্ছার পথ ধরিয়া চলে। ঘটনায় ও চরিত্রের ভিন্ন-মুখী বিচিত্র ব্যক্তিত্বে মিলন সাধনের পালাই ইহার গঠনরীতিকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। বঙ্কিমের উপন্যাসের চরম লক্ষ্য মানবচরিত্র ও মানবভাগ্যের চিত্রণ হইলেও কাহিনী নির্মাণকালে ঘটনা ও চরিত্রের কাহারও প্রতি পক্ষপাত না দেখাইয়া শিল্পী যেন ইহাদের মধ্যে সহজ সমন্বয় রচনা করিতে চাহিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের আঙ্গিক লইয়া অজস্র পরীক্ষা না চালাইলেও নিপুণতায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রোমান্স রচনায় এবং ঐতিহাসিক পটভূমি বিস্তার করিয়া মহাকাব্যিক রসোদ্বোধনে তিনি যেমন দুর্লভ সাফল্যের অধিকারী ছিলেন, তেমনি সামাজিক কাহিনী চিত্রণেও তাহার অসামান্য গঠনক্ষমতার পরিচয় মেলে। সাধারণত: তাঁহার উপন্যাস বৃত্তাকার, একটি বিশিষ্ট জীবনসমস্যার কেন্দ্র হইতে ইহার কাহিনী অংশের জন্ম। সমস্যার জটিলতা এবং সমাপ্তি (সমাধানে অথবা সমাধান যে অসম্ভব তাহা চূড়ান্তভাবে বুঝাইয়া দেওয়ায়) কাহিনীর বিবর্তনের মধ্যে রূপলাভ করে। এই কাহিনীগুলি আদি-মধ্য-অন্ত্য-যুক্ত, সম্পূর্ণাঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র নাট্যভঙ্গি এবং কাব্যরসের সহযোগিতায় কাহিনীকে আস্বাদ্য করিয়া তোলেন। বর্ণবহুল বর্ণনা, আবেগের সংযত উচ্ছ্বাস যেমন ঘটনার বিবরণকে সরস করিয়া লালিত্যে ও গীতিপ্রবাহে গতিমান করিয়া তোলে, সেইরূপ আবার ঘটনার বিবৃতি, একঘেয়েমি এবং অনুত্তেজিত ভাবকে চঞ্চল ও তরঙ্গিত করিয়া তোলে।

তাঁহার উপন্যাসে ঘটনা, বিবৃতি এবং বর্ণনার সুন্দর সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। গল্পকথনের সঙ্গে নাটকীয়তা ও কাব্যসৌন্দর্যের সমন্বয়সাধনে তাঁহার উপন্যাসরীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। সাধারণ ভাবে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিশ্লেষণের অভাব। তবে তুলনামূলক ভাবে সামাজিক উপন্যাসে বিশ্লেষণের আধিক্য আছে। অবশ্য খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ অপেক্ষা সমগ্র ব্যক্তিত্বটি তুলিয়া ধরা, তাহার অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণাকে ঘটনামুখে আকস্মিক ভাবে স্ফুরিত করাই বঙ্কিমের বিশিষ্ট পদ্ধতি।

বঙ্কিমপর্বের প্রধান ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত গুরুর পথ হইতে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমের কল্পনার প্রবল আবেগ তাঁহার ছিল না। "জীবনপ্রভাত" ও "জীবনসন্ধ্যায়" তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ইতিহাসের প্রতি যেমন অনেক বেশি আনুগত্য দেখাইতে চাহিয়াছেন, তেমনি কাল্পনিক কাহিনীগ্রন্থনেও বঙ্কিমী পদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই। হৃদয়াবেগসম্পৃক্ত কোনো সমস্যাকে কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া বৃত্তাকার কাহিনী গঠনের রীতি অনুসৃত হয় নাই। একটি যুগ-ব্যাপী ঐতিহাসিক সমস্যাকে তাহার নিজস্ব স্বরূপে রূপ দিতে চাহিয়াছেন লেখক। "সংসার" ও "সমাজ" উপন্যাস দুইটিতেও জীবনের ছোটখাটো প্রাত্যহিক কথা, পল্লীর এবং সহরের প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনায়ও ঘটনার টুকরাই প্রধান। ঘটনা বা বর্ণনায় প্রবলতার বা বর্ণাঢ্যতার আলোড়ন নাই। স্তিমিত আবেগ, সরস কৌতুকের সুরে কাহিনীটি বহিয়া চলিয়াছে, ঘটনার বাঁক কোথাও তরঙ্গিত ও নাটকীয় হইয়া উঠে নাই। আবার খণ্ড খণ্ড ঘটনার উত্তেজনাহীন প্রাত্যহিকতা আধুনিক উপন্যাসের ন্যায় চরিত্রের গভীরতম প্রদেশে অবগাহন করিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পথও খুলিয়া দেয় নাই। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের এই স্বতন্ত্র রূপরীতি সমকালীন স্বল্প প্রতিভাধর ঔপন্যাসিকেরা কতকটা অনুসরণ করিয়াছেন। আধুনিক শিল্পরীতির সহিত ইহার প্রভাবজনিত কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। কিন্তু গল্পের নিবিড়বন্ধন ভেদ করিবার দিকে রমেশচন্দ্র যে-ধারার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক উপন্যাসে একটি প্রধান রীতিরূপে অবলম্বিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র

রূপরীতির দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসে যথেষ্ট নূতনত্ব আনয়ন করিলেন। তাঁহার ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস দুটিতে ঐতিহাসিক ব্যাপকতা সৃষ্টির চেষ্টা যেমন নাই, তেমনি জীবন-ভাবনায় জটিলতা বা গভীরতাও বড় প্রকাশ পায় নাই। সামাজিক উপন্যাসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র হইতে দূরবর্তী হইলেন দুইটি দিক দিয়া: ঘটনার উত্তালতা তাঁহার উপন্যাসে কম। ছোটখাটো প্রাত্যহিক ব্যাপার যোগ করিয়াই তিনি প্লট গড়িয়া তোলেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র-বিশ্লেষণের পদ্ধতি প্রথম প্রযুক্ত হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক উপন্যাসের এই ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য স্বীকার্য—রীতিমত মন-বিশ্লেষণের সূত্রপাত হইল তাঁহার

"চোখের বালি" হইতেই। রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে শিল্পরীতির ক্ষেত্রে একটি অভিনব আবিষ্কার লইয়া আসিলেন। কোনোকালেই তাঁহার উপন্যাসে চরিত্রবিজড়িত ঘটনাবন্ধন সুদৃঢ় নিপুণভাবে গল্পগ্রন্থনে উৎসাহ পায় নাই। বঙ্কিমের উপন্যাস যে-অর্থে গল্পরসসমৃদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সে-দিক দিয়া শিথিলবন্ধ। তাঁহার শেষদিকের উপন্যাসে এই শিথিলতাকে কল্পনার অবকাশ, বর্ণনা ও তত্ত্বভাবনা দ্বারা পূর্ণ করিয়া একটি নূতন রূপ দিবার চেষ্টা ঘটিল। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিনব রূপরীতির ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন: "ইহাদের অসম্পূর্ণতা, ইহাদের খণ্ডিত সংকীর্ণতা, ইহাদের শিথিল-গ্রথিত আকস্মিকতা ও রিক্ততার মধ্যে অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য, ইহাদের জীবনের গ্রন্থিবহুল জটিলতার মধ্যে দুই একটি রঙিন ও সূক্ষ্ম সূত্রকে পৃথককরণের চেষ্টা খুব তীব্র ভাবেই আমাদের চোখে পড়ে। ইহাদের মধ্যে জীবনের যে অংশটুকু আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমরা উপলব্ধি করি ধারাবাহিকতার অবিচ্ছিন্ন আলোকে নহে, সংক্ষিপ্ত সাংকেতিকতার চকিত বিদ্যুৎদীপ্তিতে।......কবি ঔপন্যাসিকের হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছেন, বিরল-সন্নিবেশ তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যের বাঁশি সাংকেতিকতার সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, স্থূল ঘটনার যবনিকা সরাইয়া রঙ্গমঞ্চে কবিকল্পনা অধিষ্ঠিত হইয়াছে। Meredith-এর উপন্যাসের মত রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাস একপ্রকার তীক্ষ্ণ-কঠিন বুদ্ধির চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য (intellectual brilliance), দ্রুত অবসরহীন সংক্ষিপ্ততার মধ্যে গভীর অর্থগৌরবের দ্যোতনা (epigram) আমাদিগকে পাতায় পাতায় চমৎকৃত ও অভিভূত করে।"

রবীন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের রূপরীতিতেই বঙ্কিম ও রবীন্দ্রপন্থা যুগপৎ অনুসৃত হইতে দেখি। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক রূপচর্যায় তাঁহার উৎসাহ ছিল না। তিনি সামাজিক উপন্যাসই লিখিয়াছেন। কিন্তু সামাজিক উপন্যাসগুলিতে সমস্যাকেন্দ্রিক কাহিনীসৃজনে তিনি সংহত সমগ্রতাকেই আদর্শ বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসই বঙ্কিমী ধরনের—বৃত্তাকার এবং আদি-মধ্য-অন্ত্য-যুক্ত। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসোচিত ঘটনার প্রবল তরঙ্গের স্থানে তিনি প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি জিনিসকে, ঘরসংসারের স্বল্পান্দোলিত ঘটনাগুলিকেই মূলতঃ আশ্রয় করিয়াছেন এবং মানব-অন্তরে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়াস পাইয়াছেন। এদিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালির" প্রভাব তাঁহার উপরে পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে প্রত্যক্ষ ঘটনা, ঘটনার বিবরণ, পাত্রপাত্রীর সংলাপ এবং লেখক কর্তৃক তাহাদের হৃদয় বিশ্লেষণ একটা চমৎকার ভারসাম্য লাভ করিয়াছে। পাঠককে আকর্ষণ করিবার শক্তির অন্যতম কারণ ইহাই। তাঁহার "শ্রীকান্ত"

শরৎচন্দ্র

উপন্যাসে কিন্তু একেবারে স্বতন্ত্র একটি রীতির সূচনা লক্ষ্য করি। গল্পগঠনের পূর্ণ-সংহতির স্থানে ভ্রমণশীল একটি ব্যক্তির যাযাবর স্বভাবের সূত্রে নানা অভিজ্ঞতার মালা গ্রথিত হইয়াছে। কিন্তু এই নূতন "গল্পহীন" ভ্রমণচারিতার রীতিটি তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। কারণ ঐ সূত্রে কতকগুলি প্রায় পূর্ণদেহ গল্প যেন এই উপন্যাসকে আশ্রয় করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের "শেষ প্রশ্ন" "বিপ্রদাস" প্রভৃতি উপন্যাসে ঘটনার তুলনায় তর্কবিতর্ক প্রাধান্য পাইয়াছে। এই উপন্যাস দুটি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের রীতিঘটিত পালাবদলের ইঙ্গিত করে। ইহার পূর্ণরূপ তিনি গড়িয়া যাইতে পারেন নাই।

শরৎচন্দ্রের পরে

শরতোত্তর বাংলা উপন্যাসের প্রধান পুরুষ তিন বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ, তারাশংকর এবং মানিক। শিল্পী হিসাবে ইঁহারা স্বতন্ত্র ইঁহাদের ঔপন্যাসিক রূপরীতিতেও গুরুতর নানারূপ পার্থক্য আছে। কিন্তু আধুনিক উপন্যাসের শিল্পরীতির যে সব নবীনতা ইঁহাদের উপন্যাসে প্রতিফলিত, তাহার গোড়ার কথাটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

আধুনিক ঔপন্যাসিক পূর্ণদেহ, সমস্যাকেন্দ্রিক বৃত্তাকার কাহিনী বলিতে চান না। এইরূপ জমাইয়া গল্প বলা গল্পসাহিত্যের অতিপ্রাচীন ঐতিহ্য। উপন্যাসে গল্প-পিপাসু পাঠকের দাবি—"Beguile me, offer me comedy and tears, tell me about droll people and lovers and a story that will keep me rooted to the stop and my eyes glued to the page." [Encylopædia of Literature, Vol I] আধুনিক ঔপন্যাসিকের মতে, উপন্যাসের লক্ষ্য পাঠকের গল্পের নেশা মেটানো নয়, গভীরতর জটিলতর সৃষ্টি-সৌন্দর্য উপহার দেওয়া। পাঠকের কাছে তাঁহার দাবি : "Here is the artistic record of a mind, at the very moment that it is thinking. Try to penetrate within it. You will know only as much as this mind may reveal. It is you, not I, who will piece together any 'story', there may be, of course, I have arranged this illusion for you. But it is you who must experience it." (Ibid) আধুনিক উপন্যাসে তাই গল্পগ্রন্থনের কৌশল গৌণ হইয়া পড়িয়াছে, নাটকীয় চমকও পরিত্যক্ত হইতেছে, ঘটনার প্রবলতাও কমিয়াছে, সেখানে প্রাত্যহিক অনুল্লেখ্য অভিজ্ঞতার ভিড়। উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে পুরাতন রীতির ঐক্য আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। একটি ব্যক্তির জীবন-অভিজ্ঞতার সূত্রে বিচিত্র ঘটনা ও বর্ণনা ও অভিজ্ঞতা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। কখনো একটা জাতিগোষ্ঠীর বা ভৌগোলিক সীমারেখার বহু মানুষের যৌথ জীবনযাত্রা রূপ ধারণ করিতেছে। তাহা ছাড়া

আধুনিক উপন্যাস—রূপরীতির নবীনতা

মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হইয়াছে, বিশ্লেষণও অনেক সূক্ষ্ম ও বক্র হইয়া উঠিয়াছে।

ইঁহাদের মধ্যে তারাশংকর পুরাতন রূপরীতির কিছুটা অনুবর্তন করিলেন। মনোলোকের জটিল সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাঁহার উপন্যাসে বড় স্থান পায় নাই। তাহা ছাড়া কখনো কখনো নাটকীয় ঘটনার চমক অথবা ঘটনাতরঙ্গের প্রবলতাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়াছেন। তারাশংকরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য মহাকাব্যিক পটভূমিকা সৃষ্টি করা। তবে অতীতচারী রোমান্সরসকে তিনি প্রাধান্য দেন নাই। বস্তুমুখিতা তাঁহার উপন্যাসে মহাকাব্যিক বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনা-তরঙ্গের উপরে একেবারে নির্ভর করেন নাই। তাঁহার উপন্যাসে প্রাত্যহিক জীবনচিত্রই যেন স্থান পাইয়াছে। একটি ব্যক্তিচরিত্রের ক্রমবিকাশের সূত্রে জড়ানো জীবনের নানা ঘটনা, নানা অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন স্বভাবের মানুষের আসা-যাওয়া লইয়া বিভূতিভূষণের উপন্যাস নব্য রূপরীতির প্রতি আনুগত্য দেখাইয়াছে। গল্পরস বা নাটকীয়তা জমাইয়া তোলার চেষ্টা কোথাও প্রধান হইয়া উঠে নাই। বিভূতিভূষণের চরিত্রচিত্রণে বিশ্লেষণের প্রাধান্য, কিন্তু আধুনিক চেতনাশ্রয়ী উপন্যাসের ন্যায় তাহা মগ্নচৈতন্যমুখী নয়। প্রধান বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই মগ্নচৈতন্যে প্রবেশ করিয়াছেন। বাংলা চেতনাশ্রয়ী উপন্যাসের প্রথম সার্থক শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এখনও পর্যন্ত একমাত্র সার্থক শিল্পী। তাঁহার উপন্যাসেও ছোটোখাটো প্রাত্যহিক ঘটনার সমাবেশ, ঘটনার আকর্ষণ চরিত্রবিশ্লেষণের অনুগত। একটি তির্যক মনোভাব তাঁহার উপন্যাসে আদ্যন্ত ছড়াইয়া আছে।

তারাশংকর-বিভূতি-মানিক

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে পুরাতন বিভিন্নরীতির অনুবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চেতনাশ্রয়ী উপন্যাস লেখার কিছু কিছু চেষ্টা চলিতেছে। বাংলা উপন্যাসে বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে। কোথাও সাফল্য আসিতেছে। কোথাও বা উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকিতেছে। দেখা যায়, বাংলা উপন্যাসের কাহিনী-সংগঠন ও রূপরীতিতে যুগে যুগে এবং শিল্পীতে শিল্পীতে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। কখনও কাব্যের আবেগঘন বর্ণনা, কখনও নাট্যরসসঞ্চার উপন্যাসের দেহে নবীনতা আনিয়াছে। ভ্রমণ-কাহিনী, আত্মজীবনী অথবা রম্যরচনার রূপাকৃতি আত্মস্থ করিয়া উপন্যাসের দেহরূপ পুষ্ট হইয়াছে। কখনও একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে কাহিনী আবর্তিত হইয়াছে। কখনও কেন্দ্রচ্যুত ঘটনা-পরিক্রমা উপলব্ধির জগতে একটা ক্ষীণ ঐক্যের বোধ মাত্র জাগাইয়াছে। কোথাও ঘটনা ও চরিত্রের

উপন্যাসের রীতিগত আত্মসাৎ-শক্তি

পারস্পরিক সম্পর্কে কাহিনীটি বিকশিত, কোথাও চরিত্রের ব্যক্তিসত্যানিরপেক্ষ ঘটনাপ্রবাহই প্রাধান্য পাইয়াছে, কোথাও ঘটনার সামান্য প্রসঙ্গে সম্বদ্ধ গভীর মনন ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলা উপন্যাসের রূপবৈচিত্র্যের ব্যাপকতা নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখাইলে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। নানা দৃষ্টিকোণ দিয়া উপন্যাসের যত বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যে দেখা গিয়াছে, আমরা শ্রেণীবদ্ধ তালিকার আকারে তাহার পরিচয় দিতেছি:

(১) ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস—ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে এই জাতীয় উপন্যাস গঠিত হয়। ইহার মধ্যে দুটি উপবিভাগ করা যাইতে পারে: (ক) ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স; (খ) খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সে কল্পনাই প্রধান। বর্তমান স্থান ও কাল হইতে ঔপন্যাসিক সেখানে অতীত-পরিক্রমা করেন। এই কল্পনার সহিত ইতিহাসের যোগসূত্র রচনা করা হয় উহাকে বাস্তবতার একটি ছাপ দিবার জন্য। বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" বা "চন্দ্রশেখর", রমেশচন্দ্রের "মাধবীকঙ্কণ", তারাশংকরের "রাধা", প্রমথনাথ বিশীর "কেরিসাহেবের মুন্সী" প্রভৃতি উপন্যাস এই শ্রেণীভুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রাচুর্য ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইহার প্রচলন কমিয়া যায়। আবার সম্প্রতি কয়েক বৎসর এই শ্রেণীর উপন্যাসের দিকে লেখকদের আকর্ষণ পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর উপন্যাসে ঘটনার নাটকীয়তা এবং চরিত্রভাবনায় মৌলিক প্রবৃত্তিগুলির আলোড়নই প্রধান রূপগত বৈশিষ্ট্য। কাল্পনিক অতীত জীবনের বর্ণাঢ্য বর্ণনা ইহার অতিরিক্ত আকর্ষণ। চরিত্রবিশ্লেষণের সুযোগ এখানে নাই। খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা তুলনামূলকভাবে অনেক কঠিন। সেখানে কল্পনা ঐতিহাসিক রসসৃজনের সহগামী। এই জাতীয় উপন্যাসে একটা জাতির, একটা যুগের কাহিনী মূর্ত হইয়া উঠে—ব্যক্তিকে ছাপাইয়া যুগের বেদনা প্রকাশ পায়। এই জাতীয় উপন্যাসে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা, কল্পনাকে ইতিহাসের অনুগামী রাখা, যুগোচিত ব্যাপকতা সৃষ্টি, মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য তথা Sublime-কে জাগরিত করার চেষ্টা রূপরীতি হিসাবে বিশিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ", রমেশচন্দ্রের "মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত", "রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা" খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। সম্প্রতি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার চেষ্টা প্রায়ই রোমান্স রচনার ধারাটির সহিত মিলিয়া যাইতেছে।

ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস

(২) সামাজিক উপন্যাস—সামাজিক উপন্যাসে সমকালের জীবন চিত্রিত হয়। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে দুটি উপবিভাগ আছে: (ক) পারিবারিক উপন্যাস; (খ) সামাজিক উপন্যাস। যে সব উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের চিত্র, পারিবারিক সমস্যা চিত্রিত হয়, তাহাদের পারিবারিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে। শরৎচন্দ্রের "পণ্ডিতমশাই", "রামের সুমতি", "বিন্দুর ছেলে", 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি রচনায়, অনেকটা

তারকনাথের "স্বর্ণলতায়" পরিবারজীবনকথাই প্রাধান্য পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চিত্রিত সমস্যাগুলি, একটা সামাজিক সমস্যার মত ব্যাপকতা পায় নাই। কিন্তু **সামাজিক উপন্যাস** বঙ্কিমের "বিষবৃক্ষ" "কৃষ্ণকান্তের উইল", শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" "গৃহদাহ", রবীন্দ্রনাথের "গোরা" "চোখের বালি" এবং তারাশংকরের 'গণদেবতা" প্রভৃতি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জননী" প্রভৃতি, বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী" প্রভৃতি অধিকাংশ উপন্যাসই এই শ্রেণীভুক্ত। উনিশ শতকে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের তুলনায় ইহার প্রাদুর্ভাব কম ছিল, বর্তমানকালে এই ধারাটিই প্রায় সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছে। এই জাতীয় উপন্যাসে বাস্তবজীবন চিত্রণের প্রাধান্য। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের ন্যায় ঘটনার প্রবল তরঙ্গোৎক্ষেপ ও বর্ণাঢ্যতা এখানে নাই, তাহার পরিবর্তে খুঁটিনাটি প্রাত্যহিক বিবরণ, বিশ্লেষণপ্রিয়তা প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

(৩) ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস—রসের দিক হইতে ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস একটি পৃথক শ্রেণী। রূপরীতির দিক হইতেও "সিরিয়াস" উপন্যাস হইতে ইহাদের পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কাহিনী বা চরিত্রবিন্যাসে সামগ্রিকতা এবং সুসংলগ্নতা ইহাদের মধ্যে প্রত্যাশিত নয়। চরিত্র ও ঘটনার বিশেষ বিশেষ কৌতুকোদ্দীপক ও ব্যঙ্গরসপূর্ণ অংশগুলিকে এই জাতীয় উপন্যাস বিশেষ করিয়া তুলিয়া ধরে। একটা লঘু ব্যঙ্গাত্মক মুড্ ইহাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। বাস্তবতা অপেক্ষা **ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস** উহার অতিরঞ্জন, চরিত্রের স্বাভাবিক চিত্র অপেক্ষা তাহার ব্যঙ্গাত্মক 'প্রোজেকসন' বা 'ক্যারিকেচার', ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কৌতুক ও ব্যঙ্গরসাত্মক মন্তব্যের ছড়াছড়ি—ইহাদের রচনারীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মূল কাহিনীর চারিপাশে অবান্তর কৌতুকপ্রসঙ্গের অবতারণাও ইহাদের ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বঙ্কিমের "মুচিরামে", ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র বসু, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে এই রূপবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

(৪) রাজনৈতিক উপন্যাস—বিষয়বস্তু হিসাবে রাজনীতিকে প্রধান করিয়া বহু উপন্যাস রচিত হইতে দেখা যায়। বঙ্কিমের "আনন্দমঠ", রবীন্দ্রনাথের "গো…", "ঘরে বাইরে", শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী", তারাশংকরের "ধাত্রীদেবতা", মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ দিকের কতকগুলি উপন্যাস এবং সাম্প্রতিক মার্ক্সপন্থী **রাজনৈতিক উপন্যাস** ঔপন্যাসিকদের রচনাবলী এই শ্রেণীভুক্ত। এইরূপ বিষয়বস্তু অবলম্বন করায় এই জাতীয় উপন্যাসে রূপগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে, কখনো ঘটনাকে ছাপাইয়াও রাজনৈতিক মতামত বা বিতর্কের প্রকাশ দেখা দেয় এই জাতীয় উপন্যাসে। চরিত্রের সামগ্রিক স্বাভাবিক উপস্থাপনার স্থলে রাজনৈতিক দিকটিই প্রধান হইয়া ওঠে।

বাংলা উপন্যাসে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য কিরূপ রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা

দেখানো হইল। এইবার বিষয়নিরপেক্ষ ভাবে বাংলা উপন্যাসের রূপরীতিতে যত বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে তাহারও পরিচয় দেওয়া হইতেছে :

(৫) ঘটনাপ্রধান উপন্যাস—বহু উপন্যাস গল্পরসের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিচরিত্রচিত্রণ এখানে আসল কথা নয়। পাত্রপাত্রী ঘটনার দাবাবড়ের ছকমাত্র। ঘটনার রহস্য ও উত্তেজনাই পাঠকদের আকর্ষণ করে। শিল্পরচনা হিসাবে ইহারা নিম্নশ্রেণীর। অধিকাংশ গোয়েন্দাকাহিনী বা রহস্য-উপন্যাস এই শ্রেণীভুক্ত।

ঘটনাপ্রধান উপন্যাস

(৬) মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস—ঘটনার তুলনায় চরিত্রের বিশ্লেষণ এবং মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা অনুধাবন করিবার চেষ্টা এই জাতীয় উপন্যাসের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা বিশেষ নাই, তবে এখানেই মনস্তাত্ত্বিক রীতির সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলি বিশেষভাবেই মনস্তাত্ত্বিক রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তবে ঘটনাসজ্জা ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ—এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা তারাশংকর-বিভূতিভূষণ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে বাংলা উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিকতা একটি নূতন পথও খুঁজিয়া পাইয়াছে। মগ্নচৈতন্য-আশ্রয়ী উপন্যাস রচনার রীতি দেখা দিয়াছে।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

(৭) বৃত্তাকার উপন্যাস—উপন্যাসের কাহিনীগঠনের সর্বাধিক জনপ্রিয় চাহিদা ছিল ঐক্যবদ্ধ, সমস্যাকেন্দ্রিক ও সংহত প্লটের প্রতি। উহাতে একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যায় উপন্যাসের আরম্ভ হয় এবং নানা ঘটনা ও হৃদয়ালোড়নের মধ্য দিয়া একটি সুনির্দিষ্ট পরিণাম লাভ করে। উপকাহিনী এই জাতীয় উপন্যাসে থাকিতে পারে। তাহা কোনো-না-কোনো দিক দিয়া মূল কাহিনীকে বিশেষিত বা তাৎপর্যপূর্ণ করিয়া তোলে। বঙ্কিমের ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি এই গঠনরীতির অনুসারী। উচ্চশ্রেণীর শিল্পীরা সাম্প্রতিক কালে এই জাতীয় গঠনরীতির প্রতি আর আকর্ষণ বোধ করিতেছেন না।

বৃত্তাকার উপন্যাস

(৮) পন্থাকার উপন্যাস—বাংলা উপন্যাসের প্লট গঠনের এই রীতির প্রথম সুষ্ঠু প্রকাশ শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্তে"। অবশ্য উপন্যাসগত এই নূতন রীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না তিনি। তারাশংকরের "ধাত্রীদেবতা", বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী" প্রভৃতি বহু উপন্যাসে এই রীতিই অনুসৃত। একটি ব্যক্তির জীবন পর্যবেক্ষণ, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মালা এখানে সজ্জিত থাকে। কাহিনীতে নাটকীয় চমক দিয়া একটা পূর্ণ পরিণতিতে আনিবার চেষ্টা তাঁহাদের নাই। এই সব কাহিনীর দুই প্রান্তই উন্মুক্ত। জীবনপথের অনুরূপ গঠনরীতি এই সব পন্থাকার উপন্যাসের।

পন্থাকার উপন্যাস

(৯) তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস—জীবনের স্বাভাবিক রূপ অপেক্ষা উহার তত্ত্বানুভূতি-জাত একটি আদর্শোচিত রূপাঙ্কনের চেষ্টা বহু উপন্যাসে দেখা যায়। ইহাতে ঘটনা অপেক্ষা তত্ত্বালোচনার প্রাধান্য থাকে। এই জাতীয় উপন্যাসে তত্ত্বভাবনার দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিবার ফলে চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতার উপরে তত্ত্ববোধের আরোপ ঘটে। বঙ্কিমের "আনন্দমঠ", "দেবী চৌধুরাণী" প্রভৃতি উপন্যাস বা রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে ইহার প্রাধান্য আছে। তর্কপ্রধান উপন্যাস তত্ত্বোপন্যাসেরই একটা বিশিষ্ট রূপ। এখানে বিতর্কই প্রধান হইয়া ওঠে। বিতর্কের মধ্য দিয়া মতবাদের সহিত মতবাদের সংঘর্ষে মানবচরিত্র প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে", শরৎচন্দ্রের "শেষপ্রশ্ন"কে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস

(১০) কাব্যধর্মী উপন্যাস—কাব্য উপন্যাসের একটি উপাদানরূপে অনেকের কাছেই গৃহীত হয়। কিন্তু কাব্যকল্পনা এবং কাব্যোচিত বাচনভঙ্গি, বর্ণনা ও ভাবাবেগপ্রাধান্য যেখানে কাহিনীনির্মাণ, বাস্তব জীবনচিত্রণ, বিশ্লেষণাত্মক চরিত্রায়ণকে আচ্ছন্ন করে, তাহার স্বতন্ত্র আস্বাদকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা" প্রভৃতি উপন্যাসে এবং বুদ্ধদেব বসুর কতকগুলি রচনায় এই রীতির অনুবর্তন আছে।

কাব্যধর্মী উপন্যাস

বাংলা উপন্যাসে রূপরীতির অজস্র বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। উহার সীমারেখা ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে।

সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ ও প্রকৃত সার্থকতা

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে নানাবিধ মত প্রচলিত। যুগে যুগে এই মতবাদের যেমন বিবর্তন ঘটিয়াছে, তেমনি একই যুগে বিপরীত মতবাদের মধ্যে সংঘর্ষও ঘনীভূত আকার ধারণ করিয়াছে। সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ভাবনার দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। যিনি সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট ধারণা পোষণ করেন, তিনি সমালোচনা করিতে গিয়া দেখিবেন সেই বিশেষ উদ্দেশ্য-অনুযায়ী গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে কিনা। তিনি যদি সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিষয়ে ভিন্ন মতে বিশ্বাস করিতেন, তবে সেই স্বতন্ত্র বিষয়টির সন্ধানই সমালোচনার লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন। যিনি ভাবগৌরবকে সাহিত্যের মুখ্য গৌরব বলিয়া মনে করেন, তিনি ভাব-বিশ্লেষণকেই সমালোচনার লক্ষ্য বলিয়া মনে করিবেন। যিনি রূপসৌকর্যকেই সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি সমালোচনায় রূপায়ণবাদী হইবেন এইরূপ প্রত্যাশা করা

ভূমিকা

স্বাভাবিক। মোট কথা, সাহিত্যের লক্ষ্য এবং সমালোচনার লক্ষ্য এক, কিন্তু পথ ভিন্ন।

সমালোচনার আদর্শ এবং সাহিত্যসৃজন—এই দুইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সাহিত্যসৃষ্টি যেমন সমালোচনার উৎস, তেমনি সমালোচনার সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ আবার সাহিত্যসৃষ্টিকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে। সমালোচনার আদর্শ একটি কাল্পনিক পদার্থ নয়, রচিত সাহিত্যকর্মের ভিত্তিতেই উহা গড়িয়া উঠে।

সাহিত্যসৃষ্টি ও সমালোচনার সম্বন্ধ

ইলিয়াড-ওডেসি, রামায়ণ-মহাভারতের মত কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়াই Authentic epic এর আদর্শ স্থির করা সম্ভব হইয়াছিল। ইস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস, এরিস্টোফেনিসের গ্রীক নাটকগুলিকে অবলম্বন করিয়াই আরিস্তোতল Poetics শাস্ত্রটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের গ্রীক ও রোমান নাটকাবলীর উপরে আরিস্তোতলীয় রীতির নিয়ন্ত্রণ কঠিনভাবে বর্তিয়াছিল। আবার রেনেসাঁ যুগের নব্য নাট্যকলা আরিস্তোতলসহ পূর্ববর্তী সব নীতি-নির্দেশ অস্বীকার করিয়া নূতন পথ করিয়া লয়। এই নব সৃজনশীলতা আবার সমালোচনার ক্ষেত্রেও নূতন আদর্শের জন্ম দেয়। এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও সমালোচনা পরস্পরের আশ্রয়ে যেমন বাড়িয়া ওঠে, তেমনি একে অপরকে অতিক্রম করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া ওঠে।

দেশে-বিদেশে সমালোচনার যে সব আদর্শ প্রচলিত তাহাদের স্বরূপ এবং গ্রহণযোগ্যতা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। এই সব আদর্শের কোনো কোনোটি বিশেষ যুগের এবং দেশ-পরিবেশের চিহ্ন বহন করে। আবার বহু ভিন্নমুখী মতাদর্শ একই দেশে সমকালে আবির্ভূত হইয়া মতবাদের সংঘর্ষ ঘনীভূত করিয়া তোলে।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে যে সমালোচন-আদর্শ সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিল তাহা হইল রসবাদ। ভরতমুনির "নাট্যশাস্ত্রে" নাটকের উদ্দেশ্য বিদগ্ধজনের চিত্তে রসসৃজন—এই সূত্রের উল্লেখ আছে। পরবর্তী ভারতীয় আলংকারিকেরা কাব্যের ক্ষেত্রেও এই

প্রাচীন আলংকারিক দৃষ্টিভঙ্গি

দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্প্রসারিত করিয়া গ্রহণ করেন। রসসৃষ্টিই কাব্য ও নাট্য সর্ববিধ সাহিত্য-সৃজনের উদ্দেশ্যরূপে অভিহিত হইল। সমালোচনারও উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল কোনো রচনার রসসৃজনের ক্ষমতা, রসের বৈচিত্র্য ও গভীরতা নির্ণয় করা। রসবাদ ছাড়াও আরও কয়েকটি মতবাদ ভারতীয় সংস্কৃত সমালোচনরীতিতে প্রাধান্য পাইল। ভারতীয় সমালোচনরীতির প্রধান আদর্শ হইল -(১) রসবাদ (ভরতমুনি কর্তৃক প্রবর্তিত, পরবর্তীকালে বহু বিশিষ্ট আলংকারিকের দ্বারা ব্যাখ্যাত, বিশ্লেষিত ও অনুসৃত।) (২) ধ্বনিবাদ (অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক প্রবর্তিত এবং আনন্দবর্ধন

ও অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যানে প্রতিষ্ঠিত)। (৩) শব্দার্থতত্ত্ব (কুন্তক-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)। (৪) অলংকারবাদ (বামন, ভামহ এবং আরও অনেক আচার্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত)।

রসবাদ—রসবাদের মূল কথা হইল পাঠকচিত্তের লৌকিক ভাবগুলিকে জাগ্রত করা এবং বিগলিত করা। কাব্যমধ্যে কবি বিভাব-অনুভাবাদিকে এমন ভাবে ভাষানিবদ্ধ করিবেন যাহাতে রসিক পাঠকের চিত্তে তদুপযোগী ভাব জাগ্রত হয়। যেমন শকুন্তলা-দুষ্মন্তের প্রণয় পাঠকচিত্তে শৃঙ্গারভাব জাগাইয়া তুলিবে। এই শৃঙ্গারভাবটিই ক্রমে আদিরসে রূপান্তরিত হইবে। ভাব বস্তুটি লৌকিক অনুভূতি, কিন্তু রস জিনিসটি অলৌকিক। উহা একটা ঊর্ধ্বতর আস্বাদ্যমানতা। রসবাদী সমালোচনার আদর্শ পাঠকচিত্তে কাব্যাদির রসোপভোগের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছে।

রসবাদ

এই দিক হইতে উহা তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নাই। বিশেষ করিয়া কাব্যানন্দকে পার্থিব লাভ-লোকসান ও স্বার্থবোধের ঊর্ধ্বে স্থাপন করায় একটি মূল সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই মতবাদের প্রধান সীমাবদ্ধতা হইল রস বা emotional pleasure-কে একমাত্র সত্য করিয়া তোলা। সাহিত্য-রসিক কোনো কোনো কাব্য (আধুনিক পৃথিবীতে এইরূপ কাব্যের সংখ্যাই অধিক) পাঠ করিয়া রম্যবোধজনিত আনন্দ (intellectual pleasure) লাভ করিতে পারেন। উহাকে কাব্যসীমার বহির্ভূত করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাহা ছাড়া রসবাদ চরিত্রস্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে না। শকুন্তলা আদিরসের আলম্বন বিভাব এই পরিচয়ই যথেষ্ট বলিয়া মনে করে। ইহার ফলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য চরিত্রসৃজনে প্রকটিত হইয়া ওঠে না। এই সমালোচন রীতি শকুন্তলা হইতে রত্নাবলীর চরিত্রগত পার্থক্য নির্ধারণে অসমর্থ। প্রকৃতপক্ষে রসবাদের অত্যধিক প্রভাবের ফলে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত-সাহিত্যে চরিত্রসৃষ্টি বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ধ্বনিবাদ—ধ্বনিবাদ শব্দের অর্থাতিরিক্ত ব্যঞ্জনার মধ্যেই কাব্যরহস্যের সন্ধান করে। শব্দের অভিধানগত অর্থ উহার বস্তু-অংশের সংবাদ দেয়। ভালো কাব্যে শব্দার্থ বস্তুর সীমায় আবদ্ধ থাকে না। উহার মধ্যে অর্থের অতিরিক্ত একটা অনুরণন, একটা রসোপলব্ধি বা ভাবানুভূতি পাঠকহৃদয়কে সচকিত করে। ধ্বনিবাদীরা শব্দের প্রত্যক্ষ অর্থকে বলিয়াছেন অভিধেয় অর্থ, অতিরিক্ত অর্থকে বলিয়াছেন ব্যঙ্গ্যার্থ বা ব্যঞ্জনাজাত অর্থ। যেখানে এই ব্যঞ্জনাজাত অর্থ প্রত্যক্ষ অর্থকে ছাপাইয়া যায়, প্রধান এবং উপভোগ্য হইয়া ওঠে, সেখানেই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব। এই অতিরিক্ত অর্থ কখনো একটি অতিরিক্ত ভাব জাগায়, কখনো একটি অতিরিক্ত বস্তুর বোধ লইয়া আসে। কিন্তু যেখানে উহা একটি অতিরিক্ত রসের আস্বাদে চিত্তকে বিগলিত করে

ধ্বনিবাদ

সেখানেই শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ধ্বনিবাদীরা শেষ পর্যন্ত রসবাদের সঙ্গে এই করিয়া সন্ধি করিয়াছেন। কিন্তু রসবাদের সহিত উহার গোড়ায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। রসবাদে

দার্শনিক ভাববাদের চরম অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। ধ্বনিবাদ মূলতঃ শব্দ, উহার প্রত্যক্ষ অর্থ, প্রত্যক্ষ অর্থ হইতে অপ্রত্যক্ষ অর্থে উত্তরণ—এইরূপ বিশ্লেষণাত্মক পন্থায় বিশ্বাসী। ধ্বনিবাদ সমালোচনার স্থূল বস্তুবাদী আদর্শকে কঠিন আঘাত করিয়াছে, বিষয় অপেক্ষা বিষয়াতীত সৌন্দর্যব্যঞ্জনাকে সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং তাহাকে অতিরিক্ত গৌরব দিয়াছে। কিন্তু ধ্বনিবাদের প্রধান ত্রুটি ধ্বনির অস্তিত্ব ছাড়াও যে কাব্যসৃষ্টি হইতে পারে সেকথা অস্বীকার করা। প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখিতে পাই প্রত্যক্ষ বাচ্যার্থেই রমণীয় এমন সাহিত্যের সংখ্যা সেকালেও বড় কম ছিল না, একালে তো তাহা সুপ্রচুরই। সমালোচনার এই আদর্শটিও তাই কতকাংশেই মাত্র গ্রহণযোগ্য, সর্বাংশে নয়।

শব্দার্থতত্ত্ব—কুন্তকের মতবাদ অনেকটা বস্তুবাদী। সাহিত্যের প্রত্যক্ষগম্য বিষয় উহার শব্দ এবং অর্থ। কুন্তক ইহাদের উপরই মূলতঃ ভিত্তি করিয়াছেন। শব্দার্থের অতিরিক্ত কোনো রসলোক বা ধ্বননক্রিয়ায় তাঁহার শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই। শব্দের সংগীতধর্ম এবং অর্থের চিত্রধর্ম—এই দুইয়ের মিলনেই সাহিত্যের চমৎকৃতি। কবি এমন শব্দ নির্বাচন করেন যাহার শব্দাবেদন (sound effect) এবং অর্থাবেদন (meaning effect) উভয়ই চরম স্ফূর্ত এবং সমন্বিত। কবি যখন বলেন "ঝঞ্ঝার মঞ্জীর" তখন তিনি ঝড়ের নূপুরপায়ে কাল-বৈশাখীর নৃত্যের চিত্রটিকে প্রকাশ করিতে চান। কিন্তু উদ্ধৃত শব্দ দুটি ব্যবহারের ফলে সেই চিত্র এবং সংগীত যেন মূর্ত হইয়া উঠে। "ঝড়" এবং "নূপুর" এই দুইটি শব্দ উহার পরিবর্তে প্রয়োগ করিলে কবির অভিপ্রায়ানুযায়ী ভাব ও সুর প্রকাশ পাইত না। কোনো রচনার শব্দের সহিত অর্থের, বাক্য-গ্রথিত শব্দরাজির মধ্যে পরস্পরের, বাক্যের সহিত বাক্যের এইরূপ নিপুণ সুহৃদসমন্বয়ই কাব্যের প্রকৃত সৌন্দর্যের উৎস। কুন্তক তাঁহার "বক্রোক্তিজীবিত" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন আদ্যন্ত পূর্বোক্তরূপ নিপুণ গ্রন্থন ও মিলন সাধিত হইলে "পানকরসের" ন্যায় একটি সামগ্রিক আস্বাদ লাভ করা যায়। কুন্তকের মতবাদের আধুনিকতায় বিস্মিত হইতে হয়। চরিত্রসৃজনের রহস্য কুন্তকেরও জানা ছিল না। কিন্তু সাহিত্যের ভাষাবিশ্লেষণে আধুনিক সমা-লোচকগণও তাঁহার মতামতের নিকট হইতে অনেক-কিছু গ্রহণ করিতে পারেন।

শব্দার্থতত্ত্ব

অলংকারবাদ—বামন, ভামহ প্রভৃতি আচার্যগণ অলংকারকেই কাব্যের প্রাণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অলংকার অর্থে শব্দালংকার এবং অর্থালংকার। কোনো রচনার মধ্যে কি কি অলংকার আছে তাহার তালিকা নির্মাণ এবং ব্যাখ্যানই এই জাতীয় সমালোচনার উদ্দেশ্য। সাহিত্যবিচারের দিক হইতেও এই আদর্শটি গ্রহণযোগ্য নয়। বহু রচনা অলংকৃত না হইয়াও সুন্দর। আবার অলংকৃত বহু রচনা কাব্যপদবাচ্য নয়। কিন্তু এই মতবাদটি একালের বাঙালী তথা অন্যান্য ভাষাভাষী ভারতীয় সমালোচকদের উপর এখনও

অলংকারবাদ

প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। অলংকার ব্যবহার বিষয়ে অভিনবগুপ্তের ("লোচন" টীকায় বিশ্লেষিত) অভিমত শ্রেষ্ঠ—নিঃসন্দেহে আধুনিক কালেও অনুসরণযোগ্য। তিনি সার্থক অলংকার প্রয়োগের দুটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—একটি হইল "অপৃথগ্-যত্ননির্বর্ত্যতা"; অপরটি "রসাক্ষিপ্ততা'। কবি যদি এমনভাবে রচনাকে অলংকৃত করেন যাহাতে অলংকারগুলি আরোপিত বলিয়া মনে না হইয়া রচনার রসাবেদনের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া ধারণা জন্মে তবেই উহা সার্থক, অন্যথায় নয়।

প্রাচীন ভারতীয় সমালোচনশাস্ত্রের মূল ধারাগুলির যে পরিচয় লওয়া হইল, তাহাতে দেখা যায় উহাদের মধ্যে অংশতঃ গ্রহণযোগ্য আদর্শ নানাভাবে বিদ্যমান।

মধ্যযুগের বহিরাঙ্গিক সমালোচনরীতি

মধ্যযুগে আমাদের দেশে সমালোচনার চর্চা যতটুকু হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ অলংকরণ-বিশ্লেষণেই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। তাহা ছাড়া এ দেশের প্রকৃত সমালোচনা টীকার আকারে দেখা দিয়াছিল। উহাতে-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যতটা আছে, সাহিত্য-মূল্য নিরূপণের চেষ্টা ততটা নাই। বিশেষ নায়ক-নায়িকা-লক্ষণ, মহাকাব্যের আকৃতি-প্রকৃতি, নাটকের শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে সমালোচকেরা যে সব আদর্শের স্থাপনা করিয়াছেন তাহা হইয়া পড়িয়াছিল একান্তভাবেই বহিরাঙ্গিক।

ইউরোপখণ্ডে আরিস্তোতলের "পোয়েটিক্স" গ্রন্থটিকে সমালোচনার আদি আদর্শ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। আরিস্তোতলের অনেক বক্তব্য হয়তো আজ পরিবর্তিত সাহিত্যিক পরিবেশে অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে। এবং জীবন ও দৃষ্টির

আরিস্তোতলীয় আদর্শ

জটিলতা ও বৈচিত্র্যের পটভূমিতে তাঁহার আলোচনাকে অপর্যাপ্ত মনে হওয়া অসংগত নয় কিন্তু সাহিত্যসমালোচনার মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে তিনি যে পথনির্দেশ করিয়াছিলেন তাহার মূল্য এখনও অম্লান আছে। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গির বশবর্তী হইয়া সাহিত্যসমালোচনার একটি আদর্শ দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার অনেকটা এখনও অনুসরণযোগ্য বলিয়া মনে হইবে। এ বিষয়ে বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও সমালোচক টি. এস. এলিয়টের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ: "He was primarily a man of not only remarkable but universal intelligence in whatever sphere of interest, he looked solely and steadfastly at the object." আরিস্তোতলের দৃষ্টিভঙ্গির এই আত্মনিরপেক্ষ তত্ত্বানুসন্ধিৎসার জন্যই একালেও মুক্তচিত্ত সমালোচকেরা তাঁহার ভাবাদর্শের অনেকটা অনুসরণ করিতে পারেন। তাঁহার মতে সাহিত্যে ভাব ও রসবস্তুই প্রধান, কিন্তু বাস্তবজীবনের ভিত্তিতেই এ রস সার্থক হয়। সাহিত্যে বাস্তবতার সমস্যা লইয়াও তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে তিনি সৌন্দর্যের দিক হইতে বা শিল্পের দিক হইতে বিচার করিয়াছেন। মন্দলোকের ভাগ্যবিপর্যয় বা সৎলোকের ভাল হওয়া আমাদের ঔচিত্যবোধকে তৃপ্তি দান করে। কিন্তু ইহাতে যে আনন্দ তাহা লৌকিক,

শৈল্পিক নয়। নানা দিকের বিচারেই প্রাচীন সমালোচনাসাহিত্যে আরিস্তোতল প্রবর্তিত আদর্শটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক কালে সমালোচনার ক্ষেত্রে যে সব আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির সবিশেষ প্রচলন, এবারে তাহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। ঐতিহাসিক সমালোচনরীতি একালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। সাহিত্যসৃষ্টিকে বিচার করিবার জন্য সেই যুগের ইতিহাসগত পটভূমিটির পরিচয় গ্রহণ প্রয়োজন। শিল্পীর মন স্বয়ম্ভূ নয়। তাঁহার গৃহীত বিষয়বস্তুও কল্পলোক হইতে আসে না—এমন কি পরবর্তীকালে তাহাতে কল্পনার প্রগাঢ় রঙ মাখানো সত্ত্বেও। যুগের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, ঐতিহাসিক উত্থানপতনের গভীর তাৎপর্য শিল্পীর ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। জাতীয় ইতিহাসের ফল হিসাবে দেখিলেই কোনো সাহিত্যিককে এবং তাঁহার সৃষ্টিকে সত্যদৃষ্টিতে দেখা হয়।

ঐতিহাসিক সমা-লোচনরীতি

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিটি পটভূমি বিচারে বিশেষভাবে সহায়তা করে। যে-সব উপাদান সাহিত্যিকের মনোজগতের গঠনে সহায়তা করে, ঐতিহাসিক যুগ-পরিবেশের ভূমিকা তাহার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহা ছাড়া একটি ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটি অনুধাবন করিলে পূর্বাপর তুলনার মধ্য হইতে একজন সাহিত্যিকের যথার্থ স্থানটি স্থির করা সম্ভব হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক সমালোচনার আদর্শটিও আমাদের অভীষ্টলোকে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। ঐতি-হাসিক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা পটভূমির পরিচয় মাত্র পাই। সাহিত্যের ব্যক্তিরহস্য ইহার সাহায্যে ভেদ করা যায় না। এই আদর্শের সহায়তায় আমরা কোনো গ্রন্থের বিষয়-উৎস নির্ণয় করিতে পারি, কিন্তু উহার শিল্পমূল্য নির্ণয় করিতে পারি না। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র একই যুগ-পরিবেশে বড় হইয়াছেন। মানবতাবাদ, যুক্তিবোধ, স্বাজাত্যবোধ, প্রাচীন ঐতিহ্য উদ্ধার প্রভৃতি নবজাগৃতির মূল লক্ষণগুলি তাঁহাদের রচনায় আছে। ঐতিহাসিক সমালোচন-আদর্শ এই পর্যন্ত বুঝিতে আমাদের সাহায্য করে। কিন্তু বঙ্কিম, হেম ও মধুর প্রতিভায়, রচনারীতিতে, চরিত্রভাবনায়, শিল্পচেতনায়, রূপসাফল্যে এত বৈচিত্র্য ও পার্থক্য কেন ঘটিল তাহার হদিশ ঐতিহাসিক সমালোচনা-রীতির আয়ত্তের বাহিরে।

মার্ক্সীয় সমালোচন-আদর্শ ঐতিহাসিক পদ্ধতিগুলির অন্যতম। কিন্তু অপরাপর ঐতিহাসিক পদ্ধতির সহিত ইহার গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মার্ক্সবাদীরা সুস্পষ্ট আদর্শ অনুসরণ করেন। সেই আদর্শবোধের দ্বারাই তাঁহাদের সমালোচনরীতি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। মার্ক্সবাদীরা বিশ্বাস

মার্ক্সীয় আদর্শ

করেন ইতিহাসের গতি দ্বন্দ্বমূলক। শ্রেণীসংঘাতের মধ্য দিয়া ইতিহাস যুগ হইতে যুগান্তরে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এইভাবে আদিম সমাজের মধ্য হইতে দাসসমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্রমিক অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সমাজতান্ত্রিক ও সাম্য-

বাদী সমাজ, যেখানে থাকিবে না কোনোরূপ শ্রেণীশোষণ। সাহিত্যিককে এই ঐতিহাসিক গতিরেখার বাস্তবতা অনুসরণ করিতে হইবে। ইতিহাসের এই গতিপথ কাহারও মানসলোকের ফল নয়, বাস্তব অর্থনৈতিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতের অনুসরণ ইহা হইবেই। মার্কসবাদী তাই দাবি করেন, সাহিত্যিকও এই শ্রেণীসংগ্রামের অংশীদার হইবেন, সর্বহারাশ্রেণীর সাম্যবাদ স্থাপনের সহযোগিতা করিবে সাহিত্যিকদের রচনাবলী। এই আদর্শের বশবর্তী হইয়া মার্কসবাদীরা সাহিত্যবিচারের একটি আদর্শ দাঁড় করাইয়াছেন। যে রচনা শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সহায়ক, দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, প্রতিক্রিয়াশীলদের উচ্ছেদে যাহার সাহায্য গ্রহণ করা যায়, সেই সাহিত্য উচ্চস্তরের, অন্যথায় সে রচনা মূল্যহীন অথবা নিন্দনীয়। সাহিত্যের রূপসৌকর্য একটা গৌণ ব্যাপার। ভাবটাই আসল। সেই রূপরীতিই সার্থক যাহা কমিউনিস্ট মার্কিস্ট আদর্শ পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করিতে পারে।

নীতি এবং ধর্মবোধের দৃষ্টিতে মার্কসবাদীদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর সমালোচক কিন্তু সাহিত্যবিচারের পদ্ধতিতে প্রায় একই রূপ রীতির অনুবর্তন করেন।

সাহিত্য ও প্রচার

তাঁহারা মনে করেন বিশিষ্ট নীতি ও ধর্মবোধ প্রচার করাই সাহিত্যের লক্ষ্য। রূপসৌকর্য, ভাষাগত বিশিষ্টতা প্রভৃতি বহিরঙ্গ প্রসঙ্গগুলি ততদূরই তাৎপর্যপূর্ণ যতটা ইহারা নৈতিক-ধর্মীয় ভাবটিকে বহন করিতে পারে। এই আদর্শের উপরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা কল্যাণবোধের সন্ধান করেন সাহিত্যে এবং প্রায়ই নিজস্ব নৈতিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতিফলন থাকিলেই সেই রচনাকে সৎসাহিত্য বলিয়া প্রশংসা করেন।

সাহিত্য-সমালোচনার এই সব আদর্শ যে কতটা ভ্রান্ত তাহা বেনেদেত্তো ক্রোচের "এসেন্স অব এস্‌থেটিক্‌স" গ্রন্থে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে। ক্রোচের মতানুসারে সাহিত্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে কয়েকটি মুখ্য প্রতিবন্ধক পাঠক-সমালোচককে দিগ্‌ভ্রান্ত করে: (১) বক্তব্যের গাম্ভীর্য ও মাহাত্ম্য থাকিলেই কোনো রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় না।

ক্রোচের কথা

কোনো দার্শনিক জিজ্ঞাসা বা অর্থনৈতিক বিচারের মধ্যে উপলব্ধি ও মননের এমন গভীরতা প্রকাশ পাইতে পারে যাহাকে সার্বজনীন মানবসত্যরূপে শ্রদ্ধা জানানো চলে। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্ব উহাকে অতি উচ্চস্তরের দার্শনিক নিবন্ধে পরিণত করিতে পারে। সাহিত্য হইয়া উঠিবার জন্য স্বতন্ত্র কতকগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন। দেখিতে হইবে রচনাটির মধ্যে সেই গুণগুলি আছে কিনা। (২) নিজস্ব মতামত কোনো গ্রন্থে পাইলে উহার মূল্যায়নে নিরপেক্ষতা রক্ষা করা কঠিন হয়। আমার রাজনৈতিক, সামাজিক বা দার্শনিক মত, নৈতিক বা ধর্মীয় ভাবনা আমি যদি কোনো রচনার মধ্যে লাভ করি, তাহা হইলে উহাকে বিশেষ মূল্যবান সাহিত্যকর্ম বলিয়া

ঘোষণা করিতে চাই। অপরপক্ষে যদি কোন রচনার মধ্যে আমার মতামতের বিরুদ্ধতা দেখিতে পাই, উহার সাহিত্যমূল্য একেবারেই নাকচ করিয়া দিতে চাই। সাহিত্যবিচারে পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে হইবে। নিজের ব্যক্তিগত মতামত দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে। এই প্রক্রিয়াটিকে ভারতীয় প্রাচীন আচার্যগণ বলিয়াছেন রসোপলব্ধির পক্ষে বিঘ্ননাশ, মনের আবরণ-উন্মোচন। (৩) বাহিরের প্রথানুগ এবং বহুশ্রুত কতকগুলি লক্ষণের বিচারে যেন অকবিতাকে কবিতা বলিয়া মনে না করি এবং খাঁটি কবিতাকে কবিতার জগৎ হইতে বিতাড়িত না করি। এককালে আমাদের দেশে পয়ারছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস-সংবলিত যাহা রচিত হইত, তাহাই কাব্য বলিয়া গ্রাহ্য হইত। ফুল, প্রেম, পাখির গান, জ্যোৎস্না, মলয়সমীর, কতকগুলি বিশেষ ধরণের উপমার ব্যবহার, ভাষাকে যথেষ্ট কমনীয় ও তরল করিয়া তোলাই কবিত্ব বলিয়া দীর্ঘকাল চলিয়াছে। কিন্তু এই সব বহিরঙ্গ লক্ষণে খাঁটি কাব্য-সৌন্দর্য নাই।

সমালোচনার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত দুইটি ভিন্নমুখী আদর্শও আছে: (১) বিশ্লেষণাত্মক; (২) সাজ্ঞাটিক। বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি খুটাইয়া বিচার করিতে চায়। রচনাটিকে বস্তুগত নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়া অনেকটা নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিকের মনোভাব লইয়া বিশ্লেষণবাদী সমালোচক উহার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব, উহাদের মধ্যেকার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা নির্ণয় করিতে চান, ব্যবহৃত অলংকারগুলির তাৎপর্য ও যাথার্থ্য কতটা তাহা অনুধাবনের চেষ্টা করেন, শব্দনির্বাচন শব্দগ্রন্থন শব্দচিত্র লইয়া আলোচনা করেন, চরিত্রগুলির বিভিন্ন মানস বৃত্তিগুলির স্বরূপ ও বিবর্তন অনুসরণ করেন। ইঁহারা যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত করিতে প্রস্তুত নন। রচনাটিই ইঁহাদের আলোচনার বিষয়। লেখকের মনের পরিচয় লইবার জন্য ইঁহারা উৎসুক নন। সাজ্ঞাটিক পদ্ধতির সমর্থকেরা বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিকে একান্তভাবেই বস্তুগত বলিয়া মনে করেন, এতটা বিশ্লেষণের ফলে রসসৌন্দর্যের অংশটি একেবারেই মারা পড়ে। কোনো রচনাকে খণ্ডে খণ্ডে বিচার করিলে তাহার প্রকৃত তাৎপর্যটি বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাই ইঁহাদের অভিমত। সাজ্ঞাটিক পদ্ধতির নিজেরও একটি বিপদ আছে। ইহার ভিত্তিতে যুক্তি ও বস্তুগত প্রমাণের কঠিন ভিত্তি থাকে না বলিয়াই এই পদ্ধতি কাল্পনিক সিদ্ধান্তের দিকে লইয়া যাইতে পারে।

পদ্ধতিগত দুই আদর্শ

সমালোচনাকে অনেকে পূজা বলিয়া মনে করেন। সেক্ষেত্রে মূল্য নিরূপণের সাফল্য অথবা দুর্বলতা-বিচারের প্রশ্নই ওঠে না। অনেকের মতে, এই পূজার মনোভাব শুধুমাত্র প্রকৃত যুগোত্তীর্ণ (classic) রচনাবলী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে সমালোচকের দায়িত্ব রচনার অন্তর্নিহিত সেই মাহাত্ম্যটি আবিষ্কার করা, যাহার জন্য উহা মহাকালের দৃষ্টিতেও

অন্যান্য পদ্ধতি

অমরতা অর্জন করিয়াছে। অপর একটি পদ্ধতির প্রচলনও বিশেষ করিয়া রোমান্টিক কবি-সমালোচকদের সমালোচনায় দেখা যায়। উহা সৃজনমূলক বা creative রীতি। সমালোচ্য গ্রন্থের সহিত নিজচিত্তের ভাবকল্পনার সহযোগ ঘটাইয়া নূতন সৃষ্টি-ধর্মী রচনা দেখা দেয় ইঁহাদের সমালোচনার মধ্যে।

যে সব মতাদর্শ লইয়া এখানে আলোচনা করা হইল তাহাদের মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে এবং ইহাদের সহায়তায় একটি গ্রহণযোগ্য আদর্শের ইঙ্গিতও করা যাইতে পারে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি—এই বিষয়ে সমালোচকের দৃষ্টি নির্বিকার ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত। এই "সৌন্দর্য" শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। ইহার সহিত রসিক পাঠকের চিত্তের আনন্দবোধও জড়িত। এই "আনন্দ" শব্দটিও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বুঝিয়া লওয়া উচিত। আমরা সচরাচর যাহাতে বাস্তব সুখ উপভোগ করি, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যাহাতে তৃপ্ত হয়, তাহাকেই আমরা সুন্দর ও আনন্দদায়ক বলিয়া মনে করি। কিন্তু সাহিত্য যে আনন্দ দেয় উহার সহিত সর্বদা বাস্তব সুখভোগের যোগ থাকে না। দুঃখও সুগভীর আনন্দের কারণ হইতে পারে। ট্র্যাজেডিধর্মী রচনাগুলি পৃথিবীর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আপাতদৃষ্টিতে যাহা সুরূপ নয়, তাহাও অতি গভীর সৌন্দর্যের দ্যোতক হইতে পারে। আসলে সাহিত্যের সৌন্দর্যের আস্বাদ অর্থাৎ আনন্দোপভোগ অলৌকিক। বাস্তবজীবনের প্রয়োজনের সহিত উহার সম্বন্ধ নাই। উহা আমাদের মনুষ্য-আত্মার গভীরতম আকৃতির সহিত যুক্ত। আমরা মানুষ বলিয়াই প্রয়োজনের অতীত সৌন্দর্য-আনন্দের জগতে উড়িয়া যাইতে চাই। উহা জীবনের মহত্তর প্রকাশ, দৈনন্দিনের চাকা বাঁধা নয় বলিয়া উহা জীবন-বিচ্যুত নয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি সৌন্দর্য-আনন্দ সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে সমালোচনার আদর্শও সেই সৌন্দর্য ও আনন্দের জগতে পাঠককে লইয়া যাওয়া।

সৌন্দর্য ও আনন্দতত্ত্ব

সাহিত্য-সমালোচকের মন সর্ববিধ পূর্বসংস্কারমুক্ত হইয়া সমালোচনায় বসিবেই ইহাই প্রত্যাশিত। ব্যক্তি হিসাবে তিনি যে-কোনো মতামতের ভক্ত হইতে পারেন, জীবনাচরণে তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট পথের পথিক হইতে পারেন। এমন কি, কোনো বিশেষ ধরনের রচনার প্রতি তাঁহার আকর্ষণও থাকিতে পারে (হয়তো তিনি গীতি-কবিতা ভালোবাসেন, অন্য জাতের রচনায় তাঁহার রুচি নাই), কিন্তু সমালোচক হিসাবে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনে আলোচনায় বসিতে হইবে। তিনি বিচারক এবং উপভোক্তা। উপভোক্তা হইলেও বিচারকের নিরাসক্তি না থাকিলে কেহ খাঁটি সমালোচক হইতে পারেন না। আবার যিনি শুধুই বিচারক, উপভোগের শক্তি যাঁহার অল্প, তিনি সাহিত্যসমালোচক হইতে পারেন না। সমালোচকের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য-আনন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যের মূল্য

সমালোচকের কর্তব্য

নিরূপণ, সাহিত্যের বিচার। গুণের তারতম্য স্থির করাও সমালোচনার কর্তব্য। সমালোচক প্রশংসা করিবেন, নিন্দাও করিবেন। কাজেই উপভোক্তার হৃদয় এবং বিচারকের যুক্তি ও বুদ্ধির সমন্বয় না ঘটিলে ভালো সমালোচক গড়িয়া উঠিতে পারেন না। সমালোচক সাহিত্যস্রষ্টা নন। (কোনো কোনো ভালো সাহিত্যিক ভালো সমালোচকরূপেও প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন, একথা সত্য; কিন্তু সেক্ষেত্রেও দ্বৈত ব্যক্তিত্বের কথা স্বীকার করিতে হইবে।) কারণ স্রষ্টাসুলভ মনের অংশীদার তিনি, কিন্তু মনন ও বিচারের মেজাজ তাঁহার মধ্যে গৌণ নয়। সমালোচকের এই বিচারের লক্ষ্য রচনার সৌন্দর্যের পরিচয় দান (অথবা সৌন্দর্যের অভাব দেখাইয়া দেওয়া)।

কিন্তু ইহার প্রয়োজন কি? সাহিত্য উপভোগ করিবার জন্য কি সমালোচনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়? সাহিত্য অনেকেই পাঠ করেন এবং নিজের মত করিয়া উহার মূল্য বুঝিয়া লন। সকলেই বোদ্ধা। গৃহনির্মাণ বা আইনের প্রশ্নে মানুষ যেমন বিশেষজ্ঞের অভিমতের ও নির্দেশের অপেক্ষা করে, সাহিত্যপাঠের ক্ষেত্রে সেরূপ করে না। ইহাতে সমাজের ক্ষতি হয় না। কারণ রসাস্বাদে ভুল থাকিলে বাস্তব ক্ষতি কিছু নাই, তবে মানসিক ক্ষতি আছে। সমালোচনার সাহায্যে রসবোধজনিত ত্রুটি দূর করা সম্ভব। তাহাতে জাতির চিত্তোৎকর্ষ ঘটিতে পারে। সাধারণ পাঠক নানারূপ ভ্রান্ত পথে পা বাড়াইয়া কোনো গ্রন্থের এবং গ্রন্থকারের প্রকৃত মূল্য অনুধাবনে অসমর্থ হন। (এ বিষয়ে ক্রোচের পূর্বোদ্ধৃত মতের কথা মনে করা যাইতে পারে)। ভালো সমালোচক সেখানে পাঠককে সৌন্দর্যভোগের যথার্থ রাজপথটিতে হাত ধরিয়া লইয়া যান, সোনা ও গিলটি চিনাইয়া দেন। কাজেই পাঠকদের দিক হইতে সাহিত্যসমালোচনার বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ভালো সমালোচকের বিচার এবং সাহচর্য স্রষ্টার আত্মজ্ঞানলাভে এবং নৈপুণ্যবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়। ভালো সাহিত্যসমালোচনা তাই ভালো সাহিত্যসৃষ্টির ন্যায়ই অভিনন্দনযোগ্য।

সমালোচনার সার্থকতা

প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নিসর্গ-বর্ণনা

প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটিমাত্র শাখাই বিকশিত হইয়াছিল। সেকালে বাংলা ভাষায় কাব্য-কবিতা ছাড়া আর কিছুই প্রায় লেখা হয় নাই। কাব্যধারায় কাহিনীকাব্য এবং গীতিকবিতা—এই দুই শাখার পরিচয়ই আমরা পাই। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি কোনো বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল কিনা তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য। সাহিত্যজগতের দুটি মুখ্য উপাদান—মানুষ এবং প্রকৃতি। আমাদের পুরাতন কবিরা প্রকৃতিকে উপাদান হিসাবে কতটা গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিসর্গ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠিয়াছিল কিনা তাহার বিচার করিলে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক-

ভূমিকা

পূর্ব কালের একটা বিশেষ দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বিশেষ করিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিভাবনার বৈচিত্র্য যেমন প্রকাশিত, তেমনি বঙ্গপ্রকৃতির রূপসৌষ্ঠবও নানা বর্ণে মণ্ডিত হইয়া পরিস্ফুট। পুরাতন সাহিত্যধারার সহিত ইহার কোনরূপ সংযোগবিধান সম্ভব কিনা ভাবিয়া দেখা উচিত।

বাংলা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে" প্রকৃতিকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন কবিরা। বিশেষ করিয়া তত্ত্ব-ভাবনার ব্যাখ্যায় রূপকাবরণ হিসাবে বহুক্ষেত্রে নিসর্গজগৎ হইতে উপকরণ সংকলিত হইয়াছে। যেমন কোথাও বেগবান নদীর প্রবাহ বর্ণন—"ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী"; কোথাও বনভূমিতে দ্রুত ধাবমান হরিণের চিত্র "তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসঅ"; কোথাও আবার গজরাজের শৃঙ্খলচ্ছিন্ন মুক্তির আনন্দ "মাতেল চীঅ-গঅন্দা ধাবই"। তবে

চর্যাপদ

প্রকৃতি শুধু উপাদান না থাকিয়া প্রেমোদ্বোধনময় পাঠ করিয়াছে শবরপাদের দুইটি কবিতায়। সেখানে প্রকৃতিচিত্র যেমন উজ্জ্বল ও মনোরম, তেমনি মানব-অন্তরে প্রেমবাসনা জাগরিত করায় সম্পূর্ণ। কবি শবরপাদ—"নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী"—অর্থাৎ মুকুলিত বৃক্ষশাখা আকাশ স্পর্শ করিয়াছে এই বাসন্তীপ্রকৃতির পটভূমিকায় আদিম নরনারীর প্রেমমিলনের চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার অপর একটি কবিতায় জ্যোৎস্না রাত্রির প্রেমোন্মত্ত রূপটি তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে—

তোর সে মোর ভইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড়এ সেরে কপাসু ফুটিলা॥
তইলা বাড়ীর পাশেঁর জোহ্নাবাড়ী উএলা।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ-ফুলিআ।
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর-শবরী মাতেলা॥

অর্থাৎ, আমার সেই গৃহ উচ্চে অবস্থিত, তাহার চারিপাশে ফুটিয়াছে কার্পাসফুল। কাছেই চাঁদ উঠিয়াছে। জ্যোৎস্নায় কাটিয়া গিয়াছে অন্ধকার, যেন অজস্র ফুল ফুটিয়াছে আকাশে। কঙ্গুচিনা ফল পাকিয়াছে। শবরশবরী প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির এই মদিরসুরভিত পরিবেশে নরনারীর জীবনে মিলন-কামনার চাঞ্চল্য জাগে। প্রকৃতির বর্ণাঢ্য-পরিবেশ এই প্রেম-মত্ততাকে সংকীর্ণ দেহবাদ হইতে ঊর্ধ্বচারী করিয়াছে।

বাংলা কাব্যে মধ্যযুগে চারিটি শাখার প্রাধান্য ছিল: (১) অনুবাদ; (২) মঙ্গল-কাব্য; (৩) বৈষ্ণব সাহিত্য; (৪) মরমীয়া সাধনকবিতা। ইহা ছাড়া নানা ধরনের লৌকিক সাহিত্যও ছিল। উহার মধ্যে বিশেষ করিয়া ময়মনসিংহগীতিকা পূর্ববঙ্গ-গীতিকার উল্লেখ করা যায়।

অনুবাদ-সাহিত্যে বাঙালী কবি কাহিনীবর্ণনের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ঘটনার পরে ঘটনার বিবরণ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ঘটনাই সেখানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতিবর্ণনার জন্য বিশেষ অবকাশ ঘটে নাই।

অনুবাদকাব্য

রামায়ণ অনুবাদে কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া অধিকাংশ কবিই মূলের প্রকৃতি-বর্ণনামূলক অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন। রামায়ণে পম্পা সরোবরের যে স্বপ্নমেদুর বর্ণনা আছে তাহার সৌন্দর্য সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্র স্বীকার করিয়াছেন। বাঙালী অনুবাদকেরা সেই সব অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মালাধর বসুর অনুবাদে রাসপূর্ণিমার প্রাকৃতিক রমণীয়তার সামান্য উল্লেখ আছে। অবশ্য মূল ভাগবতেও প্রকৃতি বিশেষ প্রাধান্য পায় নাই।

বাংলা মঙ্গলকাব্যও ঘটনাপ্রধান। বর্ণনাও সেখানে আছে—সামাজিক রীতি-নীতির বর্ণনা। কিন্তু প্রকৃতিসৌন্দর্য সম্বন্ধে কবিরা যেন একেবারেই অন্ধ ছিলেন।

মঙ্গলকাব্য

যেখানে নিসর্গবর্ণনা একেবারে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে সেখানেও প্রাকৃত বস্তুর নামের দীর্ঘ তালিকা প্রণয়নেই কবিরা উৎসাহ দেখাইয়াছেন। প্রকৃতির নয়নলোভন শ্রবণমনোহর কোনো চিত্র সেখানে ফুটিয়া উঠে নাই। উদাহরণ হিসাবে বিজয়গুপ্তের "মনসামঙ্গল" হইতে শিবের পুষ্পবর্ণের বর্ণনা হইতে একটু উদ্ধৃত করা হইল :

পুষ্পবনে গিয়া দেখে দেব মহেশ্বর।
বিকশিত নানা পুষ্প গন্ধে মনোহর॥
চাঁপা নাগেশ্বর জাতি, লবঙ্গ মালতী যুথি,
কেওয়া কস্তুরী কুরুবক।
টগর মাধবী-লতা, অশোক অপরাজিতা,
করবী যে বকুল তিলক॥

এইরূপ প্রায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী বিভিন্ন ফুলের নামের তালিকা। ঝড়-বন্যার বর্ণনা না করিয়া কবিরা মেঘের ও নদীর নামের দীর্ঘ তালিকা উপস্থিত করিতেই অধিক উৎসাহী। মঙ্গলকাব্যে অরণ্যের গহনতা ও ব্যাপ্তির স্থান লইয়াছে বহুসংখ্যক বৃক্ষের নামোল্লেখ। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বারমাসী বর্ণনার একটি রীতি প্রচলিত আছে। বারোমাসে নায়িকার দুঃখের বিচিত্রতা বর্ণনা করিতে গিয়া কবিরা কচিৎ প্রকৃতির ঋতু-চক্রের দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছেন। ফলে মাঝে মাঝে গ্রীষ্মের প্রাখর্য, বর্ষার বিদ্যুৎ-চমক, মেঘগর্জন ও বর্ষণশব্দ, শীতের তীব্রতা, বসন্তের মাধুর্য—দুই চারিটি ছত্রে মাঝে মাঝে চিত্ররূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু প্রথানুগত্যের ফলে অন্তরঙ্গতা ও অকৃত্রিমতা বিশেষ প্রকাশ পায় নাই। মঙ্গলকাব্যে বিশেষ প্যাটার্ণের মধ্যে পড়িয়া

মুকুন্দরামের ন্যায় বড় কবির হাতেও প্রকৃতি-জগৎ রঙে রূপে প্রাণবন্ত মূর্তি ধারণ করে নাই।

বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রধান বিষয় প্রেম। প্রকৃতির সহযোগ ভিন্ন প্রেমানুভূতি স্ফূর্ত হইয়া ওঠে না। অধিকাংশ বৈষ্ণব কবি এই সত্যটি অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কবিতায় তাই প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি কাহিনীকাব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

উহাতেও প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাব্যের আরম্ভ বসন্তকালে। বৃন্দাবনখণ্ডে আসিয়াছে দ্বিতীয় বসন্ত। কাব্যসমাপ্তিতে বিরহখণ্ডে তৃতীয়বার বসন্তকাল দেখা দিয়াছে। কবি ঋতুবর্ণনামূলক সংক্ষিপ্ত কতকগুলি চিত্রের সহায়তায় তুই বৎসরের কালবিবর্তনটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে রাধার চিত্তবিবর্তনও। বসন্তকালের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানবহৃদয়ে প্রেমভাবসঞ্চারের বর্ণনা—

কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাতে মধুকর মধু পীএ॥
সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।
তে কারণে থীর নহে মনে॥

আবার—

এবেঁ মলয় পবন ধীরেঁ বহে। ল।
মনমথক জাগাএ॥ ল॥
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ। ল।
ফুটী বিরহি হৃদয়॥ ল॥

—বসন্তঋতুর এই চিত্র এবং প্রেমোদ্বোধন ভারতীয় সাহিত্যধারায় দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু ব্যবহৃত। বড়ু চণ্ডীদাস প্রথার পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে বিশেষ তাৎপর্যময় করিয়াও তুলিয়াছেন। প্রথম বসন্তে মদনপীড়নে ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণের রাধিকার নিকটে তাম্বুল প্রেরণ। পরবর্তী বসন্তে রাধার হৃদয়ে প্রথম প্রেমাকৃতির আবির্ভাব এবং তৃতীয় বসন্তে কৃষ্ণবিরহে রাধিকার চিত্তদীর্ণ ক্রন্দন। শরতের রৌদ্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় ("শরতের রৌদে রাধা বড়য়ি বিকলি") অথবা গ্রীষ্মকালের প্রসঙ্গোল্লেখে—

উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ।
শীতল গম্ভীর জলে বহিতেঁ সুখাএ॥

—বড়ু চণ্ডীদাসের বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় আছে।

পদাবলী সাহিত্যে প্রকৃতিচিত্রণ যেমন রূপমনোহর, তেমনি ভাবগভীর। বাঙালী

কবিদের মধ্যে বিশেষ করিয়া গোবিন্দদাসের নাম করিতে হয়। প্রকৃতিকে তিনি বহু রচনায় আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। সর্বত্র না হইলেও বহুক্ষেত্রে ঋতুচিত্র রচনায় কবি অলংকারবহুলতার পথটি পরিহার করিয়া চলিয়াছেন এবং বহুক্ষেত্রেই বিস্ময়কর সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়াছেন। কবির শারদপূর্ণিমা-রাত্রির চিত্রটি সরল, স্বল্প শব্দালংকারের সহযোগে একটি আনন্দোল্লাস এখানে ছন্দে ও বর্ণে আস্বাদ্য হইয়া উঠিয়াছে—

পদাবলী : গোবিন্দদাস

শরদ-চন্দ পবনমন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথি
মত্ত মধুকর ভোরণি।

বর্ষা-বর্ণনায় ধ্বনিসাম্য কখনো কখনো এই ঋতুর অন্তর হইতে সব সংগীতটুকু টানিয়া বাহির করিয়াছে—

ঝর ঝর জলধর ধার।
ঝঞ্ঝা পবন বিথার।
ঝলকত দামিনী-মালা।
ঝামরি ভৈ গেল বালা।

কিন্তু বর্ষাভিসারের কবিতায় প্রকৃতি ও রাধার চিত্র রচনায় গোবিন্দদাস যে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, তাহা তুলনারহিত। পঙ্কিল পথ, নীল নিচোলে বাধা-না-মানা বৃষ্টির বেগ, বজ্রপাতের শব্দ, বিদ্যুতের আকস্মিক চমক, ত্রস্ত অভিসারিকার "হেরইতে উচকই লোচন তার" যেমন চিত্র হিসাবে নিপুণ, তেমনি প্রেমাবেগের দুর্দম গম্ভীরতা প্রকাশে সার্থক।

অনেক বৈষ্ণব কবিই বর্ষাপ্রকৃতির পরিবেশটি শব্দচিত্রে এবং শব্দঝংকারে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বিরহ এবং অভিসারের সঙ্গে এই ঋতুটিকে যুক্ত করিয়াছেন তাঁহারা। বর্ষায় মানবচিত্ত প্রেমমিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই ব্যাকুলতাই বিরহের ক্রন্দনে কখনো ধরা-পড়া করে। কখনো বিচ্ছেদ অসহ্য হওয়ায় সব প্রাকৃতিক ও সামাজিক বাধা অস্বীকার করিয়া রাধা অভিসারে যাত্রা করে। কবি শেখরের একাধিক কবিতায় বর্ষাঋতুর জীবন্ত রূপ এবং তীব্র ভাবাবেগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার লেখা মাথুর বিরহের বিখ্যাত পদে—

শেখর ও বর্ষা

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

ঝাম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥

কবি বর্ষাঋতুর সব ধ্বনিসংগীতকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। সেই সংগীত মহোৎসবের সহিত রাধার চিত্তবীণার তারটিকে টানিয়া বাঁধিয়াছেন কবি। প্রকৃতিসংগীত এবং মানববেদনা একাকার হইয়া মিলিয়া গিয়াছে। অভিসারের কবিতায়ও শেখর বর্ষার ধ্বনিসংগীতজাত ব্যাকুলতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন সার্থকভাবে। বর্ষার সহিত যেমন বিরহ এবং অভিসারের সম্পর্ক, তেমনি বসন্তের সহিত মিলনানন্দের নৈকট্য প্রথাহিসাবেই অনেকটা প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাপতির কবিতায় এই প্রথানুসরণ আছে। অতিরিক্ত আছে বসন্তের নবীনতা, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতাটুকুকে সম্পূর্ণভাবে দোহন করিয়া ভাষাকে নূতন রসে পূর্ণ করিয়া তোলা :

বিদ্যাপতি ও বসন্ত

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল।....
নবীন রসালমুকুল মধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই
নব রসে কাননে ধায় ॥

গোবিন্দদাস এবং শেখরকে যেমন বিশেষ করিয়া বর্ষার কবি বলা যায়, তেমনি বিদ্যাপতিকে বলা যায় বসন্তের কবি।

বর্ষা এবং বসন্ত ঋতু ছাড়াও শারদশোভা কখনো কখনো বৈষ্ণব কবিতায় স্থান পাইয়াছে। কালিন্দী বা যমুনা নদী, কদম্ব ফুল, কুঞ্জবনের সৌন্দর্য, ময়ূরের বর্ণাঢ্য পুচ্ছ, জলভরা মেঘের কালো কোমল রঙ বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে বারবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই সব প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসৃত হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু এহেন বর্ণনার মধ্য হইতে বাংলাদেশের সজল শ্যামল নিসর্গরূপটি কিছুটা উঁকি দিয়াছে।

বাংলার নিজস্ব রূপ

বাংলা সাধনসংগীতের ধারাটি সংস্কৃত কাব্যরীতির প্রথা বিশেষ অনুসরণ করে নাই। সেখানে মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বড় স্থান পায় নাই। তাই প্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের গূঢ় সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা সেখানে বিশেষ নাই। প্রকৃতি প্রায়ই কোন তত্ত্বের রূপকরূপে দেখা গিয়াছে। কিন্তু কোথাও কোথাও সেই রূপকের মধ্যে বাস্তব নিসর্গচিত্র প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাউল গানে দেখি, ঝড়ে বিকল নৌকার রূপকে কবি সাধকের আত্মিক সংকট বুঝাইতে চাহিয়াছেন—

উণুর ঝুণুর বাজে নাওরে নিহাইলা বাতাসে

কিন্তু ঝড়ের গর্জন ও নদীর উত্তালতা ইহার মধ্যে বেশ তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পুরাতন বাংলা কবিতায় প্রকৃতির রুদ্ররূপ বিশেষ ভাবে অবহেলিত। সেইদিক দিয়া এইরূপ দুই চার পংক্তির নিদর্শনও তাৎপর্যহীন নয়। রামপ্রসাদ এবং অন্যান্যদের লেখা শাক্ত কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতির নানা খণ্ডচিত্র রূপকরূপে দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া আগমনী বিজয়া গানে শিউলিঝরা শরৎপ্রভাত মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে।

সাধনসংগীত

লৌকিক সাহিত্যের মধ্যে ময়মনসিংহগীতিকাগুলি প্রেমানুভূতি লইয়াই কারবার করিয়াছে। এখানে তাই প্রকৃতি একটি দৃশ্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। গীতিকার গ্রামীণ কবিরা প্রেম অথবা প্রকৃতি কোনো-কিছুর চিত্রণেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথানুবর্তন করেন নাই। গারো পাহাড়ের অরণ্যজটিল অন্ধকারময় ভীষণতা কবির ভাষায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—

ময়মনসিংহ গীতিকা

উত্তরা না গারো পাহাড় ছয় মাস্যা পথ।
তাহার উত্তরে আছে হিমানী পরবত॥
হিমানী পরবত পারে তাহারই উত্তর।
তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুদ্দর॥
চান্দ-সুরুয নাই আন্দারিতে ঘেরা।
বাঘ ভালুক বইসে মাইনসের নাই লরাচরা॥

আবার অতিপরিচিত শালিধানের ক্ষেত—কিংবা কাকচক্ষু-জল সরোবরের সৌন্দর্যও তাঁহারা ভাষাবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ষাচিত্রবর্ণনেও তাঁহারা গ্রাম বাংলাকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন—

শাওনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে।
বউ কথা কও বলি ডাকে পথে পথে॥

অথবা,

হাতেতে জলের ঝারি বর্ষা নামি আসে।

বিশেষ করিয়া ময়মনসিংহগীতিকার কবিরা চারিপাশের প্রকৃতিজগৎ হইতে উপমাদি

চয়ন করিয়া কাব্যসৌন্দর্যকে একেবারে অকৃত্রিম আনন্দের উৎস করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকৃতি এবং মানুষ সহজ সম্বন্ধে এখানে একাকার হইয়া গিয়াছে।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতির ভূমিকা বিশেষ করিয়া প্রেমকবিতাকে আশ্রয় করিয়াছে। প্রকৃতিচিত্রণে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুগামিতা লক্ষণীয়। কোথাও কোথাও স্বাধীন দৃষ্টির পরিচয় নাই এমন নয়। বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপ হইতে সেকালের বাংলা কবিতা একান্তভাবে বঞ্চিত নয়। উপমা-রূপকে প্রকৃতির উপাদান বহুল ব্যবহৃত। বেশীর ভাগই প্রথানুবর্তন। মাঝে মাঝে সহজ অভিজ্ঞতার সামগ্রীও স্থান পাইয়াছে। নিসর্গ-ভাবনা বা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া কোনো

উপসংহার

জীবনদর্শন সেকালের কবিতায় স্থান পায় নাই। তবে মানুষ ও প্রকৃতির একটি সহজ সম্পর্ক (রবীন্দ্র-নিসর্গচেতনার সমপর্যায়ভুক্ত কেমন নিগূঢ় সম্বন্ধ নয়) এখানে লক্ষ্য করা যায়। এক কথায় বলিতে গেলে অতি উচ্চপর্যায়ের কিছু না হইলেও সেকালের বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি-চিত্রণের সাফল্য অবহেলার বস্তু নয়।

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম

(ক)

মানুষের বিশিষ্ট চিত্তোদ্বোধনকারী অনুভূতি-উপলব্ধিগুলির মধ্যে স্বদেশপ্রেমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাবচিন্তা সহজেই একটা প্রবল ভাবাবেগের আকারে মানবচিত্ত অধিকার করিয়া বসে। বিভিন্ন জাতির সাহিত্যে মনন ও আবেগের মিশ্রণ-জাত এই বিশেষ প্রসঙ্গটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের নানাশাখায় স্বদেশপ্রেম একটি প্রধান সুররূপে স্থান পাইয়াছে মূলত: আধুনিক যুগ হইতে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাই না। বাঙালীর সমাজ-মানসে এই বিশিষ্ট ভাবচিন্তাটির কোনোরূপ অস্তিত্ব সেকালে ছিল না। স্বদেশপ্রেম—এই ভাবনাটির জন্ম রেনেসাঁ-পরবর্তীকালে—কি ইউরোপে, কি ভারতে। পূর্বে ধর্মের জন্য যুদ্ধ হইয়াছে, রাজভক্তির জন্য মানুষ প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। স্বদেশপ্রেম—এই উপলব্ধিটির তাৎপর্য একান্তভাবেই আধুনিক কালের ব্যাপার। ইংরেজদের আগমনের ফলে, ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত

ভূমিকা

আমাদের সংস্পর্শ ঘটিল। তাহার ফলে, মর্ত্যপ্রীতি, মানবপ্রেম প্রভৃতি বৃত্তিগুলি বিকাশিত হইল। যাহা-কিছু পার্থিব জীবনের সহিত সম্বন্ধ তাহাকে মূল্যবান বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মানবদৃষ্টি এতকাল ধর্মীয় চেতনামুখী ছিল, এইবার তাহা জীবনমুখী হইল। মানুষ আপনার জাতিকে চিনিতে চাহিল, আপনার

অতীত ইতিহাসে গৌরববোধ করিতে চাহিল, আপনার ভবিষ্যৎকে স্বপ্নে ভরিয়া দিতে চাহিল। আপনার ভাষার উন্নতি, সমাজের উৎকর্ষ তাহার কাম্যবস্তু হইয়া উঠিল। এই ভাবনা-কল্পনা-কামনাগুলিরই অন্য নাম স্বদেশপ্রেম। এককাল স্বর্গের কাল্পনিক দেবতার পূজা করিয়াছে মানুষ, এবার তাহার স্থানে নূতন দেবতার আবির্ভাব ঘটিল। ইনি হইলেন জননী জন্মভূমি। মানুষ এই নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া আপনার ভাবনা ও কর্মকে ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডি হইতে উদ্ধার করিয়া ব্যাপকতর পটভূমিতে স্থাপন করিল।

বাংলা মননশীল সাহিত্যে অর্থাৎ প্রবন্ধাদিতে স্বদেশচিন্তার যেরূপ প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বিশেষ করিয়া বাংলার সৃজনধর্মী সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। সৃজনশীল শিল্পীর ব্যক্তিত্বের দর্পণে স্বাদেশিকতার সাধারণ ভাবোপলব্ধি কিরূপ বৈশিষ্ট্য লইয়া দেখা দিয়াছে, এবং শিল্প-রচনা হিসাবে উহা কতটা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। বিষয় এবং রচনা—দুই দিক দিয়াই আলোচনা পরিচালিত করিতে হইবে।

আলোচ্য বিষয়

(খ)

বাংলা কাব্যসাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় সর্বপ্রথম স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলিতে ইংরেজ শাসকদের বিভিন্ন আচরণের অসংগতির উপরে জোর দিয়াছেন বেশী। জাতীয় জীবনের পুচ্ছগ্রাহিতা এবং অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা কবির ব্যঙ্গের বিষয় হইয়াছে। এই কবিতাগুলির পশ্চাতে কবির স্বাদেশিকতা কিছুটা কার্যকরী থাকিলেও, এইগুলিকে ঠিক স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা বলা চলে না। ঈশ্বর গুপ্তের কতকগুলি কবিতায় অবশ্য মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা সাধারণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেম স্বদেশ-স্বজাতিকে ভালোবাসার কথাটি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে। বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়াও স্বদেশের কুকুরটিকে বরণ করিয়া লইবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। পরাধীনতার জন্য বেদনাবোধ তাঁহার মনের কোণে ছিল। উহা ব্যঙ্গকবিতাগুলির মধ্যে কিছুটা উঁকি দিয়াছে, স্পষ্ট ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে চায় নাই।

ঈশ্বর গুপ্ত

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপুতদের কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে কাব্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সুর বাজিয়াছে। "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" রাজপুত সৈনিকদের এই সংগীতে পরাধীন বাঙালীর স্বাধীনতা কামনার বাণীই শোনা গিয়াছে। রঙ্গলাল বাংলা সাহিত্যের সামনে একটি নূতন পথ খুলিয়া দিলেন। রাজপুতদের পাঠান-

রঙ্গলাল

মোগলদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে আধুনিক পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা বাংলা সাহিত্যের নানাবিভাগে বিশেষভাবে দেখা যায়। পদ্মিনী-উপাখ্যানে রাজপুত রাজমহিষীর আত্মদানের কাহিনী পরোক্ষভাবে জাতির কল্যাণ-কামনাকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে।

মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধকাব্যে সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত পদ্ধতিতে স্বদেশপ্রেমের মনোভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। কাহিনী বা চরিত্র-চিত্রণের স্বাভাবিক গতি অতিক্রম করিয়া উহা প্রচার হইয়া ওঠে নাই। কবি আধুনিক এই ভাবাদর্শটিকে সুকৌশলে প্রাচীন কাহিনীর অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। লঙ্কাভূমির আক্রমণকারী রামচন্দ্রকে রাবণ-মেঘনাদসহ লঙ্কাবাসীরা সাম্রাজ্যলিপ্সু শক্তিরূপেই অনুভব করিয়াছে। লঙ্কাযুদ্ধে যাহারা প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে, জন্মভূমির রক্ষার জন্যই তাহারা মরিয়া অমর হইয়াছে। বিভীষণ রামচন্দ্রের পক্ষে যোগদান করিয়া হীন ষড়যন্ত্রকারীরূপে নিন্দিত হইয়াছে। পাপপুণ্যের দৃষ্টিভঙ্গিটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া কবি স্বাদেশিকতার ভাবসূত্রটি গ্রহণ করায় কাহিনী নূতন তাৎপর্যে মহিমান্বিত হইয়াছে। রাবণ-মেঘনাদের পটভূমিতে সমগ্র জাতির জীবনসংগীত বাজিয়াছে এবং পররাজ্যের পদানত বাঙালী লঙ্কার মধ্যে আপনাদের হৃদয়সংগীত অনুভব করিয়াছেন। মধুসূদনের বীরাঙ্গনাকাব্যের 'জনা' পত্রের কথাও স্বদেশমন্ত্রের দিক হইতে স্মরণ করা যাইতে পারে। ইউরোপযাত্রাকালে কবির "বঙ্গভূমির প্রতি" সংগীতে জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত হইয়াছে। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর বহু কবিতায় বাংলাদেশ ও ভারতের মাঠ-ঘাট-নদী, অতীত ঐতিহ্য, বিচিত্র সাংস্কৃতিক উৎসব বর্ণনাচ্ছলে মধুসূদন এই দেশের মাটির প্রতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি আপনার প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। মধুসূদনের এই কবিতায় রাজনৈতিক ভাবনার স্পর্শ নাই। কবির সৌন্দর্যচেতনা এবং আবেগ-প্রাবল্যই এখানে প্রধান। কবিতা হিসাবেও এইগুলি উন্নত স্তরের, কারণ কোথাও উচ্চকণ্ঠ রাজনৈতিক প্রচারবাসনা এখানে প্রতিফলিত নয়। কবির ব্যক্তিত্ব—তাঁহার উল্লাস, বেদনা ও স্মৃতিরোমন্থনই এখানে প্রকাশিত।

মধুসূদন দত্ত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় জাতীয়তাবাদের বাণী উচ্চকণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার খণ্ডকবিতাগুলির মধ্যে দুই শ্রেণীর কবিতা স্বদেশপ্রেমমন্ত্রকে বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছে। হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক খণ্ডকবিতাগুলির পিছন হইতে কোথাও কোথাও ইংরেজবিরোধী সুরটি আত্মপ্রকাশ করিতে ছাড়ে নাই। কোথাও জাতিগত দুর্বলতা লইয়াই কবি বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে ("নেভার নেভার" প্রভৃতি কবিতার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে) তিনি ইংরেজ শাসনের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ "ভারতসংগীত,"

"ভারতবিলাপ", "ইউরোপ ও এশিয়া", "পদ্মের মৃণাল" প্রভৃতি কবিতায় হেমচন্দ্র ব্রিটিশশাসন ও দুর্ভর পরাধীনতা হইতে উন্নতি ও মুক্তির শিখরে উঠিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। হেমচন্দ্রের কবিতাগুলিকে কাব্যগুণের দিক দিয়া উচ্চাঙ্গের রচনা বলা চলে না। কারণ এগুলির ভাষা বহুক্ষেত্রে উত্তেজক বক্তৃতার মত! তাহা ছাড়া ইতিহাস ভূগোলের অত্যধিক তথ্যের উল্লেখ ইহাদের রূপসৌন্দর্যের হানি ঘটাইয়াছে। ইংরেজদের সম্পর্কে মনোভাবের দিক দিয়া হেমচন্দ্রের মধ্যে একটি আশ্চর্য দ্বিধার ভাব দেখা যায়। ইহা হেমচন্দ্রের ব্যক্তিগত ভাবনাপ্রসূত নয়—যুগচিন্তার ছাপ যেন এখানে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইংরেজদের সম্পর্কে বিরূপতা ও স্বাধীনতার কামনা কবির অন্তরে যেমন তীব্রভাবে তরঙ্গিত, সেইরূপ আবার ইংরেজী সভ্যতা-সংস্কৃতি, এমন কি ইংরেজদের শাসনরীতি সম্পর্কেও শ্রদ্ধার ভাব কবির অন্তরে বর্তমান। এই দ্বিধার ছাপ তাঁহার কবিতায়ও লক্ষ্য করা যায়। হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার" কাব্যেও স্বাধীনতার কামনা রূপ ধারণ করিয়াছে। স্বর্গচ্যুত দেবতাদের দুর্দশায় এবং অসুরদের বিতাড়িত করবার সাধনায় পরাধীন ভারতবাসীর দুরবস্থা এবং স্বাধীনতার কামনাই প্রতিফলিত হইয়াছে

হেমচন্দ্র

নবীনচন্দ্রের তিনটি মহাকাব্য—"রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" স্বদেশপ্রেমের একটি নূতন দিক উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। কবি স্বদেশপ্রীতির সহিত ধর্মীয় উপলব্ধিকে সমন্বিত করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের কাহিনী গ্রহণ করিয়া আধুনিক স্বদেশচিন্তার দিক হইতে উহাকে ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেছেন। আর্য-অনার্যের বিচ্ছেদ ঘুচাইয়া, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের অনৈক্যের অবসান ঘটাইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও স্বার্থে বিভক্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ—আধুনিক ভারতের সম্মুখে জাতীয় সংহতির এই আদর্শটি উপস্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যত্রয়ীর সহায়তায়। নবীনচন্দ্র সেনের "পলাশির যুদ্ধ" কাব্যটির নাম এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যটিতে নবীনচন্দ্র পৌরাণিক জগতে বা টডের রাজস্থান-কাহিনীর মধ্যে পরিক্রমা না করিয়া বর্তমান ইতিহাসের দিককেই আশ্রয় করিয়াছেন। পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-অধীনতার সূত্রপাত। উক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া স্বাধীনতার চেতনাকে সরাসরি নাড়া দিবার চেষ্টা সে-যুগে রাজনৈতিক সাহসের পরিচয় বলিয়া গণ্য হইবে। তবে সিরাজকে তিনি গৌরবের রঙে আঁকেন নাই। ক্লাইভ প্রমুখ ইংরেজ প্রধানদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা কাব্যমধ্যে অপ্রকাশিত থাকে নাই। তবে রাণী ভবানী বা বিশেষ করিয়া মোহনলালের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতার গৌরবগান গাহিয়াছেন। কিন্তু নবীনচন্দ্রের স্বদেশচিন্তায়ও যুগোপযোগী দ্বিধা ছিল। কবি ইংরেজ শাসকদের প্রতি যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ঘৃণা পোষণ করিয়াছেন। এই দ্বিধাপূর্ণ মনোভাবের কারণটি খুব দুরধিগম্য নয়। ইংরেজরা

নবীনচন্দ্র

আমাদের দেশে নূতন জীবনমন্ত্র লইয়া আসিয়াছিল, মধ্যযুগের চিন্তাধারা ও জীবনাদর্শের পরিবর্তনে ইংরেজদের দান উনবিংশ শতাব্দীর কোনো প্রগতিভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসন-শোষণ হইতে মুক্তিলাভের কামনাও তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। স্বাধীনতার এই কামনা একটা অন্ধ ভাবাবেগমাত্র ছিল না; ইংরেজ শাসনের নির্মমতা, বৈষম্য ব্যবহার, নির্বিচার শোষণ প্রভৃতি গ্রামের কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিতেছিল, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়েও ক্রোধ পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিতেছিল। তবুও ইংরেজী সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা বাঙালীর মনে জাগরিত ছিল বলিয়াই তাহার স্বদেশচিন্তা মোহমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে পারে নাই।

বিহারীলাল হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রপ্রভাবপুষ্ট বিশিষ্ট গীতিকবিরা আত্মভাবনায় লীন ছিলেন। ব্যক্তিহৃদয়ের বিচিত্র কম্পন গভীর আন্তরিকতায় তাঁহাদের রচনায় ধরা পড়িত কিন্তু বহির্মুখ বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতারচনায় বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাসের উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান নাই। (এই পর্বের গীতিকবিদের মধ্যে কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী, স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতায় দেশজননীর প্রতি ভক্তি ও প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে।) এ বিষয়ে ইহাদের অনেকেরই হাতে-খড়ি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সমকালীন গীতিকবিদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের ভালো কবিতা রচনা করিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাহার স্বদেশী কবিতা ও গানগুলির মধ্যে এক প্রচণ্ড বীর্য প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ উহাদের সহিত কবি আপনার ব্যক্তিত্বকে—আবেগবিগলিত হৃদয়কে—এমনভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন যে প্রচার বলিয়া উহাদের মনেই হয় না।

রবীন্দ্রপূর্ব গীতি-কবিদের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে স্বদেশপ্রেম একটি বিশিষ্ট প্রসঙ্গ। এই কবিতা ও গানের মধ্যে বঙ্গজননী এবং ভারতমাতার ভাবঘন কল্পমূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে। দেশকে ভালবাসা, দেশের প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহার কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে অনবদ্য সুন্দর ভাষাভঙ্গিতে। কবির স্বদেশপ্রেম বিশ্বমানবমৈত্রীর সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল। আমাদের প্রথানুগ রাজনৈতিক বুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার সহিত মিলাইয়া দেখিলে রবীন্দ্রকাব্যে প্রকাশিত ভাবধারা অভিনব বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে উহাতে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি যে গভীর প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

রবীন্দ্রকাব্য ও গানে স্বদেশপ্রেম

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের মধ্যে যাঁহারা স্বদেশপ্রেমকে বিশেষভাবে বিষয়—

রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের নামোল্লেখ করিতে হয়। বিংশ শতাব্দীর কবিদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় অনেক বেশী পরিপুষ্ট হইয়াছিল। উঁহাদের কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাগুলির ভঙ্গি কতকটা বক্তৃতার ন্যায়—সুরও খুব উত্তেজনাপূর্ণ, আবেগের যেন কিছু অভাব আছে। কিন্তু নজরুলের কবিতায় ভাবাবেগের লাভাস্রোত প্রবাহিত। তাহার কবিতার ভাষায় যেন এক আশ্চর্য বৈদ্যুতিক চমক আছে। উহাদের কাব্যসার্থকতা যে উচ্চধরনের তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার স্বদেশপ্রেম দেশের অত্যাচারিত মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসিবার মধ্যে নূতন পথ খুঁজিয়াছে।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে স্বদেশপ্রেম

(গ)

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম প্রথমতঃ ঐতিহাসিক কাহিনী আশ্রয় করিয়া পরোক্ষভাবে দেখা দিয়াছে। পরে সামাজিক কাহিনীতে প্রত্যক্ষভাবে এই সুর প্রকাশ পাইতে থাকে। কাব্যে স্বদেশপ্রেম প্রধানতঃ ভাবাবেগ-নির্ভর, উপন্যাসে ভাবাবেগের সহিত বাস্তবতাও প্রকটিত।

উপন্যাস-সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একটি প্রধান প্রসঙ্গ স্বদেশপ্রেম। "দুর্গেশনন্দিনীতে" লেখকের সমর্থনের কেন্দ্রটি পরিষ্কার হয় নাই, উপন্যাসরচনায় হাতও পাকে নাই। সে কারণে স্বদেশপ্রেম স্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু 'মৃণালিনী' উপন্যাসে লক্ষণসেনের মুসলমানকাহিনীর নিকট পরাজয়ের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কবি স্বাদেশিকতাকে কতকটা প্রকাশ করিবার সুযোগ করিয়া লইয়াছেন। পশুপতির দেশদ্রোহী ষড়যন্ত্র উপন্যাসমধ্যে ধিক্কৃতও হইয়াছে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ইংরেজবিরোধী সংগ্রামে মীরকাশেমের দৃঢ়তা, প্রতাপের বীর্য সহজেই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাবকে পুষ্ট করিয়াছে। এই উভয় উপন্যাসেই বঙ্কিম ব্যক্তিগত জীবনসমস্যার সহিত স্বাদেশিকতার প্রশ্নটিকে মিলাইয়া লইয়াছেন। কাহিনীর সুনির্দিষ্ট যুগের সহিত যাহাতে কালানৌচিত্য-দোষ কোথাও না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ফলে প্রচারমূলকতা তাঁহার উপন্যাসকে কিছুমাত্র ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই, "সীতারাম" এবং "রাজসিংহ" উপন্যাসে হিন্দু রাজা মুসলমান সম্রাটদের প্রবলতর শক্তিকে পর্যুদস্ত করিয়াছে। অনেকে উহাকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের লক্ষণ এবং সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া মনে করিয়াছেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর ইতিহাসসম্মত তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যঞ্জনায় পরাধীন জাতিকে উদ্বোধিত হইবার মন্ত্র শুনাইয়াছেন। দুইখানি উপন্যাসে তিনি প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজদের

বঙ্কিমচন্দ্র

বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ। "দেবী চৌধুরাণী"তে স্বদেশী ডাকাতদল ইংরেজদের অনাচারী শাসনকে উপেক্ষা করিয়া পাল্টা সরকার তৈরী করিয়াছে। "আনন্দমঠে"র সন্তানেরা দল তৈরী করিয়া ইংরেজ বিতাড়নের স্বপ্ন দেখিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই শেষোক্ত উপন্যাসটির প্রভাব যে কত গভীর তাহা সুবিস্তৃতভাবে বলিয়াও শেষ করা যায় না। বঙ্কিমের শেষ দুইটি উপন্যাসে তত্ত্বচিন্তা ও স্বদেশভাবনা শিল্পগুণের তুলনামূলক অপকর্ষের জন্য দায়ী—কেউ কেউ এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র

বঙ্কিমের পরবর্তী কালে ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত "বঙ্গবিজেতা" উপন্যাসে স্বাদেশিকতার পরিচয় দিতে চাহিলেও তাহা বীরত্ব প্রদর্শন এবং পাপপুণ্যের সংগ্রামের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। "মাধবীকঙ্কণে" রাজপুতদের প্রসঙ্গে, বিশেষ করিয়া যশোবন্ত সিংহের মহিষীর চরিত্রাঙ্কনে, স্বদেশপ্রেমের এক জ্বলন্ত রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু রমেশচন্দ্রের যে দুইখানি উপন্যাস স্বাদেশিকতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, তাহা হইল "মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত" এবং "রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা"। দুইখানি গ্রন্থই ঐতিহাসিক উপন্যাস। কবি বড় বেশী কল্পনার দ্বারস্থ হন নাই। কিন্তু ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে শিবাজীর সংগ্রাম এবং শত দুঃখ বরণ করিয়াও প্রতাপসিংহের অনমনীয় চরিত্রদীপ্তি পাঠকের মনে সংগ্রামী জাতীয় নেতার উজ্জ্বল চরিত্র ফুটাইয়া তোলে। জীবনপ্রভাতে ঔপন্যাসিক স্বাধীনতা-মন্ত্রে উৎসর্গিতপ্রাণ একটা জাতির যে জীবনসংগীত চারণগীতির রীতিতে বাজাইয়া তুলিয়াছেন, উপন্যাস-আঙ্গিকে তাহার অভিনবত্বও বিস্ময়চকিত করিয়া তোলে।

বঙ্কিম-অনুজ ঔপন্যাসিকগণ

বঙ্কিম-অনুজ ঔপন্যাসিকেরা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে দুইটি পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। মুসলমানী প্রণয়ের বিচিত্র উল্লাসকে তাঁহারা চিত্রিত করিয়াছেন। অথবা মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে হিন্দু নৃপতি বা সামন্তদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার সংগ্রামের মধ্যে দিয়া জাতীয়ভাব উজ্জীবিত করিয়াছেন। এই সময়ের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর শুধু ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে নয়, সামাজিক উপন্যাসেও স্বদেশমন্ত্র প্রচারিত হইতে দেখি। কিন্তু সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব যেভাবে স্বাধীনতা-লাভের কথা ভাবিয়াছেন, স্বর্ণকুমারীর দৃষ্টিভঙ্গি তাহা হইতে স্বতন্ত্র ছিল। দামোদর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে নানা ভঙ্গিতে স্বাদেশিকতার সুর বাজানো হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের দুটি উপন্যাস স্বদেশপ্রেমকে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গণ্য করিয়াছে: "গোরা" এবং "ঘরে বাইরে"। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে কংগ্রেসের আন্দোলনের

প্রতি তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া গঠনমূলক দেশপ্রেমের শান্ত মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন কবি। "গোরা" উপন্যাসটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতামতের অভিনবত্ব প্রকাশ পাইলেও ব্রিটিশবিরোধী সুর এবং দেশসেবার আদর্শ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বাঙালী পাঠকের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্রের একটিমাত্র উপন্যাসে প্রত্যক্ষতঃ স্বদেশপ্রেমের বিষয় অবলম্বিত হইয়াছে। উহা "পথের দাবী"। 'পথের দাবী'তে গুপ্ত সন্ত্রাসবাদকে পরোক্ষতঃ সমর্থন জানানো হইয়াছে। উপন্যাসটি শিল্পরূপের দিক দিয়া উচ্চস্তরের না হইলেও সব্যসাচীর আকর্ষণীয় চরিত্রের জন্য বাঙালী তরুণদের মন সহজেই জয় করিয়া লইতে পারিয়াছিল। গ্রন্থটি রাজরোষে পতিত হইয়া এহেন আকর্ষণ আরও বাড়াইয়াছিল। শরৎচন্দ্র "বিপ্রদাসের" মধ্যে স্বদেশপ্রেমকে কতকটা স্থান দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু অন্য সমস্যার স্রোতে পড়িয়া তাহা কোথায় তলাইয়া গিয়াছে।

শরৎচন্দ্র

শরতোত্তর আধুনিক উপন্যাসে স্বদেশপ্রেম একটি প্রধান বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে তারাশংকরের রচনায়। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার "ধাত্রীদেবতা", "গণদেবতা," "পঞ্চগ্রাম" প্রভৃতি উপন্যাসের নাম করিতে পারি। তারাশংকরের রাজনীতিচেতনা বিংশ শতাব্দীসুলভ তীক্ষ্ণ এবং পরিচ্ছন্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভাবনাকে চরিত্রকল্পনা ও ঘটনাবিন্যাসের সহিত তিনি সুন্দরভাবে মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি উপন্যাসে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বদেশপ্রেমের বাণী প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের শিল্পরূপ উচ্চস্তরের নয়। সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির উপন্যাসেও স্বদেশপ্রেম বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইঁহাদের কেহ মার্ক্সবাদী, কাহারও ঝোঁক সন্ত্রাসবাদের দিকে, কেহ নির্দলীয় স্বাধীন মতানুবর্তী। কেহ আবার গান্ধীবাদী।

আধুনিক উপন্যাস

(ঘ)

উপন্যাস এবং কাব্যের ন্যায় বাংলা নাটকও স্বদেশপ্রেম উদ্বোধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। উহার মধ্যে জনমনের উপরে নাটকের প্রভাব আরও বেশী বলিয়া মনে হয়। কারণ অভিনয়ের মধ্য দিয়া নাটক উদ্দিষ্ট ভাবটি প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে পারে। এই কারণেই ব্রিটিশ সরকার "ড্রামাটিক পারফরমেন্‌স য্যাক্ট" পাশ করাইয়া নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিতেছিলেন। রঙ্গালয়ে হানা দিয়া অভিনেতা ও পরিচালকবর্গকে গ্রেপ্তার করিবার

নাটকে স্বদেশপ্রেম

উদাহরণও সেকালে বিরল ছিল না। অবশ্য পূর্বদেহ নাটক বা প্রহসন (যেগুলি বর্তমান আলোচনায় গ্রহণযোগ্য) ছাড়াও জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঠিক বারলেক্স বা (ফার্স) রচনা করিয়া নৃত্যগীতসহযোগে অভিনয় করা হইত। উহাতে শাসকদের প্রতি অতি তীব্র কটাক্ষপাত থাকিত। জনসাধারণ এইগুলিকে যেমন উপভোগ করিত, তেমনি ইহাদের দ্বারা উত্তেজিতও হইত।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটক প্রথম লিখিলেন মধুসূদন দত্ত। তাঁহার "কৃষ্ণকুমারীতে" ভাগ্যহত ভীমসিংহের মুখে ভারতভূমির পরাধীনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের এই প্রথম নিদর্শন হইতেই আমরা স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ লক্ষ্য করি। আমাদের ঐতিহাসিক উপন্যাসে কখনও কখনও রোমান্সরস ও মুক্তপ্রণয়লীলাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিক নাটকে প্রায় সর্বদাই জাতীয়তাবাদী সুরটি প্রকাশ পাইয়াছে। দীনবন্ধু মিত্রই সর্বপ্রথম সমকালীন প্রত্যক্ষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া স্বদেশপ্রেমমূলক নাটক লিখিলেন। "নীলদর্পণ" নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের প্রাণবন্ত চিত্র স্থান পাইয়াছে। ব্রিটিশশাসন সম্বন্ধে লেখকের বিরুদ্ধতা এ নাটকে প্রকাশ পায় নাই।

মধুসূদন-দীনবন্ধু-জ্যোতিরিন্দ্র

কিন্তু ইহার ফলশ্রুতি, জনমনে ইহার আবেদন নাটকের প্রত্যক্ষ বস্তু অতিক্রম করিয়া বিস্তারিত হইয়াছে। শুধু নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্বন্ধে জনসাধারণ সচেতন হইয়া উঠে নাই, ব্রিটিশ শাসনকেই অনাচার বলিয়া মনে করিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহাসিক নাটকগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইংরেজী নাট্যরীতি, রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী এবং দেশাত্মবোধের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা। "পুরুবিক্রম" রচিত হইল সেকেন্দার এবং পুরুর যুদ্ধকাহিনী অবলম্বন করিয়া। "সরোজিনী" আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের পটভূমিতে রচিত। "অশ্রুমতী"তে প্রতাপসিংহের কন্যা অশ্রুমতী, শত্রু মানসিংহ, ভ্রাতা শক্তিসিংহ, মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীর প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্র-দ্বন্দ্ব, দেশপ্রেম এবং প্রণয়সংঘাত বেশ তীব্র, ঘনপিনদ্ধ ও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। "স্বপ্নময়ী" নাটকে বাংলাদেশে শোভাসিংহের ঐতিহাসিক বিদ্রোহকাহিনী অবলম্বিত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের যে সব ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের নাম হইল "সিরাজদ্দৌলা", "মীরকাশিম", "ছত্রপতি শিবাজী"। লক্ষণীয়, একমাত্র শিবাজী-কাহিনীতেই মহারাষ্ট্র ও মুসলমানশক্তির সংঘাতের মধ্য দিয়া ব্রিটিশ-বিরোধী

গিরিশচন্দ্র

স্বাদেশিকতা প্রকাশিত, অপর দুইটি ক্ষেত্রে ইতিহাস অনেকটা আধুনিক, প্রত্যক্ষতঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশীয় নৃপতিদের সংগ্রাম ও স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা সেখানে বিবৃত। নিঃসন্দেহে সিরাজদ্দৌলা এবং

মীরকাশিমের কাহিনীতে উনবিংশ শতাব্দীসুলভ দেশপ্রেমের আরোপ ঘটিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে এই ভাবনার অস্তিত্ব নবাব বা তাঁহার সৈন্যদলে থাকিবার কথা নয়। গিরিশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমেও ইংরেজদের সম্পর্কিত মনোভাবে যুগোপযোগী দ্বিধা আছে। কিন্তু করিমচাচা প্রভৃতি কাল্পনিক চরিত্রমাধ্যমে স্বদেশপ্রেম বেশ তীব্র আকারে ভাষারূপ পাইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি। প্রধানতঃ মুঘল ও রাজপুতদের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করিয়া তিনি "তারাবাঈ", "দুর্গাদাস", "মেবার-পতন" প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। নাটকগুলিতে ইতিহাসের সত্যতা অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। তবে আদর্শবাদী কল্পনারও যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে জাতীয়তাবাদী যে ভাবধারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এই নাটকগুলির মধ্যে তাহার সুর অনুরণিত হইয়াছে। এইগুলি সবই বিংশ শতকের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে রচিত। বিশেষ করিয়া "মেবার পতনে" বিশ্বমানবমৈত্রী এবং জাতীয়তাবাদের দুইটি আদর্শকে তিনি সমন্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয়তাবাদী সংগীতগুলির ওজস্বিতা ইহাদের স্বদেশপ্রেমের সুরটিকে আবেদনের দিক হইতে অপ্রতিরোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের "বঙ্গের প্রতাপাদিত্য", "পদ্মিনী", "চাঁদবিবি" "বাঙ্গালার মসনদ", "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পাইয়াছে। মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজেন্দ্র-ক্ষীরোদ-মুকুন্দ

রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" নামক রূপকনাট্যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণব্যবস্থাকে ধিক্কার জানানো হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার রূপক নাটকগুলিতে আধুনিক-কালের মানবজীবনের মুক্তির সমস্যাটি নানাদিক হইতে আলোচিত হইয়াছে। বিদেশী শাসন ও শোষণমুক্তি উহার অঙ্গরূপেই দেখা দিয়াছে; কোথাও স্বতন্ত্র হইয়া প্রধান হইয়া ওঠে নাই।

রবীন্দ্রনাথ

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে মন্মথ রায়ের পুরাণাশ্রিত নাটকগুলিতে ("দেবাসুর", "কারাগার", "শ্রীবৎস") জাতীয়তাবাদী সুর অনুরণিত হইতে শোনা যায়। অথচ নাট্যরচনা হিসাবে এগুলি উল্লেখযোগ্য শিল্পগুণের অধিকারী। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "গৈরিক পতাকা", "সিরাজদ্দৌলা" প্রভৃতি নাটকে স্বাদেশিকতার ভাবাতিরেক দৃষ্ট হয়। মহেন্দ্র গুপ্তের লেখা অনেকগুলি নাটকের নামোল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যায়। তুলসী লাহিড়ীর এবং অন্যান্য নাট্যকারেরা আধুনিক সামাজিক বিষয়বস্তুর মধ্যে স্বদেশপ্রেম প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।

আধুনিক নাট্যকার

বাংলা নাটকের বিভিন্ন শাখায় স্বদেশপ্রেমের ধারাটি বিশেষ পুষ্ট। সর্বদা তাহা শিল্প-সিদ্ধিতে পৌঁছায় নাই, কিন্তু জনমনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বাংলা কাব্য ও উপন্যাসের তুলনায় নাটকের উৎকর্ষগত ন্যূনতা

(উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাংলা সৃজনধর্মী সাহিত্যের নবজন্মলাভ ঘটিল।) নূতন ধরনের কাব্যকবিতা দেখা দিল। উপন্যাস নামে একটি সম্পূর্ণ অভিনব ধরনের গদ্যে রচিত আখ্যানধর্মী সাহিত্যরীতি দ্রুত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আবির্ভাবও এই কালে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নাটক নামক বস্তুটি ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। যাত্রা ধরনের কোনোরূপ অভিনয়গ্রাহ্য সাহিত্যরীতি সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল। কিন্তু উহারও যথেষ্ট নিদর্শন আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। আধুনিক বাংলা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের প্রধান শাখা তিনটি; (১) কাব্য-কবিতা; (২) উপন্যাস-গল্প; (৩) নাটক। ইহাদের পারস্পরিক সাহিত্যিক উৎকর্ষের তুলনা করিবার কথা তাই সহজেই মনে আসিবে। কাব্য-কবিতায় আমরা মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভার সাহচর্য পাইয়াছি। উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং ছোটোগল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের অতি উচ্চ স্তরের শিল্পসিদ্ধির পরিচয় পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছি। বাংলা সাহিত্যের এই তিনটি প্রতিভা পৃথিবীর সাহিত্যিক মানচিত্রে অত্যুচ্চ মহিমার স্থান-লাভের অধিকারী। দেশকালনিরপেক্ষ ভাবে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যপ্রতিভা ইহাদের। ইহাদের মধ্যে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু নাট্যসাহিত্যের আদর্শে ঐ রচনাগুলি উচ্চস্তরের নয়। গিরিশচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলাল—উনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট এই দুইজন নাট্যকারও কবি মধুসূদন, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এবং কবি ও গল্পকার রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষতা দাবি করিতে পারেন না।

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে যে রচনাগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাদের তুলনামূলক বিচার করিলেই উল্লিখিত মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে। মধুসূদন দত্ত কাব্য এবং নাটক দুই-ই লিখিয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলির ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার্য। কিন্তু মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা কিংবা চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে যেরূপ শ্রেষ্ঠ কাব্যকবিতার লক্ষণ মিলিতেছে, কোনো নাটকেই সেরূপ উচ্চ নাট্যগুণের সন্ধান পাওয়া যায় না। মেঘনাদবধকাব্যের কাহিনীগঠনে কবি কৌশল এবং ভাবগভীরত্বকে নৈপুণ্যের সহিত সমন্বিত করিয়াছেন। চরিত্রচিত্রণে, বর্ণনায়, চিত্রকল্পনায়, জীবনভাবনার গভীরে

মধুসূদনের কাব্য বনাম নাটক

অনুপ্রবেশে তিনি এই রচনায় শিল্পপ্রতিভার একটি মহৎ পরিচয় তুলিয়া ধরিয়াছেন। বিশেষ করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের গম্ভীর নির্ঘোষ বীর্য ও মহিমাকে শিল্পরূপে ভূষিত করিয়াছে। রাবণচরিত্রের ট্র্যাজেডি কল্পনায় অভ্রভেদী আর্তনাদ প্রকাশ পাইয়াছে; সৃষ্টিরহস্যভেদকারী বিমূঢ় জিজ্ঞাসা তাহার আস্বাদকে বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন করিয়া তুলিয়াছে। সর্বোপরি মেঘনাদবধকাব্য মহাকাব্যের দুর্লভ সেই গুণ অর্থাৎ Sublime-কে স্পর্শ করিয়াছে। বীরাঙ্গনাকাব্যের বৈশিষ্ট্য নাটকীয়তা, লিরিসিজম্ এবং আখ্যানরীতির বিস্ময়কর মিশ্রণে এবং নারীচরিত্রের বিচিত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অন্তরলোকের রহস্য-উদ্ঘাটনে। চতুর্দশপদীতে কবি যে শুধু একটি নূতন শিল্পরীতি আবিষ্কার করিলেন তাহাই নয়, আপন অবক্ষয়িত চিত্তের কারুণ্যে চতুর্দশপদকে মর্মরিত করিয়া তুলিলেন। এই কাব্যগুলির তুলনায় কবির 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' একান্তই অকিঞ্চিৎকর নাটক। চরিত্রচিত্রণ, নাট্যদ্বন্দ্ব, ঘটনার প্রত্যক্ষতা সব দিক দিয়াই এই নাটক দুইটি একান্ত দুর্বল রচনা। এমন কি, মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণ-কুমারী' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ট্র্যাজেডি হইলেও বিশ্বনাট্যের মানদণ্ডে প্রথম শ্রেণীর রচনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। নারীচরিত্রসৃজনে কবি শক্তির পরিচয় দিয়াছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু নাটকীয় ঘটনাবর্ত ও প্রবৃত্তিমুখর সংঘাতময়তা বহুক্ষেত্রে সংলাপের দৈর্ঘ্য এবং কবিত্বময়তার ফলে বিনষ্ট হইয়াছে। ট্র্যাজেডির মধ্যে অতলস্পর্শী গভীরতা নাই, ট্র্যাজিক নায়কের চরিত্রের মধ্যে জটিলতা এবং অনিবার্যতার অভাবও লক্ষ্য করা যায়।

কবিতা ও গল্পের সহিত রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার তুলনা করিলে উহাদের মূল্য-মানের পার্থক্য হৃদয়ংগম হইবে। প্রথানুগ রীতিতে 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' প্রভৃতি যে নাটকগুলি রচিত, তাহাদের মধ্যে ইতস্ততঃ বর্ণনায় কাব্যসৌন্দর্য থাকিলেও যথার্থ নাট্যগুণের অভাব রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সংকেতনাট্যগুলির মধ্যে সুপ্রচুর কবিত্ব এবং সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তা থাকিলেও তাহাদের স্বতন্ত্রশ্রেণীর সাহিত্য বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। তাহাদের রূপ-রস দুই-ই পৃথক জাতের। রূপক-সংকেত ধরনের নাটকগুলিকে একপাশে সরাইয়া রাখিলে দেখা যাইবে ছোটো গল্প এবং কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির তুলনা করাই চলে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় জীবনের ও প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শের বিচিত্র সৌন্দর্য ভাষারূপে প্রকাশিত, তেমনি ভাবকল্পনার গভীরতা, রহস্যময় অনির্বচনীয়তা তাঁহার কবিতায় শিল্পরূপবদ্ধ। মর্ত্যপ্রীতি ও অসীমাকৃতির দুই ভিন্নমুখী তারে ঘা দিয়া তিনি একটি সমন্বিত সংগীতের সুর বাজাইয়া তুলিয়াছেন। মানবের প্রাত্যহিক অস্তিত্বের অন্তরতম প্রদেশে সুপ্ত আদর্শ সৌন্দর্যলোকের জন্য

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, ছোটোগল্প বনাম নাটক

পুঞ্জীভূত আর্তি ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন কবি। বিশ্বগীতিকবিতার ভাণ্ডারে রবীন্দ্র-কবিতার এই অবদান খুবই উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত। রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পে বাস্তব জীবনচিত্র এবং গীতিলালিত্য মিশিয়া গিয়া এক অভিনব আস্বাদের সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটো গল্পকার চেকভ মপাসাঁর সহিতই মাত্র তাঁহার তুলনা করা চলে। অথচ স্বাদে-বর্ণে উহারা কতই-না স্বতন্ত্র। আসলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল না খাঁটি নাটকীয় প্রতিভা। তাঁহার যে নাট্যরচনাগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও মূল্যবান তাহারাও কবির গীতিপ্রতিভারই প্রতিফলন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে রোমান্স কল্পনার অতিরেক দেখা যায়। ঘটনার প্রবলতা ও নাটকীয়তা এবং বর্ণনায় কাব্যময়তাকে তিনি উপন্যাসের গঠনরীতিতে সুকৌশলে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু যে গুণে তাঁহার উপন্যাসগুলি শ্রেষ্ঠ আসনের দাবি করে তাহা হইল মানবজীবন ও ভাগ্যের রূপায়ণ চরিত্রস্পন্দনে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন নিপুণতা এবং গভীরতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শুধু আমাদের সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যের এক দুর্লভ বস্তু। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিচিত্র ভঙ্গি যেমন তাঁহার পরিকল্পিত চরিত্রগুলিতে বিস্ময়কর রূপ ধারণ করিয়াছে, তেমনি মানবপ্রকৃতির মূল প্রবৃত্তিগুলির নিগূঢ় ও জটিল আলোড়নজাত ট্র্যাজেডি তাঁহার উপন্যাসগুলিকে অত্যুচ্চ শিল্পকীর্তির মর্যাদা দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলার' শ্বাসরুদ্ধকর ট্র্যাজিক রূপ জীবনের সঙ্গে জীবনাতীত রহস্যের সেতুবন্ধনের নিষ্ফল সাধনায় বেদনার্ত; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'বিষবৃক্ষে' সমাজচেতনা ও মুক্ত প্রণয়প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বজাত আত্মার অবক্ষয়: 'সীতারামে' বীর্যবান পৌরুষের সর্বনাশ ভেদ করিয়া নিয়তিরূপা নারীর সৌন্দর্যের বঙ্কিমের শিল্পী অন্তরে যে গভীর জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করিয়াছে, ম্যাথু আর্নল্ড কথিত 'Criticism of Life"-এর অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণরূপে তাহাকে গণ্য করা যাইতে পারে।

বঙ্কিম উপন্যাসের উচ্চ শিল্পাদর্শ

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কবি ও গল্পকার রবীন্দ্রনাথ এবং কবি মধুসূদনের সহিত তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালী নাট্যকার বলিয়া অভিহিত দুইজন— গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনা করা যাইতে পারে। গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলিতে ভক্তিরসের এবং ধর্মভাবেরই প্রাধান্য। যাত্রার আদর্শে ইহাদের মধ্যে গান ও তরল উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি। অতিলৌকিক ঘটনার সাহায্যে চমকসৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন তিনি। রঙ্গমঞ্চের মুখ চাহিয়া সস্তা এবং বহিরঙ্গ 'মেলোড্রামাটিক' ভাব চাপাইতে তিনি সংকোচ বোধ করেন নাই। সামাজিক নাটকগুলিতে মানবচরিত্রের কয়েকটি স্থূল দিক লইয়াই তিনি মাথা

ঘামাইয়াছেন। সূক্ষ্ম ও গভীর জটিল ও মনস্তাত্ত্বিক জীবনসমস্যা, চরিত্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং ট্র্যাজেডি তাঁহার নাটকে শিল্পসম্মত রূপ ধারণ করে নাই। বাহিরের ঘটনাকে চরিত্রের অন্তরসত্যের সঙ্গে সমন্বিত করিবার মত অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার ছিল না। সমাজ-সমস্যার কোনো নিগূঢ় পরিবেশের গভীরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই গিরিশচন্দ্র। মাতলামি, জুয়াচুরি, ভাইকে ঠকাইয়া সম্পত্তি বেদখল করিবার চেষ্টা, গুপ্তহত্যা—এই জাতীয় ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া গিরিশচন্দ্র নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মানবচরিত্র ও ভাগ্যের গভীরতম প্রদেশে তাঁহার প্রবেশ ছিল না। তাহা ছাড়া নাট্যশিল্পের যে বড় কথা ঘটনার প্রত্যক্ষতা তাহার স্থূল একটি রূপ লইয়াই গিরিশচন্দ্র সন্তুষ্ট ছিলেন। গিরিশচন্দ্র নানা সাময়িক কারণে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু শাশ্বত নাট্যশিল্পের বিচারে তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিশেষ প্রশংসা করা যায় কি?

গিরিশচন্দ্রের নাট্যদৃষ্টির দুর্বলতা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাটকের শিল্পমূল্যে কিছু গভীরতার সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের দুটি নাটকে—'সাজাহান' ও 'নূরজাহানে'—কয়েকটি চরিত্র-কল্পনায় গভীর ভাবনার পরিচয় আছে। সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতা এবং চিত্ত-অবক্ষয়ের প্রবলতা, ঔরঙ্গজীব ও নূরজাহান চরিত্রে বিচিত্র প্রবৃত্তির সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতে জটিলতা সৃষ্টি করিয়া তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে উচ্চস্তরের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু উক্ত দুটি নাটক তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি হইলেও, নাট্য-গুণের বিচারে সামগ্রিক ভাবে প্রথম শ্রেণীর রচনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কারণ ইহার মধ্যে কবিত্বের বড় বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। সংলাপের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য, বহু চরিত্রকল্পনায় আদর্শবাদের আরোপ, ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাসের আতিরেক, সংহত নিটোল ঐক্যের পরিবর্তে গঠনরীতিতে শিথিলতা—এইগুলি প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের শিল্পসাফল্য হইতে দ্বিজেন্দ্রলালকে বঞ্চিত করিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে বড় সাহিত্যিকের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু খাঁটি নাট্যকারের প্রতিভার অধিকারী তিনি ছিলেন না।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাফল্য ও দুর্বলতা

অনেকের মতে, উনিশ শতকে বাংলাদেশে যাঁহারা নাটক লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র দীনবন্ধু মিত্রেরই খাঁটি নাটকীয় প্রতিভা ছিল। দীনবন্ধু মিত্র অবশ্য অন্যান্য বাঙালী নাট্যকারদের ন্যায় কবিত্বের উচ্ছ্বাসে নাটকীয় বস্তুনিষ্ঠা হইতে চ্যুত হন নাই, আদর্শবাদের আরোপ তাঁহার চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিকতাভ্রষ্ট করে নাই। কিন্তু

গভীর, গম্ভীর, কমনীয়—জীবনের এই দিকগুলিতে প্রবেশের অধিকার দীনবন্ধুর শিল্পী-প্রতিভার ছিল না। যাহা বক্র কৌতুককর তাহাতেই ছিল দীনবন্ধুর অধিকার। এই কারণে দীনবন্ধুর মধ্যে প্রকৃত নাট্য-প্রতিভা অনেকখানি থাকিলেও তাহা শেষ পর্যন্ত একজন সার্থক প্রহসনকারেরই জন্ম দিয়াছে, উচ্চাঙ্গের নাট্যকার গড়িয়া তুলিতে পারে নাই।

দীনবন্ধুর সীমাবদ্ধতা

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নব্য সাহিত্যের পত্তন। সেকালের বিভিন্ন শাখার পরিচয় লইলে দেখা যায় নাট্যসাহিত্যের তুলনায় কাব্য ও কথাসাহিত্যের শাখা দুইটি অনেক বেশী শিল্পগুণমণ্ডিত। ইহার কারণ কি, অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য, সাহিত্যের ইতিহাসের বিশেষ সমস্যা প্রতিভার আবির্ভাব প্রভৃতি সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করিলেই ইহার কতকটা যুক্তিসংগত উত্তর পাওয়া যাইবে।

দুর্বলতার কারণ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে। ইউরোপীয় সাহিত্যকে অন্ধভাবে এবং বাহির হইতে অনুকরণ করিলে সে সৃষ্টি শিল্পসমৃদ্ধ এবং জাতীয় রূপবিশিষ্ট হইতে পারিত না। ইউরোপীয় শিল্পভাবনার সম্পর্কে আসিয়া ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর তরুণ শ্রেণীর যে চিত্তবিকাশ ঘটিল, তাহাই এমন রূপরীতি ও রুচির প্রতি আগ্রহী হইল যাহার সহিত মধ্যযুগীয় ভাব-ভাবনা আদর্শ ও সাহিত্যরুচির কোনো সম্পর্কই নাই। যে নব মানবচেতনা, যুক্তিবোধ, মর্ত্যমমতা নবযুগের জীবনচেতনার বৈশিষ্ট্য, তাহাই এযুগের সাহিত্য-শিল্পে আত্ম-প্রকাশ করিল। ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংরেজী সাহিত্যকলাকে আত্মসাৎ করিয়া নূতন বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে লাগিল মধ্যযুগের সাহিত্যিক অবশেষের প্রতি কিছুমাত্র মমতা প্রকাশ করিল না। কাব্যসাহিত্যে মঙ্গলকাব্য বৈষ্ণবপদাবলীর যুগ আপনার প্রাণশক্তি হারাইয়া পূর্বেই গত হইয়াছিল। কবিওয়ালাদের কাব্য-ধারা বলিষ্ঠভাবে পরিত্যক্ত হইল। নবযুগের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ না বুঝিয়াই ঈশ্বর গুপ্ত আপনার খণ্ডকবিতায় পুরাতন যুগের উপরে যবনিকা টানিয়া দিতে চাহিলেন; রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যে আখ্যানকাব্য লিখিলেন তাহাতে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের আকৃতি-প্রকৃতি একেবারেই অনুপস্থিত হইল না। মধুসূদন সচেতনভাবে ইউরোপীয় কাব্যাদর্শ অনুসরণ করিলেন। ইউরোপীয় কাব্যাদর্শকে আত্মসাৎ করিয়া জাতীয় রূপ দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তিনি ক্লাসিক আদর্শের মহাকাব্য, ইতালীয় আদর্শের সনেট এবং আধুনিক রীতির গীতিকবিতা রচনা করিলেন। তাঁহার প্রতিভার শক্তি ইউরোপীয় কাব্যবীজকে এই দেশের মাটিতে এমনভাবে ফলাইল যে, পরবর্তী কোনো কবিই

উপন্যাস ও কবিতায় ইংরেজী আদর্শের প্রতিষ্ঠা

ঐ পথ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মধ্যযুগীয় কাব্যরীতির প্রতি কোনোরূপ প্রবণতা কাহারও কাহারও থাকা অসম্ভব ছিল না; কিন্তু মধুসূদনের হাতে-বাঁধা মূলপথের বাহিরে যাওয়া আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইল না। উপন্যাসের ক্ষেত্রে কি ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সে, কি সামাজিক উপন্যাসে, ইউরোপীয় আদর্শটি সম্পূর্ণভাবে বরণ করিয়া লইলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাচীন ভারতীয় কথাকাহিনী, কাদম্বরী ধরনের উপাখ্যানের প্রতি কোনোরূপ আকর্ষণই তিনি বোধ করেন নাই। বঙ্কিম ইউরোপীয় উপন্যাসরীতিকে বাংলার নিজস্ব সাহিত্যরীতিতে রূপান্তরিত করিলেন। তাঁহার প্রতিভার বলে এমন ধরনের উচ্চাঙ্গের উপন্যাস সৃষ্টি হইল যে, অন্য কোনো রীতি আকর্ষণের প্রশ্নই আর আসিল না। জীবনাদর্শের দিক হইতে বঙ্কিমপরবর্তী কোনো কোনো সাহিত্যিক হয়ত স্বতন্ত্র ভাবনার অনুগামী ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমপ্রবর্তিত রীতির বাহিরে যাওয়া সম্ভব হয় নাই এইভাবে ইংরেজী আদর্শের নিঃসংশয়িত অনুধাবনায় বাংলা আধুনিক কবিতা ও উপন্যাস এমন একটা ন্যূনতম শিল্পমান প্রথম হইতেই স্থির করিয়া দিল, যাহা আমাদের সাহিত্যের ঐ দুই শাখার উৎকর্ষের গ্যারান্টি হইয়া রহিল।

কিন্তু নাট্যাদর্শে দ্বিধা ও সংশয়

নাটকের আদর্শ প্রথমাবধিই অনেকখানি অস্থির ছিল। মধুসূদনের পূর্ববর্তী দুই একজন নাট্যকারও ইংরেজী আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন কিন্তু ইংরেজী নাট্যাদর্শ এবং ভারতীয় (অর্থাৎ সংস্কৃত) নাট্যাদর্শের প্রকৃত পার্থক্য কোথায়, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; বহিরঙ্গ পার্থক্যগুলিকেই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। এইভাবে দেখা যায়, মধুসূদনের কাল পর্যন্ত সংস্কৃত নাট্যাদর্শ, সংস্কৃত নাটকের সরাসরি অনুবাদ এই দুইটি ধারাই ছিল প্রধান। তখন বাংলা দেশে "সৌখীন নাট্যশালার যুগ। প্রাচীন প্রথাকে ভাঙিবার প্রবৃত্তি তাহাদের অনেকেরই ছিল না। এই কারণে মধুসূদনের ন্যায় বিপ্লবী মনোভাবসম্পন্ন সাহিত্যিককেও শর্মিষ্ঠা-

নবযুগের প্রাণমন্ত্র: ইউরোপীয় আদর্শ—নাট্যসাহিত্যে দ্বিধা

পদ্মাবতী রচনাকালে মুখে ইউরোপীয় রীতির কথা বলিলেও কার্যতঃ সংস্কৃতরীতিরই অনুসরণ করিতে হইয়াছে। মধুসূদন জানিতেন ইংরেজী নাট্যাদর্শই খাটি নাট্যাদর্শ। উহাকে নিজের করিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেই বাংলা নাটকের মুক্তি। প্রহসন দুইটি এবং কৃষ্ণকুমারী নাটকে মধুসূদন ইংরেজী রীতির মোটামুটি প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু কবির নাটকীয় প্রতিভা এমন উচ্চস্তরের ছিল না যাহাতে বাংলা নাটকের ধারাকে মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। দীনবন্ধু এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজী রীতির অনুসরণে কোনোরূপ সংশয় প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু মনোমোহন বসু, রাজকৃষ্ণ রায় হইতে

ইংরেজী রীতি অবহেলিত এবং যাত্রাঢঙের প্রবর্তন ঘটিতে লাগিল। গিরিশচন্দ্রে উহা চরমে পৌঁছিল। তাঁহার অধিকাংশ নাটকের অন্তরপ্রেরণা যাত্রাধর্মী, কিন্তু বাহিরের দিক হইতে উহাদের মধ্যে ঘটনা-বহুল প্রবৃত্তি-তাড়নার রূপ সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা হইল। এই বহিরঙ্গ এবং উক্ত অন্তরধর্ম সহজভাবে সমন্বিত হইতে পারে না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের হাতে এই মিশ্রিত রূপটি যেমন অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিল, তেমনি জনসাধারণের ধর্মাদর্শকে ও ভক্তিভাবকে বিশেষভাবে তৃপ্ত করিল। কিন্তু ইহার জন্য শিল্পগুণকে বিসর্জন দিতে হইল। বাংলা নাটক যাত্রার সহিত মিশ্রণের ফলে এমন একটা তরল রূপের সৃষ্টি করিল যাহার সাহিত্যিক উৎকর্ষ খুব উচ্চস্তরের হইল না। আধুনিক বাংলা সাহিত্য যেখানেই মুক্তি পাইয়াছে, সেখানে তাহা ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রাণসত্তা শোষণ করিয়া নিজের করিয়া লইতে পারিয়াছে। নাটকের ক্ষেত্রে যে দ্বিধা দেখা দিয়াছে, কখনো প্রাচীন সংস্কৃত রীতি, কখনো-বা মধ্যযুগীয় যাত্রা ঢঙের সহিত সন্ধি করিতে চাহিয়াছে, এবং ফলে তাহা যথোচিত উৎকর্ষ-লাভ করিতে পারে নাই।

বাংলা নাটকে বড় প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে নাই, ইহাও উক্ত ধারার তুলনামূলক দুর্বলতার একটি কারণ। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সঙ্গে দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিভার তুলনাই চলে না।

বড় প্রতিভার অভাব

নাটকে বড় প্রতিভার জন্ম কেন হইল না, তাহা কেহ নিশ্চয় বলিতে পারে না। প্রতিভার জন্ম কতকটা দৈব-নির্ভর। কেন, কখন, কোথায় উহা দেখা দিবে এবং প্রচলিত ইতিহাসের ধারা হঠাৎ আগ্নেয়গিরির তেজে ঊর্ধ্বমুখে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নবতর স্তরে উন্নীত করিয়া দিবে, তাহা হিসাব করিয়া বলা যায় না। বাংলা নাটকে সেরূপ ব্যাপার ঘটে নাই।

বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের মধ্যে নাটকোচিত বৈশিষ্ট্যের অভাবও অন্যতম কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমরা যেমন গীতিপ্রাণ তরলমতি জাতি, আমাদের জীবনে যেমন কর্মের ও সংঘর্ষের একান্ত অভাব তাহাতে এই জীবনের প্রতিফলন রূপে একটি সফল নাট্যসাহিত্য গড়িয়া উঠা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। খাঁটি নাটকের লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া মোহিতলাল যে-কথাগুলি বলিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে—"ভারতীয় আদর্শের কাব্যনাটক প্রভৃতিতে 'রস'ই ছিল মুখ্য, মানুষের জগৎ ছিল গৌণ। মানুষেরই যে সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তিনিবৃত্তি সর্বমানুষের মধ্যে সংস্কাররূপে বিরাজমান—মানুষের সেই জীবনকে, তাহার সেই রক্তমাংসঘটিত হৃদয়-সংবেদনাকে গৌণ করিয়া, সে নাটকে একটি নির্বিশেষ রসবস্তুর দিকেই দৃষ্টি রাখা হইত।

বাঙালীর জীবনে নাট্যসম্ভাবনার অভাব

য়ুরোপে তাহা হয় নাই… ‘উৎকৃষ্ট নাটকের প্রধান লক্ষণ এই যে, নাটকের দৃশ্যবস্তু হইবে মানুষের জীবন; ভাবের বা চিন্তার জীবন নয়—নিয়ত আবর্তমান, সৃষ্টির চক্রের ঘূর্ণাবেগতাড়িত, দেহ-মন-প্রাণের উৎক্ষেপ-আক্ষেপময় গতি-শক্তিমান জীবন। অর্থাৎ সৃষ্টির নিগূঢ় উৎস হইতে যে দুর্ধর্ষ প্রাণধারা প্রবাহিত হইয়া বিশ্বকে একটি বিরাট কর্ম-যজ্ঞশালায় পরিণত করিয়াছে—মানুষের মধ্যেও সৃষ্টির সেই প্রাণধারা যে-জীবনকে নিত্য গতিমান ও বেগবান রাখিয়াছে—সেই জীবনের রাগ-বিরাগ, আশা-দুরাশা, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য প্রভৃতির যে-দ্বন্দ্ব যে অপূর্ব রসরূপে মানুষের হৃদয়গোচর হয়—নিজেরই দেহ-মন-প্রাণের প্রবল অথচ অবশ ঘূর্ণাস্রোতে সে চকিতে যে আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তাহা ভাবজীবন বা মনোজীবনে সম্ভব নয়, তাহা ওই প্রবৃত্তিময় জীবনেই সম্ভব।” এই উপাদান ও সুর বাঙালীর জীবনে নাই বলিয়াই বাঙালী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জন্মিবার সম্ভাবনা খুবই কম।

উনবিংশ শতাব্দীর সেই ধারা বিংশ শতাব্দীতেও সমান প্রবহমান থাকিয়াছে। যে মূল কারণে বাংলা নাটকের জন্মকালেই শিল্পসিদ্ধি হইতে উহা বিচ্যুত হইয়াছে, সেই একই কারণে বিংশ শতাব্দীতেও খুব বড় ধরনের নাট্যকারের সন্ধান পাই না।

বিংশ শতকেও একই ধারা বহমান

মন্মথ রায়, শচীন সেন গুপ্ত কিংবা তুলসী লাহিড়ীকে ভালো নাট্যকার বলিতে পারি, কিন্তু তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পলেখকদের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করিতে পারি কি? কিংবা জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্র দত্ত, মোহিতলাল প্রভৃতি কবির ন্যায় সমশক্তিসম্পন্ন বলিতে পারি কি?

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস-চেতনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য ছিল। উপাদানঘটিত একঘেয়েমি সেকালের সাহিত্যসৃষ্টিকে বিশেষভাবেই ক্লান্তিকর করিয়া তুলিত। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতপুরাণের অনুবাদ, বৈষ্ণবপদাবলী, মঙ্গলকাব্যের গল্পের কয়েকটি প্রচলিত ধারা—ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদান কিছুই ছিল না, থাকিবার সুযোগও ছিল না। প্রত্যক্ষতঃ, ইতিহাসের কাহিনী স্থান পাইয়াছে আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে, ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলে’, চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে এবং ‘মহারাষ্ট্রপুরাণে’। তবে কাল্পনিক

কাহিনীকাব্যগুলিতেও কোথাও কোথাও অস্পষ্টভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে ইতিহাস-চেতনার কিছু কিছু প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের ইতিহাস-চেতনা আধুনিক কালের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা ছিল খণ্ডিত এবং আঞ্চলিক। আধুনিক স্বদেশমাহাত্ম্যের বোধ সেকালে যেমন মিলিবে না, তেমনি ইতিহাসবিষয়ক বস্তুনিষ্ঠার ছিল একান্ত অভাব। প্রায়ই ধর্মচেতনা, অলৌকিক ভাবনা ইতিহাসের উপরে আরোপিত হইয়া তাহার চরিত্র বিনষ্ট করিত।

ভূমিকা

মধ্যযুগের সমাজজীবন ও জনমানস বাংলাদেশে এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, দেশের বৃহত্তর ইতিহাসের সহিত প্রায়ই তাহার কোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক ঘটে নাই। মানুষের জীবনযাত্রা গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইত, গ্রামের বাহিরে হাটের মারফৎ কিছুদূর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করা হইত। রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের সহিত বৃহত্তর জনসাধারণের কোনো সম্পর্ক থাকিত না। খাজনা আদায়ের সূত্রে এক ধরনের ক্ষীণ সম্বন্ধ দেখা যাইত। উহার কোনো প্রভাব তাহাদের মনোলোকের গভীরে প্রবেশ করিত না। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় উত্থানপতনের বৃহৎ তরঙ্গগুলিও জাতীয় জীবনের বড় বড় দুর্যোগ ও বিপর্যয়গুলিও মধ্যযুগের বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে কোনোরূপ উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া কোনো অঞ্চলে ঘটিলে—কোনো গ্রাম প্রকৃত যুদ্ধের অকুস্থলে পরিণত হইলে অস্পষ্টভাবে তাহাদের ভাবনার সঙ্গে ইতিহাসের গতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। কিন্তু তাহা যেমন ক্ষীণ, তেমনি অস্বচ্ছ। যাহারা রাজধানীতে বাস করিতেন, রাজকার্যের সহিত যাহাদের স্বার্থের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ থাকিত, রাষ্ট্রীয় উত্থানপতন তাহাদের মনে নানারূপ ভাবনা জাগাইত; তবে সে ভাবনাও সুষ্ঠু ঐতিহাসিক চেতনা নয়—কারণ প্রায়ই ব্যক্তি-স্বার্থের দ্বারা তাহা হইত আচ্ছন্ন। রাজাদের সভাসদদের মধ্যে বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তিও কিছু কিছু থাকিতেন; তাঁহাদের নিকট হইতে মধ্যযুগসুলভ কতকটা ঐতিহাসিক চেতনা প্রত্যাশা করা চলে। তবে বাংলাদেশের কবিকুলে প্রকৃত সভাকবির সংখ্যা বেশী ছিল না। কাজেই সেযুগের বাংলা সাহিত্য ইতিহাসচেতনার দিক হইতে মোটেই পুষ্ট নয়, এ কথা বলা চলে।

ইতিহাস-চেতনার ক্ষীণতা

বাংলা অনুবাদসাহিত্যের পিছনে প্রথম দিকে একটি বৃহৎ ও গভীর ঐতিহাসিক চেতনা কার্যকর ছিল; কিন্তু বিশেষ বিশেষ কবি কতটা সে বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করিতেন বলা যায় না। মুসলমান-বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে বাঙালী সাহিত্যিকেরা যে খুব স্পষ্টভাবে কিছু চিন্তা করিয়াছেন এমন প্রমাণ নাই। তবে এই

ঘটনার সাংস্কৃতিক-সামাজিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। মুসলমানধর্মের আকর্ষণে অত্যাচারে ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে অন্ত্যজ বাঙালীরা ব্যাপক হারে ধর্মান্তরিত হইতে লাগিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তরফ হইতে তখন ইসলামবিরোধী হিন্দুদের একটি সাংস্কৃতিক ধর্মীয় প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইল। সংস্কৃত ভাষা হইতে হিন্দুর প্রধান ধর্ম ও লোকশিক্ষার গ্রন্থ রামায়ণ মহাভারত ভাগবত অনুবাদের পিছনে প্রথমযুগে এই মনোভাবই বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তবে অনুবাদক কবিরা সচেতনভাবে এই মহৎ সমস্যা ভাবিয়াছেন অথবা অবচেতনায় অনুভব করিয়াছেন তাহা সঠিক বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে মালাধর বসুর ভাগবতপুরাণের অনুবাদগ্রন্থটির উল্লেখ করা চলে। গ্রন্থসমাপ্তিতে কলিযুগের দোষ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা মুসলমানবিজয়ের পরবর্তীকালের বাংলাদেশের ইতিহাসের বিপর্যয়ের আলোচনায় পূর্ণ। ভাগবতের কৃষ্ণের ন্যায় পরম শক্তিধর পুরুষের আগমন প্রার্থনা করিয়া কবি সূক্ষ্মভাবে আপনার ইতিহাসচেতনার প্রমাণ দিয়াছেন। আবার পাশাপাশি কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীতে ইতিহাস বিষয়ে বিস্ময়কর নিষ্ঠাহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে গৌড়নৃপতির আনুকূল্যের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, তাঁহার নামটি বলিবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নাই।

অনুবাদ সাহিত্যে সমাজ-চেতনা

মঙ্গলকাব্যগুলির প্রথানুগ কাহিনীর মধ্যে সমাজজীবনের বিচিত্র খুঁটিনাটি বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসবোধ কোনো মঙ্গলকবিরই যথেষ্ট তীক্ষ্ণ ছিল না। মুসলমান শক্তিসম্বন্ধে মঙ্গলকাব্যের কবিরা সকলেই সচেতন ছিলেন। চৈতন্যপূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে বিজয় গুপ্তের নাম এ বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিজয়গুপ্ত মুসলমানরাজশক্তির প্রতি যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন তাহার মূল ধর্মঘটিত কারণ অপেক্ষা রাজনৈতিক ঐতিহাসিক বোধই অনেক বেশী কার্যকর। তুর্ক শাসকশ্রেণী প্রথম দুইশত বৎসর দেশব্যাপী অরাজকতাকে প্রশ্রয়ই দিয়াছে, বিজিত হিন্দুদের উপরে ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচারেও কুণ্ঠিত হয় নাই। হাসান-হোসেন ও মনসার সর্পকুলের দ্বন্দ্বে কবির ইতিহাসবোধ কিছুটা প্রতিফলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ইতিহাস-চেতনা : ধর্মবিদ্বেষ

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে অঙ্কিত চিত্রের সহিত বিজয়গুপ্তবর্ণিত পূর্বোক্ত চিত্রের তুলনা করিলে চৈতন্যপূর্ব যুগের সঙ্গে পরবর্তীযুগের পার্থক্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ষোড়শ শতাব্দীতে আসিয়া হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনেকটা সুস্থির হইয়াছে। মুসলমান-বিজয়ের সুফল বাংলাদেশের জীবনে ও সাহিত্যে যাহা-কিছু

প্রকাশ পাইয়াছে তাহা এই ষোড়শ শতাব্দী জুড়িয়া। মুকুন্দরাম কালকেতুকে দিয়া গুজরাটে যে নগরপত্তন করিয়াছেন তাহাতে ব্রাহ্মণাদি নানা শ্রেণীর হিন্দুর পার্শ্বে বিভিন্ন স্তরের মুসলমানদেরও স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। কবির ভাষায় ও বর্ণনায় কোথাও বিদ্বেষ বা বিদ্রূপের চিহ্নমাত্র নাই। মুকুন্দরামের ঐতিহাসিক দৃষ্টি বিজয় গুপ্ত অপেক্ষা তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ বলিয়া নয়, দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যের মধ্যে আসলে কালগত পার্থক্যের প্রতিফলন পড়িয়াছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

মুকুন্দরামের ঐতিহাসিক চেতনার অন্যতম পরিচয় উল্লেখযোগ্য। তিনি রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার হইয়া প্রথম জীবনে স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ধর্মীয় অবস্থা যুগপৎ মুকুন্দরামকে বিব্রত ও ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে কবির মনে একটি স্বচ্ছ ও সুস্থ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা দেখা দিয়াছিল। রাজার হাতে প্রজার শোষণকে মধ্যযুগের খুব কম কবিই এরূপ বলদৃপ্ত কণ্ঠে ধিক্কার দিয়াছেন। বনের পশুদের দুঃখের কথায় অত্যাচারিত প্রজাপুঞ্জের ব্যথাকাতর কণ্ঠস্বর বাজিয়াছে। শুধুমাত্র শোষিতের প্রতি সহানুভূতিতে নয়, এমন একটি আদর্শ রাজ্যের পরিকল্পনা কবি করিয়াছেন যেখানে প্রজার প্রতি রাজার সহানুভূতি প্রবল, সাহায্যের হস্ত সর্বদাই প্রসারিত। দরিদ্রের ধনলুণ্ঠন যেখানে নিষিদ্ধ, খাজনার হার যেখানে সামান্য, সরকারী সহায়তাও সুপ্রচুর।

মুকুন্দরামের ইতিহাস-চেতনা : রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বোধের স্পষ্টতা

ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির ভিত্তিতে যে কাহিনীটি আছে তাহা কতটা ইতিহাস হইতে সংকলিত সে-কথা ভাবিয়া দেখিবার মতো। ইহাতে পালবংশীয় কোনো নৃপতির কাহিনী অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। কতকগুলি স্থান ভৌগোলিক বলিয়া চিহ্নিত। ইছাই ঘোষের কাহিনী, প্রাগ্‌জ্যোতিষ-কামরূপ বিজয়কথার ভিত্তিতে কিছু কিছু ইতিহাসের স্মৃতি ঘুমাইয়া থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই সব কাহিনী লোকমুখে নানা কিম্বদন্তী এবং ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যঘটিত গল্পের সহিত জড়াইয়া গিয়া যখন সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের হাতে আসিয়া পড়িল তখন ঐতিহাসিক উপাদান বলিতে আর বড়-কিছু অবশিষ্ট ছিল না। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে তাই দূর হইতে ভাসিয়া-আসা ইতিহাসের কিছু গন্ধমাত্র আছে, অন্য কিছু নাই।

ধর্মমঙ্গলে ইতিহাসের স্মৃতিমাত্র আছে

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলি ঐতিহাসিক উপাদান এবং ঐতিহাসিক চেতনার উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে গণ্য হইতে পারে। চৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া যে ধর্মীয় আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল, সারা বাংলাদেশে উহার ফলে চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থগুলি প্রায়ই ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার বিবরণ না হইয়া পরিপুষ্ট ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ হইয়া

উঠিয়াছে। চৈতন্যের জীবনকাহিনীর চারিপাশে বৃন্দাবন দাসের ন্যায় বস্তুনিষ্ঠ লেখক বাংলার নবজাগরণের কাহিনীটি মিলাইয়া দিয়াছেন, অলৌকিকতার ক্ষীণ আবরণটি উন্মুক্ত করিয়া দেখিলে তাহার যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ংগম করা যায়। চৈতন্যদেব কাজীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া সহস্র সহস্র জনতার ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহা শুধুমাত্র ধর্ম-প্রসঙ্গ নয়, মনুষ্যমহিমার স্বীকৃতির সংগ্রাম—মধ্যযুগের ইতিহাসে ইহা দুর্লভ ঘটনা। ইহার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক চেতনার পরিচয় যেমন আছে তেমনি আছে রচয়িতা বৃন্দাবন দাসেরও। যবন হরিদাসপ্রসঙ্গ, জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনাও মুসলিম শাসনের মধ্যে বাঙালীর নবজাগ্রত প্রত্যয়ের পরিচয় বহন করে। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের প্রারম্ভে সমাজের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা শুষ্ক বিবরণ মাত্র নয়, উহার মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের মূল সুরটি—প্রধান সমস্যাটি ধরা পড়িয়াছে। বহুধাবিচ্ছিন্ন আত্মপ্রত্যয়হীন বাঙালীর উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রার্থনাটি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন কবি এবং চৈতন্যের মধ্যে সেই নেতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে ইতিহাস-চেতনার স্বচ্ছতা

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যটির কাহিনী-ভিত্তিতে রহিয়াছে ইতিহাস। আলাউদ্দিনের লোভের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চিতোর-মহিষী পদ্মিনীর আত্মবিসর্জনের কাহিনী উপজীব্য হইলেও কবি কাল্পনিক আখ্যান-কাব্যের ঢঙেই ইহা রচনা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে রাজসভা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কারাবরণও তিনি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ইতিহাসাশ্রিত কাব্যটিতে অন্য নানাবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও ইতিহাস-চেতনার সুরটি কোথাও স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ ও কামলোলুপতাও পর্যন্ত ধিকৃত হয় নাই। চিতোররাণার স্বাধীনতা-রক্ষার গৌরব কবি অনুভব করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ মুসলমানী দৃষ্টিকোণই ইহার জন্য দায়ী। মুসলমান সুলতান আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে কোনো দিক দিয়া চিতোররাণাকে সমর্থন জানাইতে চান নাই আলাওল।

আলাওলের পদ্মাবতী

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত অনেকগুলি কাব্যেই ইতিহাসবোধ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহার মধ্যে নানা ধরনের দুর্বলতা আমাদের চোখে পড়িবে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে আধুনিক কালসুলভ ঐতিহাসিক চেতনা কিছুতেই প্রত্যাশা করা যায় না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই শতাব্দী বিশেষভাবে যন্ত্রণা ও বিপর্যয়ে পরিপূর্ণ। একদিকে মুর্শিদাবাদের নবাবী

ভক্তের অধিকার লইয়া হানাহানি, অন্যদিকে ইংরেজ বেনিয়াদের ক্ষমতাবৃদ্ধি পুরাতন যুগের অবসান সূচিত করিতেছিল একান্ত নীরবে। অবশেষে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের জয় বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে কত বড় যুগান্তকারী ঘটনারূপে দেখা দিল, তাহা সঠিকভাবে কেন, মোটামুটিভাবেও সেকালের রাষ্ট্রনীতিবিদেরা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তবে রাজ্যব্যাপী অরাজকতা, জনগণের দুঃখভোগ প্রভৃতি প্রসঙ্গ সমকালীন কবিদের বিশেষভাবে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বেশী আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল বর্গীর হাঙ্গামা।

১৮শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক চেতনার বৈশিষ্ট্য

ভারতচন্দ্রের ঐতিহাসিকবোধ যুগোচিত ছিল একথা বলা যায়। তিনি মঙ্গলকাব্য-ধারায় অন্নদামঙ্গল লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কাহিনীর মুখবন্ধে সমকালীন ইতিহাস-বিবরণ স্থান তো পাইই নাই, কাব্যটির একটি প্রধান অংশ "মানসিংহ" ইতিহাস-আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিল। কাব্যারম্ভে কবি বর্গীর হাঙ্গামার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা বস্তুনিষ্ঠ। মহারাষ্ট্রীয়দের অত্যাচারের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন কবি। কিন্তু বাঙালীর জাতীয় জীবনে উহার ফলে যে বিপর্যয় দেখা দিল, দেশব্যাপী যে অর্থনৈতিক মাৎস্যন্যায় প্রবল আকার ধারণ করিল তাহার বর্ণনাটি খুবই বাস্তব ভঙ্গির—

ভারতচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা

বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃত-আকৃতি॥
লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি;
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥

বর্গীদের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করিলেও কবি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় ধর্মীয় বুদ্ধির বিভ্রমে পড়িয়াছেন। আলিবর্দীর পাপেই এই দেশে বর্গীসৈন্যদের আগমন ঘটিয়াছে। কিন্তু 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?' কাজেই সাধু লোকেরাও কষ্ট পাইয়াছে। কিন্তু ভারতের ইতিহাসবোধের গভীরতম পরিচয় আছে তাঁহার অন্নদা-কল্পনায়। মাৎস্যন্যায়ের ফলে যখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজিত তখন তিনি অন্নদা-দেবীর প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছেন। ইহা কবির সমাজচেতনা তথা ইতিহাসচেতনার পরিচয়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের তৃতীয় অংশের নাম 'মানসিংহ'। যশোহরের স্বাধীন ভূস্বামী প্রতাপাদিত্যের কাহিনী ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আধুনিক কালোপযোগী দৃষ্টিতে প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রতি কবির শ্রদ্ধা প্রকাশের

অবকাশ সেখানে ছিল না। বিশেষ করিয়া বিশ্বাসঘাতক ভবানন্দ ছিলেন কবির কাব্যের নায়ক। এই 'বিশ্বাসঘাতকতা'ও আধুনিক দৃষ্টিতে যত বড় পাপ, সেরূপ কোনো তাৎপর্য লইয়া সেকালের কবির কাছে দেখা দেয় নাই। বরং কবি অলৌকিক উপায়ে ভূতেদের সহায়তায় দিল্লীর বাদশাহকে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া উল্লাস অনুভব করিয়াছেন। সেকালে জাতীয় ভাবনা মূলতঃ ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কাব্য 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'। পুরাণের ছাঁদে কাব্যটি রচিত। পরিকল্পনাটি বোধ হয় বড়ই ছিল, কিন্তু অল্পাংশই মাত্র পাওয়া গিয়াছে 'প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর-পরাভব'। কবি গঙ্গারাম ইহার লেখক। এই গ্রন্থটির বিষয়ে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ডঃ. সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "মহারাষ্ট্র-পুরাণে কবি সাক্ষাৎ-দৃষ্ট ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন অনতিরঞ্জিতভাবে।

মহারাষ্ট্র-পুরাণ

তাহাই এই দীর্ঘ কবিতাটির একমাত্র মূল্য। ১২৪৯-৫০ সালে মারাঠা বর্গীদের পশ্চিমবঙ্গ লুণ্ঠন, আলিবর্দীর পরাভব ও অবশেষে জনসাধারণের বিরোধিতায় বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের পরাভব ও নিধন মহারাষ্ট্রপুরাণের বিষয়। ঘটনার আট বছর পরে, ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে, কবিতাটি লেখা হইয়াছিল।" কবি গঙ্গারামের দৃষ্টিভঙ্গির এই ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা সেকালের পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ঐতিহাসিক চেতনার দিক হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকার দাবি করিতে পারে। ঐতিহাসিক উপাদান এবং চেতনা যেমন স্বল্প ও সংকীর্ণ, তেমনি খণ্ডিত ও অস্বচ্ছ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানবরস

বাংলা সাহিত্যের পুরাতন খণ্ডকে প্রাচীন ও মধ্যযুগে দুই স্তরে ভাগ করিয়া দেখাই ইতিহাসসম্মত প্রথা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিস্থিতিতে এই দুই স্তরে নানারূপ পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সাধারণ রীতিনীতিতে বিশেষ পার্থক্যের সৃষ্টি হয় নাই। এক কথায় পুরাতন বাংলা সাহিত্য তুর্কিবিজয়ের পূর্বে এবং পরে মূল লক্ষণের দিক হইতে অনেকটা একরূপ ছিল। বাংলা পুরাতন সাহিত্য ছিল প্রধানতঃ ধর্মকেন্দ্রিক। চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনকথায় পরিপূর্ণ। বাউল-সুফী প্রভৃতি সাধনসংগীতেও আমরা ধর্মসাধনার এবং সাধ্যবস্তুলাভের কথাই বিশেষ করিয়া শুনিতে পাই। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি সবই দেবদেবীর পূজাবন্দনা প্রচারের উদ্দেশ্যে

রচিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথার পশ্চাতে রহিয়াছে গৌড়ীয় তত্ত্বের প্রতিফলন। অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিও কাব্যরচনার বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য লইয়া পদ রচনা করেন নাই; কবিতা লেখা ছিল তাঁহাদের ধর্ম-সাধনারই একটি অঙ্গবিশেষ। এমন কি, অনুবাদ করিতে গিয়াও মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা সংস্কৃত মহাকাব্যের বীরর্ষভ পুরুষ-প্রধানদের স্বয়ং ভগবানে রূপান্তরিত করিয়াছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে আরাকানের মুসলমান কবিদের কয়েকটি কাহিনী এবং কিছুসংখ্যক লোকসাহিত্যের কথা বাদ দিলে সবই প্রত্যক্ষতঃ ধর্মসম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে মধ্যযুগের অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের সহিতই বাংলা সাহিত্যের পার্থক্যটি লক্ষ্য করিবার মতো। সমকালীন হিন্দি সাহিত্যে আমরা ধর্ম-অসম্পৃক্ত বহু রচনার সন্ধান পাই। কিন্তু বাংলা সাহিত্য একটি দিকেই কেন বাড়িয়া উঠিল তাহা সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

পুরাতন বাংলা সাহিত্য ধর্ম-সম্পৃক্ত

সর্বাপেক্ষা বড় কথা হইল বাংলাদেশে আদি ও মধ্যযুগে যে-জাতীয় ধর্মের চর্চা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতের ধর্মাচরণে যাহার সন্ধান মিলিত না। এই বিশিষ্ট ধর্মচেতনার মধ্যেই ছিল তাহার মানববিশ্বাসের বীজ। আচার্য ক্ষিতিমোহন লিখিয়াছিলেন, "বাংলাদেশে এই মানবের মধ্যেই সাধনা, প্রেমই হল ধর্মের প্রাণ। এই সব কথাই বাংলার যোগমতে, বাংলার তান্ত্রিক সাধনায়, বাংলার প্রাকৃতগানে চলে আসছে। বাংলাদেশের সাধনার এইটেই প্রাণবস্তু।....এই স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশকে অন্য প্রদেশের সনাতনপন্থীরা কোনোদিনই সুচক্ষে দেখতে পারেন নি। অথচ বাংলার বাউলদের এই সব হল সাধারণ মূলতত্ত্ব। বাংলাতে বৌদ্ধধর্ম এই সবের সঙ্গে মিশে গিয়ে মহাযান হয়ে দাঁড়াল। প্রেমের সাধনায় অনেক দুঃখ অনেক বিপদ আছে, তবু বাংলা তাকেই স্বীকার করেছে, তবু শুষ্ক আচার ও জ্ঞানের পথে যায় নি।" [—বাংলার সাধনা] বাংলার ধর্ম-সাধনার মধ্যেই রহিয়াছে তাহার মানবসাধনা। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীর এই জাতীয় বৈশিষ্টটি চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাঁহার "বাঙালীর ইতিহাস" নামক গ্রন্থে। তাঁহার অনুসরণে বলা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালীর ধর্মসাধনায় এই ধরনের নীরস বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের ভূমিকা কোথাও নাই। দিগম্বর জৈনধর্মের অল্প-কিছু বিস্তার বাংলাদেশে ঘটিয়াছিল। কিন্তু খুবই সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে উহা সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহারা কখনই সাধারণ বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা তাঁহাদের পদ্ধতির বিরুদ্ধে নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মী একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীরাও ছিলেন। তাঁহারা যে খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এমন মনে হয় না। মহাযানী শ্রমণ ও আচার্যদের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল, কিন্তু তাঁহারা জীবনবিমুখ ছিলেন না, মানবজীবন ও সংস্কারকে অস্বীকারও করিতেন না। যদিও তাঁহারা নিজেদের সাংসারিক জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ

ছিলেন না, কিন্তু সমগ্র প্রাণিজগতের প্রতি তাঁহাদের করুণা এবং মৈত্রীভাবনা তাঁহাদের জীবন ও ধর্মসাধনাকে একটি অপূর্ব স্নিগ্ধরসে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে সহজযানী, বজ্রযানী, মন্ত্রযানী, কালচক্রযানীদের ধর্মসাধনার ভিত্তিতে রহিয়াছে দেহযোগ বা কায়াসাধনা এবং তাহার পথ ও উদ্দেশ্যই হইতেছে এই দেহ এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়কুলকে আশ্রয় করিয়া দেহভাবনার ঊর্ধ্বে উন্নীত হওয়া। নাথধর্ম, কাপালিকধর্ম, অবধূতমার্গ, বাউলমার্গ প্রভৃতি সমস্তই মোটামুটি ঐ একই ভাবকল্পনা ও সাধনপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহারা যে ধরনের সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের পথাবলম্বী ছিলেন তাহা নীরস, ইহবিমুখ আত্মনিপীড়নের বৈরাগ্য নয়; দেহবন্ধন—ইহবন্ধনের মধ্যেই ইহারা মোক্ষ খুঁজিতেন। ইহাদের বৈরাগ্যসাধনা বড়ই বিচিত্র। ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধি, আসক্তির মধ্যে নিরাসক্তির কামনায়ই ছিল ইহাদের ধর্মসাধনার অভিনবত্ব। জীবনরসরসিকের যে পরম বৈরাগ্য—গৃহীমনের বৈরাগ্যই প্রাচীন বাঙালীর চিত্ত হরণ করিয়াছিল এবং সেইজন্যই বাংলাদেশে বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান, নাথধর্ম প্রভৃতির এত প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং সেইজন্যই বৈষ্ণব সহজিয়াধর্ম, বাউলপন্থ, তন্ত্রধর্ম, দেহযোগ প্রভৃতির প্রতি সেকালে বাঙালীর এত অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। এই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য স্বাধীনভাবে পৃথকভাবে মানুষের কথা বলিতে চাহে নাই—প্রয়োজনবোধও করে নাই। ধর্মের গান গাহিতে গিয়া বাঙালী মানবতার সুরটিই ক্রমাগত বাজাইয়াছে দুইটি স্বতন্ত্র তারে ঘা দিয়া, ধর্মসাহিত্য ও মানবসাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ সে অনুভব করে নাই। একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, পুরাতন বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষতঃ যাহাকে লক্ষ্য বলিয়া মনে হয় সেই ধর্ম উপলক্ষ্য মাত্র, মানুষই সেখানে লক্ষ্য।

বাঙালীর ধর্মাচারের মধ্যেই মানবতার বীজ

আদিযুগের একটিমাত্র বাংলা কাব্যগ্রন্থের পরিচয় মিলিতেছে। উহা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত গানের সংগ্রহ। ঐ গানগুলির মধ্যে তাঁহারা সাধ্যবস্তু অর্থাৎ সহজের স্বরূপ, তাঁহাকে লাভ করিবার দুশ্চর দেহসাধনা এবং মহাসুখের আনন্দের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বস্তুময় বিশ্ব যে আমাদের চঞ্চল চিত্তের ফল সেকথাও বারবার বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। চঞ্চল চিত্তকে নিরুদ্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই সত্য প্রকাশ করিবার সময়ে কবিরা বাস্তবজীবন এবং মানবসংসারের রূপক আশ্রয় করিয়াছেন। চর্যায় দেখি, দুরূহ তত্ত্বসাধনার কথা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কবিরা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের জীবনের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র আঁকিয়া ফেলিয়াছেন। কোথাও ব্যাধেরা হরিণ শিকারে বাহির হইয়া হাঁকডাক পাড়িতেছে, কোথাও বসিয়াছে বাদ্যযন্ত্র গীত ও নৃত্যসহযোগে বুদ্ধনাটক অভিনয়ের আসর, কোথাও গাছ ফাড়িয়া পাটি জুড়িয়া পুল বাঁধা হইয়াছে নদীর উপরে, নৌকা চলিয়াছে পদ্মা বাহিয়া, ডোমব

আদিযুগের চর্যাপদে মানবরস

চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে, নেড়ে বামুনের নজর সেইদিকে, কোথাও গ্রামবৃদ্ধদের দাবার আসর, কখনও সংকেতচিহ্ন দেখিয়া মণ্ডপেরা ভিড় জমাইয়াছে দোকানে, আর শবর-শবরীর প্রণয়মত্ত লীলাবিলাস কখনও তত্ত্বকে পিছনে ফেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জাতীয় উদাহরণ এবং রূপক দিয়া গহনগূহ্য অনেক-কিছু বুঝাইয়া দেওয়াই সম্ভবতঃ সাধকদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু উপলক্ষ্য মানবজগৎ বড় হইয়া উঠিয়া লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এবং সেই সব স্থানেই ভাষা সুরময়, আবেগপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

মধ্যযুগে যে সব কাব্যধারা বাংলাসাহিত্যের আসরে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্টতা নানা কারণে। মঙ্গলকাব্যে বাংলাদেশের নিজস্ব দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশের চেষ্টা আছে। কাব্যগুলি মৌলিক আখ্যান-কাব্য এবং সৃষ্টিপ্রাচুর্যে বহুশাখার বিস্তারে ইহাদের গুরুত্ব অসাধারণ। প্রধান মঙ্গলকাব্যের ধারা তিনটিঃ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল। অপ্রধান মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে শিবায়ন এবং অন্নদামঙ্গলের নাম উল্লেখযোগ্য। আরও বহু ছোটবড় দেবতার কথা লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঙ্গলকাব্য লেখা হইয়াছিল। বাহুল্যবোধে তাহাদের উল্লেখ করা হইল না। মঙ্গলকাব্যের দেবতারা অনার্য এবং আর্যভাবনার সহযোগে সৃষ্ট। তবে ইহাদের ভিত্তিতে লোককল্পনা এবং সামাজিক প্রয়োজনবোধই বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল। মনসাদেবী বঙ্গদেশের জলাজঙ্গলসমাকীর্ণ দেশের অধিবাসীদের সর্পভয় হইতে রক্ষা করেন, পুত্রহীনকে পুত্র দেন, এমন কি মুসলমান কাজী প্রভৃতির অত্যাচার হইতেও ভক্তকে রক্ষা করেন। চণ্ডীদেবী ব্যাধকে রাজ্যদান করেন, হারানো ছাগল অথবা স্বামীকে ফিরাইয়া দেন। ধর্মঠাকুর কুষ্ঠ শ্বেতী প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত করেন, যুদ্ধে বিজয় দেন। তদুপরি সকলেই ধনহীনকে ধনদান করেন। বাঘকুমীরের অত্যাচার হইতে আবাদী জমিকে মুক্ত করিবার জন্য দক্ষিণ রায়ের পূজা করা প্রয়োজন, বসন্ত রোগের উপশম ঘটিবে শীতলা পূজার দ্বারা—এইরূপ আরও বহুসংখ্যক লোকসংস্কারজাত দেবতা আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভাবনার সহিত কিছুটা জড়িত হইয়া মঙ্গলকাব্যে গৌরবের স্থান লাভ করিয়াছে। ইহারা যতটা দেবতা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী মানবিক জীবনযাত্রা ও সামাজিক ব্যক্তিক প্রয়োজনসিদ্ধির দেবরূপ। মঙ্গলকাব্যে মানবরসের ইহা প্রথম চিহ্ন। দেবচরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করিলেও উহাদের মধ্যে মানবোচিত লক্ষণই বেশী করিয়া দেখা যাইবে। ধর্মঠাকুরের দেবত্ব তাঁহার অস্পষ্টতায়। কিন্তু হিংসা, ঈর্ষা, ক্রোধ লইয়া মনসা আমাদের অতিপরিচিত সংসারযাত্রার মানবীরূপেই অঙ্কিত। চণ্ডী কখনও কখনও দশভুজা মূর্তি ধারণ করিলেও ফুল্লরার সহিত ছলনায় অথবা গঙ্গার সঙ্গে কলহে একান্ত বাস্তব নারীরূপ গ্রহণ করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের কবিদের ধর্মচেতনা তাঁহাদের বস্তুজগতের বাহিরে

মঙ্গলকাব্যে মানবরস

দেবকল্পনায় মানবভাবনার প্রভাব

লইয়া যাইতে পারে নাই। তাঁহাদের কল্পনায় স্বর্গের যে-ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত আমাদের পল্লীর এপাড়া-ওপাড়া সম্পর্ক। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যবধানই নাই। স্বর্গে যে সুখৈশ্বর্যের এমন কিছু আধিক্য—এই কাব্যগুলি পড়িয়া তাহা মনে হয় না।

মঙ্গলকাব্যে কাহিনীকথনের লক্ষ্য হইল উদ্দিষ্ট দেব-দেবীর পূজাপ্রচার। কিভাবে নানাবিধ বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া মর্ত্যলোকে তাঁহাদের পূজা প্রচারিত হইল—কাহিনীটির যেন তাহাই লক্ষ্য। কিন্তু সেই কাহিনীটি চারিদিকে বিচিত্র সব বর্ণনায় ও মণ্ডনকলায় শাখায়িত পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে মধ্যযুগের বাঙালী জীবনধারার একটি বস্তুনিষ্ঠ নিখুঁত ছবি মিলিতেছে। কোথাও রন্ধনের বর্ণনায় সেকালের ভোজ্যদ্রব্যের বিস্তৃত চিত্র প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও বাণিজ্যযাত্রার প্রসঙ্গে বাঙালীর ব্যবসায়িক জীবনের কথা কাব্যমধ্যে স্থান পাইয়াছে। বাংলাদেশের হাটবাজার, নদনদী, ফুলপল্লববৃক্ষ, পশুপক্ষীর কথা, জাতকর্ম হইতে প্রেতকর্ম পর্যন্ত জীবনাচরণের প্রত্যেকটি স্তর, নারী-পুরুষের বেশভূষা অলংকার — মধ্যযুগের গোটা মানব-জীবনই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যতটা বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত এমনটি আর কোথাও হয় নাই।

মানবজীবনের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র

শুধু বাস্তবজীবনের উপকরণ-বর্ণনায়ই নয়, মানবমানবীর বিচিত্র হৃদয়াবেগের চিত্রণেও কবিরা আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। শক্তি-অনুযায়ী কবিরা চরিত্রচিত্রণ ও মানবানুভূতির বর্ণনায় সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সকলেই মানুষের হাসিকান্না, মানবপ্রবৃত্তির বিচিত্রতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাৎসল্য, প্রেম, বন্ধুত্ব, সৌভ্রাত্র, শত্রুতা, ঈর্ষা, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তির তারগুলি বাজাইয়াছেন বলিয়াই উহা দেবপূজাপ্রচারের সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ না থাকিয়া সাহিত্য পদবাচ্য হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত কল্পিত মনসার চরিত্রে একটি নারীচিত্তের হিংস্রবিকৃতিমুখী বিবর্তন মানবিক মনস্তাত্ত্বিক বোধের নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে। বিজয়গুপ্ত এবং নারায়ণদেবের রচনায় চাঁদসদাগরের বীর্যপূর্ণ মহিমা এবং প্রায় সকল মনসামঙ্গলকাব্যের রচনায় বেহুলার কোমল দৃঢ়তা ও সনকার বাৎসল্যবোধ সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মমঙ্গলের রূপরাম ও ঘনরাম বাররমণীদের চিত্রাঙ্কণে দেখাইয়াছেন দক্ষতা, মহামদ পাত্রে ঈর্ষা-ক্রোধতাড়িত ব্যক্তিত্বটিও তাঁহারা জীবন্ত করিয়াছেন স্বল্প আয়োজনেই। মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ মানবরসিক কবি মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র। মুকুন্দরাম কৌতুকরসের সহিত যুক্ত করিয়া ভাঁড়ু, মুরারি, দুর্বলা, লহনা প্রভৃতি সংসারের অতি-পরিচিত নরনারীদেরই অভিনব মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন।

মানবচরিত্রাঙ্কন

সপ্তদশ শতকের শেষভাগেই কবিতায় ধর্মের আবরণ সাধারণভাবে খসিয়া

পড়িবার উপক্রম হইয়াছে বিশেষ করিয়া ঐ মঙ্গলকাব্যেই। রামেশ্বরের শিবায়ণ ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের কথা এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে পড়িবে। শিবায়ণ কাব্যে শিবদেবতার কৃষকমূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে। কৃষকজীবনের একটি বস্তুনিষ্ঠ ছবি এই কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে। শিব-পার্বতী-নারদ-নন্দী এই কয়েকটি পৌরাণিক নাম ছাড়া ধর্মসংক্রান্ত আর কিছুই নাই। এক দরিদ্র কৃষক এবং তাহার পত্নী ও সাঙ্গোপাঙ্গের কাহিনীই এখানে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অন্নদামঙ্গলে সমকালীন সমাজজীবনের ব্যঙ্গবক্র ছবি আঁকিয়াছেন ভারতচন্দ্র। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিতে মুকুন্দরাম-বিজয়গুপ্তাদির রচনাদিতে প্রকাশিত ভক্তিরসেরও বড় স্থান ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ হইতে কাব্যরচনা করিয়াছেন, তবে বিষয়টা মধ্যযুগের প্রচলিত প্রথানুযায়ী ধর্মসম্পৃক্ত। বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়লীলা একান্তভাবেই মানবিক, কালীর মহিমাটি আরোপিত মাত্র। লক্ষণীয় ভারতচন্দ্রের কাব্যের শেষাংশে এবং 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' নামক অপর একটি কাব্যে ধর্মীয় বিষয় পরিহার করিয়া ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বিত হইতে দেখা যায়।

শিবায়ণ—অন্নদামঙ্গল

হিন্দুধর্মের আওতার বাহিরে আরাকানের মুসলমান কবিরা যে কাহিনী-কাব্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখ করা চলে দৌলতকাজী রচিত "লোরচন্দ্রাণী" এবং আলাওলের "পদ্মাবতী"র কথা। যাঁহারা এই কাব্যগুলির মধ্যে, বিশেষতঃ আলাওলে সুফীপ্রভাবের সন্ধান করেন, তাঁহাদের পক্ষে যুক্তি খুব দৃঢ় নয়। এই দুইটি কাব্যই প্রত্যক্ষতঃ ধর্ম-বিবিক্ত, মানবিক রোমান্টিক প্রেমকাহিনীর রূপায়ণ। ইহাদের মধ্যে 'পদ্মাবতী' শিল্পোৎকর্ষে উল্লেখযোগ্য কাব্যহিসাবে সব মহলের প্রশংসা পাইবে।

আরাকানের মুসলমান কবি

বৈষ্ণব পদকর্তারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে তত্ত্বভাবনার বাহনরূপে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন চৈতন্যোত্তর কালে। কিন্তু প্রাক্‌চৈতন্য পদাবলীর চণ্ডীদাসে ইন্দ্রিয়োর্ধ রোম্যান্টিকতার যে সুর ধ্বনিত হইয়াছে উহা ইন্দ্রিয়ভাবনার ঊর্ধ্বচারী বলিয়াই ধর্মসম্পৃক্ত নয়। মানবিক ভাবনার একটি মহলই ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া যায়। সেদিক দিয়া দেখিলেই উহাদের সম্যক রসাস্বাদ করা যাইবে। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধাকৃষ্ণ নামেই দেবমণ্ডলীভুক্ত—চরিত্ররূপে একান্ত লৌকিক। কবি কৃষ্ণচরিত্রে অমার্জিত গ্রাম্য যুবকের জীবন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন। রাধার মধ্যে যৌনমনস্তত্ত্বের যে ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাহা বিশেষভাবেই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণও কবির ন্যায় রাজসভাকেন্দ্রিক নগরজীবনের সহিত জড়িত। তাহাদের মধ্যে দেবত্ব নাই। ভোগবিলাসী নরনারীর প্রসাধিত ও বিদগ্ধ চিত্তের পরিচয় আছে। চৈতন্যোত্তর কবিরা লীলাশুক বৃত্তির অংশরূপেই পদ রচনা করিতেন। রাধা তাঁহাদের নিকট ভগবান কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি। কিন্তু পদরচনায় মানবিক হৃদয়ানুভূতির তরঙ্গ-চাঞ্চল্যই ধরিয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, শেখর প্রভৃতির

বৈষ্ণবসাহিত্য-পদাবলী

কবিতায় তত্ত্বভাবনা মানবরসপুষ্ট বলিয়াই উচ্চশ্রেণীর কাব্যসৌন্দর্য প্রকাশ পাইয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তিই বিশেষভাবে স্মরণ করিতে ইচ্ছা হয়—

সত্য করি কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি দেখেছিলে এই প্রেমচ্ছবি?
কোথা তুমি শুনেছিলে এই প্রেমগান?

তাঁহারা যে মানবজীবনেই এই চিত্র দেখিয়াছিলেন, এই গান শুনিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কবিরা তত্ত্বের ভাবনাই ভাবিয়াছেন, মানবজীবনের গভীরে প্রবেশ করিতে চান নাই, তাঁহারা ব্যর্থ হইয়াছেন।

চরিতকাব্য

বিশেষ করিয়া জীবনচরিতগ্রন্থ রচনায় বৈষ্ণব কবিরা মানুষকে অবলম্বন করিয়া, তাহার তথ্যপূর্ণ জীবনকাহিনীর অনুসরণ করিয়া যে মানবরস-রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার অভিনবত্ব অবশ্য স্বীকার্য। চৈতন্যচরিতে তাঁহাকে দেবত্বে উন্নীত করা হইলেও তাঁহার মানবরূপ কোথাও অপ্রকাশিত থাকে নাই।

এই ভাবে মৌলিক কাব্যসাধনার বিভিন্ন শাখায় বাঙালী কবিরা মানবরসকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, দেবমাহাত্ম্য পটভূমিতে পর্যবসিত হইয়াছে।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রূপরীতি, দেহগঠন ও প্রসাধনকলা

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসাহিত্য গবেষক ও ইতিহাসবিদ্‌দের কাছে মূল্যবান। কিন্তু সাহিত্যসৌকর্যের দিক হইতে ইহার মধ্যে স্বাদযোগ্য অংশ কতটুকু আছে? সেকালের বাঙালী কবিরা কবিতার দেহগঠন, শব্দচিত্রনির্মাণ, অলংকরণ প্রভৃতির উপরে কতটা জোর দিয়াছেন, কাব্যকে রূপোজ্জ্বল করিবার জন্য কি পরিমাণ চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

ভূমিকা

সাহিত্যের মূল্য উপকরণ-সংগ্রহে নয়, বিষয়বস্তুর গৌরবে নয়, ভাবের মাহাত্ম্যেও নয়—ভাবকে ভাষায় রূপ দিতে হইবে যাহাতে সেই রূপ পাঠকহৃদয়ে রসের সঞ্চার করিতে পারে। স্বভাবকবিত্ব এবং অবহেলাভরে কাব্য রচনার যে-কথা প্রায়ই শুনা যায় উহা ভাবালুতাপূর্ণ উক্তি ছাড়া কিছুই নয়। পৃথিবীর সব ভালো কবিই দক্ষ রূপশিল্পী। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রূপনির্মাণের কোনোরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কিনা এবং তাহার মধ্য দিয়া সেকালের কাব্যের শিল্পমূল্য নির্দেশ করা সম্ভব কিনা উহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে প্রধানতঃ চারটি কাব্যরীতির প্রচলন দেখা যায়: (১) পদসাহিত্য বা গীতিকবিতা। সেকালের পদসাহিত্য আধুনিক লিরিক হইতে রূপে ও স্বাদে স্বতন্ত্র। আধুনিক লিরিকে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের নিভৃত বেদনার দীর্ঘশ্বাসটি শোনা যায়। সেকালের পদসাহিত্যে কবির ব্যক্তি-আত্মার প্রকাশ ঘটে নাই। কারণ সেকালের সমাজ-পরিবেশে কবিদের ব্যক্তিচেতনার (individuality) বিকাশ ঘটিবার বড় সুযোগ ছিল না। পুরাতন পদসাহিত্যে মানবিক ভাবোচ্ছ্বাস এবং কাহিনীবিবিক্ত আবেগ-উপলব্ধি প্রকাশ পাইত। কিন্তু উহার পশ্চাতে পৌরাণিক কাহিনীর একটি পটভূমি থাকিত। যেমন বৈষ্ণব পদসাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়োচ্ছ্বাসের ভাষারূপ, কখনো কখনো যশোদার বাৎসল্যের আবেগ। শাক্ত পদসাহিত্যের উমাসংগীতে মেলে মেনকা ও উমার বাৎসল্যের উচ্ছ্বাস। আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রকাশই কবিদের এখানে লক্ষ্য, কিন্তু উহা বিশিষ্ট পৌরাণিক পাত্রপাত্রীদের—রাধাকৃষ্ণ, যশোদা, মেনকা, উমা প্রভৃতির; কবিদের ব্যক্তি-আত্মা পরোক্ষভাবে উহার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিত মাত্র, আধুনিক লিরিকের ন্যায় সোজাসুজি নিজেকে উপস্থিত করিতে পারিত না। কতকগুলি সাধন-বিষয়ক কবিতায় (যেমন বাউলগান, দেহতত্ত্ব-পদ, শ্যামাসংগীত) কবিরা নিজেদের ভক্তিভাবের কথাই বলেন, কিন্তু সেখানেও কবিদের সাম্প্রদায়িক বোধ যতটা প্রকট, একান্ত ব্যক্তিচেতনা ততটা প্রকাশিত নয়।

পদসাহিত্য : লিরিক-রীতি

মধ্যযুগের দ্বিতীয় প্রধান কাব্যরীতিটি পাঁচালি নামে পরিচিত। পাঁচালি হইল আখ্যানকাব্যের আঙ্গিক। ঘটনার বিবরণ, পাত্রপাত্রীর চরিত্র ও সংলাপ এবং বর্ণনা—এই তিনের সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিত এই জাতীয় কাব্য। ইহার দুইটি স্বতন্ত্র রূপ আমরা দেখিতে পাই। একটি অনুবাদধর্মী, অপরটি মৌলিক। রামায়ণ মহাভারত ভাগবতপুরাণের অনুবাদের মধ্য দিয়া বাংলাভাষা কাহিনীনির্মাণের কঠিন কার্যে শিক্ষা লাভ করে। মঙ্গলকাব্যগুলি মধ্যযুগের মৌলিক পাঁচালিকাব্যের মধ্যে প্রধান। বাংলা সাহিত্যে মোটামুটি চার-পাঁচটি মৌলিক কাহিনী দান করিয়াছে মঙ্গলকাব্যধারা। ইহাদের কাহিনীবিন্যাসরীতিতে একটা সুনির্দিষ্ট গঠননৈপুণ্য লাভ করিয়াছে। মনসামঙ্গলে বিরোধী ঘটনার সুতীব্র সংঘর্ষে কাহিনীটি বিকশিত হইয়াছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে ব্যক্তিগত বীর্যসাধনার উদাহরণস্বরূপ 'অ্যাডভেঞ্চার' ও যুদ্ধমূলক অনেকগুলি ঘটনা এক-সূত্রে বাঁধা হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে পরিবারতন্ত্রের চিত্র-সুনিবিড় ঐক্য বা সুনিপুণ গ্রন্থন লক্ষ্য করা যায় না। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি উদ্দেশ্যের ছাঁচে ফেলিয়া গড়া। তাই তাহাদের মধ্যে নিপুণ কাহিনীগ্রন্থনজাত যে রসোপভোগের সুযোগ ছিল তাহা অনেকটা ব্যাহত হইয়াছে। কাহিনীগুলি শেষ পর্যন্ত উদ্দিষ্ট দেবতার পূজায় সমাপ্ত। ফলে গল্পের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হইত প্রায়ই। যেমন

পাঁচালি কাব্যরীতি

চাঁদসদাগরকে দিয়া মনসার পূজা করানো, ঘটনাবিকাশ এবং চাঁদচরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতির ফল নয়। কখনো আবার গল্পের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও বাহির হইতে জোর করিয়া একটি দেবমাহাত্ম্য চাপাইয়া দেওয়া হইত: যেমন বিদ্যাসুন্দরের কালীর গৌরবখ্যাপনে। ইহাতে গল্পের স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যাইত। তাহা ছাড়া অধিকাংশ মৌলিক গল্পের মধ্যেই পুরাণ হইতে সংকলিত নানা কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইত। মঙ্গলকাব্য ছাড়া রোম্যান্টিক প্রণয়-আখ্যানগুলিও লক্ষ্য করিবার মতো। আলাওল-দৌলত কাজীর কাব্য-দুইটি মঙ্গলকাব্যের বাঁধাধরা রীতি-পদ্ধতির বাহিরের বলিয়া অনেকটা পরিচ্ছন্ন। মঙ্গলকাব্যসুলভ গতানুগতিকতা এখানে দেখা যায় না।

মঙ্গলকাব্যগঠনে গতানুগতিকতা অত্যন্ত প্রকট। ইহার আঙ্গিক বিষয়ে এমন একটা প্যাটার্ণ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যাহাতে গল্পরস বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইত এবং কবিপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্যও প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ পাইত না। প্রথমেই নানা দেবদেবীর সুদীর্ঘ বন্দনা, তাহার পরে কবির আত্মজীবনী এবং দেবীর আদেশে কাব্যরচনার বিবরণ, সৃষ্টিপত্তন, দেবতাদের স্বর্গলীলা, ছোটোখাটো কোনো দেবতাকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্যভূমিতে পূজা প্রচারের জন্য প্রেরণ। অখণ্ড কাহিনীর চারিপাশে সমাজজীবনের তথ্যসমৃদ্ধ বাস্তব ছবি, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বিচিত্র ধর্মীয় লৌকিক অনুষ্ঠানের বিবরণ, স্ত্রী-আচার প্রভৃতি থাকিবেই। তাহা ছাড়া নারীগণের পতিনিন্দা, চৌতিশা বা চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণের আদ্যাক্ষরসহযোগে রচিত দেবস্তুতি, বারমাস্যা প্রভৃতি ছাড়া মঙ্গলকাব্য গঠিতই হইত না। সর্বোপরি খণ্ড খণ্ড পালাগানের আকারে মঙ্গলকাব্য জনসমাজে পরিবেশিত হইত। পালাগুলি বহুক্ষেত্রে এরূপ বিস্তার লাভ করিত যে, পারস্পরিক গ্রন্থনজাত নিবিড় ঐক্য বহুক্ষেত্রে খণ্ডিত হইত। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে চাঁদমনসার সংঘাতের কাহিনীটি অন্যতম পালারূপে একান্ত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের রীতিতে প্যাটার্ণের আধিক্য

নাটগীতিকে সেকালের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রূপরীতিরূপে গ্রহণ করা চলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছাড়া এরূপ আঙ্গিকের অন্য কোনো রচনা পাওয়া না গেলেও কৃষ্ণলীলাত্মক অনেক পালায় এবং পূর্ববর্তী বাঙালী কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে ইহার নিদর্শন রহিয়াছে। এখানে আখ্যান গীতিসংলাপের মাধ্যমে বিকশিত। চণ্ডী যাত্রার। সংলাপই মুখ্য স্থান অধিকার করে। তবে সে-সংলাপ গীতাত্মক। এই রীতির চর্চা বেশী হয় নাই। হইলে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য রূপরীতির দিক হইতে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিত। গীতিসংলাপেও নাটকীয় সংঘাতের রস বেশ জমিয়া উঠিতে দেখি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে।

নাটগীতি

মধ্যযুগের বাংলাকাব্যের চতুর্থ রূপরীতিটিকে বলা যায় আবৃত্তিযোগ্য কড়চা-নিবন্ধ।

এগুলি সাধনসংক্রান্ত গদ্যপদ্যমিশ্রিত নির্দেশ এবং প্রধানতঃ তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ—ঠিক সাহিত্যপদবাচ্য নয়। চৈতন্যদেবের জীবনী ও দর্শনসংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতকে কড়চা-নিবন্ধশ্রেণীর উচ্চাঙ্গের সাহিত্যগ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করা চলে। তবে তাহা রসসাহিত্য নয়, মননসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। যুক্তি তর্ক প্রমাণ—তথ্যসাক্ষ্যাদির নিপুণ এবং বহুল উপস্থাপনায়, ব্যাখ্যায় এবং বিশ্লেষণে মননসাহিত্যের আঙ্গিকে ইহার স্থান খুবই উচ্চে।

কড়চা-নিবন্ধ

ভাষাসচেতনতা এবং অলংকারপ্রয়োগের কথায় আসিলে লক্ষ্য করিতে হইবে, গোটা মধ্যযুগে এই প্রবৃত্তির কোনোরূপ ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন ঘটিয়াছে কিনা, বিশেষ বিশেষ শাখার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কিনা, শিল্পীব্যক্তিত্বের বিশেষ প্রবণতার প্রতিফলন প্রসাধনের উপরে কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা ভাষা, অলংকরণ প্রভৃতির বিচার করিবার কয়েকটি দিক আছে। ধরা যাক শব্দচয়ন এবং শব্দনির্মাণের কথা। কবি কোন্ জাতীয় শব্দের প্রতি বেশী আকৃষ্ট; কবির অবলম্বিত বিষয়বস্তুর সহিত উহার সামঞ্জস্য; কবিকৃত নূতন শব্দনির্মাণ—উহার তাৎপর্য এবং শিল্পগত সাফল্য; পদবন্ধ রচনায় শিল্পীর বিশিষ্টতা; শব্দচিত্র বা image গঠনের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সমস্যার বিশ্লেষণ করিতে হইবে। অতঃপর অলংকার-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রথানুগ অথবা নূতন অলংকরণের প্রতি অধিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোনো কোনো কবি শব্দালংকারের ধ্বনি-ঝংকারেই মুগ্ধ, কেহ আবার অর্থালংকার চিত্রলোকের পক্ষপাতী, কেহ কেহ বাচন-চাতুর্য ও বৈদগ্ধ্য প্রকাশের জন্যই অলংকার ব্যবহার করেন। এইভাবে আলোচনা করিলেই অলংকার প্রয়োগের মধ্য দিয়া শিল্পীপ্রতিভার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব হইবে। সংস্কৃত অলংকার বিচাররীতিতে শুধুই বিভিন্ন ধরনের অলংকারের নামের তালিকা। বিস্তারিত তালিকা রচনা করিয়া কাব্যসৌন্দর্যের কোনোরূপ রহস্যই ভেদ করা যায় না।

ভাষাসচেতনতা ও অলংকার প্রয়োগ

মঙ্গলকাব্যের বিচারে যদি প্রসাধনকলার এই দিকটি গ্রহণ করি, তাহা হইলে দেখা যাইবে শব্দচিত্ররচনায় কবিরা সর্বাপেক্ষা কম আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। যে সব প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চিত্ররচনার সুযোগ রহিয়াছে, সেখানেও মঙ্গলকাব্যের কবিরা নামের তালিকা রচনা করিয়া চলিয়াছেন: যেমন কালকেতু বন কাটিয়া নগর বসাইতেছে—সেখানে গহন অরণ্যের ভাষাচিত্র ফুটাইয়া তোলার চেষ্টা বড় করেন নাই কবিরা, নানাবিধ বৃক্ষের সুদীর্ঘ তালিকা উপস্থিত করিয়াছেন। চাঁদ নৌকা সাজাইয়া বাণিজ্যে চলিয়াছে, নৌকার নাম আছে—যাত্রার মনোরম ছবি নাই। পুষ্পবনে প্রবেশ করিলে ফুলের শোভা চোখে পড়ে না, জানা অজানা অজস্র ফুলের নাম শোনা

মঙ্গলকাব্যে শব্দচিত্রের অভাব

যায়। সাধারণভাবে বর্ণনার দিকেই মঙ্গলকবিদের আগ্রহ কম। আখ্যানকাব্যে যদি ঘটনার সহিত সংলাপ ও বর্ণনার সাযুজ্য বিধান করা না যায়, তাহা হইলে উহা আকর্ষণীয় হয় না, শিল্পোৎকর্ষ লাভ করে না। মঙ্গলকাব্যে নারীদেহের রূপবর্ণনার চেষ্টা মাঝে মাঝে করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্যাদিতে বহুল ব্যবহৃত অলংকারাদির চর্বিত চর্বণ করা হইয়াছে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের কোনো কোনো অংশ যে একান্ত জীর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। মঙ্গলকাব্যে নারীদেহের বর্ণনায় হস্তীসদৃশ গতি, পর্বতসদৃশ কুচযুগ, মেদিনীর ন্যায় নিতম্ব—এইরূপ উপমা বারবার ব্যবহার করা হইয়াছে। এই জাতীয় উপমা কোনোরূপ নয়নানন্দকর চিত্রের জন্ম দেয় না। এই সব অলংকরণে বিশেষভাবেই বস্তু হইতে ভাবকে ছাঁকিয়া বাহির করিবার চেষ্টা আছে। এ হেন Abstraction কাব্যশিল্পের পক্ষে হানিকর। মঙ্গলকাব্যের ভাবকল্পনা এবং জীবনরূপনির্মিতিতে যে লোকজীবনের কথা বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে, রূপনির্মাণে তাহার একান্ত অভাব চোখে পড়ে। অলংকারাদির চয়নে, শব্দপ্রয়োগে কবিরা প্রথম দিকে কখনো কখনো কচিৎ লোকজীবনের প্রতি সহজ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিমাত্রায় সংস্কৃতভাষার ঋণগ্রহণ লক্ষ্য করিবার মতো বৈশিষ্ট্য। বিজয়গুপ্তের ন্যায় পুরাতন কবিরা কখনো কখনো "ব্যাধের হাতে পড়ি যেন পক্ষীর কিলকিলি"র ন্যায় লৌকিক উপমাদি ব্যবহার করিয়া কাব্যরূপে প্রাণের সঞ্চার করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহার উদাহরণ বড় বেশী নয়। মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর মুকুন্দরাম অবশ্য সংস্কৃতানুগ এবং লোকসংস্কারজাত দু'ধরনের অলংকারই ব্যবহার করিয়াছেন, সেক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতাজাত অলংকারগুলি অনেক বেশি প্রাণবন্ত। মুকুন্দরাম শক্তিমান কবি বলিয়াই পাঠকমনে চিত্রকল্পের প্রভাব যে গুরুতর, সেকথা জানেন এবং তালিকানির্মাণের মঙ্গলকাব্যিক প্রথার বন্ধনের অন্তরালেও মাঝে মাঝে ভাষাচিত্র রচনায় সফলতাও দেখাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি লোকজীবন হইতে কাব্যের উপাদান সংকলন করিয়াছিলেন। ভাবকল্পনা এবং চরিত্রচিত্রণ সব-কিছুই গ্রামজীবনের সঙ্গে সম্বদ্ধ। কবি কিন্তু ভাষা ও

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অলংকরণ ও ভাষাভঙ্গি

অলংকার ব্যবহারে সংস্কৃত রীতির প্রতি যথেষ্ট আনুগত্য দেখাইয়াছেন। মাঝে মাঝে তাহা ব্যবহারজীর্ণ, মাঝে মাঝে তাহাতে চিত্ররূপও সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। তবে কবি "মাকড়ের হাতে যেহ্ঝুনা নারিকেল", "রাঅ কাড়ে যেন বোকা ছাগ" প্রভৃতি একান্ত লোকজাত অলংকার এবং "খোড়াচুলা" কাঙ্গাই জাতীয় বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করিয়া যেমন একদিকে মৌলিক শব্দচেতনা ও অলংকারনির্মিতির পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ কাব্যটির প্রাণবস্তুকেও সংস্কৃতানুগ ভাষাব্যূহের কৃত্রিমতা হইতে অনেকটা রক্ষা করিয়াছেন।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবিতায় সংস্কৃতানুগ ভাবাবিন্যাসের প্রাধান্য ছিল কম। তৎসম শব্দের আধিক্য এবং কাব্যদেহের সংস্কৃত আদর্শে পরিমার্জনা চৈতন্যপ্রভাব কালের

বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন সাহিত্যের গবেষকেরা কালনির্ণয় করিতে গিয়া প্রায়ই ভাষাগত মার্জনার অভাব দেখিয়া অধিকতর পুরাতন রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনায় ভাষা ও অলংকারের প্রয়োগে লেখকেরা বেশী সচেতনতা দেখাইয়া থাকেন। চৈতন্যযুগের অবসানের পরে বাংলাদেশের সামাজিক জীবন যখন নানাবিধ সমস্যায় অবক্ষয়িত হইতে লাগিল, জাতির মানসিক স্বাস্থ্য যখন ভাঙিয়া পড়িল, তখন বহিরঙ্গ প্রসাধনকলার প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ দেখা গেল। শিল্পরূপ না থাকিলে ভাবের গভীরতা এবং উচ্চতাও যেমন কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না, কাব্যের ভাবকল্পনার সহিত উহার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়িয়া না উঠিলে বাহিরের প্রসাধনের চাকচিক্যে চোখ ধাঁধাইয়া দেওয়াও রচনার অন্তঃসারশূন্যতার পরিচায়ক। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে অষ্টাদশ শতকের এইরূপ প্রসাধননৈপুণ্য এবং ভাবকল্পনার দৈন্য যুগপৎ দেখা দেয়। এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যকে অনেক সমালোচক "ভাষাশিল্পের তাজমহল" আখ্যা দিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ ছিলেন, শব্দচিত্রনির্মাণে তিনি সেকালের পক্ষে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহা ছাড়া ভারতচন্দ্রই সংস্কৃত ছন্দভাণ্ডার হইতে নানাবিধ নূতন ছন্দকে বাংলা ভাষায় আমন্ত্রণ জানাইলেন। ইহার ফলে বাংলা উচ্চারণরীতির কিছুটা পরিবর্তন করিয়া লইতে হইল। ছন্দবিষয়ে এইরূপ ঋণগ্রহণের রীতি বাংলা ভাষায় স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; কারণ উচ্চারণে কিছুটা বিকৃতি না ঘটাইয়া এইরূপ ছন্দের ভঙ্গি আয়ত্ত করা যায় না। কিন্তু ভারতচন্দ্র ইহার সাহায্যে তাহার কাব্যের রূপে বিশেষ বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কতকটা সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন।

ভাষা ও অলংকাররীতির উপরে যুগের প্রভাব

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সাধারণ স্তরের কবিরা গতানুগতিক ভাব তথা রূপকে একান্ত মামুলী ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিরা রূপরীতির ক্ষেত্রেও বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। অলংকার প্রয়োগাদির ক্ষেত্রে তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পদাবলীর কয়েকজন কবির রচনা ব্যক্তিগত প্রবণতায় এবং প্রতিভার স্পর্শে অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। বিদ্যাপতির কবিতায় আমরা দেখি অলংকরণের বহুলতা। তিনি অর্থালংকারে বহুবর্ণখচিত ঐশ্বর্য-ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণ চিত্র দ্বারা আপনার কবিতা পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় তির্যক বৈদগ্ধ্যপূর্ণ অলংকরণ প্রয়োগও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উহার বক্রিমদৃপ্ত আস্বাদ বিদ্যাপতির জীবনদৃষ্টির চমৎকার প্রতিফলন। চণ্ডীদাস সোজাসুজি চিত্র আঁকিয়াছেন—অলংকারের ব্যবহার অত্যন্ত কম। তাঁহার চিত্রগুলি ভাবগর্ভ এবং ব্যঞ্জনাময়। রূপাতীত লোকেই যেন উহাদের যাত্রা। গোবিন্দদাসের কবিতায় অর্থালংকারে চিত্রকল্পনা চমৎকার ফুটিয়াছে কিন্তু আবার শেখরের কবিতায় দেখি শব্দের

বৈষ্ণব পদাবলীতে রূপসাফল্যের সাধনা

ঝংকারের সমারোহ। তিনিও ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন শব্দসজ্জার সাহায্যে। জ্ঞানদাসের কবিতায় রূপনির্মাণ চিত্রের সীমানা ছাপাইয়া যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

শাক্তপদাবলী-রূপককবিতা

শাক্তপদাবলীতে রূপককে বিশেষভাবে আশ্রয় করা হইয়াছে। রূপকের ছবিগুলি পরিচিত লোকজীবন হইতে সংকলিত। অন্তরালে তত্ত্ব থাকিলেও এই কারণেই তাহার মধ্যে জীবনতরঙ্গ অনুভব করা যায়।

সমগ্রতঃ বলা যায়, রূপচেতনায় বাংলার মধ্যযুগের কবিতা একান্ত দীন ছিল না। নানাবিধ দুর্বলতা-সত্ত্বেও তাহার সাফল্যের পরিমাণ একেবারেই অনুল্লেখ্য নয়।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সাময়িক পত্রের ভূমিকা

মধ্যযুগে ইউরোপে এবং আমাদের দেশে প্রধানতঃ তিনটি কেন্দ্র হইতে সাহিত্য সৃষ্টির আনুকূল্য করা হইত: (১) রাজদরবারের সহায়তা, অমাত্যবর্গের উৎসাহ এবং অর্থনৈতিক সাহায্য সাহিত্যসৃজনের পথ সুগম করিত। (২) মধ্যযুগে জনজীবনে ধর্ম এবং ধর্মসঙ্ঘের গুরুতর প্রভাব ছিল। দেশে শক্তিশালী সঙ্ঘারাম, ধর্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। সেই প্রেরণার বশবর্তী হইয়া, তাহারই আনুকূল্যে প্রভূত পরিমাণ সাহিত্য রচিত হইয়াছে। (৩) একান্তভাবে লৌকিক প্রেরণাও সাহিত্যের একটি সুবিস্তৃত শাখার জন্ম দিয়াছিল। সাহিত্যপাঠকবর্গের নিকট পৌছাইয়া দিবার সহজ সুযোগও পূর্বোক্ত প্রেরণাস্থলগুলির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।

ভূমিকা—আধুনিক সমাজ-জীবনে সাময়িক পত্রের প্রভাব

তাহা কোনরূপ স্বতন্ত্র সমস্যার সৃষ্টি করে নাই। আধুনিক কালে পুরাতন প্রেরণাস্থলগুলি শক্তিহীন হইয়া পড়িল। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার পরিমাণ বাড়িয়া গেল। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ঘটিল। এই কয়টি কারণে সাহিত্যসৃষ্টির পটভূমি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। গ্রন্থাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং সাময়িক পত্রের প্রকাশও বৃদ্ধি পাইল। উহাদের ক্রেতৃবর্গই সাহিত্যের অর্থনৈতিক আনুকূল্য করিতে লাগিল। বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব্যসাহিত্যের উদ্ভব ঘটিবার কালে সাময়িকপত্র একটি গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

মুদ্রাযন্ত্রের দুইটি দান সাহিত্যজগতে গুরুত্বপূর্ণ: (১) গ্রন্থ প্রকাশ; (২) সাময়িকপত্র প্রকাশ। এই দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও কিছু পার্থক্যও আছে। গ্রন্থ একজনের রচনা। এক ধরনের রচনা। ইহা একটি একক চেষ্টা। পাঠকের মনে এক ধরনের রসসৃজন করে। সাময়িকপত্র একটি প্রতিষ্ঠান। নানাধরনের রচনার সংকলন। তাহা ছাড়া সাময়িকপত্রের মূল্যও অল্প। এই কারণে সাময়িকপত্রের সাহায্যে জনসাধারণের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। অবশ্য ইহাদের একের

গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র

কাজ অপরের দ্বারা সাধিত হয় না। একটিকে অপরটির পরিপূরক বলা যায়। তবে সাময়িকপত্র নানা কারণে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের উপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে অল্পকালের মধ্যে।

বাংলা গদ্যভাষা সাহিত্যিক রূপ পাইতে আরম্ভ করিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

গদ্যভাষার বিবর্তন—জনসংযোগ

স্কুল বুক সোসাইটির চেষ্টায় স্কুলপাঠ্য বাংলা গ্রন্থ গদ্যরীতিকে সুনির্দিষ্ট আকৃতি দিতেছিল। কিন্তু স্কুল-কলেজের সীমাবদ্ধতা হইতে সাময়িক পত্রই প্রথম বাংলা গদ্যরীতিকে ব্যাপক জনসাধারণের নিকট লইয়া গেল। ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থের ভাষা এবং জনসাধারণের জন্য লিখিত সাময়িকপত্রের ভাষা যে পৃথক হইবে—অন্ততঃপক্ষে ভাষাগঠনের সেই প্রথম যুগে তাহাতে সন্দেহ নাই। সাময়িক পত্রের ভাষা যে তুলনামূলকভাবে অনেক প্রগতিশীল ইহা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সমাচারদর্পণ, সম্বাদকৌমুদীর ন্যায় পত্রিকা প্রথম যুগের বাংলা গদ্যকে ব্যাপকতর পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইহার ফলে ভাষার শক্তি ও সারল্য যে বৃদ্ধি পাইল তাহা সুনিশ্চিত। পরবর্তীকালেও আমরা দেখিয়াছি ভাষাকে সহজ করিবার জন্য, সর্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া তুলিবার জন্য অকারণ সংস্কৃতবাহুল্য ও কাঠিন্য দূর করিবার প্রশ্নে সাময়িকপত্রই বিশেষ সহায়তা

ভাষার সারল্য বিধানে ভূমিকা

করিয়াছে। রাধানাথ সিকদার এবং প্যারীচাঁদ মিত্র "মাসিকপত্র" নামে একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পত্রিকাটির প্রধান লক্ষ্যই ছিল ভাষাকে সংস্কৃতানুগত্য হইতে মুক্ত করিয়া স্ত্রীলোক এবং বালকদের বোধগম্য করিয়া তোলা। "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থ বাংলার ভাষাসংস্কারে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, "মাসিকপত্রে"র আন্দোলন তাহার সাহচর্য করিয়াছে বেশ সামর্থ্যের সঙ্গে। বিংশ শতাব্দীতেও আমরা দেখিতে পাই, লঘু এবং মননগম্ভীর সর্ববিধ রচনায় চলিত গদ্যের প্রবর্তন প্রমথ চৌধুরীর "সবুজপত্রে"র দ্বারা অনেকাংশে সাধিত হইয়াছে। বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তনের ইতিহাস কয়েকটি সাময়িক পত্রের ভূমিকার দ্বারা চিহ্নিত: (১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। সংস্কৃতানুগ সাধুরীতির গদ্যভাষার প্রতিষ্ঠার দিকচিহ্নস্বরূপ। (২) মাসিক পত্রিকা। সহজ সরল কথ্যরীতির অনুগামী। (৩) বঙ্গদর্শন পত্রিকা। সাধু কথ্যরীতির মিশ্রণের চেষ্টা। (৪) ভারতী ও সাধনা পত্রিকা সাধু কাঠামোয় চলিত রীতির প্রাধান্যের সূচনা। (৫) সবুজপত্র। চলিত রীতির পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

সাহিত্যজগতে ভাবের, চিন্তার ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সাময়িক পত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। Popular Literature অর্থাৎ জনসাধারণের জন্য সাহিত্য রচনার প্রয়োজন লইয়া যত আন্দোলন হইয়াছে, তাহার মধ্যে "বিবিধার্থ-সংগ্রহে"র ন্যায় পত্রিকার ভূমিকা সবাপেক্ষা বেশী কার্যকর হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম এবং হিন্দুধর্মের বিরোধ, বিভিন্ন সমাজসংস্কার আন্দোলন লইয়া বিপরীত মতের সংঘর্ষ সাময়িক

পত্রগুলিকে কেন্দ্র করিয়া সেকালে বিশেষভাবেই তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাষাগ ধারা পরিবর্তনে কতকগুলি সাময়িক পত্রের ভূমিকার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র গুরুত্বের কথা, নব্য হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে "প্রচার"

ভাবের আন্দোলন ও সাময়িক পত্র

পত্রিকার ভূমিকা, "নারায়ণ" পত্রিকার স্বাদেশিকতা প্রচারচেষ্টার কথা এ-বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক কালে "পরিচয়" পত্রিকাটি বেশ কিছুকাল ধরিয়া নিষ্ঠার সহিত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করিয়া আসিতেছে। রাষ্ট্রনীতি-সমাজনীতি বিষয়ক মতামত প্রচারের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যঘটিত নব্য ভাবনা প্রকাশ করিবার ব্যাপারেও নানা পত্রিকা নানারূপ প্রভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। আধুনিক কালের "কল্লোল" পত্রিকা যেমন জটিল জীবনবোধ ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাসমন্বিত মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবটি বাংলা সাহিত্যে বহমান করিতে চাহিয়াছিল, তেমনি "শনিবারের চিঠি"র ন্যায় পত্রিকা রক্ষণশীল ভাবধারা বহমান রাখিতে চাহিয়াছে। "সবুজপত্র"কে কেন্দ্র করিয়া বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, রোম্যান্টিক ভাবধারা বিরোধী একটি তীক্ষ্ণ মার্জিত সাহিত্যদৃষ্টির চর্চা চলিয়াছে। অপরপক্ষে "সাহিত্য" "নারায়ণ" প্রভৃতি পত্রিকা ভাষায় ও ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর ধারাই বহন করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিল। "সাহিত্য", 'নারায়ণ', "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি পত্রিকা রবীন্দ্রকেন্দ্রিক ভাবধারার, রোমান্টিক ভাবাতিরেক, অতিমাত্রায় Subjectivity এবং রহস্যনিগূঢ়তার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। অপর দিকে "প্রবাসী", "সবুজপত্র" প্রভৃতি পত্রিকা রবীন্দ্রসমর্থনে দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য, সমকালীন ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলিও এ ব্যাপারে নীরব রহিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ বিশিষ্ট বিশিষ্ট পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া, বিশেষ বিশেষ ভাবধারা বিকশিত হইয়া উঠিত এবং বিরোধী পত্রিকাগুলির সংঘর্ষে সাহিত্য বহুমুখী বিকাশে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা দেখা দিয়াছে যাহাদের সহিত সম্পৃক্ত না করিয়া বিশেষ কয়েকজন সাহিত্যিকের কথা ভাবাই যায় না। আমরা সংক্ষেপে তালিকার আকারে তাহার উল্লেখ করিলাম : রামমোহন রায়—সম্বাদকৌমুদী। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—সংবাদ-প্রভাকর। অক্ষয়কুমার দত্ত—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। মধুসূদন দত্ত—বিবিধার্থসংগ্রহ

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাময়িক পত্রের সম্পর্ক

পত্রিকা। কালীপ্রসন্ন সিংহ—বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা। ভূদেব মুখোপাধ্যায়—এডুকেশন গেজেট। রাজেন্দ্রলাল মিত্র—বিবিধার্থসংগ্রহ পত্রিকা, রহস্যসন্দর্ভ পত্রিকা। প্যারীচাঁদ মিত্র—মাসিক পত্রিকা। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বসু—বঙ্গবাসী পত্রিকা। বিহারীলাল চক্রবর্তী—অবোধবন্ধু পত্রিকা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গদর্শন পত্রিকা, প্রচার। স্বর্ণকুমারী দেবী—ভারতী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—হিতবাদী, ভারতী, বালক, সাধনা, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র, প্রবাসী।

প্রমথ চৌধুরী—সবুজপত্র। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—সাহিত্য। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—যমুনা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—ভারতবর্ষ। জলধর সেন—ভারতবর্ষ। উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়—বিচিত্রা। নজরুল ইসলাম—ধূমকেতু। সজনীকান্ত দাস—শনিবারের চিঠি। আরও অনেক সাহিত্যিক এবং তাঁহাদের সম্পর্কিত সাময়িক পত্রের নামোল্লেখ করিয়া তালিকাটিকে আরও অনেক দীর্ঘ করা যাইত। আমরা শুধু প্রধান লেখকদের এবং মুখ্য সাময়িকপত্রগুলির কথাই বলিলাম। ইঁহাদের অনেকের সাহিত্য-প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইত না, যদি ঐ সাময়িক পত্রগুলির সমর্থন এবং অবাধ আনুকূল্য ইঁহারা লাভ না করিতেন। আবার অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্র শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায়ও অভিষিক্ত হইতে পারিত না। বঙ্গদর্শন পত্রিকাটির প্রকাশ বঙ্কিমের দ্বিতীয় পর্বের সামাজিক উপন্যাসগুলির রচনার সহিত একই সুরে বাঁধা। বিশেষ করিয়া বঙ্গদর্শনের মাসিক জঠর পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে "বিবিধ প্রবন্ধ" "লোকরহস্য" "কমলাকান্তে"র ন্যায় গ্রন্থ লিখিতে হইয়াছে। অবিশ্রান্ত দ্রুত তালে উপন্যাস রচনার তাগিদ বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় এমন অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের জন্ম দিয়াছে, বাংলা সাহিত্যে যাহাদের মূল্য অপরিসীম। হিতবাদী-সাধনা-সবুজপত্র রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পরচনার অন্যতম কারণ, কিন্তু তাই বলিয়া সেই ছোটো গল্পগুলি ফরমায়েসী রচনা হইয়া থাকে নাই। উহাদের শিল্পোৎকর্ষ বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময়ের বস্তু।

সমালোচনা-সাহিত্যের বিকাশ

সমালোচনার জন্য দুই-একটি সূত্র নানা দিকে দেখা গেলেও সাময়িকপত্রে পুস্তক সমালোচনার মধ্যেই উহার প্রকৃত বিকাশ দেখা গেল। "বিবিধার্থসংগ্রহ" এই দিক দিয়া পথ প্রদর্শন করিল। "সোমপ্রকাশ," রহস্য-সন্দর্ভ," "বঙ্গদর্শন", "এডুকেশন গেজেট" এবং পরবর্তী সব কয়টি সাময়িক পত্র নূতন পুস্তকের পরিচয়-প্রসঙ্গে সমালোচনার ধারাটি প্রবহমান রাখিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া উহা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। শুধু সমালোচনা-সাহিত্যের বিকাশের জন্যই ইহার মূল্য নয়, সৃজনশীল সাহিত্যের উপরও ইহার গুরুতর প্রভাব বর্তাইল। উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রতিটি গ্রন্থের সমালোচনা পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হওয়ায় লেখকেরা উৎসাহ বোধ করিতে লাগিলেন। মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টির ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় তাঁহার প্রতিটি রচনাকে কেন্দ্র করিয়া সমকালীন একাধিক পত্রপত্রিকা সোৎসাহ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইত। সেই উৎসাহের উত্তাপ কবির সৃষ্টির প্রদীপটিকে জ্বালাইয়া রাখিতে সাহায্য করিত। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটিয়াছে। তুলনামূলকভাবে হেমচন্দ্রের ন্যায় অনেক দুর্বল লেখকও সাময়িকপত্রের প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ হইয়া অবিশ্রান্ত কাব্য রচনা করিয়া চলিয়াছেন।

সাহিত্যসৃজন একক ব্যাপার। কিন্তু ভাবাদর্শ, রূপচেতনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য,

সাহিত্যের লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ে সমাজে সাহিত্যের ভূমিকা সম্বন্ধে সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতে এদেশে এবং বিদেশে উভয়ত: দেখা যায়। ইহার ফলে সাহিত্যজগতে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও ইতিহাসের উপরে এরূপ কোনো কোনো গোষ্ঠী প্রভাবও ফেলে। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"কে কেন্দ্র করিয়া এরূপ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রথম লক্ষ্য করা যায়। অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রিকা-গোষ্ঠীতে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মধুসূদন দত্ত, বিদ্যাসাগর সম্পৃক্ত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর এরূপ শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠীনির্মাণের গৌরব বঙ্গদর্শনকে দিতে হইবে। এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার ভূমিকাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া রামদাস সেন, অক্ষয়কুমার সরকার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকেরা এখানে সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার আসল মূল্য ছিল সম্পাদকের নেতৃত্বে। পরবর্তী পত্রিকাগুলির মধ্যে "ভারতী"কে কেন্দ্র করিয়া যে গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার উল্লেখ করা চলে। আধুনিক কালের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবুজপত্র-গোষ্ঠী, কল্লোল-গোষ্ঠী, পরিচয়-গোষ্ঠী এবং শনিবারের চিঠি-গোষ্ঠী সাহিত্যসমাজে বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। "বিচিত্রা," "ভারতবর্ষ", "প্রবাসী"কে কেন্দ্র করিয়াও অনেক সাহিত্যিক সমবেত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি "দেশ" সাপ্তাহিক পত্রিকা গোষ্ঠীই বাংলা সাহিত্যের উপরে কর্তৃত্ব করিতেছে।

সাময়িকপত্র ও সাহিত্যিক-গোষ্ঠী

সম্প্রতি বাঙালীর সাহিত্যরুচির উপরে যে সাময়িক পত্রগুলি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে "দেশ" "অমৃতে"র ন্যায় সাপ্তাহিক বৃহৎ সংবাদপত্রের সাহিত্যশাখা এবং "উল্টোরথ" প্রভৃতির ন্যায় সিনেমা-সংস্কৃতি পত্রিকার ভূমিকাই উল্লেখযোগ্য। 'দেশ'-'অমৃত' চুটকির পসরা সাজাইয়াছে। বৃহৎ দৈনিক পত্রিকার শক্তি অর্থ ও সংগঠনের সাহায্য পাইয়া মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ইহারা সাংবাদিকতাকে সাহিত্যের উপরে স্থান দিয়াছে। উপন্যাস-গল্প কোনোমতে সস্তা প্রমোদ-উপকরণ হিসাবে টিকিয়া আছে। সাময়িক মনোরঞ্জনের নানা কলাকৌশলে ইহাদের দেহ পূর্ণ এবং ইহারাই বাংলা সাহিত্যের প্রধান নিয়ন্ত্রা। 'উল্টোরথ' প্রভৃতি সিনেমা পত্রিকাগুলি উপন্যাসের হরির লুঠ সৃষ্টি করিতেছে। এবং যত বড় লেখকের রচনাই হউক উহাদের অধিকাংশেরই লক্ষ্য রূপালী পর্দা। পুরাতন ভালো লোকেরা আজ ইহাদের মুখাপেক্ষী। এই সব পত্রিকায় লিখিতে না পারিলে আধুনিক লেখকের মর্যাদা হয় না। অর্থকরী সুবিধা তো হয়ই না। নিষ্ঠাপূর্ণ সৃষ্টি আজ সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে এবং সাংবাদিকতার উদ্ধত খড়্গাঘাত খাইয়া মননশীল গভীর ও গম্ভীর আলোচনা "অ্যাকাডেমিক" অপবাদে চিহ্নিত হইয়া "বিশ্বভারতী পত্রিকা" "বঙ্গীয় সাহিত্য

সাম্প্রতিক সমস্যা

"পরিষদপত্রিকা" প্রভৃতি গবেষণামূলক পত্রে আশ্রয় লইতেছে। অথচ মাত্র পনেরো-বিশ বছর পূর্বেও 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষে'র গৌরবের যুগে "সিরিয়াস" রচনামাত্রকে এরূপ নির্বাসন দিবার ব্যবস্থা হয় নাই। সাময়িক পত্রের অন্যায় অনর্থকর দাপটে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আজ সংকটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কালে যেমন, তেমনি মধ্যযুগেও অনুবাদকর্ম একটি প্রধান শাখারূপে গণ্য হইয়াছে। বহু প্রাচীন যুগ হইতেই অনুবাদের সহায়তায় বাংলা সাহিত্য নিজের ভাণ্ডার পুষ্ট করিতে চাহিয়াছে এবং সমৃদ্ধতর ভাষাসাহিত্যের নিকট হইতে অনেক-কিছু শিখিবার চেষ্টাও করিয়াছে। পৃথিবীর উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষাগুলিতে অনুবাদের সুবিপুল আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। ভাষার দেওয়ালে ভাবচিন্তা ও রূপসৌকর্য বদ্ধ থাকিবে, কোনোকালেই মানুষ তাহা মানিয়া লইতে পারে নাই। অন্য ভাষার যবনিকা তুলিয়া তাহার রত্নরাজি সংগ্রহের চেষ্টা সে চিরকালই করিয়াছে। একদেশের সাহিত্য এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুবাদ এবং ভাবপরিগ্রহের মধ্য দিয়া অপর জাতির সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় গল্পসাহিত্য আরব দেশের আরব্যরজনীর রোমান্সগুলির একটি বৃহৎ অংশের প্রেরণা যোগাইয়াছে, আবার এই আরব্য কাহিনীগুলি 'ডেকামেরন' প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে ইউরোপীয় আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যের ভিত্তিপত্তন করিয়াছে। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চেষ্টায় নয়, দীর্ঘকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে এই আত্মীকরণ এবং আত্মপ্রসারণ চলিয়াছে। এই ঘটনা সুন্দর ভাবে প্রমাণিত করে, বহু পুরাতন কাল হইতেই সাহিত্যরসের রাজ্যে ভূগোলের বেড়া ভাঙিবার কি দুঃসাধ্য সাধনা মানবজাতি বিনা আড়ম্বরে করিয়া আসিয়াছে!

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে আমরা মোটামুটি দুইটি যুগে বিভক্ত করিয়া দেখি: প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিস্তার অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত; ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে একেবারে বর্তমান বৎসর পর্যন্ত আধুনিক যুগের প্রসার। এই দুই যুগেই অনুবাদকর্মে বাঙালী বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছে। তবে অনুবাদের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে স্বাভাবিক কারণেই ইহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। অনুবাদ এবং ভাবগ্রহণ—দুই রীতির মধ্যেই নৈকট্য রহিয়াছে। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া অনুবাদের আলোচনাই করা হইবে। ভাবগ্রহণ অনুবাদকর্মের অন্তর্ভুক্ত কঠিন কর্ম ও দায়িত্বটুকু এড়াইয়া, উহার সুযোগটুকু, ভাবগত বৈচিত্র্যটুকু মাত্র গ্রহণ করিতে

বাংলা অনুবাদের দুই যুগ—
মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ

চায়। অবশ্য কোনো কোনো রচনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অনুবাদ ভাবগ্রহণের আদর্শটির সহিত সন্ধি করিতে চাহিয়াছে এরূপও দেখা যায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদকাব্য একটি প্রধান শাখারূপে পরিগণিত হইয়াছে। মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিত পরে, দুইশত বৎসর ধরিয়া, বাংলাদেশে এমন অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়ের অবস্থা বিরাজ করিতেছিল যে, সেই পরিস্থিতিতে কোনো-কিছু সৃজনশীল সাহিত্য দেখা দেয় নাই। অবস্থা কিছুটা শান্ত ও স্বাভাবিক হইয়া আসিবার পরে আমরা দেখিলাম প্রধানতঃ অনুবাদধর্মী কাব্যকবিতা আশ্রয় করিয়াই নূতন বাংলা সাহিত্য দেখা দিয়াছে।

মধ্যযুগের অনুবাদের উদ্দেশ্য

মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ মুখ্যতঃ রামায়ণ ও মহাভারতের, সামান্যতঃ ভাগবতের। অন্যান্য পুরাণের অনুবাদও কিছু কিছু হইয়াছে। তবে তাহা খুবই অল্প। সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি সংকীর্ণতর কিন্তু উল্লেখযোগ্য অনুবাদের ধারা দেখা যায়—ফার্সি গল্পসাহিত্যের অনুবাদ। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল সম্পূর্ণ সাহিত্য-ঘটিত কারণে নয়। এই গ্রন্থগুলির সাহিত্যমূল্য ছাড়াও সমাজমানসের উপরে গুরুতর ধর্মীয় প্রভাব বিদ্যমান। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বলিয়া ইহাদের সর্বভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। যখন মুসলমান ধর্মের স্রোত তদানীন্তন রাজশক্তির সহায়তায় উদ্দাম হইয়া বাঙালী অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীকে বিপুল সংখ্যায় গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা শঙ্কা গণিল। এই বিপুলসংখ্যক মানুষকে হিন্দুধর্মের পতাকাতলে সমবেত করিয়া মুসলিমধর্মের প্রসার হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইল। তথাকথিত নিম্নবর্ণের অনার্য অস্মার্ত অপৌরাণিক দেবকল্পনা, পূজাচার, জীবচর্চা যেমন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বহুলাংশে বরণ করিয়া লইল, সেইরূপ আবার আর্য দেব-ভাবনা, পৌরাণিক জীবনাদর্শও সর্বস্তরে বিস্তারিত করিয়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সাধনায় সর্বাপেক্ষা বড় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদগুলি। ইহাদের কাহিনী-অংশের সহিত বিজড়িত অবস্থায় হিন্দু আদর্শ লোকমুখে কিছুটা প্রচারিত ছিল। বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে এইগুলি ব্যাপক জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইল। দুই কোটির হিন্দুর মিশ্রণের মধ্য দিয়া যে আধুনিক বাঙালীর হিন্দুধর্মের রূপ দানা বাঁধিয়া উঠিল তাহাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিল এই অনুবাদগ্রন্থগুলি। অবশ্য কাব্যরসের প্রতি আকর্ষণও একটা গৌণ কারণরূপে বিবেচিত হইতে পারে। অনেকটা ইহারই জন্য বাংলা অনুবাদে রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় ভাগবত ততটা সমাদর পায় নাই। রামায়ণ-মহাভারতের সহিত কাব্যোৎকর্ষের বিচারে ভাগবত সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। মহাভারত-অনুবাদের কতকগুলি ক্ষেত্রে মুসলমান নৃপতিদের আনুকূল্যও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের

বীর্যপূর্ণ যুদ্ধবর্ণনা তাঁহাদের খুবই উৎসাহিত করিত এইরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের অবসানে এবং মধ্যযুগের প্রারম্ভে অনুবাদকাব্যের ধারাটির প্রথম প্রতিষ্ঠা। আদিযুগের বাংলা সাহিত্যে যেমন ছিল না বিষয়বৈচিত্র্য, তেমনি ছিল না কাব্যগঠনে কোনো জটিল রূপাদর্শ। বাংলা ভাষা শুধু ক্ষুদ্রাকৃতি চর্যাগানের উপযোগী বলিয়া নিজেকে প্রমাণ করিয়াছে, কিন্তু কাহিনীকাব্য রচনা ও চরিত্রসৃজনের অপেক্ষাকৃত জটিল প্রক্রিয়ায় উহা তখনও অভ্যস্ত হইয়া ওঠে নাই। সংস্কৃত ভাষার অতি প্রাচীন এবং অত্যন্ত পরিণত আদর্শের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সেকালের বাংলা সাহিত্য ঠিক পথই ধরিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের নিকট হইতে বাংলা কাব্য কাহিনীকাব্য রচনার পদ্ধতিটি শিখিয়াছে। সাহিত্যের গঠনযুগে দুর্বলতর ভাষা সমৃদ্ধতর ভাষা-সাহিত্যের নিকট হইতে এইভাবে শিক্ষাগ্রহণ করিয়াই শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে।

মধ্যযুগে বাংলা অনুবাদ প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হইয়াছে। ইহার কারণটি বড় দুরধিগম্য নয়। সংস্কৃত ভাষার সহিত বাংলা ভাষার যেমন ঘনিষ্ঠ নৈকট্য, সেইরূপ সংস্কৃত সাহিত্যেও বাঙালী পণ্ডিতদের গভীর অধ্যয়ন ছিল। কাজেই গ্রহণ করিতে গিয়া সর্বপ্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিই আকৃষ্ট হইবা স্বাভাবিক, বিদেশী ভাষার মধ্যে মুসলমান আমলে ফার্সির সহিতও বাঙালীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। উর্দু-ফার্সি কেচ্ছা-সাহিত্যের রসাস্বাদের দ্বার উন্মুক্ত হইল দৌলত কাজী, আলাওলের চেষ্টায়। কোনো বিদেশী ভাষার সহিত বাঙালীর পরিচয় বিশেষ গভীর ছিল না। অপরাপর প্রাদেশিক ভাষায়ও সাহিত্যরচনার এমন কোনো উচ্চ আদর্শ দেখা যায় নাই, যাহাতে উহার অনুবাদের জন্য মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা উৎসাহিত হইবেন। মধ্যযুগের অনুবাদকেরা মূলের কাহিনীটি ও চরিত্রভাবনাকে মোটামুটি অনুসরণ করিয়াই তৃপ্ত থাকিতেন। মূলের রসকে সঞ্চারিত করা অথবা মূলের নিষ্ঠাপূর্ণ নির্ভরযোগ্য অনুবাদের কোনোরূপ নীতি তাঁহারা অনুসরণ করিতেন না। মালাধর বসুর ভাগবতে কতকটা যথাযথ অনুবাদের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণ গ্রন্থগুলিতে সর্বাধিক মূলচ্যুতি ঘটিয়াছে। মহাভারতেও মূলাতিক্রমণ বড় কম নয়। মূলের বহু অংশ, বিশেষ করিয়া সৌন্দর্যবর্ণনামূলক অংশগুলি, যেমন পরিত্যক্ত হইয়াছে তেমনি বহু নূতন কল্পিত কাহিনীও সংযোজিত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বড় পার্থক্য ঘটিয়াছে রসাবেদনের ক্ষেত্রে। রামায়ণ-মহাভারতের মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য—Sublime-এর রস অনুবাদে খুব কমই রক্ষিত হইয়াছে। রামায়ণে প্রায়ই তরল ভক্তিরসের বাড়াবাড়ি স্থান পাইয়াছে; মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনায় কচিৎ বীর্যধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে।

মধ্যযুগের অনুবাদের আদর্শ

আধুনিক কালে অনুবাদসাহিত্য সম্পূর্ণ নূতন আদর্শ গ্রহণ করিল। অনুবাদের আদর্শ কি হইবে, পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। এফ. ডব্লিউ. নিউম্যান যাথার্থ্যকেই অনুবাদের আদর্শ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন: "The translator

should retain every peculiarity of the orignal, so far as he is able, with the greater care the more foreign it may be." রবার্ট ব্রাউনিং ও ছিলেন এই মতের পোষক। তাঁহার মতে অনুবাদককে হইতে হইবে "literal at every cost save that of absolute violence to our language." এক কথায়, মূলের ভাব ও ভাষাগত প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যতটা সম্ভব অনুবাদেও রক্ষা করিতে হইবে। নিশ্ছিদ্র মূলানুগত্যই অনুবাদের লক্ষ্য—এ সিদ্ধান্ত তত্ত্বের দিক হইতে যতই লোভনীয় বলিয়া মনে হউক না কেন, বাস্তবতঃ সম্পূর্ণ অনুসরণযোগ্য নয়। যথাযথ ভাষান্তরে ভাবকে ধরা যাইতে পারে, ভাষাকে কতটা আয়ত্ত করা যায়? ভাষাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে ভাবের ঘরেও ফাঁকি থাকিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া অত্যধিক literal হওয়ায় মূলের রসাস্বাদে বিঘ্ন ঘটা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন: "অনুবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। কবিতাগুলি এমন সহজ ও সরল হইয়াছে যে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। মূলের রস কোনো মতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না। কিন্তু তোমার এ লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রসসৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য।" রবীন্দ্রনাথ-কথিত এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তটি নিউম্যান-ব্রাউনিং-এর পূর্বোক্ত বক্তব্যের একেবারে বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ মূলের আশ্রয়মাত্র গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন, রসসৌন্দর্য যাহা সৃষ্ট হইবে তাহা সম্পূর্ণই মৌলিক। এই মতকে অনুবাদের আদর্শ বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা চলে না। বরং এ বিষয়ে ই. বি. রিউ প্রচারিত বক্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মনে হয় ঐ বক্তব্যটিই সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত এবং অনুসরণযোগ্য: "I call it the principle of equivalent effect and regard it as signifying that that translation is the best which comes nearest to creating in its audience the same impression as was made by the original on its contemporaries. Higher than this, I hold that no translator can aim." এই মতটি বিশ্লেষণ করিলে দুইটি কথা পাওয়া যাইবে:—(১) সাধারণ পাঠকদের বোধগম্য করিয়াই মূলগ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল। অনুবাদ করিতে গিয়াও সমকালীন পাঠকদের বোধগম্যতার উপরই জোর দিতে হইবে। (২) কোথাও মূল গ্রন্থের লেখক ইচ্ছা করিয়া জটিল ও কঠিন রীতির ভাষা অনুসরণ করিয়া থাকিলে এবং উহার ফলে সেখানে কোনো বিশেষ ধরনের রস সৃজিত হইয়া থাকিলে অনুবাদককেও উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের সুখ্যাত বাইবেল-অনুবাদক কমিটির রীতি-ঘটিত প্রস্তাবটির কথা স্মরণ করা চলে: "We aim at a version

অনুবাদের তাত্ত্বিক আদর্শ—আধুনিক কালে

which shall be intelligible to contemporary readers or as nearly as possible. It is to be genuinely English in idiom." অনুবাদকের নিজের ভাষার আধুনিক প্রাণধর্মট বজায় রাখিয়া মূলের আত্মাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই কারণেই অনুবাদের গদ্যরীতি সমকালীন হইলেও সাময়িকতার দ্বারা অতিরিক্ত আচ্ছন্ন হইবে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

গদ্য অনুবাদের প্রথম যুগ

আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আদর্শ বরণ করিয়া লইয়াছে। অনুবাদের ক্ষেত্রেও মুখ্যতঃ ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারস্থ হইয়াছে বাংলা সাহিত্য। কিছুটা সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক গদ্যের প্রতিষ্ঠা হইল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। গদ্যরীতির নিজস্ব রূপাকৃতি গড়িয়া তুলিবার জন্য একটি সুষ্ঠু গদ্যের আদর্শের প্রয়োজন ছিল। সেই আদর্শটির সন্ধান মিলিল সংস্কৃত এবং ইংরাজী রচনায়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের রচনাবলীর মধ্যে ইংরাজী, সংস্কৃত এবং কিছুটা ফার্সী গ্রন্থ হইতে অনুবাদের চেষ্টা দেখা যায়। শ্রীরামপুর মিশন বাইবেল অনুবাদে যে গদ্যরীতির আশ্রয় লইলেন, তাহা বাংলা ভাষার ইতিহাসে সফল হয় নাই। 'স্কুল বুক সোসাইটি', 'বঙ্গীয়-ভাষানুবাদক সমাজ' অনুবাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য ইহাদের চেষ্টা প্রধানতঃ জ্ঞানবিস্তারের ক্ষেত্রেই সক্রিয় ছিল। প্রথম দিকের দুইজন বড় অনুবাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয় মুখ্যতঃ রসসাহিত্যের অনুবাদ করিয়াছেন। সংস্কৃত এবং ইংরাজী ভাষা হইতে তিনি যে অনুবাদগ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন তাহা অবশ্য কিছুটা মুক্ত অনুবাদ, আধুনিক অনুবাদের আদর্শরূপে তাহাকে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু গদ্যে বাংলা গল্পসাহিত্যের একটি কাঠামো তিনি ধরিতে চাহিয়াছিলেন। মডেল হিসাবে তিনি সংস্কৃত এবং ইংরাজী সাহিত্যের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। অক্ষয়কুমার জ্ঞানমূলক সাহিত্যানুবাদে উচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। অপরিণত বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি পূর্ববর্তীদের ন্যায় পশুপক্ষীর বিবরণ বা ভূগোল ও ইতিহাসকথার ভাষান্তর করেন নাই। পরিণত মানুষের মানসসম্পদবৃদ্ধি এবং জ্ঞানবৃদ্ধির অনুশীলনের উদ্দেশ্যে তিনি অতি উচ্চ ও জটিল বিষয়ের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' দুটি গ্রন্থেই অনেক মৌলিক প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু মূলতঃ এ দুইটি অনুবাদগ্রন্থ এবং অতি উচ্চ স্তরের অনুবাদ। এই কালে বাঙালী অনুবাদকেরা আরব্যোপন্যাসের কাহিনী অনুবাদে বিশেষ প্রবণতা দেখাইয়াছেন। একাধিক খণ্ডে বহু লেখকই আরব্য-উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

গদ্যসাহিত্যের আরও বিকাশ ঘটিলে অনুবাদের পরিমাণ কিছু কমিয়া আসিল।

প্রথম দিকে বাংলা গল্পসাহিত্যে ছিল মৌলিকতার অভাব, স্বাধীন চলিবার শক্তির ন্যূনতা। তাই আদর্শের জন্য, সাহায্যের জন্য ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ইংরাজী হইতে অনুবাদের দিকেই অবশ্য ঝোঁকটি বেশী ছিল। তাহার পরেই সংস্কৃত সাহিত্যের স্থান। নব্য বাঙালীর চিত্তের এই দ্বিমুখী প্রসার। বঙ্কিমের আবির্ভাবের মধ্য দিয়া বাংলা গদ্য নূতন প্রাণ লাভ করিল। উপন্যাস এবং প্রবন্ধ উভয় ক্ষেত্রেই মৌলিকতা প্রতিষ্ঠিত হইল। বঙ্কিমানুসারীরাও মৌলিক রচনার প্রতিই অধিক আকর্ষণ দেখাইতে লাগিলেন। অনুবাদের লক্ষ্য পরিবর্তিত হইয়া গেল। বিশ্বসাহিত্যের সুন্দর অংশগুলির সহিত পরিচিত বাসনাই একালের অনুবাদের লক্ষ্য হইল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা গদ্যসাহিত্যে সৃজনধর্ম শতধারায় বিকশিত হইয়া উঠিল। একালে অনুবাদের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গেল। উল্লেখযোগ্য অনুব্যদ নাই বলিলেই হয়। কোনো বড় লেখকই অনুবাদে আর হাত দিতে চাহেন নাই। ভুবন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির ন্যায় স্বল্পশক্তিধর লেখক ইংরাজি রহস্যগল্প ও বিলাতি গুপ্তকথার ভাবান্তর প্রকাশ করিয়া পাঠক জনসাধারণের স্থূলরুচি তৃপ্তি করিতে লাগিল। এই যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গদ্যানুবাদের মধ্যে নাম করিতে হয় মধুসূদনের 'হেক্টর-বধ'। গ্রীকভাষা হইতে ইলিয়াডের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে অনুবাদের এই সাধনা অভিনব সন্দেহ নাই। ফরাসীভাষা হইতে অনুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। দু-একটি বিশিষ্ট ফরাসী উপন্যাস ছাড়াও ভিক্টর কুঁজা রচিত 'সত্যশিবসুন্দরে'র অনুবাদ তাঁহার কীর্তিরূপে গণ্য হইতে পারে। এই যুগে বাংলা গদ্যানুবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। বাঙালী পণ্ডিতদের যৌথকর্মের বিজয়বৈজয়ন্তী এই গ্রন্থ।

গদ্যানুবাদ—
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নরওয়েজিয়ান সাহিত্যসম্পদ হইতে উপন্যাস অনুবাদ করিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিত্যের পরিধি বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গদ্যানুবাদে জোয়ার আসে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে তাহা বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। এই কালপর্বে বাংলা সাহিত্যে মৌলিক সৃজনশীলতায় ভাঁটার টান ধরিয়াছিল এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মানুষ আর সুনির্দিষ্ট দেশসীমায় আবদ্ধ নাই, তাহারা হইয়া পড়িয়াছে বিশ্বের অধিবাসী। ভাষার বন্ধন মানিয়া অপর দেশের সাহিত্যসম্পদ হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিতে রাজী নয় আধুনিক মানুষ। তাই সবদেশেই অনুবাদের আয়োজন বাড়িয়াছে। বাংলা অনুবাদ ইংরাজির জগৎ হইতে পশ্চিমপৃথিবীর নানাস্থানে আপনার রুচি ও সাধনাকে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে। লক্ষণীয় এই পর্বে কথাসাহিত্যের তুলনায় গদ্যপ্রবন্ধের অনুবাদ হইয়াছে অনেক কম। বিশিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কমিউনিষ্ট আদর্শের

বিংশ শতাব্দীর গদ্যানুবাদ

কিছু প্রবন্ধ অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলাসাহিত্য বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক প্রবন্ধরচনায় যেমন নিজে সংকুচিত, সেইরূপ প্রবন্ধ-অনুবাদেও উৎসাহহীন। রাজনৈতিক কিছু পুস্তকের কথা ছাড়িয়া দিলে বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অনূদিত হইতে দেখি না। ইহার কারণটি অনুধাবনযোগ্য। শিক্ষিত বাঙালী ছাড়া উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধগ্রন্থ কে পড়িবে, কে কিনিবে? শিক্ষিত বাঙালী মানেই ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙালী। এবং ইংরাজি ভাষায় অনুবাদশাখা এত সমৃদ্ধ যে বিশ্বের উল্লেখ্য গ্রন্থসমূহ যে-কোনো ভাষায় প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজিতে ভাষান্তরিত হইতেছে। বাংলার প্রবন্ধগ্রন্থ অনুবাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক এইখানে। উপন্যাসাদির অনুবাদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইংরাজি ভাষার উপরে নির্ভরশীলতা। ১৯৫০-এর পূর্ব পর্যন্ত যে সব রুশ, ফরাসী, নরওয়েজিয়ান, স্পেনিস বা ইতালীয় গল্পসাহিত্যের অনুবাদ হইয়াছে তাহা সবই ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিদেশী ভাষাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়াছে। বহু রচনাই সরাসরি মূলভাষা হইতে অনূদিত হইতেছে। তাহা ছাড়া অতি সাম্প্রতিক কালে অনুবাদের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা এবং মূলানুগতোর পরিমাণ বাড়িয়াছে। দুই দশক পূর্বেও বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি যেরূপ খণ্ডিত ও বিকৃতভাবে অনূদিত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তবে গদ্যসাহিত্যের ক্লাসিকগুলি অনুবাদের ক্ষেত্রে বাঙালী পাঠক এখনও যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে না। বাংলা সাহিত্যের অতি সংকীর্ণ বাজার (বিশেষ করিয়া পূর্ববাংলা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পরে) এবং শিক্ষাহারের দ্রুত উন্নতির অভাব অনুবাদসাহিত্যের বিস্তারের পক্ষেও বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান দুই দশকে বাংলা গদ্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রচনাবলীরও কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য ইহার প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু উহাদের অতিরিক্ত দৌর্বল্য বাঙালী পাঠকদের মধ্যে প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না।

বাংলা নাটকের প্রস্তুতিকালে অনুবাদের উপরে বিশেষভাবে নির্ভর করা হইত। কোন্ আদর্শ গৃহীত হইবে এই দ্বিধা বাংলা নাটকের জন্মকালে প্রবল ছিল। লোকের প্রচলিত রুচিতে আঘাত দিতে সাহায্য করিত না বলিয়াই সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করা হইয়াছে প্রচুর পরিমাণে। স্বভাবতঃই কালিদাসের নাটকাবলীর অনুবাদই বেশী হইয়াছে। সেগুলি মূলানুগ। সেই তুলনায় প্রথম দিকে ইংরাজি নাটকের অনুবাদ হইয়াছে সামান্যই। হরচন্দ্র ঘোষ ইংরাজি নাটকের প্রথম অনুবাদক। তিনি শেকস্‌পীয়রের দুইটি নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কোনোটিই যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। বাংলা নাট্যানুবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রধান প্রধান প্রায় সবগুলি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন। তাহা ছাড়া মূল ভাষা হইতে কয়েকটি ফরাসী নাটকের অনুবাদ করিয়া তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের পরিধি

নাট্যসাহিত্যে অনুবাদ —প্রস্তুতির কালে

বাড়াইয়া তোলেন। গিরিশযুগে বাংলা নাট্যসাহিত্যে মৌলিক নাটক ও প্রহসন লেখার ধুম পড়িয়া যায়। ইংরাজি প্রহসন হইতে কিছু কিছু ভাবগ্রহণ অমৃতলাল বসু প্রভৃতির রচনায় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু খাঁটি নাট্যানুবাদের পরিমাণ কমিয়া যায়। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গিরিশচন্দ্র কৃত ম্যাকবেথ।

আধুনিক কালে নাট্যানুবাদ

বাংলা নাট্যসাহিত্যে অত্যাধুনিক কালে অনুবাদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদিসের 'ঈদিপাস' হইতে আরম্ভ করিয়া প্রিস্টলে, ও-নীল পর্যন্ত অনূদিত ও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইতেছে। সেক্সপীয়রেরও কিছু কিছু পরীক্ষামূলক কিছু কিছু অভিনয়-যোগ্য সম্পাদিত অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। আধুনিক বাংলা নাটক মৌলিক সৃষ্টিতে যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয় বলিয়াই হয়ত অনুবাদের উপরে এত বেশী ঝোঁক পড়িয়াছে। কিন্তু আধুনিক বাংলা নাট্যানুবাদ যে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মতো এই সব অনুবাদ এতই প্রাণবন্ত হইতেছে যে মঞ্চাভিনয়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেছে।

কাব্যানুবাদ

উনবিংশ শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য কাব্যানুবাদ সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য হইতে। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত' বাংলাভাষায় একাধিকবার অনূদিত হইয়াছে। তুলনামূলকভাবে ইংরাজি হইতে অনুবাদের সংখ্যা অনেক কম। কাব্যানুবাদে সাফল্যলাভ সর্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার। শেলী-কীট্স্-ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-ব্রাউনিংয়ের সঙ্গে সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁহাদের লেখা কবিতা পরীক্ষামূলকভাবে দু-একটি অনূদিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে থাকে। সত্যেন্দ্রনাথ বহুসংখ্যক কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলেন। নজরুল ইসলামের ফার্সী-কবিতার অনুবাদে মূলের রসটি জমিয়া উঠিয়াছে। অত্যাধুনিক বহু কবি ইউরোপীয় আধুনিক কবিতার অনুবাদে উৎসাহী। একালের সৃজনশীল প্রথম শ্রেণীর কবিরা অনুবাদে আগ্রহ প্রকাশ করেন। নিজের প্রবণতানুযায়ী কবিদের রচনার ভাষান্তর করেন। কিন্তু উপন্যাস-নাটকের ক্ষেত্রে সৃজনশীল শ্রেষ্ঠ লেখকদের অনুবাদে হাত দিতে বড় দেখা যায় না।

উপসংহার

বাংলা অনুবাদের অপূর্ণতা সতর্ক পাঠককে অবশ্যই ভাবিত করিয়া তুলিবে. (১) বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক অনুবাদে এখনও এদেশীয় অনুবাদকদের আগ্রহ প্রবল নয়। (২) প্রবন্ধসাহিত্যে আমাদের অনুবাদ অত্যন্ত সংকীর্ণ। (৩) প্রধানতঃ ইউরোপীয় সাহিত্যানুবাদেই আমরা সক্রিয়তা দেখাইয়াছি, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর। (৪) প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য এবং উপজাতিদের লোকসাহিত্যের অনুবাদেও জোর দেওয়া প্রয়োজন। (৫) অনুবাদের অনুবাদ (অর্থাৎ কোনো গ্রন্থের

ইংরাজি অনুবাদ হইতে বঙ্গানুবাদ) করিতেই আমরা বেশী অভ্যস্ত। সম্প্রতি মূলভাষা হইতে অনুবাদের সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে, তাহাকে আরও পুষ্ট করিয়া তোলা দরকার।

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য

(চিন্তা-প্রধান)

প্রবন্ধ-সাহিত্যের রূপরীতি স্থির করা এক দুরূহ কাজ। এই নামটির আশ্রয়ে এত বিভিন্ন ধরনের রচনা স্থান করিয়া লইয়াছে যে, তাহার মধ্যে একটি সুনিয়মিত ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করা বেশ কঠিন কাজ। 'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ছিল প্রকৃষ্ট বন্ধন। এই অর্থেই শব্দটি বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে এবং প্রাচীন সংস্কৃতে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'পাচালি-প্রবন্ধ', 'কাব্য-প্রবন্ধ' এইরূপ প্রয়োগ বহু মিলিয়াছে। কিন্তু এখন প্রবন্ধ বলিতে যে-ধরনের রচনা বুঝি উনবিংশ শতাব্দীর বহু লেখকই তাহাকে 'প্রস্তাব' নামে চিহ্নিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির চেষ্টায় 'প্রবন্ধ' নামটির ব্যবহার সুনির্দিষ্ট হইয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামকরণটি লক্ষণীয়। এই নামটি এবং ইহার মোটামুটি তাৎপর্য বর্তমান বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রবন্ধ বলিতে আমরা এক ধরনের গদ্যরচনা বুঝি। "চৈতন্যভাগবত", বিশেষ করিয়া "চৈতন্যচরিতামৃতের' নিদর্শন দেখাইয়া কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন যে, ছন্দোবদ্ধ ভাষায়ও আলোচনাগ্রন্থ রচিত হইতে পারে। চৈতন্যচরিতামৃতের দার্শনিক বিচারকে প্রবন্ধশ্রেণীতে অবশ্যই ফেলিতে হয়। কিন্তু এরূপ নিদর্শনকে ব্যতিক্রম বলাই ভাল। প্রবন্ধের ভাষা অবশ্যই গদ্য। প্রবন্ধের চরিত্র অনুধাবন করিলেই ইহার ভাষাগত এই বৈশিষ্ট্যের কারণ বুঝা যাইবে। গদ্যভাষায় গল্পোপন্যাস এবং নাটকাদিও রচিত হইয়া থাকে। ইহারা সৃজনশীল সাহিত্য। রসসৌন্দর্যসৃজনই ইহাদের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধ উহা হইতে স্বতন্ত্র। কাহিনীবর্ণনা বা চরিত্রসৃষ্টি করিবার দায়িত্ব নাই প্রবন্ধের। রসসৃষ্টি উহার লক্ষ্য নয়। কাজেই বলা যাইতে পারে প্রবন্ধ হইল গদ্যে-রচিত "non-fiction and non-dramatic literature"। প্রবন্ধ উপন্যাস নাটক হইতে স্বতন্ত্র গদ্যরচনা। কিন্তু উহার নিজস্ব কাজ কি? প্রবন্ধ আলোচনা করে। যে-কোনো বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া যুক্তিপ্রমাণসহযোগে একটি বক্তব্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণই প্রবন্ধের কাজ। মানুষের মধ্যে যে যুক্তিপ্রধান মননশীল অংশটি রহিয়াছে তাহার নিকটই প্রবন্ধসাহিত্যের আবেদন। কিন্তু চিন্তাপূর্ণ কোন বিষয়ের উপস্থাপনই 'প্রবন্ধসাহিত্য'রূপে গণ্য হইতে পারে না। তাহা হইলে যে-কোন পাঠ্যপুস্তককে প্রবন্ধগ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। ঐ গ্রন্থগুলির মধ্যে রচয়িতার মৌলিকতার পরিচয় নাই। মৌলিকতা

প্রবন্ধসাহিত্যের প্রাথমিক লক্ষণ

প্রবন্ধসাহিত্যের একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু মৌলিক চিন্তাপ্রধান গদ্য রচনামাত্রই প্রবন্ধ নয়। তাহা হইলে সংবাদপত্রে নিত্য প্রকাশিত সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলি প্রবন্ধরূপে গৃহীত হইত। উহারা একান্তভাবেই সাময়িক। লেখকের নিজস্ব একটি মত উহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইলেও উহা চলমান ঘটনা-প্রবাহ সম্পর্কিত মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ উহার কিছু মূল্য থাকিতে পারে, কাল উহাকে কেহই মনে রাখিবে না। প্রত্যাশিত স্থায়িত্ব কিভাবে লাভ করা যায় তাহা এক কথায় বলা যায় না। রচনাভঙ্গির সৌকর্য ও অভিনবত্ব, ভাবনার গভীরতায় বা রচয়িতার উচ্চ ও গভীর মননের স্পর্শে যে সব রচনা তুলনামূলকভাবে স্থায়ী হইবার দাবি করিতে পারে তাহাদের প্রবন্ধ নাম সার্থক। প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রাথমিক রূপরীতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি উপরের আলোচনা হইতে পাওয়া যায়—(১) গদ্যরচনা; (২) কাহিনীধর্মী নয়; (৩) আলোচনাত্মক; (৪) মৌলিক; (৫) স্থায়ী। এই সঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। অন্য বহুগুণ থাকিলেও ভাষারীতি ও প্রকাশভঙ্গিতে কোনো রচনা একেবারে পঙ্গু হইলে তাহাকে প্রবন্ধ-সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত করা কঠিন। কারণ 'প্রবন্ধ'ও এক শ্রেণীর সাহিত্য এবং সাহিত্যের কাজ ভাষায় প্রকাশ করা।

প্রবন্ধের দুই শ্রেণীর কথা বহুল আলোচিত। এক ধরনের প্রবন্ধ বিষয়প্রধান। তাহাদের objective বা চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধ, জ্ঞানগর্ভ রচনা, বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। লেখকের ভূমিকা পরিকল্পনার, সজ্জার ও চিন্তার। পন্থা, যুক্তি, তর্ক, প্রমাণের। লেখক এই চিন্তা যুক্তি ও প্রমাণের উপস্থাপক হইলেও উহা তাহার হৃদয়-নিরপেক্ষ; উহার মধ্যে তাহার ব্যক্তিহৃদয়ের প্রতিফলনের সুযোগ নাই। এই জাতীয় প্রবন্ধ একটা সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে গিয়া পৌঁছিতে চায়। অপর জাতীয় প্রবন্ধ কিন্তু subjective essay, আত্মগৌরবী রচনা, রসরচনা, রচনাসাহিত্য প্রভৃতি নামেই সমধিক পরিচিত। অন্যজাতীয় প্রবন্ধের সহিত ইহার মিল একান্তই বহিরঙ্গ। এই জাতীয় রচনায় লেখকের ব্যক্তিহৃদয়ের গুঞ্জরণ অনুভূত হয়। তাহা ছাড়া ইহাদের লক্ষ্য রসসৃষ্টি। এক কথায় ইহারা পরিপূর্ণভাবে সৃজনধর্মী। এই জাতীয় রচনার পরিচয় দিতে গিয়াই জনসন বলিয়াছিলেন: "An essay is a loose sally of the mind, an irregular, undigested piece, not a regular and orderly composition." এই জাতীয় গদ্যসাহিত্য শিল্পরচনা হিসাবে খুবই উন্নত স্তরের সন্দেহ নাই। ইহার শিল্পগুণ বিষয়ে রবার্ট লিণ্ডের উক্তিটি স্মরণ করা যাইতে পারে: "It is strange that the essay, which at first sight looks the easiest and most natural thing in the world to write, has so seldom achieved excellence. Yet it is an indisputable fact that the greatest essayist,

প্রবন্ধের দুই শাখা—রসধর্মী ও মননধর্মী

like the greatest letter-writer, is rarer even than the great poet." রচনাকে যেমন বলা যায় পুরোপুরি সৃজনধর্মী রসসাহিত্য, প্রবন্ধকে সেইরূপ বলা যায় না। উহাকে রসসাহিত্যের বাহিরে মননসাহিত্যরূপেই চিহ্নিত করিতে হইবে। বাহিরের মিল থাকা সত্ত্বেও দুটি বস্তু এতই পৃথক যে, এক নামে উহাদের পরিচয় দেওয়ায় অসুবিধা হয়। আমরা বর্তমানে মননধর্মী প্রবন্ধ লইয়াই আলোচনা করিতেছি।

প্রবন্ধের লক্ষ্য কি ?

মননধর্মী প্রবন্ধের লক্ষ্য রসসৃজন নয়, কিন্তু উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়ে গভীর ভাবনার প্রয়োজন আছে। উহার লক্ষ্য কি শিক্ষাপ্রচার, পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধি। প্রবন্ধ নামে পরিচিত একটা বৃহৎ অংশ পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রচিত। এই জাতীয় প্রবন্ধের সংখ্যা যেমন অনেক, তেমনি উহাদের প্রয়োজনীয়তাও অবশ্য স্বীকার্য। ভাষায় যাহা কিছু রচিত হয়, বিশেষ করিয়া গদ্যে—তাহার দুইটি দিক আছে। একদিকে তাহা সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে, অন্যদিকে তাহা সৌন্দর্যসৃষ্টি করে। জনশিক্ষা বিস্তার, সামাজিক মানুষের বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধির উপায়স্বরূপ গদ্যভাষায় লেখা প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। অপরিণত মানুষের ক্ষেত্রে যেরূপ, পরিণতমন মানুষের পক্ষেও সেইরূপ জ্ঞানের তৃষ্ণা চিরকালই থাকে; আধুনিক প্রবন্ধ-সাহিত্য নিত্যবর্ধমান জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করে। এই কারণেই গদ্যপ্রবন্ধকে literature of knowledge বলা হইয়া থাকে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে ভূরিভূরি প্রবন্ধ রচিত, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত এবং গ্রন্থবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু প্রবন্ধের আর একটি উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। যদি শিক্ষাদানই প্রবন্ধের লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে পরিণতমন মানুষের নিকট উহার বিশেষ মূল্য থাকিত না। জ্ঞানের কথা একবার বলা হইলেই ফুরাইয়া গেল। উহার স্থায়িত্বের সুযোগ কোথায়? জীবনপথে যাহারা যাত্রা শুরু করিবে তাহাদের পুরাতন জ্ঞানের পুঁজি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আর নূতন জানিবার বিষয়ও জানিলেই শেষ হইল। তাহার জন্য আধুনিক কালে খবরের কাগজের রিপোর্ট, বড় জোর সাময়িকপত্রের একটি প্রবন্ধ প্রয়োজন। আধুনিক রকেট বিদ্যার যেটুকু সাধারণের জানা প্রয়োজন এবং তাহাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব, সেই technical সহজ কথাগুলি তো জানিলেই ফুরাইয়া গেল। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারেরা শুধু স্কুলমাস্টারি বা সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তাহাদের প্রবন্ধ তাই যতটা জানায় তাহা অপেক্ষা বেশী ভাবায়। সিদ্ধান্ত করা অপেক্ষা, পূর্ব হইতে গড়িয়া তোলা সিদ্ধান্তকে বিতর্কের সূচিমুখে আলোড়িত করিয়া তোলায় তাহার অধিক আনন্দ। ভালো প্রবন্ধপাঠের আনন্দ জ্ঞানলাভের আনন্দ নয়, জ্ঞানচর্চার আনন্দ। সুনির্দিষ্ট শিক্ষামূলক প্রত্যয়ে পৌঁছানো নয়, নূতন চিন্তার খোলা মাঠে মুক্তি পাওয়া। বিষয়টি জানা থাকিলেও তাহা ফুরাইয়া যায় না, সিদ্ধান্তটি পুরাতন হইলেও নূতন চিন্তার খোরাক

মেলে। বহুক্ষেত্রে এই আনন্দ বড় মনের সংস্পর্শে আসার আনন্দ, বহুক্ষেত্রে ভাবনার অভিনব ভঙ্গিই ইহার উৎস।

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য আধুনিক কালের সামগ্রী। ইউরোপীয় বিশেষ করিয়া ইংরেজি সাহিত্যশিক্ষার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার জন্য চিত্তলোকে সৃষ্ট আলোড়নের মধ্য দিয়াই ইহার উদ্ভব। বাংলা গদ্যভাষা কিছুটা পরিণতি লাভ করিবার পরেই প্রবন্ধসাহিত্যের জন্ম সম্ভব হইল। প্রথম দিকে অনুবাদধর্মী গল্পকথা বা পশুপক্ষীর বিবরণে মৌলিক প্রবন্ধের লক্ষণ ছিল না। প্রথমে রামমোহন রায়ই বাংলা শিশুগদ্যে প্রবন্ধরচনার সাধনা করিলেন। রামমোহন বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে আলোচনায় এবং সামাজিক সমস্যাদির বিচারে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রের প্রমাণে এবং যুক্তির প্রবলতায়, বিতর্কের তীক্ষ্ণ শরচালনায় তাঁহার গদ্য এক কঠিন পৌরুষ লাভ করিল। বাংলা ভাষায় যে গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা সম্ভব রামমোহনই তাহা দেখাইয়া দিলেন।

রামমোহন রায় : বাংলা প্রবন্ধের জন্ম

বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারবিষয়ক প্রবন্ধগুলি তাঁহার কর্মের সহচররূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তথ্য, তত্ত্ব, যুক্তি এবং প্রমাণে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলিকে তিনি প্রায় ছিদ্রহীন করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার উপরে আছে ভাষার লালিত্য। ইহা তাঁহার মননশীল প্রবন্ধাবলীর একটি অতিরিক্ত গুণ। বিদ্যাসাগরের এই সব প্রবন্ধের তুলনায় গদ্য গল্পগ্রন্থগুলি অনুবাদাশ্রয়ী হইলেও অনেক উন্নতশ্রেণীর রচনা। কিন্তু তাঁহার সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাগ্রন্থটি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে প্রথম বাংলা আলোচনা এইটি; ইহার মধ্যে লেখকের সাহিত্যভাবনার মৌলিকতাও কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাবন্ধিক হিসাবে অক্ষয়কুমার দত্তের স্থান খুবই উচ্চে। তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ-পুস্তক রচনা করিলেও উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য "বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" এবং "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়"। উভয়ক্ষেত্রেই ইংরাজি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার। কিন্তু বিষয়বস্তুর বিন্যাসে এবং উদাহরণাদি সংকলনে তো বটেই, মূল দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও তিনি স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থের ইংরাজ লেখক কুম্ব বস্তুতন্ময় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং মধ্যযুগসুলভ ধর্মীয় অলৌকিকত্বে বিশ্বাসকে একই সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। তাঁহার মতে প্রকৃতিজগতের বাহিরে ঈশ্বর নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণই ঈশ্বরসাধনা। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে মৌলিক গবেষণায় তিনি যে জাতীয় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, প্রথম যুগের প্রবন্ধসাহিত্যে তাহা বিস্ময়কর। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধাবলীও প্রাক্-বঙ্কিম প্রবন্ধসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী। ভূদেবের প্রতিপাদ্য বিষয়টি তাঁহার নিজের ভাষায় উপস্থিত করা যায় : "স্বদেশীয় সমাজের

বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-ভূদেবচন্দ্র

বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয় ভাব সংস্থাপিত এবং পরিবর্ধিত হইতে পারে কিনা, তাহার বিচার করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, জাতীয় ভাব পরিগ্রহের পথ আমাদিগের পক্ষে একান্ত সংরুদ্ধ নহে।" ভূদেবের সিদ্ধান্ত আধুনিক পাঠকের নিকট অত্যন্ত রক্ষণশীল বলিয়া মনে হইবে। বঙ্কিমপূর্ব অপরাপর প্রাবন্ধিকদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির নামোল্লেখ করা চলে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধসাহিত্যের অসামান্য শিল্পী হিসাবে যেমন আত্মপ্রকাশ করিলেন, তেমনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি বহুসংখ্যক প্রাবন্ধিককে বাংলা সাহিত্যের রাজ্যে উপস্থিত করিলেন। অবশ্য বঙ্কিমপন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধরচয়িতাই বঙ্কিমের ভাষারীতি ও ভাবনাপরিমণ্ডলের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনায় বাংলা সমালোচনাসাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। পূর্ববর্তী সমালোচনার তুলনায় তাহার মধ্যে গুণগত সমুন্নতি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনায় সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনায় এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারে আপনার রসসৃষ্টির গভীরতার সুস্পষ্ট প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। সৌন্দর্যসৃষ্টিকে তিনি সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং নীতিশিক্ষাকে গৌণ উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। সংস্কৃত রসবাদী সমালোচনার বিরুদ্ধে তিনি ইংরাজি রোমান্টিক সমালোচনার আদর্শটিই তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন। ধর্ম ও সমাজভাবনামূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে বঙ্কিমের মনোভাবের পরিবর্তনটি লক্ষ্য করা যায়। প্রথম জীবনে তিনি ইউরোপীয় দার্শনিক কোঁতের আদর্শে নিরীশ্বরবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য Utopian Socialism-এর আদর্শটি তিনি প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। উত্তরজীবনের প্রবন্ধে তিনি নিষ্কামকর্মের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক গবেষণাবুদ্ধি সমন্বিত হইয়াছে তাঁহার সুবিখ্যাত "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য : "(বঙ্কিম) বীরদর্প সহকারে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তিদ্বারা তন্ন তন্ন রূপে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং চিরপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়নপূর্বক অপমানিত বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার গৌরবের সিংহাসনে রাজাসন দিয়াছেন।" ঐতিহাসিক এবং পুরাতাত্ত্বিক বিষয়ের প্রবন্ধেও বঙ্কিম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙালীর উৎপত্তিনির্ণয় এবং তাহার বীর্যের ঐতিহ্য প্রতিপাদনই বঙ্কিমের অধিকাংশ ঐতিহাসিক আলোচনার লক্ষ্য ছিল।

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমানুজ প্রাবন্ধিকদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী উনবিংশ শতাব্দীর অর্থাৎ প্রায় সমকালের ইতিহাসরচনায় যে নিষ্ঠা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ তথা উদার নিরপেক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। গবেষক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রসবোধও

ছিল বিশেষ পুষ্ট। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এত বড় গবেষক সারা ভারতে দুচারজনই মাত্র দেখা যায়। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম, ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতির কোন দিকই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই; এবং পঞ্চাশ বৎসরের অধিককালব্যাপী পরিশ্রম, আলোচনা ও বহু দর্শনের পরিণত ফল এই পুস্তক ও প্রবন্ধগুলির বহুসহস্র পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার আসক্তি ছিল দুইটি বিষয়ে—মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনা এবং নানা দিক দিয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলীর গুণগ্রাহিতা।" কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দার্শনিক নিবন্ধাবলী, কালীপ্রসন্ন ঘোষের মানবস্বভাববিষয়ক চিন্তা, চন্দ্রনাথ বসুর সমাজ ও সাহিত্যালোচনা, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণা, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের জীবনীবিষয়ক আলোচনা, রামদাস সেনের পুরাতত্ত্বচর্চা, রজনীকান্ত গুপ্তের ইতিহাসবিচার, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যসমালোচনা, বিবেকানন্দের সমাজ-তত্ত্বের বিচার বঙ্কিমযুগের প্রবন্ধসাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

বঙ্কিমযুগের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকগণ

রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-প্রবন্ধ সাহিত্যের মূল্য-নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথের গভীর মননশীলতা, উচ্ছ্বসিত আবেগ, কল্পনাদীপ্তি ও ভাষাপ্রয়োগের অদ্ভুত নিপুণতার পরিচয় মিলে। সাধারণতঃ তথ্যপ্রধান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যুক্তিধর্মী, তীক্ষ্ণ ও স্মরণীয় বাক্যসন্নিবেশে তৎপর, শ্লেষ ও ব্যঙ্গের প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ও আলোচনার দীর্ঘ বিস্তার ও নিঃশেষ সমাপ্তির প্রতি আগ্রহশীল। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে লঘুস্পর্শ বা কল্পনার ক্রীড়াশীলতা বিশেষ দেখা যায় না—লেখকের অতিরিক্ত গুরুত্ববোধ (seriousness) ও উদ্দেশ্যের অতন্দ্র অনুবর্তন সময় সময় ক্লান্তিকর হইয়া উঠে। ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগধর্মী ব্যাখ্যার প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও প্রগাঢ়তর অধ্যাত্ম-অনুভব ইহাদের উচ্চতর সাহিত্যিক পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। ঐশ স্পর্শলাভের জন্য লেখকের আবেগময় আকূতি, লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠানের পিছনকার মূল ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও কাব্যসৌন্দর্যময় প্রকাশরীতি ইহাদিগকে একাধারে সাহিত্যরসিক ও ধর্মপিপাসু উভয় শ্রেণীর পাঠকদের হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে লেখকের উদার মানস মুক্তি ও আদর্শনিষ্ঠা এবং বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির যান্ত্রিকতা ও অন্যান্য প্রকারের অসম্পূর্ণতা যতটা ধরা পড়িয়াছে, গঠনমূলক পরিকল্পনার ততটা পরিচয় নাই। কবি তাঁহার বিশ্বভারতীতে যে নূতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত মধ্যে মধ্যে পাওয়া গেলেও ইহার দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রয়োগ-সফলতার কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। মনে হয় যে, লেখক এই জাতীয় প্রবন্ধে জাতীয় মনের সাধারণ

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ

অসন্তোষকেই তাঁহার নিজের কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ও পূর্ণতাকামী কবিমনের গূঢ় অসন্তোষের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন; সমস্যার রূপ যতটা পরিস্ফুট করিয়াছেন সে পরিমাণে সমাধানের ইঙ্গিত দেন নাই।" সমালোচক হিসাবেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। তিনি অবশ্য বিশ্লেষণের তুলনায় কবিজনোচিত সূক্ষ্ম অনুভূতির উপরে জোর দিয়াছেন বেশী, কিন্তু সমালোচ্য বিষয়গুলির মর্মমূলটি যেভাবে তাঁহার আলোচনায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা উচ্চপ্রশংসার অপেক্ষা রাখে।

রবীন্দ্রযুগের প্রবন্ধসাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞানভিত্তিক দার্শনিক জিজ্ঞাসাগুলি যে অত্যন্ত উচ্চ স্থানের অধিকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি চিন্তাশীল মানুষের মনে এমন গভীর ও অস্তিত্ব-বিচলিত-করা সমস্যা জাগাইয়া তুলিয়াছেন যাহা প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিকের নিকটেই মাত্র প্রত্যাশা করা যায়। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের আস্বাদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। উহার লঘু ক্রীড়াশীল ভঙ্গি এবং তির্যক ভাষার স্বতন্ত্র আবেদনটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মতো। কিন্তু তিনি কতকগুলি ধরাবাঁধা সিদ্ধান্তের, গতানুগতিক প্রসঙ্গের অবতারণা মাত্র না করিয়া মানবমনে নবীন মননশীলতা জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এমন কতকগুলি দৃষ্টিকোণ তিনি মেলিয়া ধরেন তাঁহার প্রবন্ধে, যাহাতে সব-কিছুর পুনর্মূল্যায়নের বাসনা জাগে। এ যুগের অপর বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, মোহিতলাল মজুমদার, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, রাজশেখর বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রভৃতি বহু লেখকের নামোল্লেখ করা চলে।

রবীন্দ্রযুগের প্রাবন্ধিকগণ

বঙ্কিমযুগে ইতিহাস—পুরাতত্ত্ব-দর্শন ও ধর্ম-সমাজচিন্তা—সাহিত্যালোচনা প্রভৃতি বহুমুখে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক কালে তাহা আবার প্রধানতঃ সাহিত্য-আলোচনায় সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে। নানা দিকে বাঙালীর চিন্তা বিকশিত হইয়া উঠিতেছে না। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে পূর্ব হইতেই বিচিত্র ধারায় বিকাশ না হওয়ায় যে দুর্বলতা ছিল, বিংশ শতাব্দীতে তাহা বিশেষ কমে নাই, বরং বাড়িয়াই গিয়াছে। স্বাধীনতালাভের পরবর্তীকালেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে নাই। উপরন্তু সম্প্রতি 'সিরিয়াস' কোনোরূপ রচনার বিরুদ্ধে একটি মনোভাব দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে; সাংবাদিকেরা এবং রম্য-লিখিয়েরা গভীরগম্ভীর, চিন্তাপ্রধান, তথ্যবহুল, পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া বসিয়াছে। এই মনোভাবের পাল্টা পরিবেশ সৃষ্টি করিতে না পারিলে প্রবন্ধসাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিশেষ সংকটাপন্ন হইয়া পড়িবে। উহার প্রতিক্রিয়া জাতীয় জীবনেও বর্তাইবে। গভীর মননশীলতার হানি ঘটিলে জাতির মানসিক পুষ্টি যে ব্যাহত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপসংহার

জীবনচরিত ঃ আত্মজীবনী

ভূমিকা

জীবনী রচনার প্রচলন খুবই পুরাতন। অধুনাতন কাল পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহাদের জীবনকথা জানিবার গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে। উহা দ্বারা আমরা নিজেরাই উন্নত হইতে পারি। যাঁহারা জীবনের কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনকাহিনী আমাদের উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। ধর্মপ্রচারক ধর্মসাধনায় সিদ্ধপুরুষদের জীবনী শুনাইয়া ভক্তদের পথ দেখাইতে চান। দেশনেতার জীবনী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতারক্ষা ও দেশগঠনের পথ দেখায়। সমাজ-সংস্কারকদের জীবনীপাঠে সমাজব্যবস্থার দোষত্রুটি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক ইতিহাসের প্রধান পুরুষদের জীবনী রচনা করিয়া ঘটনার বিবরণের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধটি দেখাইয়া দেন। নানা উদ্দেশ্যে নানা ধরনের চরিতগ্রন্থ পৃথিবীর সব ভাষায়ই লেখা হয়। প্রধানতঃ জ্ঞান অর্জন, শিক্ষালাভ এবং বড় মানুষের কথা পড়িয়া চিত্তপ্রসার লাভ করার জন্যই সবশ্রেণীর লোক জীবনচরিত পাঠ করিয়া থাকে। ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের আনন্দ আছে। ভালো চরিতগ্রন্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মানবিক বাস্তব পরিচয়টি তুলিয়া ধরে। ব্যক্তিত্বের সেই উত্তাপ উপযুক্তভাবে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিলে খুবই উপভোগ্য হইয়া উঠিবে। আত্মজীবন চরিতগ্রন্থের একটি শাখাবিশেষ। ইহাদের রূপরীতি, বিশিষ্টতা এবং উপভোগ্যতা সবই স্বতন্ত্র ধরনের। মোটামুটিভাবে বলা যায়, জীবনচরিত এবং আত্মজীবনী সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। বাংলা সাহিত্যে এই শাখাটি কম সমৃদ্ধ নয়।

জীবনচরিতের লক্ষণসমূহ

জীবনচরিতের প্রধান লক্ষণ বস্তুনিষ্ঠা এবং তথ্যসমৃদ্ধি। কোনো মহাপুরুষ অথবা জীবনের কোনো ক্ষেত্রে (যেমন ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজসংস্কার, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি) যাঁহারা সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনকথাই লেখা হইয়া থাকে। চরিতগ্রন্থ লিখিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন তাঁহাদের জীবনের ছোটো-বড়ো যত বেশি সম্ভব তথ্যের সঞ্চয়। পূর্ব হইতে বুঝিবার উপায় নাই কোন্ তথ্যটি কতটা প্রয়োজনীয়। কোনোরূপ পূর্বধারণার বশবর্তী হইয়া তথ্যসঞ্চয়ে অগ্রসর হওয়াও ঠিক নয়। তথ্য মননিরপেক্ষ। নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়াই তথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। কোনো মহাপুরুষ সম্পর্কে আমি যে থিওরী দাঁড় করাইয়াছি, প্রাপ্ত কোনো তথ্য তাহার সহিত খাপ না খাইলে তাহা পরিত্যাগ করিবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিতে পারে। জীবনচরিত-কারকে এইরূপ প্রবণতা পরিহার করিতে হইবে। তাহাকে subjective মনোভাব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ হইয়া তথ্য সঞ্চয় করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, জীবনের বাহ্যিক ঘটনাবলীর তথ্যসমৃদ্ধ সামগ্রিক পরিচয়ের সঙ্গে, তাঁহার কার্যাবলীর

বিস্তৃত তথ্যভিত্তিক সংবাদও সব খুঁটিনাটিসহ সংগ্রহ করিতে হইবে। কার্যাবলীর উপরে কম গুরুত্ব দিলে চলিবে না। কারণ উহার জন্যই কোনো ব্যক্তি স্মরণীয় হন। যিনি রাজনৈতিক তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলী জীবনঘটনার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু যিনি সাহিত্যিক তাঁহার সৃষ্টিগুলির পরিচয় লইতে হইবে। যিনি ধর্মগুরু তাঁহার ধর্মপ্রচারকর্মের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় দার্শনিক মতামতের মূল্যায়নও করিতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির ধর্মভাবনা, সাহিত্যিকের সাহিত্যসৃষ্টি, রাজনৈতিক নেতার রাষ্ট্রনীতিদর্শনের সমালোচনা করাও জীবনচরিতের অন্যতম কর্তব্য। কারণ তাঁহার সৃষ্টকর্ম ও সাধনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় গ্রহণের মাধ্যমেই উহার মূল্যনিরূপণ করিতে হইবে। যাঁহার জীবনী লিখিতে বসিয়াছি তাঁহার যথার্থ মূল্যায়ণের জন্যই তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন। মধুসূদনের জীবনীকার তাঁহার রচনাবলীর শিল্পমূল্য নির্ণয় করিবেন, হেমচন্দ্রের জীবনীরচনায়ও শিল্পবিচার করিতে হইবে। এই শিল্পবিচার যথার্থ ও নিরপেক্ষ হওয়া চাই। নতুবা পূর্বোক্ত কবিদ্বয়ের জীবনী পড়িয়া বুঝিবার উপায় থাকিবে না, কবিপ্রতিভায় কে শ্রেষ্ঠ। যখন যে কবির জীবনী পড়িব, তখনই মনে হইবে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রতিভা কোনো কালে জন্মগ্রহণ করে নাই। জবাহরলালের জীবনীতে তাঁহার রাজনৈতিক দর্শন এবং কার্যাবলীর সমালোচনা থাকা চাই। নব্যভারত গঠনে তাঁহার আদর্শবাদী দৃষ্টি এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানের অপারগতা সমভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। স্বাধীনতা-আন্দোলনে তাঁহার রক্ষণশীল ও প্রগতিমার্গের মধ্যে দোদুল্যমানতা যেন সমালোচিত হয়। অন্যথায় রাষ্ট্রনৈতিক নেতা হিসাবে তাঁহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়লাভ সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ এক কথায় জীবনীকারকে নিরপেক্ষতায় অবিচল থাকিতে হইবে। জীবনচরিতকে স্তুতিবাচনে পরিণত করার প্রবণতা সুপ্রচলিত। আদর্শ চরিতগ্রন্থরচয়িতাকে সে-বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে।

নিরপেক্ষ তথ্যসঞ্চয় এবং সমালোচনা

জীবনীকার উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনঘটনার বারংবার পর্যালোচনা এবং কার্যাবলী ও মতামতের সমালোচনার মধ্য দিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত করিবেন। জীবনে সফল ব্যক্তিদের প্রতিভার স্বরূপটি খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। সব ঘটনা ও ভাবনার উৎসে ব্যক্তিত্বের যে কেন্দ্রটি রহিয়াছে তাহার আবিষ্কারই সর্বাপেক্ষা দুরূহ এবং ভালো জীবনীগ্রন্থের পক্ষে অপরিহার্য। এই কেন্দ্রটি আবিষ্কার করা কঠিন, কারণ সর্বদা কার্যে এবং মতামতে ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটে না, বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রটি বক্রভাবে এবং বর্ণবৈচিত্র্যমণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পায়। এই সত্যটি অনুধাবন করিবার জন্য জীবনীকারকে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইতে হইবে। এই বিষয়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কনিষ্ঠ বন্ধুদের স্মৃতিকথা, তাঁহার ব্যক্তিগত পত্রাবলীর সহায়তা গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই কেন্দ্রটি আবিষ্কার করিলে জীবনের একটি তাৎপর্য আবিষ্কার করা

প্রতিভার স্বরূপ এবং ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র আবিষ্কার প্রয়োজন

সম্ভব হইবে। তথ্যগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা জীবনীকারের পক্ষে সহজ হইবে। আপাতদৃষ্টিতে যে ঘটনা ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন মনে হইয়াছিল, তাহাই হয়ত নূতন আবিষ্কৃত সত্যের আলোয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে হইবে। এমন অবশ্যই ঘটিতে পারে যে, একজন জীবনীকার কোনো মনীষীর জীবনঘটনার ব্যাখ্যা করিয়া ব্যক্তিত্বের যে-সত্যে পৌঁছাইবেন, অপর জীবনীকার সেখানে নাও পৌঁছাইতে পারেন। উভয়েই যথাসাধ্য তথ্যনিষ্ঠ হইয়াও আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের জন্য এইরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি হইতে পারে। মোট কথা, জীবনচরিতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সন্ধান করি—(১) উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনের তথ্যনিষ্ঠ পরিচয়। (২) ব্যক্তিকেন্দ্রের সহায়তায় তথ্যস্তূপ হইতে ঘটনাবলীর সতর্ক নির্বাচন এবং গুরুত্ব অনুসারে যথাযোগ্য বিন্যাস। (৩) ব্যক্তির কার্যাবলীর পরিচয় এবং তাহার মূল্যায়ন। (৪)ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রটি(personality and centre of personality) ফুটাইয়া তোলা। স্বভাবতঃই বহু চরিতগ্রন্থ প্রথম লক্ষ্যটি অনুসরণ করাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করে। চরিতগ্রন্থ নামে প্রচলিত বহুই গ্রন্থ নির্বাচন ও ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়া মানুষটির সমগ্র পরিচয় দিবার চেষ্টা করে না। সবিশেষ তথ্য সংকলনের চেষ্টাই সেখানে করা হয়। উদাহরণ হিসাবে নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থের নাম করিতে হয়। ইহা সার্থক চরিতগ্রন্থ না হইলেও তথ্য-সংকলনের দিক হইতে মূল্যবান উৎসগ্রন্থরূপে বিবেচিত হইতে পারে।

চরিতগ্রন্থে অবশ্য যুগের ভূমিকাটি জীবন্ত করিয়া তোলার চেষ্টা করা উচিত। ব্যক্তি যুগকে বাদ দিয়া কখনো পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া যাঁহাদের জীবনীগ্রন্থ রচনা করা হয় তাঁহারা আপন ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন না। বৃহত্তর সমাজজীবনের সহিত নানাবিধ বন্ধনে

যুগপরিবেশ

আপনাকে জড়াইয়া ফেলেন। বিশেষ করিয়া যুগের বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তির চরিত্রভাবনা ও কর্মকে কখনো প্রত্যক্ষতঃ, কখনো-বা পরোক্ষতঃ প্রভাবিত করিবেই। রামমোহনের কালের বাংলাদেশকে না জানিলে, এদেশে প্রাচীন ও নবীন জীবনযাত্রার সংঘর্ষের তাৎপর্যটি আবিষ্কার করিতে না পারিলে রামমোহনকে বুঝা যাইবে না। কোনো মনীষীর ব্যক্তিত্বই স্বয়ম্ভূ হইতে পারে না। তাহা অনেকখানি যুগপরিবেশের উপরে নির্ভরশীল। তবে যুগপরিবেশের ঐক্যসত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনাদর্শ বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়। এইখানেই ব্যক্তিত্বের রহস্য। যুগপটভূমিকাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতেই হইবে, কিন্তু ব্যক্তিরহস্যের পরিপূরক হিসাবেই উহাকে স্থান দিতে হইবে। মার্ক্সবাদী লেখকদের ন্যায় যুগসর্বস্বতাবাদ অনুসরণযোগ্য নয়।

চরিতগ্রন্থকে আমরা রসসাহিত্য বলিতে পারি না, উহা মননসাহিত্য। চরিতগ্রন্থ পাঠের নানাবিধ প্রতিক্রিয়া ঘটিতে পারে; উহার কারণ যাঁহাদের জীবনকাহিনী রচিত হয় তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও কর্মের বৈচিত্র্য। কেহ রাজনীতিবিদ্, কেহ

সমাজসংস্কারক, কেহ দুর্গমের অভিযাত্রী, কেহ-বা শিল্পী। তবে স্থূলতঃ চরিতগ্রন্থ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) কর্মীর জীবনী এবং (২) ভাবুকের জীবনী। কর্মীদের জীবনী ঘটনাবহুল। বাহিরের ঘটনায় তাহাদের অনেকখানি পরিচয় নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু যাহারা ভাবুক ও স্রষ্টা তাহাদের জীবন সচরাচর ঘটনাবহুল হয় না। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও আছে। বহু কবি বা শিল্পীর জীবনকাহিনী নাট্যচমকে আকর্ষণীয়। কর্মপ্রধান জীবনকাহিনী পাঠ করার একরূপ উত্তেজনা আছে। ঘটনার তরঙ্গে এক জাতীয় নাটকীয় রস উপভোগ করিবার সুযোগ পাওয়া যাইতে পারে। অপরপক্ষে ভাবুকদের জীবনী তত্ত্বভাবনা, ধর্মোপলব্ধি, শিল্পরসের রাজ্যে পাঠকদের লইয়া যায়। স্বভাবতঃই ভাবজীবনের কাহিনী ঘটনাবহুল কর্মজীবন হইতে স্বতন্ত্র। মনের উৎকর্ষ না থাকিলে এই জাতীয় চরিতকথা অনেক পাঠকের নিকটেই আকর্ষণীয় বলিয়া মনে হইবে না। সব মিলাইয়া জীবনচরিত নানা দিক হইতে পাঠকচিত্তে আবেদনের সৃষ্টি করিতে পারে। ইতিহাসপাঠের যে আনন্দ, যুদ্ধকাহিনীপাঠের যে উত্তেজনা, ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনীপাঠে তাহা যে অংশতঃ লাভ করা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজনৈতিক নেতার জীবনীপাঠ রাজনীতিচর্চার সহায়তা করে, সেনাপতির জীবনীপাঠ সাহসিকতা অকুতোভয়তা শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণাবলী পাঠকমনে সঞ্চার করে, সমাজ-সংস্কারকের কথা সমাজসত্যের পরিচয় দেয়, শিক্ষাবিদের কাহিনী শিক্ষানীতির পর্যালোচনায় সহায়তা করে, অভিযাত্রীর চরিত য়্যাডভেঞ্চার ও দেশভ্রমণের স্বাদ বহন করে। দার্শনিকের জীবনীতে দর্শনালোচনা, ধর্মপ্রাণ মনীষীর জীবনী ধর্মীয় উপলব্ধিতে পূর্ণ থাকে। সাহিত্যিক-শিল্পীর জীবনীপাঠে শিল্পরসের আস্বাদ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া বড়ো মানুষের আন্তরিক পরিচিতি লাভের ফলে পাঠকের মন প্রসারিত হয়, বিচিত্র ধরনের আদর্শে চিত্ত উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে।

চরিতগ্রন্থ পাঠের উপকারিতা

কোনো ব্যক্তি নিজের জীবনকথা রচনা করিলে উহাকে আত্মজীবনী বলা হয়। জীবনচরিতের সঙ্গে আত্মজীবনীর কতকগুলি সাধারণ ধরনের মিল থাকিলেও মূলে অমিলই বেশী রহিয়াছে। প্রথমতঃ, কোনো বিশেষ ধরনের স্মরণীয় ব্যক্তি অথবা সমাজনেতা বা মনীষীর চরিতগ্রন্থই লেখা হয়। সাধারণ মানুষের জীবনকথা রচনার প্রয়োজন ও তাগিদ কেহ অনুভব করিবে না। কিন্তু খুব সাধারণ ধরনের মানুষ, যাহার জীবনচরিত অপর কেহই লিখিবেন না, তিনিও মনোরম আত্মজীবনী রচনা করিতে পারেন। জীবনকাহিনী কীর্তিমান ব্যক্তির কথা, আত্মচরিত নিজের অন্তরঙ্গ কাহিনী। যে-কোনো ব্যক্তি আপনার জীবনকথা বলিতে পারেন, তাহার মধ্যে সমাজ ইতিহাসে আলোড়নসৃষ্টিকারী কিছু না থাকিলেও বলিতে পারেন। রচনাসৌকর্য থাকিলে, বিষয়গত দৈন্যও আত্মজীবনীতে লক্ষ্য করিবার মতো ব্যাপার নয়। দ্বিতীয়তঃ, চরিতগ্রন্থ প্রধানতঃ মননশীল রচনা। পাঠকের বোধির নিকটই উহার আবেদন। আত্মজীবনী দুই জাতীয় হইতে

আত্মজীবনী

পারে। উহা মননপ্রধান রচনা হইতে পারে, রসপ্রধানও হইতে পারে। যদি কোনো দেশনেতা আত্মজীবনীতে প্রধানতঃ আপনার রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিটিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন, উহা চিন্তাপ্রধান রচনারূপে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু আত্মজীবনীতে কতকগুলি আলোচনামাত্র থাকিলে উহা খাঁটি আত্মজীবনীরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। আলোচনাগ্রন্থরূপে উহা পরিগণিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, আত্মজীবনীতে আমরা ব্যক্তির অন্তরলোকের পরিচয় পাই। চিঠিপত্র এবং আত্মজীবনীর সহায়তায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনের অনেক অনুদ্‌ঘাটিত রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ, আত্মজীবনী লিখিতে বসিয়া কেহ আপনার গৌরব খ্যাপন করেন, কেহ আপনার চরিত্রদুর্বলতা কথনে পঞ্চমুখ হইয়া ওঠেন। এক কথায় বলা যায়, আলোচ্য বস্তু—অর্থাৎ জীবনকাহিনীর লেখক এখানে এক ব্যক্তি হওয়ায়, আত্মভাবনার প্রতিফলন খুব বেশীই হইয়া থাকে। বিষয় ও বিষয়ীর এজাতীয় একীকরণ এক ধরনের subjective রচনার সৃষ্টি করে, কিন্তু কোনো কোনো আত্মজীবনীতে দেখি লেখক আপনার জীবন হইতে আপনার লেখকসত্তাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। এই জাতীয় আত্মচরিত সংখ্যায় অল্প; এবং ইহাদের মধ্যে একটি অভিনব স্বাদুতা আছে। লেখক হিসাবে আপনার ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে ওঠা বড় সহজ ব্যাপার নয়।

মধ্যযুগেই বাংলা জীবনীসাহিত্যে উল্লেখ্য রচনার সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্যযুগের ধর্মপ্লাবিত বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যের আবির্ভাব নূতন মানবিক মূল্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে। চৈতন্যের জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া বাংলা-ভাষায় অন্ততঃ দুইখানা চরিতগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তথ্যনিষ্ঠার দিক হইতে গ্রন্থদুইটি মূল্যবান হবে লেখকদের ধর্মীয় মনোভাব চৈতন্যের ব্যক্তিত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে, আধুনিক কালে তাহা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে চৈতন্যসম্প্রদায়ের ধর্ম ও দর্শন-ভাবনার যে ব্যাখ্যান আছে তাহা সবিশেষ মূল্যবান।

বাংলা জীবনচরিত-সাহিত্য —মধ্যযুগে

আধুনিক কালে প্রথম জীবনীগ্রন্থ লেখেন রামরাম বসু, যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে। কিন্তু উহা যথেষ্ট তথ্যনিষ্ঠ নয়, কিম্বদন্তীর নির্বিচার মিশ্রণ সেখানে ঘটিয়াছে। আধুনিক জীবনচরিত রচনার আদর্শটি আমরা ইংরেজি সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছি। এবিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত চেম্বার্সের Biographies পুস্তকখানির অনুবাদ আদর্শনির্মাণের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় দেশীয় কবিওয়ালা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর একাধিক বিশিষ্ট কবির জীবনী প্রকাশ করিয়া স্বাধীন ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনীরচনার ধারাটির প্রবর্তন করেন। অবশ্য এই গ্রন্থগুলি তথ্যসঞ্চয়েই প্রধানতঃ ব্যাপৃত থাকিয়াছে, অন্তরপরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা করে নাই। পাশাপাশি 'বিবিধার্থসংগ্রহ' প্রভৃতি কোনো

আধুনিক জীবনচরিতের আরম্ভ

কোনো পত্রিকা অনূদিত জীবনীপ্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া এই ধারাটির প্রতিষ্ঠায় যত্ন করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবনঘটনা অবলম্বনে যে প্রবন্ধ কয়টি লিখিয়াছিলেন তাহার মূল্য তথ্যবিন্যাসে, অন্তর্জীবনের পরিচয় বিশ্লেষণে। বাংলা চরিত-প্রবন্ধে এই প্রথম তথ্যভেদ করিয়া অন্তর্দৃষ্টি সম্পাতের চেষ্টা। পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর উল্লেখ্য চরিতগ্রন্থ

সামাজিক-ঐতিহাসিক একটি ব্যাপক পটভূমিতে তিনি রামতনু লাহিড়ীর যে জীবনী লিখিয়াছেন উহা আধুনিক বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস হইয়া উঠিয়াছে। এই গ্রন্থে রামতনু লাহিড়ীর জীবনী ছাড়াও সমকালীন প্রধান সব ব্যক্তির জীবনী সন্নিবিষ্ট হইয়া একটি জীবনীকোষে পরিণত হইয়াছে। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি অনেকের জীবনেরই তথ্যপূর্ণ কাহিনী শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছে। এই সব গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ যোগীন্দ্রনাথ বসুর লেখা মধুসূদনজীবনী। তথ্যবিন্যাসে, চরিত্রব্যাখ্যায়, প্রতিভার স্বরূপনির্ণয়ে, কাব্য-নাটকের সমালোচনায়, যুগপটভূমির চিত্রণে গ্রন্থটি আদর্শস্থানীয়।

বিংশ শতাব্দীতে জীবনীরচনার বহুমুখী চেষ্টা চলিয়াছে। আমরা কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মাত্র নামোল্লেখ করিতেছি। প্রভাত মুখোপাধ্যায় চারি খণ্ডে যে রবীন্দ্রজীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, উহা তথ্যসঞ্চয়ে যেমন নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে, কবির অন্তরপ্রকৃতিতে প্রবেশ-পথগুলিও সেইরূপ দেখাইয়া দিয়াছে। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা বিনয় ঘোষের তিন খণ্ডে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরজীবনী এবং ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নয় খণ্ডে প্রকাশিত বহুসংখ্যক প্রথম ও মধ্যম শ্রেণীর সাহিত্যসেবকের জীবনী উল্লেখ করিবার মতো গ্রন্থ। প্রমথ চৌধুরী জীবনীগ্রন্থ লেখেন নাই, তবে পূর্বসঞ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির (রামমোহন, ভারতচন্দ্র) অন্তরপুরুষের চিত্রাঙ্কনের যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের "চারিত্রপূজা", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'চরিতকথা'ও এই জাতীয় বিশিষ্ট চেষ্টা। একান্ত আধুনিক কালে রামকৃষ্ণ প্রমুখ সাধকপুরুষদের জীবনী রচনায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যে সরস কথকতার ভঙ্গিটির আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা কিন্তু তথ্য বিষয়ে একান্ত বিচারহীনতাকে প্রশ্রয় দিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য চরিতগ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট আত্মচরিতগ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। উহার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থ আন্তরিক অধ্যাত্ম-উপলব্ধির সুরে বাঁধা, শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনাটি সহজ স্মৃতিচারণায় উপভোগ্য, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের গ্রন্থ সমাজজীবনের সহজ পরিচয়ে পূর্ণ। নবীনচন্দ্র সেনের

আত্মচরিত গ্রন্থ

গ্রন্থ বৃহদায়তন, মাঝে মাঝে আত্মস্তুতিতে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছেলেবেলা' এ ধারার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলির রচনাসৌকর্য নানাদিক হইতে পাঠকদের সাহিত্যরসতৃষ্ণা মিটাইয়াছে। ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যে জীবনী ও আত্ম-জীবনী রচনার ধারা কোন্ পথ ধরিবে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলাই এখন সম্ভব নয়।

রম্যরচনা

সাহিত্যের ইতিহাসে রম্যরচনা একটি নূতন শ্রেণী। অথবা পুরাতন বস্তুরই নূতন নাম। সৃজনধর্মী সাহিত্যে নূতন নূতন রূপরীতি গড়িয়া ওঠা প্রয়োজন, উহা সাহিত্যের প্রবহমান প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়। একদিন মহাকাব্য একটি জীবন্ত শাখারূপে সাহিত্যরাজ্যে ছিল বিরাজিত, আজ উহা ইতিহাসের সামগ্রী। ছোটগল্প অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ লাভ করিয়া একটি স্বতন্ত্র শাখারূপে গণ্য হয়। অবশ্য নূতন একটি রূপের মধ্যে পুরাতন রূপ ও রীতির নানাবিধ অস্পষ্ট ছায়া থাকিয়া যায়। কিন্তু একটি নূতন নামে কাহাকেও চিহ্নিত করিতে হইলে তাহার নিজস্ব পৃথক সত্তা থাকা প্রয়োজন।

এই নামকরণের প্রকৃত কোনো তাৎপর্য আছে কি ?

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকে 'রম্যরচনা' এই নামটি চারিদিকে শোনা যাইতেছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি, সে বিষয়ে কোনো কথা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন। একজনের ব্যাখ্যা অপরে মানিবেন, এরূপ সম্ভাবনা অল্প। বুদ্ধদেব বসু আধুনিক সাহিত্যের এক দিক্‌পাল ব্যক্তি। এ-বিষয়ে তাঁহার ভর্ৎসনা খুবই তীক্ষ্ণ। তিনি লিখিয়াছেন, "যাঁরা কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস কিছুই লিখতে পারেন না, এবং সত্যিকার সাংবাদিক পর্যন্ত নন, যাঁদের না আছে তথ্য বা জ্ঞান, না উদ্ভাবনশক্তি বা কলানৈপুণ্য; সংগতি রক্ষা করে কোনো বিষয়ে একসঙ্গে চিন্তা করতে বা পরস্পর দুটো বাক্য রচনা করতে যাঁরা স্বভাবগুণে অক্ষম, তাঁদের বিশৃঙ্খল প্রগল্‌ভতা ছাপার অক্ষরে উদ্ধৃত হয়ে উঠতে পারতো না, যদি না 'রম্যরচনা' শব্দটির সৃষ্টি হতো।" বুদ্ধদেব বাবুর মতে রম্যরচনা নামটি শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, ক্ষতিকরও। যেখানে বস্তুগত সত্যকার কোনো পার্থক্য নাই সেখানে পৃথক নাম ব্যবহার অর্থহীন। রম্যরচনার সত্যকার কোনো নিজ রূপ অথবা আস্বাদ আছে কি? সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'পরম রমণীয়' নামক গ্রন্থে রম্যরচনার এক সংকলন করা হইয়াছিল। উহাতে বলা হইয়াছে "বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে রম্যরচনা লেখা হয়ে আসছে। লঘু নিবন্ধ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, আমেজী সাহিত্য, বৈঠকী রচনা এই নানান নামে তার পরিচয়।" অর্থাৎ রম্যরচনা ব্যক্তিগত প্রবন্ধেরই একটি রূপ। "লঘু" ব্যক্তিগত প্রবন্ধই রম্যরচনা। এইরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হয় লঘুত্বের উপরে জোর দিবার জন্যই এই জাতীয় নামকরণের চেষ্টা। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের

লঘু হইবার সুযোগ আছে এবং গভীর হইবার পক্ষেও কোনো বাধা নাই; উহা আন্তরিক হইবেই; তরলও হইতে পারে আবার ঘনীভূতও হইতে পারে। সৃজনশীল সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটির মধ্য হইতে তরল, লঘু, আমেজী, বৈঠকী রচনাগুলিকে স্বতন্ত্র নামে চিহ্নিত করিবার চেষ্টা উদ্দেশ্যমূলক বলিয়াই মনে হয়। মনে হয়, বুদ্ধদেব বসু যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেকখানি সত্যতা আছে।

তাহা ছাড়া উদ্ভাবিত এই নূতন নামটিও কোনো সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত করে না। রম্য কথার অর্থ রমণীয় বা সুন্দর। সৃজনশীল সাহিত্যের মূল লক্ষ্যই হইল সৌন্দর্যসৃষ্টি। উপন্যাস, কাব্য ইহাদেরও রমণীয় রচনা বা রম্যরচনা বলায় ব্যুৎপত্তির দিক হইতে কোনো আপত্তি করা চলে না। তবে সাহিত্যাস্বাদে রসোপলব্ধি এবং রম্যবোধ কথা দুটির মধ্যে কিছু গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। সেদিকে ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন 'কাব্যালোক' গ্রন্থে। রস অর্থে emotional pleasure। রচনার অর্থবোধ পাঠক-হৃদয়ে ভাবের বিগলিত প্রবাহ সৃষ্ট করে। কিন্তু রম্যবোধ রচনার অর্থও ভাবগত সৌন্দর্যের উপভোগ। প্রথম ক্ষেত্রে আস্বাদ মূলতঃ subjective এবং আবেগপ্রধান; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহা কতকটা objective এবং বুদ্ধিপ্রধান। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মধ্যে নির্বাচন করিয়া বুদ্ধিদপ্ত রচনাগুলিকে 'রম্যরচনা' নাম দেওয়া চলিত এই যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়া। কিন্তু এরূপ স্বাতন্ত্র্যও বহিরঙ্গগত। অর্থে-ভাবে সুন্দর যে রচনা তাহাই পাঠকচিত্তে আনন্দের আস্বাদ জাগায়। সুন্দর অর্থ এক্ষেত্রে কারণ এবং রসের আস্বাদ কার্য। অবশ্য সে রসাস্বাদেও বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। কাজেই এই নামকরণও বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা বহন করে না।

'রম্যরচনা' কথার অর্থ

কিন্তু রম্যরচনা নামটির ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে। তত্ত্বের বিচারে এই নামটির সব তাৎপর্য আমরা নস্যাৎ করিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাত্ত্বিকদের আলোচনা-সভার সিদ্ধান্তের দ্বারা কোনো সাহিত্যরূপের নাম স্থির করা সম্ভব নয়। উপন্যাস ছোট-গল্প এইসব নামে সহজেই সর্বগ্রাহ্য হইয়াছে। প্রবন্ধ, সন্দর্ভ, নিবন্ধ, প্রস্তাব প্রভৃতি নানারূপ ব্যবহারের মধ্যে প্রবন্ধ কথাটিই শেষ পর্যন্ত টিকিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ গদ্যসাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা গৃহীত হইবার ফলেই এই নামকরণ সর্বজনগ্রাহ্য হইয়াছে। আধুনিক কালে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সাহিত্য-জগতে কাহারও একচ্ছত্র আধিপত্য নাই। রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে 'গদ্য কবিতা' নামটি চালু করিয়া দিলেন। কিন্তু সৃজনধর্মী গদ্য রচনা (যাহা গল্প বা উপন্যাস নয়, আলোচনাধর্মী) তাহার কোনো একটি বিশিষ্ট নাম দেওয়া প্রয়োজন। এই জাতীয় রচনা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি অতি পুরাতন সম্পদ হইলেও সর্বসম্মত কোনো নামে উহাদের চিহ্নিত করা যায় নাই। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'রচনা-সাহিত্য' নামটি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু রচনা বলিতে ভাষায় সর্ববিধ সৃজনকর্মকে

সাহিত্য-গুণান্বিত প্রবন্ধ ও রম্যরচনা-নামকরণের সমস্যা।

বুঝিতে হয়। তাহা ছাড়া ডঃ দাশগুপ্তের প্রস্তাবটি সাধারণ লেখক ও পাঠকসমাজ কর্তৃক গৃহীতও হয় নাই। সম্প্রতি প্রমথনাথ বিশী 'আত্মগৌরবী প্রবন্ধ' এই নামটি প্রচলনের পক্ষপাতী। Subjective Essay এই ইংরেজি নামের আদর্শেই ইহা পরিকল্পিত। এক্ষণে প্রবন্ধের বৃহত্তর শ্রেণীর অংশরূপে—একটি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া ইহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই জাতীয় নামগুলির মধ্যে অধিক পরিচিত হইল 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বা 'সাহিত্যিক প্রবন্ধ' এই নাম দুইটি। সন্দেহ নাই তথাকথিত 'রচনা-সাহিত্য'ও এক ধরনের প্রবন্ধ। অর্থাৎ প্রবন্ধসাহিত্যের সহিত উহার কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। উভয় ক্ষেত্রেই গল্পকথন বা চরিত্র-নির্মাণের চেষ্টা নাই; উভয়েই কোনো একটি বিষয় লইয়া আলোচনা করে এবং উভয়ের ভাষাই গদ্য। কিন্তু অনেকেই বলিবেন এরূপ কয়েকটি বহিরঙ্গ বিষয়ের ঐক্য দেখিয়া লাভ নাই; অন্তরধর্মের দিক হইতে এই দুইটি শাখা স্বতন্ত্র শ্রেণীর। মননশীল রচনাগুলির লক্ষ্য জ্ঞানচর্চা, যুক্তিতর্ক তাহার উপায়, নিশ্ছিদ্র বন্ধনেই তাহার রূপরীতির সার্থকতা। বিষয়মাহাত্ম্য এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সাহিত্যিক প্রবন্ধগুলির লক্ষ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি, চিত্রধর্মিতা, ভাষাকৌশলের মাধ্যমেই উহা পাঠকচিত্তে প্রভাব বিস্তার করে, যুক্তি-তর্কে, তথ্যের সঞ্চয়ের সহিত উহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়। বিষয়মাহাত্ম্য নয়, লেখকের অন্তরলোকই এখানে প্রধান। বিষয় হিসাবে তিনি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে-কোনো প্রসঙ্গ অবলম্বন করিতে পারেন। রবার্ট লিণ্ডের ভাষায় "Sometimes it is nearly a sermon, sometimes is nearly a short story. It may be a fragment of autobiography or a piece of nonsense. It may be satirical, vituperative, or sentimental. It may deal with any subject from the day of judgment to a pair of scissors." কিন্তু আসল বিষয় অবলম্বিত প্রসঙ্গটি নয়, লেখকের নিজের হৃদয়, তাঁহার আত্মা। ফরাসি সাহিত্যিক মঁতেন তাই বলিয়াছেন, "Reader, I, myself, am the subject of my work." এবং এই জাতীয় প্রবন্ধে প্রকৃষ্ট বন্ধন কোথাও নাই। বরং ঘনপিনদ্ধ এবং অসংচিন্তিত বন্ধনের অভাব, মনের একধরনের বন্ধনহীন বিচারণা ইহাদের লক্ষণরূপে বিবেচিত হয়। জনসনের ভাষায় ইহা হইল "loose sally of the mind, an irregular, undigested piece, not a regular and orderly composition." যেক্ষেত্রে বস্তুপ্রধান প্রবন্ধে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত অপরিহার্য, সেখানে সৌন্দর্যপ্রধান প্রবন্ধ হইল "মানসিক পায়চারি" (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়), কোনো সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল ইহার নাই। ইংরেজ সমালোচক এই সিদ্ধান্তের অভাব লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে "প্রয়াস" বলিয়াছেন, "a trial of subject and not in the least a thorough and final examination of it." রূপে রসে সব দিক হইতে স্বতন্ত্র এই দুই ধারার সাহিত্যকে কয়েকটি বহিরঙ্গ সাদৃশ্যের নজিরে "প্রবন্ধ" এই একটিমাত্র নামে চিহ্নিত করা উচিত নয়। বিষয়প্রধান প্রবন্ধকে 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' শ্রেণীভুক্তই করা চলে না, অন্যদিকে

তথাকথিত সৌন্দর্যপ্রধান প্রবন্ধকে পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ সাহিত্য বলিয়া অভিহিত করা চলে। কাজেই দুইটি ভিন্ন বিশেষণ-সহযোগে ইহাদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। "প্রবন্ধ" নামটি বিষয়প্রধান প্রবন্ধের অর্থ বোঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে—এই অর্থেই নামটি লেখক এবং পাঠকসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। অপরদিকে "রম্যরচনা" নামটিও সম্প্রতি বহু ব্যবহৃত হইতেছে। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহাই হউক না কেন, সাহিত্যিক প্রবন্ধকেই মোটামুটিভাবে এই নামটির দ্বারা বোঝানো হইয়া থাকে। রম্যরচনার কোনো স্বতন্ত্র রূপ কাহারও কাছে স্পষ্ট নয়। লঘুত্বের উপরে, তারল্যের উপরে ঝোঁক দিয়া রম্যরচনার সীমা সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার যে চেষ্টা দু-একজন করিয়াছেন তাহার কোনো তাৎপর্য নাই। লঘুতা বা গম্ভীরতা, তরল বা ঘনীভূত রস নিবেদনের পার্থক্য লেখকের ব্যক্তিত্ব ও রচনাকৌশলের স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করে। ইহার জন্য দুইটি ভিন্ন ধরনের নাম ব্যবহার করিবার চেষ্টা বিভ্রান্তিকর। ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে সমগ্রতঃ রম্য-রচনা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে রম্যরচনাকে তাহার অস্পষ্ট এবং বহুরূপী চেহারা হইতে বাহির করিয়া সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হিসাবে গ্রহণ করা সংগত। অনেকে এই অর্থেই উক্ত নামটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরাও এই অর্থেই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশ উক্ত নামটিকে চিহ্নিত করিব।

রম্যরচনার আদি নিদর্শন দেখি ফরাসি লেখক মঁতেনের সৃষ্টিতে ষোড়শ শতাব্দীতে। তাঁহার বইটি সম্পর্কে সমালোচনা-প্রসঙ্গে এড্‌মণ্ড গুস যে কথাগুলি লিখিয়াছিলেন তাহাতে অল্প কথায় রম্যরচনার রূপটি চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে : "It was in the chapters of his strange new book that Montaigne introduced the fashion of writing briefly, irregularly with constant digressions about the world as it appears to the individual who writes." ইংলণ্ডের আদিযুগের রম্যরচনাকারদের মধ্যে ওভারবেরি, কাউলে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কাউলের রচনারীতিতে মঁতেনের অনুসরণ লক্ষণীয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্টীল এবং এডিসনের হাতে ইংরেজি রম্যরচনা প্রতিষ্ঠা পেল। উনবিংশ শতাব্দীতে তাই ল্যাম্বের ন্যায় রম্যরচনাকারের আবির্ভাব সম্ভব হইল। আন্তরিক ভঙ্গি, সহজ ভাষারীতি, ঘরোয়া আবেষ্টনী এবং স্বতোৎসারিত কৌতুকরসে ভরপুর তাঁহার রচনাগুলি কোনো আড়ম্বরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই জীবনের একটি গভীর রাগিণী বাজাইয়া তোলে।

রম্যরচনার জন্ম

ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম। রম্যরচনার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মচরিত বলিতে গিয়া কঠিন পৌরুষের অন্তরস্থিত সহজ মানুষটিকে যেভাবে বাহিরে আনিয়াছেন, তাহা স্বকপোলকল্পিত রীতি-অনুসরণের ফল। বঙ্কিমপূর্ব সার্থক রম্যরচনা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'। ইহার ব্যঙ্গের শাণিত

বাংলা রম্যরচনা—আবির্ভাব

তীর মর্মভেদী। ভাষার বিদ্যুৎগতিতে এবং চিত্ররচনার নৈপুণ্যে লেখক শিল্পকৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

বাংলা রম্যরচনার গৌরবযুগের সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। বঙ্কিমচন্দ্রের লোক-রহস্যের কয়েকটি রচনায় যেমন লঘুকৌতুকের সুরটি বাঁধা, সেইরূপ কমলাকান্তে একটি অভিনব রচনারীতির সিদ্ধি লক্ষণীয়। কমলাকান্ত শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যে রম্যরচনার একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কয়েকটি প্রবন্ধে যেমন লিরিকের মূর্চ্ছনা, অন্তরভেদী দীর্ঘশ্বাস প্রকাশিত, তেমনি অপরগুলিতে নির্মল হাস্যরস প্রগল্ভ। কিন্তু আদ্যন্ত বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। সর্বোপরি কমলাকান্তের ব্যক্তিচরিত্রের আভাস পাঠকের অতিরিক্ত পাওনা। হিউমারের এ-জাতীয় নিদর্শন খুবই দুর্লভ। প্রথম শ্রেণীর রম্য লিখিয়েদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থানও অত্যন্ত উচ্চে। তাঁহার 'বিচিত্র প্রবন্ধে' দু-একটি রচনায় লঘু সুরের চর্চা করা হইলেও গভীর রসাপ্লুত ভাবটিই প্রধান। প্রয়োজনের ঊর্ধ্বলোকে অকাজের খেয়ালী জগতে কবি কচিৎ মুক্তি চাহিয়াছেন, বেশীর ভাগই ডুব দিয়াছেন সৌন্দর্যাস্বাদের অসীম অতলে। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটিতে বৈঠকী আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষণীয়। ছয়টি নরনারীর আলোচনা, নানামুখী ব্যক্তিত্ব হইতে বিচ্ছুরিত আলোকে ঝলমল করিতেছে। কোথাও সিদ্ধান্তের দিকে পৌছুবার চেষ্টা নাই, কিন্তু চরিত্রগুলির জীবন্ত ও আন্তরিক উপস্থিতি উহাদের স্বাদুতা বহু পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু বাংলা রম্যরচনায় ব্যক্তি-মানুষের অপেক্ষা কবিব্যক্তিত্বই বড় হইয়া উঠিয়াছে—এই দুই শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনা বিচার করিলে সেই কথাই বলিতে হয়। এই পর্বের অন্যান্য রম্যলেখকদের মধ্যে অক্ষয়কুমার সরকার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নামোল্লেখ করা চলে।

গৌরবযুগ

রম্যরচনার আধুনিক পর্বের সূত্রপাত ঘটিয়াছে প্রমথ চৌধুরীর হাতে। গভীর রসব্যাকুলতার বিরুদ্ধে তিনি বুদ্ধিদৃপ্ত লঘু চটুলতাকে সাহিত্য-জগতে আমন্ত্রণ জানাইতে চাহিয়াছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর এই দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ধারাবাহীরা মানবমনের লঘু ও খেয়ালী প্রকাশগুলিকে সাহিত্যে প্রবেশাধিকার দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। বীরবল সেই পথটি খুলিয়া দিলেন। এই ধারায় সুন্দর রম্য রচনা পাইয়াছি অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলি প্রভৃতির হাতে। কিন্তু লঘুতাকে সর্বস্ব করিয়া তোলার, তারল্যকেই জীবনের একমাত্র সুর মনে করার একটা ধুম পড়িয়াছে সাম্প্রতিক রম্যরচনায়। উহার গতিরোধ না করিলে বাংলা রম্যরচনার ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন হইবে।

আধুনিক পর্ব

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

সাহিত্যে হাস্যরসের আয়োজন অন্যান্য রসের তুলনায় কিছুটা অভিনব। করুণাদি অন্যান্য রসের ক্রিয়া পাঠকের অনুভূতিলোকে—হাস্যরস বুদ্ধিবৃত্তির অপেক্ষা রাখে। আমাদের কামনা ও অভিজ্ঞতার, স্বপ্নকল্পনা এবং বাস্তবের মধ্যে যে-সংঘর্ষ, তাহার লঘুতর দিকটির প্রতি যদি জোর দেওয়া হয়, তবেই হাস্যরসাত্মক মনোভঙ্গি প্রশ্রয় পায়। হাস্যরস একদিকে রোমান্টিক ভাবালু দৃষ্টিভঙ্গি—আবেগপ্রবলতা এবং কল্পনাগাঢ়তার যেমন বিরোধী, অন্যদিকে সেইরূপ সমুন্নত গাম্ভীর্য ও মাহাত্ম্যসূচক ক্লাসিক্যাল রীতির সহিতও নিঃসম্পর্কিত। হাস্যরসিক সাধারণতঃ পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি কটাক্ষপাতই করিয়া থাকেন। তাঁহার মধ্যে কল্পনা ও ভাবাতিরেকের স্থলে বাস্তব মনোভাবই প্রাধান্য পাইয়া থাকে। হাস্যরসিক কখনও আক্রমণাত্মক বিদ্রূপপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, কখনও উদ্ভট আজগুবি বিষয়ের উপস্থাপনা করেন, কখনও তাঁহার ভাষার বক্রতায় বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাস্যরসিক শিল্পী হাস্যকারুণ্যমিশ্রিত এক অভিনব রসাস্বাদও সৃষ্টি করেন। হাস্যরসাত্মক সাহিত্য কখনও উচ্চহাস্যের জন্ম দেয়, কখনও স্মিত হাস্যরেখা ফুটাইয়া তোলে, কখনও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা অনুভব করিতে হয়। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারাটি বেশ সমৃদ্ধ। মধ্যযুগেও ইহাতে উল্লেখযোগ্য কাব্যাদি রচিত হইয়াছে। অবশ্য দু-একজন কবি ছাড়া অপরের রচনায় স্থূলতার এবং প্রথানুগত্যের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। ["মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস" বিষয়ে প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।] আধুনিক কালে হাস্যরসের এই ধারাটি অনেক বেশী বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সব কয়টি মুখ্য শাখায়ই হাস্যরসের সমৃদ্ধ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

ভূমিকা

[১] কাব্য-কবিতা

বাংলা আধুনিক কবিতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা মধুসূদনের সৃষ্টিতে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবিওয়ালা পাঁচালিকারদের হাতে আধুনিকতার কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে যুগসন্ধির কবি দাশরথি রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দাশরথি পৌরাণিক বিষয় লইয়া কবিতা লিখিলেও তাহাতে আধুনিক সমস্যা এবং নরনারীর একালীন চরিত্রবৈশিষ্ট্য আরোপিত হইয়াছে। ভাবকেন্দ্রের এরূপ বৈপরীত্য তাঁহার কবিতাকে একজাতীয় হাস্যরসে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় আধুনিক যুগের নানাবিধ লক্ষণ অনেক বেশী প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সমাজ-সচেতন সাংবাদিক ছিলেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার কবিতায়ও বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আমাদের সমাজজীবনে ও

দাশরথি-ঈশ্বরগুপ্ত

ভাবলোকে যে পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে তাহার গভীর ও গম্ভীর দিক মধুসূদনের কল্পনা-ভিত্তিকে সচেতন এবং প্রবলবেগে বহমান করিয়াছিল। কিন্তু উহার ফলে যে সব অসংগতি ও অন্যায়গ্রস্ত, যে-সব বিবেচনাহীন বাড়াবাড়ি এবং অকারণ অনুকরণ-স্পৃহা দেখা দিয়াছে আমাদের জীবনে, ঈশ্বরগুপ্তের ন্যায় কৌতুকরসের কবিরা তাহাকেই কবিতার বিষয়বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। ঈশ্বরগুপ্তের কৌতুকরসের ভিত্তি তাঁহার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাও এই তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যঙ্গরসের কারণ হইতে পারে। তিনি কতকটা রক্ষণশীলতার দিক হইতে স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারের প্রতি ব্যঙ্গের আঘাত করিয়াছেন। সামাজিক মানুষের নানাশ্রেণীর স্বভাববৈশিষ্ট্যের প্রতি ব্যঙ্গও তাঁহার বহু কবিতায় দেখা গিয়াছে। কবি প্রায়ই ভোজনরসিকতা লইয়া হাস্যরসমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহার ফলে বহু ক্ষেত্রে ব্যঙ্গের আক্রমণের দিকটি কিছুটা ঢাকা পড়িয়া রসিকতাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ঈশ্বরগুপ্তের যোগ্য উত্তরাধিকার লক্ষ্য করা যায় হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতাগুলির মধ্যে। মহাকাব্য রচনায় তিনি মধুসূদনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও ব্যঙ্গকবিতার আদর্শটি ঈশ্বরগুপ্তের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। হাস্যরস বহুক্ষেত্রেই নানাবিধ সামাজিক সাময়িক প্রসঙ্গকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু রচনাভঙ্গিতে উহা একালের আস্বাদকেও স্পর্শ করিয়াছে। হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ কবিতায় একদিকে যেমন বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি দেশবাসীর চরিত্রবিহ্বলতার প্রতিও আঘাত হানা হইয়াছে। তাঁহার রচনাভঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ব্যঙ্গের রঙে অঙ্কিত চিত্রমালা এবং তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি পাত্রপাত্রীর মুখাবয়ব।

হেমচন্দ্র

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চারিসর্গাত্মক একটি ছোটো ব্যঙ্গকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম "ভারত-উদ্ধার"। মধুসূদনের মহাকাব্যিক রীতির অনুসরণে বীররস ও অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ করিয়া "ছুচুন্দরীবধকাব্য", "মেঘনাদ-ব্যঙ্গকাব্য" প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। এগুলি শিল্পোৎকর্ষের বিচারে মূল্যহীন রচনা। এই ধারায় সার্থকতম রচনা ইন্দ্রনাথের "ভারত-উদ্ধার"। সমকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরকেও নকল বীররসাত্মক কাব্যের মাধ্যমে ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন কবি। অতিশয়োক্তির ঘন রঙে ব্যঙ্গ মাঝে মাঝে আজগুবি পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া উদ্দাম হাস্যের জন্ম দিয়াছে।

ইন্দ্রনাথ

ঊনবিংশ শতাব্দীর হাস্যরসের অন্যান্য কবির মধ্যে বিশেষ করিয়া নাম করিতে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। দ্বিজেন্দ্রলালের "আষাঢ়ে" এবং "হাসির গান" কাব্য দুইটি বুদ্ধিমার্জিত হাস্যরসে পরিপূর্ণ। বুদ্ধিমার্জিত হইলেও উহা স্মিত নয়, মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠ।

দ্বিজেন্দ্রলাল

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক প্রতিভায় হাস্যরসাত্মক কবিতা খুব সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত

হইয়া উঠে নাই। তাঁহার "প্রহাসিনী" কাব্যগ্রন্থে কৌতুকরস খুবই স্মিত এবং কোমল হইয়া দেখা দিয়াছে; উহার মধ্যে ব্যঙ্গের ধার বা কৌতুকরসের গভীরতা না থাকিলেও উহার নিজস্ব যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহা অবহেলার সামগ্রী নয়। কবির "খাপছাড়া"র অধিকাংশ ছড়াই Nonsense Rhyme লিখিবার চেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের "হসন্তিকা" দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থক উত্তরাধিকার বহন করিতেছে। ছন্দের নিপুণতায় ব্যঙ্গের সহিত রঙ্গের মিশ্রণে উহাদের কৌতুক যেমন মার্জিত তেমনি প্রগল্ভ। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় যে শাণিত ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার ভিত্তিতে রহিয়াছে কবির জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য;—তাঁহার নৈরাশ্য ও বিদ্রোহ। প্রমথ চৌধুরীর ব্যঙ্গ বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। সর্ববিধ ভাবালুতা এবং রোম্যান্টিক অতিকল্পনার বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান। শব্দচয়নে ও অলংকারাদির প্রয়োগে কবির সচেতন নিষ্ঠা হাস্যরসসৃজনে বিশেষ সার্থক হইয়াছে। নজরুল ইসলামের "চন্দ্রবিন্দু" বইয়েও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ কবিতা আছে। সুকুমার রায়ের Nonsense Rhyme-এ আমরা যে সুরের সাফল্য লক্ষ্য করি, তাহা বিশ্বসাহিত্যে এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সহিত উপমিত হইতে পারে। অতি আধুনিক কবিদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, প্রমথনাথ বিশী এবং বনফুলের কবিতায় ব্যঙ্গের সুরটি অনুশীলিত হইতে দেখা যায়।

রবীন্দ্রোত্তর কবিরা

[২] গল্পোপন্যাস

বাংলা হাসির গল্প প্রথম লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র। "সুবর্ণগোলক" এবং "গালগল্প" নামে যে লেখা দুইটি 'লোকরহস্যে'র অন্তর্ভুক্ত তাহা নিঃসন্দেহে ছোটগল্পজাতীয়, নিবন্ধ বা নকশাজাতীয় নহে। 'সুবর্ণগোলকে' আজগুবি কল্পনাকে নাটকীয় ভঙ্গিতে চমৎকার দানা বাঁধানো হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র একটি ক্ষুদ্র ব্যঙ্গোপন্যাসও রচনা করেন। "মুচিরামের গুড়ের জীবনচরিত" ব্যঙ্গরচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে গ্রাহ্য হইবে। ইহাতে সমকালীন সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখকের যে-সমালোচনা রূপ পাইয়াছে, উহার অঙ্গুলিসংকেত শাশ্বত-কালের বিমূঢ়তা, স্বজনপোষণ, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, তোষামুদিকে বিদ্ধ করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমের মুচিরাম রচনার কিছু পূর্বে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ব্যঙ্গোপন্যাস "কল্পতরু" প্রকাশিত হয়। তাঁহার "কল্পতরু" এবং "ক্ষুদিরাম" ব্যঙ্গ উপন্যাস হিসাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ক্ষুদিরাম যেন পূর্ণদেহ উপন্যাস হইয়া ওঠে নাই। ইন্দ্রনাথ কতকটা রক্ষণশীলতার দিক হইতে সমকালীন জীবন-ধারাকে আঘাত করিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পিত ঘটনাগুলি অপেক্ষা বর্ণনার ভঙ্গি এবং মন্তব্যের তির্যকতা অধিক উপভোগ্য। দীনবন্ধু মিত্র "যমালয়ে জীবন্ত মানুষ" নামে একটি হাস্যরসাত্মক

উনবিংশ শতাব্দীর ব্যঙ্গ গল্পোপন্যাস

গল্প লিখিয়াছিলেন। কল্পনার উদ্ভটতা ইহাঁর হাস্যরসের ভিত্তি। ইন্দ্রনাথের সমকালে যোগেন্দ্রনাথ বসু "কৌতুককণা" নামক গল্পসংগ্রহ, "শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী" এবং "মডেলভগিনী" নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। শেষোক্ত উপন্যাসে আধুনিকতার বিরুদ্ধে আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র। "শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী" সুবৃহৎ ব্যঙ্গোপন্যাস। বক্র-দৃষ্টিতে উনবিংশ শতাব্দীর নব ভাবনার স্বরূপটি তুলিয়া ধরা হইয়াছে এই উপন্যাসে। ইহার হাস্য প্রগল্‌ভ নয় এবং ব্যঙ্গ তীব্রও নয়। কিন্তু উপন্যাসের আদ্যন্ত হাস্যদৃষ্টিটি অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত।

এই পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৌতুকগল্পের লেখক হইলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা গালগল্প, উদ্ভট গল্পের লৌকিক রীতিটিকে মার্জিত করিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গরসের সহিত যুক্ত করিয়া যে রসিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অনন্য।

ত্রৈলোক্যনাথ

রবীন্দ্রনাথের গল্পসাহিত্যে কৌতুকরসের উদাহরণরূপে "চিরকুমারসভা"র উল্লেখ করা চলে। ইহাতে ব্যঙ্গের ধার নাই। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কখনও ব্যঙ্গ বা উচ্চহাস্যের পথ ধরেন নাই। তিনি এই উপন্যাসে গভীর humour সৃজনের সাধনাও করেন নাই। ইহা সরল তরল ও মধুর হাস্যরসে পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যে আমরা পরশুরামের ন্যায় অতি উচ্চ প্রতিভাধর লেখকের সন্ধান পাইয়াছি। ত্রৈলোক্যনাথের ধারাটিকে আরও মার্জিত এবং আধুনিক জীবন-দৃষ্টির সহিত সমন্বিত করিয়া তিনি যে গল্পগ্রন্থগুলি লিখিয়াছিলেন ("গড্ডলিকা", "কজ্জলী", "হনুমানের স্বপ্ন", "কৃষ্ণকলি", "ধুস্তুরি মায়া", "গল্পকল্প", "আনন্দীবাঈ", "নীলতারা", "চমৎকুমারী" প্রভৃতি) তাহার রসগভীরতা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলিতে তির্যক মনোভাব প্রকটিত। উহার ভাষারীতির মার্জিত ঔজ্জ্বল্য এবং বক্র কটাক্ষ লক্ষ্য করিবার মতো। বিংশ শতাব্দীর বাঙালী লেখকেরা হাস্যরসাত্মক উপন্যাস রচনায় উল্লেখযোগ্য সাধনার পরিচয় দেন নাই। তবে ছোট-গল্প রচনায় কৌতুকরস নানা ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। হাসির গল্প লিখিয়া আধুনিক যে সব লেখক প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশী, শিবরাম চক্রবর্তী, পরিমল গোস্বামী, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বনফুল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রোত্তর গল্পকার

[৩] নাটক

বাংলা নাটকে হাস্যরস দুইভাবে প্রকটিত হইয়াছে: (১) প্রহসন নামক একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হাস্যরসপ্রধান নাট্যধারা। (২) গম্ভীর রসের নাটকে হাস্যরসাত্মক দৃশ্য বা চরিত্রের উপস্থাপন। 'প্রহসন' নামটি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য হইতে গৃহীত হইলেও বাংলা প্রহসন ইংরেজি 'কমেডি অব ম্যানার্‌স্‌'-এর আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে। সংস্কৃত প্রহসনে ঠক, বারাঙ্গনা, মণ্ডপ, নীতিহীন বিচারক, অসৎ গুরু প্রভৃতিকে ব্যঙ্গ করিবার

উদ্দেশ্যে সামান্য কাহিনীসূত্রে স্থূল হাস্যরসাত্মক দৃশ্যসমূহের অবতারণা করা হইত।

প্রহসন—রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু

বাংলা প্রহসন প্রথম হইতেই সামাজিক সমস্যাকে আক্রমণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে গঠনে শিথিলতা প্রথম দিকে ছিল। উদাহরণ হিসাবে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র নাম করা চলে। মধুসূদন "একেই কি বলে সভ্যতা?" এবং "বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ" নামক প্রহসন-দুটিতে পুরোপুরি ইংরেজি রীতির অনুসরণ করিলেন। কাহিনীগ্রন্থনের ঘনীভূত নৈপুণ্যে, চরিত্রের বক্র ভঙ্গ রূপাঙ্কনে, সংলাপের শাণিত বিদ্রূপাত্মক সুরে সর্বোপরি সমাজসমালোচনার তীক্ষ্ণ সামগ্রিকতায় এই প্রহসন দুটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা হইয়া আছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবা'র একাদশী' 'জামাইবারিক' এবং 'বিয়েপাগলা বুড়ো'র মধ্যে কোথাও কোথাও মধুসূদনের অনুসরণ আছে। তবে মধুসূদনের ন্যায় নিটোল নৈপুণ্য তিনি দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রহসনের শ্রেষ্ঠত্ব কতকগুলি চরিত্রচিত্রণে, হাস্যরসের অন্তরালবর্তী করুণ রসের উৎসটি দেখাইয়া দেওয়ায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসী কৌতুকনাট্যের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৌলিক প্রহসনেও ফরাসী মেজাজ সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। উহাতে ব্যঙ্গ অপেক্ষা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল

রঙ্গরসেরই প্রাধান্য। গিরিশচন্দ্র গম্ভীর ও আবেগপ্রধান লেখক। তাঁহার প্রহসন লেখার চেষ্টা তাই সফল হয় নাই। অমৃতলাল বসু ব্যঙ্গশিল্পীর মেজাজ লইয়া জন্মিয়াছিলেন। তিনি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজসমস্যার বিচার করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রগুলি প্রায়ই 'ক্যারিকেচার' হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভাষাপ্রয়োগে নাট্যকারের তীক্ষ্ণ সচেতনতা উহাদের শাশ্বত মূল্য দিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন দুটির বিষয় ও মেজাজ স্বতন্ত্র। উহার রস মার্জিত, সমাজব্যঙ্গ অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বভাব-দৌবল্যের প্রতিই ইঙ্গিতটা অধিক।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে সমাজসমালোচনামূলক প্রহসনের জোয়ার বহিয়াছিল। সে সব রচনা কিছুমাত্র উল্লেখযোগ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমারসভা'. এবং 'শেষরক্ষা' নামে যে নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন উহা সমাজব্যঙ্গমূলক প্রহসন নয়, ব্যক্তিচরিত্রের ভিত্তিতে গড়িয়া

রবীন্দ্রনাথ

তোলা কৌতুকনাট্য। উহাদের মার্জিত রসের আভিজাত্য অত্যন্ত সুরুচিসম্মত। এইসব রচনায় কৌতুকের ভিত্তি মানুষের অসম্ভব প্রতিজ্ঞায়, ঘোষিত আদর্শে এবং আচরণের পার্থক্যে। কবি প্রায়ই সন্ন্যাসধর্মকে কৌতুকের বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকে প্রহসনের ধারাটি সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বনফুলের

রবীন্দ্রোত্তর

"দশভাণ", প্রমথনাথ বিশীর "মৌচাকে ঢিল", "ঋণং কৃত্বা", "ঘৃতং পিবেৎ" প্রভৃতি নাট্যরচনার নাম করা

যায়। রঙ্গমঞ্চে কচিৎ কখনো হাস্যরসাত্মক নাটকের অভিনয় হয়, তাহা প্রায়ই স্থূল এবং অকিঞ্চিৎকর।

গম্ভীররসের নাটকে হাস্যরসাত্মক চরিত্র ও দৃশ্য সংস্থাপনের দিক হইতে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য বিদূষকচরিত্র। প্রধানতঃ এই জাতীয় একটি চরিত্র অবলম্বন

বিদূষক

করিয়া ট্র্যাজেডি বা রোমান্টিক নাটকেও কৌতুকরস পরিবেশন করা হইয়া থাকে। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের স্থূলতা বাংলা নাটকে ক্রমে কমিয়া আসে। সেক্স্‌পীয়রের কোর্ট-জেষ্টার ধরনের চরিত্রবৈশিষ্ট্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই ধরনের সৃষ্টির মধ্যে মধুসূদনকৃত ধনদাস, গিরিশচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন ভক্ত বিদূষক-কঞ্চুকীরা, দ্বিজেন্দ্রলাল পরিকল্পিত দিলদার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গম্ভীর রসের নাটকে নাটকীয় বিশ্রান্তি হিসাবে লঘুদৃশ্যের অবতারণা করা হইয়া থাকে। নিপুণ হস্তে না পড়িলে উহা সস্তা জনপ্রিয়তার অঙ্গমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। বাংলা নাটকে অনুরূপ অনেক উদাহরণ আছে।

[৪] গদ্য-রচনা

বাংলা নিবন্ধ নক্‌শাজাতীয় রচনায় কৌতুকরস প্রকাশ পাইয়াছে সুপ্রচুর। তাহার মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ চিরস্মরণীয় হইবার উপযুক্ত। "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা"য় কালীপ্রসন্ন

হুতোম প্যাঁচা ও কমলাকান্ত

সিংহ ব্যঙ্গরসের সহযোগে ভাষাকে একেবারে শিখরদশনা করিয়া তুলিয়াছেন। ব্যঙ্গচিত্র রচনায় তাঁহার নিপুণতা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। এই জাতীয় অনেক নকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি উল্লেখের যোগ্য নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তের দপ্তরে" যে কৌতুকরস প্রকাশ পাইয়াছে, বিশ্বসাহিত্যে তাহা অনবদ্য। কমলাকান্তের চরিত্রভিত্তিতে রহিয়াছে কৌতুকের বীজ এবং সমাজব্যঙ্গে রূপককল্পনার বৈশিষ্ট্যে তাহাকে বঙ্কিম যেভাবে ব্যবহার করিয়া ব্যঙ্গ ও উদ্ভটের যুগ্মধারে ঘা দিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরই মাত্র করায়ত্ত।

গম্ভীর প্রবন্ধে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী এবং রামেন্দ্রসুন্দর সংযত কৌতুকের একটি সুর বহাইয়াছেন। কোথাও মন্তব্যে, কোথাও ভাষার ব্যঞ্জনায়, কোথাও

গম্ভীর প্রবন্ধে কৌতুক

উদাহরণের অভাবিতপূর্ব অভিনবত্বে দৃষ্ট এই কৌতুকরস প্রবন্ধের বিষয়গাম্ভীর্যে কোনোরূপ হানি ঘটাইতে পারে নাই। গম্ভীর ও কৌতুকের এই আশ্চর্য মিশ্রণ বাংলা সাহিত্যের সম্পদবিশেষ।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যের নানা ধারায় হাস্যরসের যে সাধনা চলিয়াছে তাহার মূল্য কম নয়। বাঙালীর জীবনে নানা বিপর্যয় চলিলেও মনের সেই প্রসন্নতা জাতি রক্ষা

উপসংহার

করিতে পারিয়াছে যাহাতে একজাতীয় সাহিত্যসৃষ্টি ও উপভোগ করা সম্ভব হয়। হাস্যরসাত্মক সাহিত্যে বাঙালীর মনের শক্তি-মুক্তি প্রতিবিম্বিত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি

ভূমিকা

সাহিত্যে প্রকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। প্রকৃতিকে উপাদানরূপে কবিদের ব্যবহার করিতেই হয়, কারণ মানবজীবনকে প্রকৃতি চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। জীবনকে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃতিকে মানবজীবনের পটভূমি মাত্র করিয়া না রাখিয়া একটা পরিপূর্ণ স্বাধীন সত্তারূপে অনুভব করা কবির দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতা এবং কল্পনার গভীরতার অপেক্ষা রাখে। প্রাগাধুনিক বাংলা কবিতায় প্রকৃতির চিত্র মাঝে মাঝে স্থান পাইলেও কোথাও প্রাধান্য পায় নাই; সেইজন্য সে-সব বর্ণনা হয় গতানুগতিক না হয় পটভূমিমাত্র। কচিৎ প্রকৃতির রূপ জীবন সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

[এই গ্রন্থের 'মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় প্রকৃতি' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য]

আধুনিক কবিতায় প্রকৃতির ভূমিকা প্রশস্ততর

ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে বাংলা সাহিত্যে যে নূতন ধারার সূত্রপাত ঘটিল তাহার মূল কথাটি হইল মর্ত্যপ্রেম। এই বিশ্বপৃথিবীটি তুচ্ছ নয়, যেমন মূল্য আছে মানব-জীবনের, তেমনি এই প্রকৃতির। ধর্ম, ভক্তি, দেবতার স্থানে সাহিত্যে নূতন বিষয়বস্তুর অবতারণা ঘটিল। প্রকৃতি ও মানুষ উহার কেন্দ্রে আসিয়া বসিল। ইংরেজী সাহিত্যে প্রকৃতি বহু পূর্বেই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং রসবস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যেও প্রকৃতির প্রতি কবিদের দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। প্রধানতঃ এই দুইটি কারণে মধ্যযুগের তুলনায় আধুনিক কবিতায় প্রকৃতির ভূমিকা অনেক প্রশস্ত।

ঈশ্বর গুপ্ত

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যেই প্রথম প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিল। তাঁহার ঋতুবিষয়ক কবিতাগুলি প্রকৃতির বস্তুপরিচয়ে সমৃদ্ধ। কাব্যমূল্যে সেরূপ উচ্চ না হইলেও ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যরচনার একটি প্রধান বিশেষত্ব তাঁহার সংস্কারহীন দৃষ্টি। নিজের স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তিনি প্রকৃতির দিকে চোখ মেলিয়া তাকাইয়াছেন। সহজ ও অরঞ্জিত দৃষ্টিতে দেখা প্রকৃতির রূপ তাঁহার কবিতায় মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে প্রকৃতিবিষয়ক নূতনত্বের ইঙ্গিতটুকু মাত্র ছিল, শিল্পসার্থকতা ততটা ছিল না এবং উহার কারণ কবির অপরিণত শিল্পচেতনা।

মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র

ঈশ্বর গুপ্তের পরে মধুসূদনের অতি-উচ্চস্তরের প্রতিভার স্পর্শে বাংলা কবিতা নানাদিকে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। মধুসূদনের কাব্য প্রকৃতির রূপপ্রকাশে কিন্তু তুলনা-মূলকভাবে কুণ্ঠিত। অবশ্য তাঁহার ক্লাসিকধর্মী রচনাবলীতে প্রকৃতি-সম্পর্কিত স্বাতন্ত্র্যবোধ কিছুটা সংকুচিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবি হোমর হইতে মিলটনের যুগে—ব্যাস-বাল্মীকির জগতে যতই মানসভ্রমণ করুন না কেন, পুরাদস্তুর ক্লাসিকধর্মী হইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার মধ্যে রোম্যান্টিক দৃষ্টির সূক্ষ্ম একটি সূত্র ছিল। একারণেই

প্রকৃতিচেতনায় তিনি অনুল্লেখ্য নন। কবির "তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে" রোম্যান্টিক প্রকৃতিচেতনার কিছুটা পরিচয় পাই। প্রকৃতির সুন্দর বস্তুসমূহের তিল তিল করিয়া উত্তমাংশ সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমা গঠন করা হইল। এই রমণীর আদর্শরূপে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যরহস্যের কেন্দ্রটি রচিত হইয়াছে যেন। কবি তিলোত্তমার সহিত প্রকৃতিসৌন্দর্যের যে সম্বন্ধটি আঁকিয়াছেন রোম্যান্টিক কবির হাতেই মাত্র তাহা প্রকটিত হইয়া উঠিতে পারে। মধুসূদনের "মেঘনাদবধকাব্যে" প্রকৃতিচিত্র প্রধানতঃ পটভূমিতে স্থান পাইয়াছে। ক্লাসিক আদর্শের মহাকাব্যে এইরূপ ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার কথোপকথনে আরণ্য প্রকৃতি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু প্রাণবন্তই নয়, মানবহৃদয়ের সহিত তাহার নিবিড় সম্পর্কও গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সীতা যেন মূর্তিমতী বনদেবী হইয়া উঠিয়াছেন। এই কল্পনার মূলে কালিদাসের শকুন্তলাচরিত্রের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কবির মৌলিক ভাবনা এবং রচনার সৌকর্য সেই প্রভাবকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। "ব্রজাঙ্গনাকাব্যে" মধুসূদন যে বৈষ্ণব আদেশের পদরচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার সৃষ্ট রাধিকা সখীহীনা, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান তার সখীস্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাদের লক্ষ্য করিয়াই রাধা প্রেমের উচ্ছ্বাস এবং আক্ষেপ ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু রসরূপের দিক দিয়া এই কবিতাগুলি খুব সার্থক হয় নাই। উল্লিখিত নিসর্গবস্তুটির চিত্রসৌন্দর্য কবির ভাষায় ধরা পড়ে নাই। নিসর্গ বিষয়ে কোনো মুগ্ধতা রাধার মনের উপরে ছায়া ফেলে নাই। মধুসূদন অবশ্য সংস্কৃত ধ্বনিগাম্ভীর্যের সহায়তায় প্রকৃতির রুদ্রগম্ভীর রূপাঙ্কনে তুলনামূলক সাফল্য দেখাইয়াছেন। মধুসূদনের খাঁটি নিসর্গকবিতা স্থান পাইয়াছে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যকবিতায় প্রকৃতিবর্ণনার স্থান প্রচুর। কিন্তু তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু প্রাচীন এবং তাঁহার রচনাভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণ চিরাচরিত সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই কারণেই প্রায়ই তাঁহার প্রকৃতিবর্ণনা সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই। হেমচন্দ্র প্রত্যক্ষতঃ ইংরেজী কবিতায় অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রকৃতি-বিষয়কে অবলম্বন করিয়া তিনি আপন চিত্তভাবকে জাগ্রত ও বিস্তারিত করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রায়ই তাহা খাঁটি কাব্যকল্পনা না হইয়া মননপ্রাধান্যকে প্রশ্রয় দিয়াছে। নবীনচন্দ্রও প্রধানতঃ মহাকাব্যজাতীয় রচনায় আপনার প্রতিভার প্রকাশের পথ খুঁজিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার দৃষ্টিতে সরসতা বেশী ছিল, হেমচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার সফলতাও ঘটিয়াছে বেশী। এ বিষয়ে জনৈক সমালোচকের উক্তি উদ্ধার করা যায়: "প্রাচীন আলংকারিক রীতিতেও যখন নবীনচন্দ্র প্রকৃতির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, তখনও এই সরস দৃষ্টি তাঁর কাব্যকে অনেক পরিমাণে সংস্কারমুক্ত করে তুলেছে। তাঁর প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে মাঝে মাঝে কবির নির্বাচনরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই রুচির অভিব্যক্তিতে কবির নিরাবরণ চিত্তটি পাঠকের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে বলে নবীনচন্দ্রের প্রকৃতিবর্ণনায় অন্তর্লীন দৃষ্টির কিছুটা আভাস এসে গেছে।"

বাংলা প্রকৃতিকবিতায় বিস্ময়কর নবীনতা আসিল বিহারীলালের হাতে। তিনি প্রকৃতিচেতনায় প্রথানুগত ছিলেন না। একান্তভাবেই আপনার প্রাণের নিভৃত অনুভূতিটিকে তিনি কাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। বিহারীলাল প্রকৃতির রূপাঙ্কনে অবশ্য সর্বত্র সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। হিমালয়পর্বত বা মহাসমুদ্রের ন্যায় মহান্ গম্ভীরের সামগ্রিক গৌরব তাঁহার কবিতায় প্রকাশ পায় নাই। বরং কোমল ও পেলব নিসর্গবস্তুর রসরূপ নির্মাণে তিনি সফল হইয়াছেন। নিসর্গের উত্তেজনাহীন প্রশান্তি, নিদ্রাঘন ভাবালুতা শ্যামল সরসতার প্রতিই যেন তাঁহার বিশেষ করিয়া আকর্ষণ। কিন্তু এই ভাষারূপ অপেক্ষাও বড় কথা আপন হৃদয়ের সঙ্গে নিসর্গের নিবিড় যোগাযোগের উপলব্ধি। তিনি জনাকীর্ণ নগর ছাড়িয়া নির্ঝরে গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া থাকিয়া তৃপ্ত পাইবেন, হরিণীর গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া অলৌকিক আনন্দ লাভ করিবেন। আসলে বিহারীলাল প্রকৃতিকে একটা অর্ধপরিচয়ের রহস্যে আবৃত করিয়াছেন। আপন অন্তরের সঙ্গে প্রকৃতির একটা রহস্যময় নিবিড় সম্পর্ক অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এই রোমান্টিক রহস্যময়তায়ই বিহারীলালের নিসর্গচেতনা সমাপ্ত হইয়া যায় নাই—তিনি প্রকৃতির রহস্যময়তা ও বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক অসীম সত্তার সন্ধান পাইয়াছেন। এই সত্তারই নাম দিয়াছেন তিনি 'সারদা'। বিহারীলালের রোম্যান্টিক রহস্যচারণা এবং মিষ্টিক উপলব্ধি অনুজ কবিবর্গের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তবে বিহারীলালের সাধারণ প্রভাব পরবর্তীদের উপরে বর্তিয়াছে। সংস্কারের দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে না দেখিয়া তাহার প্রত্যক্ষ রূপের দিকে চাহিয়াছেন কবিরা। মানব-অন্তরের গভীরে প্রকৃতির প্রভাবের সন্ধান করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া আপন চিত্তপদ্মটিকে উন্মোচিত করিয়া ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রপ্রভাববহির্ভূত এই পর্বের কবিদের মধ্যে বিশেষ করিয়া নাম করিতে হয় দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতি ভাষারূপে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নিকট আপনার তীব্র প্রমত্ত আবেদন লইয়া আসিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতিবিষয়ক কবিতায় পৌরুষদৃষ্টির শক্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তবে এই পর্বের কবিরা প্রকৃতির সৌন্দর্যসম্ভোগে উৎসাহ প্রকাশ করিলেও মানবজীবনের সহিত তুলনা করিয়া প্রকৃতিকে অধিক গৌরব দিতে চাহেন নাই। বিহারীলাল অনুভূত সেই ধারাটির পুনরুজ্জীবন এবং শিল্পগত বিস্ময়কর বিকাশ ঘটিল রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথের নিসর্গকবিতা শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেও অনন্য।

বিহারীলাল ও নূতন ধারা

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিভাবনায় সংস্কৃত এবং পশ্চিমদেশীয় কাব্যকল্পনার প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু কবির মৌলিকতাই তাঁহার প্রকৃতিচেতনার আসল কথা। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে আপনার সত্তার একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত এই অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আজ তাঁহার রক্তে রক্তে তরঙ্গিত স্মৃতিকণিকারূপে। আধুনিক মানবসভ্যতার জটিল জালে বদ্ধ হইয়া প্রকৃতির সেই সহজ এবং অপর্যাপ্ত প্রাণ-উৎস হইতে তিনি বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছেন। মনকে বড় করিয়া তুলিয়াছে

মানুষ, প্রাণের উপরে আসন দিয়াছে। প্রাণ-উৎস, সহজ প্রাণের লীলায় বিচিত্র প্রকৃতির সঙ্গে আজ তাহার বিরোধ। সেই বিরোধকে মানিবেন না কবি, কিন্তু বিরহকে উত্তীর্ণ হইবেন কি করিয়া? প্রকৃতিবিরহকে কবি কাব্যকল্পনায় ভরাইয়া তুলিতেছেন। আত্মার পরমাত্মীয় আজ দূরবর্তী হইয়া রহস্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরের গভীরে আছে পরম ঐক্যানুভূতি, আর বাস্তব বিচ্ছেদকে ভাষাসৃষ্ট সৌন্দর্যে, কামনার বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত করিয়া সম্ভোগ করিতেছেন কবি, রহস্যময়ী দূরবর্তিনীর প্রতি দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রধাবিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অনির্বচনীয় উপলব্ধিটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কবি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহার একটি অংশ এখানে উদ্ধার করা হইল: "আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।....তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।" রবীন্দ্রনাথের ঋতুচক্রের কল্পনাটিও অভিনব। কবি বিশ্বস্রষ্টা নটরাজের নৃত্যতালের ছন্দে স্পন্দিত হইতে দেখিয়াছেন জগৎকে। তাঁহারই নৃত্যের তালে তালে ঋতুর থালায় নূতন নূতন পুষ্পপল্লবের সমারোহ। ঋতুচক্রের পরিবর্তনে পুরাতনকে সরাইয়া নূতনের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠা। কোথাও রসোপভোগের জীর্ণতা হইতে তপস্যার কঠোরতায় সমুত্তরণ, কোথাও ক্লিষ্ট রুদ্রসাধনা হইতে রসের বর্ষণে অবগাহন। প্রকৃতিই কবির কাছে মুক্তির বাণীবাহক। জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছতা এবং প্রয়োজনের বন্ধন হইতে আনন্দের জগতে লইয়া যায় প্রকৃতি। রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির ভূমিকা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুধু মাত্র ভাবকল্পনার গভীরতার দিক হইতে নয়, প্রকৃতির বর্ণাঢ্য চিত্র অঙ্কনেও, তাহার সুরটি ছন্দটি ধরিয়া দেওয়ায় কবির সাফল্য প্রায় তুলনারহিত। বাংলার পদ্মাবিধৌত অঞ্চলের সজল সরসতা, কোপাইতীরের রুক্ষ বৈরাগ্য, বর্ষা-শরৎ-হেমন্তের শোভা, বাংলা দেশের বৃক্ষলতাপল্লব পক্ষীপতঙ্গের রূপ তাঁহার সব দার্শনিক ভাবনার মধ্য হইতে উঁকি দিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় কালিদাস রায়—কুমুদরঞ্জন মল্লিক—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—যতীন্দ্রমোহন বাগচি প্রকৃতি-প্রেমিক কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথসুলভ ভাবগভীরতা, কল্পনার প্রসারতা তাঁহাদের

থাকিবার কথা নয়। তাঁহাদের কবিতার বৈশিষ্ট্য হইল বাংলা পল্লীপ্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং সেই প্রীতির বর্ণে তুচ্ছ ক্ষুদ্রকেও অপরূপ করিয়া তোলা।

রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় নিসর্গদৃষ্টি

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় প্রকৃতির প্রতি প্রীতিঘন দৃষ্টিতে দৃক্‌পাত করা হয় নাই। বরং একটি তীক্ষ্ণ বিরূপতা, একটি কুরূপ নিষ্ঠুরতা প্রকৃতির আপাতসৌন্দর্যের মধ্য হইতে তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। সৃষ্টি জুড়িয়া যে দুঃখস্রোত প্রবাহিত, প্রকৃতির মধ্যেও তাহাই সমভাবে প্রবহমান। সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃতিবিষয়ক অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বাংলার বর্ষার বিচিত্র রূপ, বিশেষ করিয়া ধ্বনিসৌকর্য তাঁহার কবিতায় প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোনো বিশেষ নিসর্গদর্শনের পরিচয় তাঁহার কবিতায় মেলে না। নজরুল ইসলামের মধ্যেও প্রকৃতির সুকুমার সৌন্দর্যের প্রতি এক সূক্ষ্ম আকর্ষণ ছিল। কিন্তু উত্তপ্ত উত্তেজনায় তাহা প্রায়ই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তবুও মাঝে মাঝে তাঁহার কবিতায় একটি শান্ত সুরের অনুরণন বাজাইয়াছে প্রকৃতিই। রণক্ষেত্র হইতে যেন বিশ্রামের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে কবিপ্রাণের। অতি আধুনিক কবিদের রচনায় প্রকৃতির যে প্রকাশ-বৈচিত্র্য ঘটিতেছে তাহার সম্যক মূল্য নির্ধারণের সময় এখনও আসে নাই।

কবিতায় প্রকৃতির ভূমিকা মুখ্য থাকে। গল্পসাহিত্যে উহা ততটা প্রধান হইয়া উঠিতে পারে না। মানবজীবন ও ভাগ্যই সেখানে সাহিত্যের উপজীব্য। প্রকৃতি-পরিবেশ প্রধানতঃ কাহিনীর পশ্চাৎপট রচনা করে।

কথাসাহিত্যে প্রকৃতি

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণবাহুল্যের মধ্যেও রাজস্থান মহারাষ্ট্র এবং দিল্লী-আগ্রার প্রকৃতির খাঁটি ছবি বহু ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক রসনির্মিতিতে সহায়তা করিয়াছে। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র পটভূমি অপেক্ষা গভীরতর ভূমিকায় প্রকৃতিকে স্থাপন করিয়াছেন। মানবহৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কহীন রূপরাশির কথা বলিয়াছেন। অপূর্বসুন্দর এই প্রকৃতি কিন্তু মানবপ্রীতির প্রতি নিরাসক্ত—জড়ধর্মী। এই প্রত্যয়টি রবীন্দ্রভাবধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; ইহার মধ্যে আত্মলীনতাবিমুখ যে ভাবটি আছে, তাহার সাদৃশ্য ইউরোপীয় অনেক উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যরথীর রচনায় মেলে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতির ভূমিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানবজীবনকে প্রকৃতির সহিত মিলাইয়া অনুভব করিতে চাহিয়াছেন তিনি, প্রকৃতির স্পর্শ ছাড়া মানবজীবন অসম্পূর্ণ এবং অর্থহীন। প্রকৃতির মধ্য দিয়া দেখা জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি ও ভাব অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে কবির রচনায়। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বাংলার এক একটা বিশেষ অঞ্চলকে পরিপূর্ণভাবে জীবন্ত করিয়া তোলার চেষ্টায় প্রকৃতি নূতন রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কখনো বাংলার গ্রামপ্রকৃতির দৈন্য ও প্রশান্ত, সামান্য আয়োজনে অনন্ত রহস্যের ব্যঞ্জনা তাঁহার পাত্রপাত্রীরা আবিষ্কার করিয়াছে; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো কোনো উপন্যাসে পদ্মাতীরের জীবনযাত্রা, নদী ও মানুষের

সম্পর্ক একটা গভীর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য লইয়া দেখা দিয়াছে। তারাশংকরের উপন্যাসে বাংলার রাঢ়ভূমি যেন প্রাণবন্ত হইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অতি আধুনিক কথাসাহিত্যিকেরা পটভূমিসন্ধানে সুদূর আন্দামান হইতে নাগাপর্বত, মরু-অঞ্চল এবং সমুদ্রগর্ভে ভাসমান জাহাজকে নির্বাচন করিয়া আস্বাদে নবীনতা আনিতেছেন। ইহার মধ্য হইতে কেহ কেহ হয়ত মানব ও প্রকৃতির সম্পর্কজনিত নূতন তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়াও ফেলিবেন।

ভ্রমণসাহিত্যে প্রকৃতি

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও রস প্রকাশ পাইতেছে। প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী হিমবন্ত মানস-সরোবর প্রভৃতির প্রাকৃতিক রূপ ধরা পড়িয়াছে। হিমালয়ের প্রাকৃতিক চিত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জলধর সেন, প্রবোধকুমার সান্যাল এবং একান্ত আধুনিক বহু লেখকের রচনায় স্থান পাইতেছে। বিদেশের প্রাকৃতিক রূপও বহু ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

নাট্যসাহিত্যে প্রকৃতি

নাট্যসাহিত্যে অবশ্য প্রকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটার স্বাভাবিক সুযোগ নাই। তবুও কোনো কোনো কবিপ্রাণ নাট্যকার সংলাপে প্রকৃতির বর্ণনা আনিয়া ফেলিয়াছেন। মধুসূদন বা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের বিরুদ্ধে "কাব্য" করিবার যে অভিযোগ আনা হয় তাহা এই কারণেই। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কয়েকটি সংকেতনাট্যে প্রকৃতির শক্তির ও সৌন্দর্যের দিককে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নাটকগুলি সাধারণ ঘটনাবহুল নাটক অপেক্ষা অনেক স্বতন্ত্র। তাই প্রকৃতিভাবনার অনুপ্রবেশ ইহাদের রূপরসে হানি ঘটায় নাই।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতির ভূমিকা নানা দিক হইতেই গুরুত্বপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ। তবে সাম্প্রতিক রচনায় ইহার মধ্যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটিবে, এরূপ অনুমান করা অসংগত নয়। কালের প্রভাবে পরিবর্তন ঘটিবেই এবং তাহা আমাদের মানিয়া লইতে হইবে।

শিশুসাহিত্য

শিশু-সাহিত্য অথবা কিশোর-সাহিত্য এই দুটি নামেই বাংলা ভাষায় ছোটদের জন্য লেখা সাহিত্যকে বুঝানো হইয়া থাকে। পূর্বে বালকবালিকাদের জন্য রচিত সাহিত্যেও এইরূপ পরিচয়লিপি ব্যবহার করা হইত। তবে শিশুসাহিত্য নামটিই অধিক ব্যবহৃত। ইংরেজিতে এই অর্থে Juvenile Literature নামটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রচিত সাহিত্যকেই শিশু সাহিত্য বা Juvenile Literature বলা হয়।) এখানে 'শিশু' শব্দটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। শিশু অর্থে ব্যাপকভাবে বালক কিশোর প্রভৃতিকেও বুঝিতে হইবে। কোনো কোনো

মনীষী ব্যক্তি অবশ্য শিশুসাহিত্য বলিয়া স্বতন্ত্র একটি শাখা-নির্দেশের পক্ষপাতী নহেন। প্রমথ চৌধুরীর ন্যায় ব্যক্তিও এরূপ কথা বলিয়াছিলেন: "শিশুসাহিত্য বলতে কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারে না।...ছেলেরা যে সাহিত্য পড়ে আর পড়তে ভালবাসে, তা মুখ্যতঃ কি গৌণতঃ ছেলেদের জন্য নয়, বড়দের জন্যই লেখা হয়েছিল। রূপকথা, রামায়ণ, মহাভারত, আরব্য উপন্যাস, Don Quixote, Gulliver's Travels, Robinson Crusoe—এ সবের কোনটিই আদিতে শিশুদের জন্য রচিত হয় নি। এর থেকেই প্রমাণ হয়, উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যেরই একটি বিশেষ অঙ্গ ছেলেরা আত্মসাৎ করে নেয়।" কথাটি আংশিক সত্যমাত্র। বড়দের সাহিত্যের একটা অংশ যেমন স্বাভাবিক ভাবেই ছোটদের আস্বাদযোগ্য, তেমনি ছোটদের নিজেদের ভাব ভাবনার একটা নিজস্ব জগৎ আছে। তাহাদের মনের এমন একটা গঠন আছে যাহাতে তাহাদের জন্য বিশেষ ভাবে চিহ্নিত গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন আছে।

ভূমিকা

শিশুসাহিত্যের লক্ষ্য এবং লক্ষণবিশ্লেষণ করিলে বড়দের সাহিত্যের সহিত ইহার পার্থক্যটিও ধরা যাইবে। (১) শিশুর মন পরিণামমুখী। ধীরে ধীরে বাহিরের জগতের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার বিকাশ ও পরিণতি ঘটিতেছে। শিশুর শিক্ষা, খেলাধুলা, খাদ্য, সাহিত্য সবকিছুর মূল লক্ষ্যই হওয়া উচিত তাহার দেহমনের সুস্থ এবং স্বাভাবিক বিকাশ। বড়দের সাহিত্যের এরূপ কোনো স্পষ্ট লক্ষ্য থাকে না। কারণ পরিণত-মন মানুষের নিকটই তাহার আবেদন। অবশ্য উৎকৃষ্ট সাহিত্যপাঠের ফলে পাঠকচিত্ত প্রয়োজনাতীত আনন্দলাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হয়। মানবচিত্তের এই কর্ষণা খুব বড় কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু মানবমন গঠনের দায়িত্ব সাহিত্য গ্রহণ করে না। এই দুইটি ব্যাপারের মধ্যের সূক্ষ্ম পার্থক্যটি অবশ্যই অনুধাবনযোগ্য। (২) শিশুসাহিত্যের সহিত বড়দের একটি বড় পার্থক্য শিক্ষাঘটিত প্রশ্নে। বড়দের সাহিত্যে দুই ভাগ—মনন সাহিত্য এবং রসসাহিত্য। রসসাহিত্যকেই আমরা খাঁটি সাহিত্য বলি। মননসাহিত্যের সাহিত্য অভিধা নেহাৎই ভাষাসম্পর্কের জন্য। ছোটদের ক্ষেত্রে রসসাহিত্যকে পৃথক করিয়া খাঁটি সাহিত্য বলিয়া নির্দেশ করা চলে না। রসসাহিত্য এবং জ্ঞানমূলক সাহিত্য সেক্ষেত্রে খুবই কাছাকাছি মিলিয়া মিশিয়া থাকে। কোনো গল্পকবিতার সহিত যদি সূক্ষ্মভাবে এবং সুন্দরভাবে শিক্ষার লক্ষ্য মিলিত হয়, তবে তাহাকে নিন্দা করা যায় না, সাহিত্যধর্মচ্যুত বলিয়া সমালোচনাও করা যায় না। অথচ বড়দের সাহিত্যে কোথাও নীতি ধর্ম অন্য কোনোবিধ বক্তব্য প্রচারের চেষ্টা দেখা গেলে উহাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়। পরিণত সাহিত্যের শিল্পগুণ অসামাজিক মানসিকতা, অবৈধ সমস্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বরং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠসাহিত্যে বিকৃতমনা মানুষের

শিশুসাহিত্যের লক্ষ্য ও লক্ষণ— বড়দের সাহিত্যের সঙ্গে পার্থক্য

শুমনের বিশেষত্ব

সহিত জড়িত

চরিত্র-রূপ প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। ম্যাকবেথের চরিত্রে যে ঈর্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষার রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে ছোটদের সাহিত্যে তাহাকে বড় জোর 'ভিলেন'রূপে দেখানো যাইতে পারে। তাহাও সমীচীন নয়। পাপের বিচিত্র গতি, প্রবল আকর্ষণ পরিশেষে অধঃপতিত হইলেও ছোটদের সাহিত্যে উহাকে স্থান দেওয়া সমীচীন নয়। পরিণত সাহিত্যের শিল্পগুণ পাপপুণ্য, নীতি-দুর্নীতি নিরপেক্ষ। মানবজীবন ও ভাগ্যের গভীর রহস্যে তাহার অবগাহন এবং বিশ্লেষণ। কিন্তু ছোটদের সাহিত্যের মূল্যবিচারের পদ্ধতিই স্বতন্ত্র, শিক্ষাগুণকে সেখানে শিল্পগুণের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে। (৩) ভাব-গভীরতা এবং জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক হইতেও শিশুসাহিত্য বড়দের সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগতের। বড়দের সাহিত্যে চরিত্রগত জটিলতা এবং মনস্তাত্ত্বিক গভীর বিশ্লেষণ না থাকিলে তাহাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে না। কিন্তু ছোটদের সাহিত্যে এরূপ গভীরতা—জটিলতা থাকিবার কথা নয়। কারণ মানবমনের সেই স্তরে শিশুদের বোধ প্রবেশ করিতে পারিবে না। শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যেও তাই মানবমনের তরল সরল সহজ দিকটির চিত্রই থাকিবে। ছোটদের সাহিত্যে মনোলোক অপেক্ষা বাহিরের ঘটনাজগতের প্রাধান্য ঘটিলেও সবদা তাহাকে নিন্দা করা যায় না। কিন্তু বড়দের সাহিত্যে মনোলোকই প্রাধান্য পাইয়া আসিতেছে; ঘটনা মুখ্য হইয়া উঠিলে তাহার শিল্পোৎকর্ষ একালে আর স্বীকৃত হইবে না। (৪) বড়দের সাহিত্যে নবরস এবং উহাদের বিচিত্র ও জটিল প্রয়োগই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ছোটদের সাহিত্যে আদিরস প্রকাশের সুযোগ নাই। কারণ আদিরসাত্মক মনোভাবের ভিত্তি অপরিণত মনে গড়িয়া উঠে না। উহার প্রকৃত রসাস্বাদনও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শান্তরসটিও শিশুদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় মনে হইবে না। তাহাদের মধ্যে যে চঞ্চল গতিময় ভাব আছে উহাকে বিকশিত করিতে হইবে, উহাকে অবদমিত করিলে চলিবে না। বীভৎস রস বালকদের মনে সুন্দরের প্রতি বিরূপতা জাগাইয়া তুলিবে এবং ট্র্যাজেডিজাতীয় ঘনীভূত করুণরস হজম করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। ছোটদের সাহিত্যে হাস্য, সহজ করুণ এবং বীর রসেরই প্রাধান্য থাকা উচিত।

ভাবগভীরতা ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার পরিহার

শিশুসাহিত্যে রসাবেদনের স্বাতন্ত্র্য

ছোটদের এবং বড়দের সাহিত্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কিন্তু তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটা অংশে ছোটদেরও অধিকার আছে। তাহা ছাড়া শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য বয়স্ক লোকেদেরও আনন্দ দিতে পারে। সমালোচকের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি কিছু অতিশয়োক্তি মনে হইলেও মোটামুটি অসত্য নয়: "No book is really worth reading at the age of ten which is not equally (and often far more) worth reading at the age of fifty."

শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যের সর্বজনীনতা

শিশুসাহিত্যের মধ্যে এমন কিছু অংশ আছে যেখানে বয়স্ক ও শিশুর মনোলোকের পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। তাহার একটি অংশ বালকদের উপভোগ্য হইলেও কোনো গভীরতর তাৎপর্যের প্রতি পরিণতমন পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শিশুসাহিত্যের মধ্যে অবশ্য একটা অসুবিধা রহিয়াছে। পাঁচ বছরের শিশু হইতে পনেরো ষোলো বছরের কিশোর পর্যন্ত নানা স্তরের পাঠকের জন্যই এই সাহিত্যের আয়োজন করিতে হয়। সর্বস্তরের পাঠকের মনের গঠন ও পরিণতি একরূপ নয়। লেখক এবং পাঠকদের অভিভাবকেরা এই বিষয়ে সচেতন না থাকিলে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে।

কিছু পূর্বে আমরা শিশুসাহিত্যের লক্ষ্য বিষয়ে যে-আলোচনা করিয়াছি তাহাতে শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ফলে এইরূপ মনে হইতে পারে যে, শিশু-সাহিত্য শিশুশিক্ষারই একটি অঙ্গবিশেষ। কিন্তু শিক্ষা কথাটিকে আমরা খুবই ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছি—উহা স্কুলের পাঠ্যতালিকাভুক্ত শিক্ষা নয়—মনুষ্যত্বের ব্যাপক শিক্ষা। তাহা ছাড়া এই শিক্ষার সহিত আনন্দের সহজ সমন্বয় ঘটানো উচিত। এবং ছোটোদের গল্পকবিতায় শিক্ষা যেন সূক্ষ্মভাবেই মাত্র প্রকাশ পায়, গল্পরসের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে মনকে বশীভূত করিয়া ফেলে। শিশুরা সাহিত্যপাঠের অভ্যাস করিলে উহার নানাবিধ ভালো ফল দেখা দিবে। অবশ্য যদি ভাষায় শিশুসাহিত্যের শাখাটি সংবদ্ধ হয় এবং লেখক প্রকাশক অভিভাবক ও সরকার এবিষয়ে সতর্ক থাকেন। শিশুদের সাহিত্যপাঠের উপকারিতাগুলি সূত্রাকারে বিবৃত হইল : (১) আনন্দের মধ্য দিয়া বিভিন্ন বিষয়ে (তাহার মধ্যে পাঠ্য বিষয়ে এবং পাঠ্যতালিকাবহির্ভূত বিষয়ে) জ্ঞানলাভ। (২) নির্দোষ আনন্দ লাভ। (যে-সব ক্ষেত্রে শিক্ষাদান বা নীতিকথা বলিবার কোনোরূপ চেষ্টা থাকে না, নির্দোষ সরল আনন্দে শিশুর চিত্ত পূর্ণ করিবার চেষ্টা হয় (এই আনন্দ দুঃখের গল্প হইতেও পাওয়া যায়) তাহাদের আকর্ষণী শক্তি কিছু কম নয়। (৩) শিশুর ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি। (৪) সাহিত্যরসের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি। (৫) শিশুর কল্পনা-শক্তির বিকাশ। (৬) জীবনীসাহিত্য পাঠ করিবার ফলে মনীষীদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া। (৭) অ্যাডভেঞ্চার-মূলক গল্প, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি পাঠের ফলে বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা এবং সাহস বৃদ্ধি।

শিশুদের সাহিত্যপাঠের উপকারিতা

বাংলা সাহিত্যে শিশুদের জন্য লিখিত গ্রন্থের এবং পত্রপত্রিকার ভূমিকাটি সামান্য নয়। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে ইহা ক্রমে প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেও শিশুদের মনের খোরাক যোগাইবার উপযোগী আয়োজন ছিল। তবে তাহা সম্পূর্ণ মৌখিক লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। পুঁথিতে লিখিয়া রাখিবার কোনোরূপ প্রেরণা সে সব রচনা পায় নাই। পুরাতন বাংলার লোকসাহিত্যের দুইটি শাখা মুখ্যত: শিশুদের লক্ষ্য করিয়াই সৃষ্ট: (১) রূপকথা; (২) ছড়া। ছেলেভুলানো ছড়ার সহিত মেয়েলি ছড়া বহুস্থানে মিলিয়া গিয়াছে—

পুরানো বাংলার শিশুসাহিত্য

তাহার ফলে কিছু কিছু ছেলেভুলানো ছড়ায় বয়স্কদের মনোলোকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ছেলেভুলানো ছড়ার অসংলগ্ন চিত্রধর্মিতা এবং দ্রুত অপস্রিয়মাণ চিত্ররাজির মাল্যরচনা শিশুমনের পক্ষে বড়ই উপযোগী। ইহার আজগুবি রসও তাহাদের আনন্দরস ও বিস্ময়রস যুগপৎ পরিবেশন করিবে। তবে একান্ত শৈশব অতিক্রম করিবার পরে শিশু-বালকদের এজাতীয় ছড়াসাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকে না। রূপকথার দুটি শাখা। রূপকথা রাজা-রাণী-রাক্ষস-খোক্ষসদের কথা আর উপকথায় পশুপক্ষী জন্তু-জানোয়ারের ভিড়। ইহাদের মধ্যে নানা অবিশ্বাস্য ব্যাপারের ছড়াছড়ি। তবে কাহিনীরসের মধ্যে বিস্ময়জড়িত আনন্দের উপকরণ থাকে। উপকথায় কৌতুক-রসেরই আধিক্য। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রূপকথা প্রসঙ্গে যে মন্তব্যটি করিয়াছেন তাহা বিশেষ মূল্যবান: "শিশুর মনের গোপন কোণে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমাট হইয়া আছে তাহাতে পৃথিবীর সমুদয় রহস্য যেন নীড় রচনা করে; তাহার চিন্তাকাশে যে কুহেলিকা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে, অন্ধকারের তারার মত, নানাবর্ণের আকাশ-কুসুম ফুটিয়া থাকে। পৃথিবীর দানশীলতার শেষ সীমা সম্বন্ধে এখনও তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে নাই; নানারূপ সম্ভব-অসম্ভব আশা-কল্পনার রঙীন নেশায় সে সর্বদা মশগুল। রূপকথা তাহার সম্মুখে একটি দিগন্তবিস্তৃত, বাধাবন্ধহীন কল্পনারাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহার সংসারানভিজ্ঞ মনে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে। রূপকথার সৌন্দর্যসম্ভার তাহারই জন্য, যে পৃথিবীর সংকীর্ণ আয়তনের মাঝে নিজ আশা ও কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে নাই।"

উনবিংশ শতাব্দীর শিশুপত্রিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে গদ্যভাষা যখন সাহিত্যিক রূপ পরিগ্রহ করিল তখন তরুণদের জন্য সহজ ভাষায় গ্রন্থরচনা এবং পত্রিকাপ্রকাশ আরম্ভ হইল। অনেকে এই জাতীয় যাবতীয় রচনাকে শিশুসাহিত্য বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। তাহা হইলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বেশীর ভাগ গদ্যরচনাকে শিশুসাহিত্য বলিতে হয়। বাংলা গদ্যভাষাই তখন শৈশবের সীমায় রহিয়াছে। পাঠকদের মনের শৈশবই ঘোচে নাই। ইহারা প্রকৃত শিশুসাহিত্য নয়। অবশ্য স্কুল বুক সোসাইটির কিছু পুস্তিকা এবং "পশ্বাবলী" নামক পত্রিকার রচনাবলীকে বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রাথমিক চেষ্টা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পত্রপত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল "সখা" (প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত) পত্রিকাটি। নেহাৎ স্কুলপাঠ্য পত্রিকা না হইয়া ইহাতে বাহিরের জ্ঞানের ও আনন্দের হাওয়া প্রবেশ করিয়াছিল। "সাথী" পত্রিকাটিও উল্লেখযোগ্য। শিশুপাঠ্য কবিতা ইহার একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল। এই শতাব্দীর "মুকুল" পত্রিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্রপ্রসাদ, শিবনাথ শাস্ত্রী (সম্পাদক) পত্রিকাটিকে নানা রসের রচনায় সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট শিশুপত্রিকার মধ্যে ১৯১৩ সালে প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর

রায়চৌধুরীর "সন্দেশ"। সম্পাদকের মনোরম রচনাগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতির রচনা ইহাকে সমৃদ্ধ করিত। সুকুমার রায়ের অনেকগুলি লেখা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আধুনিক পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে নবপর্যায় 'সন্দেশ", "মৌচাক", "শিশুসাথী" ও "শুকতারা"র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়।

বিংশ শতাব্দীর শিশুপত্রিকা

বাংলা শিশুসাহিত্যিকদের মধ্যে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনাগুলিকে যাহারা শিশুসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করিতে চান, তাঁহারা উহাদের মর্ম অনুধাবন করিতে পারেন নাই। বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম উল্লেখ্য লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। তিনি হ্যানস্ এ্যাণ্ডারসনের অনেকগুলি গল্পের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মধুসূদন দত্ত প্রণীত নীতিগর্ভ কবিতাগুলিও রচনাসৌকর্যে উল্লেখ্য। কিন্তু পরবর্তীকালে যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বিচিত্রধর্মী রচনায় বাংলা শিশুসাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। রবীন্দ্রনাথের হাতেও শিশুদের উপভোগ্য গল্পকবিতা কিছু বাহির হইয়াছে। উহাদের শিল্পোৎকর্ষ যত অধিক, শিশুমনের উপরে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা বোধ হয় ততটা বেশী নয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনীগুলি বাংলা ভাষার নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছে। উহার বর্ণাঢ্য চিত্ররচনা এবং শিশুমনস্তত্ত্বের তারগুলিতে অঙ্গুলিসঞ্চালন বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বাংলার রূপকথাকে যেভাবে ভাষায় ধরিয়া রাখিয়াছেন তাহার মধ্যে ঠাকুরমা-দিদিমার কণ্ঠস্বর যেন শোনা যায়। সুকুমার রায়ের রচনাবলীর কৌতুকরসাত্মক তাৎপর্য বড়দের অধিগম্য হইলেও উহা প্রত্যক্ষতঃ শিশুদের জন্য লিখিত এবং উহার অনেকটা তাহাদের অবশ্যই উপভোগ্য। পরবর্তী লেখকদের মধ্যে সুখলতা রাও, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুনির্মল বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির নামোল্লেখ করা চলে।

প্রধান শিশুসাহিত্যিকগণ

আধুনিক শিশুসাহিত্যে গোয়েন্দাকাহিনীর সংখ্যা বাড়িতেছে। উহার কিছুটা শিশুবুদ্ধিকে প্রসারিত ও তীক্ষ্ণ করিবার কাজে লাগিতে পারে। কিন্তু উহার অতিচর্চায় এক ধরনের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইবে, যাহা কোনোক্রমেই সমর্থনীয় নয়। শিশুসাহিত্যসৃষ্টি ও পরিবেশনে যদি জাতি সতর্ক না হয় তাহা হইলে জাতির ভবিষ্যৎ অবশ্যই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে।

উপসংহার

পত্রসাহিত্য

চিঠি সকলেই লিখিয়া থাকে। কিন্তু উহার মধ্যের একটি ক্ষুদ্র অংশই সাহিত্যরূপে স্বীকৃতি পায়। পত্রসাহিত্য যেন একই সঙ্গে পত্র এবং সাহিত্য দুইই হয়। সাধারণ মানুষ নানা প্রয়োজনে চিঠি লেখে। তাহার মধ্যে নানা বিষয়ে খবরাখবর থাকে। কিন্তু উহা সাহিত্য নয়। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে কেহ যদি পত্ররচনার রীতিটি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহা সাহিত্য হইতে পারে—পত্রসাহিত্য হইবে না।

পত্রসাহিত্য কি ?

কারণ পত্রের যে বিশেষ গুণ তাহার সন্ধান সেখানে মিলিবে না। পত্রের এই বিশেষ গুণটি কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত "বাংলা সাহিত্যের একদিক" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন : "চিঠিতে থাকে আমার সমগ্র ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ। সেখানে নিজেকে কোথাও বাদ-সাদ দিয়া, কাটিয়া-ছাঁটিয়া, ঢাকিয়া-চাপিয়া, সাজাইয়া-গুছাইয়া বলিবার কোন প্রয়োজনই বোধ করি না ; নির্ভয়ে, অসংকোচে, অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজেকে প্রকাশ করি, লিপির প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠে এক হৃদয়ের সহিত অন্য হৃদয়ের নিবিড় যোগ।" চিঠিপত্রের বড় কথাই হইল আপনাকে এইভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা, নিজের মনোলোকের একটি প্রসাধনহীন মূর্তিকে বাহির করিয়া আনা। ব্যক্তি নিজে ধরা দেয় চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় লেখক খ্যাতির উচ্চ শিখরে উঠিবার পরে হয়তো মনে করিতে পারেন তাহার প্রতিটি পত্রই সযত্নে রক্ষিত সংকলিত ও প্রকাশিত হইবে। এই মনোভাব থাকিলে চিঠির সহজ গুণের স্থানে সচেতন সাহিত্যসৃজনের ভাব আসিয়া পড়িবে। কিন্তু অধিকাংশ চিঠি লিখিবার সময়ে এই মনোভাব থাকে না। চিঠি একজনের কাছে লেখা, তাহা প্রকাশের জন্য নয়। এই রচনা পত্ররচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ইহারই ফলে লেখক যত সহজে এবং যত প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার চিঠিতে আপনাকে ধরা দেন, অন্য কোনো রচনাতেই তাহা ঘটে না। ব্যক্তির বদ্ধমনের গোপন দরজায় কান পাতিয়া আত্মগত সংলাপ শুনিবার অধিকার পাঠক তাহার চিঠিপত্রের মধ্যেই লাভ করিতে পারে। যদি কোনো চিঠি—চিঠির এই নিজস্ব গুণটি পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া রচনাগুণে শিল্পমূল্য লাভ করে—তাহা হইলে পত্রসাহিত্য বলিয়া গণ্য হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে অল্প কয়েকখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পত্রমাত্র, সাহিত্য নয়। বিশেষতঃ তাহা বিষয়প্রধান পত্র—কতকটা business letter ধরনের, আত্মপ্রকাশক চিঠি নয়। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি" বা "জাভাযাত্রীর পত্র" পত্রাকারে লেখা প্রবন্ধ মাত্র। যেমন নাকি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যার নিকট লিখিত পত্রাবলী আসলে পত্রাকারে লেখা প্রবন্ধ। যে-চিঠি আত্মভাবের বাহন এবং যে-চিঠি সচেতন প্রসাধনের সহযোগ ছাড়াই সাহিত্য-সৌন্দর্যের বাহন, তাহাই পত্রসাহিত্য নামের যোগ্য।

পত্রসাহিত্য শুধুমাত্র নিজস্ব আস্বাদবৈশিষ্ট্যের জন্যই উল্লেখযোগ্য নয়, সাহিত্য-সাধনায় ইহা নানাভাবে কাজে লাগে। এ-বিষয়ে অজিতকুমার চক্রবর্তী "কাব্য-পরিক্রমা" নামক গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। লেখকদের কবিপ্রতিভার স্বরূপ বা মনীষীদের ব্যক্তিত্বের মূলটি জানিতে হইলে তাঁহাদের চিঠিপত্রের সাহায্যগ্রহণ যে বিশেষ প্রয়োজন এবিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, "......একথা সত্য যে তাঁহাদের সম্বন্ধে যতই জানা যাইবে, ততই তাঁহাদিগকে বুঝিবার সাহায্য হইবে। অবশ্য তাঁহাদের জীবনের এমন অনেক দিক থাকিতে পারে, যাহার সঙ্গে কাব্যের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহা নিতান্তই বাহিরের দিক। কিন্তু জীবনের ভিতর হইতে যখন কাব্য প্রতিফলিত হইতেছে, তখন জীবনের সন্ধিতে যতই প্রবেশ করা যাইবে ততই অন্তর্লোকের এমন সকল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে যাহা কাব্যের পূর্ণ রসগ্রহণের পক্ষে অমূল্য। এইজন্য ছোটবড় সকল খবরই চাই—অনেক-কিছু সংগ্রহ হইলে তখন তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সমালোচক সাঁৎ বভ (Sainte Beuve) যে-সকল লোকের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের সকলেরই চিঠিপত্র হইতে ও অন্যান্য নানা ছোটখাটো ঘটনা হইতে তাঁহাদের অন্তরের প্রতিকৃতিটি তিনি আঁকিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। জুবেয়ার, মাদাম রোলাঁ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধগুলি পড়িলে একথা সুস্পষ্ট হইবে। ম্যাথু আর্নল্ড অনেক সমালোচনায় এই পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন। ইহার কারণ, চিঠিপত্র যে শুধুই সংবাদ বহন করিবার কাজ করে তাহা নহে, চিঠিপত্রও মানুষের ভাবপ্রকাশের একটি উপায়। যেমন নাট্য উপন্যাসে, যেমন প্রবন্ধ, গল্প বা গীতি-কবিতায় মনের ভাবকে মানুষ বাহিরে স্থায়ী আকার দান করিয়া সার্থক হয়, চিঠিতেও আর এক রকমে তাহার সেই কার্যই সাধিত হয়। উপন্যাসে বা নাটকে ব্যক্তিগত প্রকাশের স্থান অল্প—সেখানে চিত্তভাবকে নানা লোকচরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া প্রশস্ত ক্ষেত্রে সাড়া দিয়া প্রকাশ করিতে হয়। ছোটগল্পে সে ক্ষেত্র আরও একটু সংকীর্ণ—কবিতাতে বা প্রবন্ধে আরও বেশি—সুতরাং সেখানে নিজের মনের কথা বেশ সহজেই বলা যাইতে পারে। কিন্তু বোধ হয় সকলের চেয়ে নিবিড়ভাবে মনের কথা বলা যায় চিঠিতে, তাহার কারণ চিঠিতে একটিমাত্র মনের মানুষকে বলা হয়, বাহিরের পাঠকসমাজ সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না।"

পত্রসাহিত্য এবং উহার বহুমুখী প্রয়োজনীয়তা

সত্যই ব্যক্তিকে বুঝিবার জন্য, তাঁহার অন্তর্জীবনে পৌঁছিবার জন্য প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের পিছনে যবনিকার অন্তরালে প্রবেশ করিতে হয়। বাহিরের সমাজে কেউ রাজা, কেউ মন্ত্রীর ছদ্মবেশে দেখা দেন। কাউকে মাস্টার বলিয়া জানি, উকিল বলিয়া জানি, পণ্ডিত বলিয়া জানি। দেশনেতা যখন বক্তৃতা দেন, কর্মী যখন সামাজিক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট থাকেন, বৈজ্ঞানিক যখন গ্রহান্তরে যাত্রা করেন, দার্শনিক যখন বিশ্বসত্যের ব্যাখ্যা

কর্মী ও জ্ঞানীর পত্র

করেন, তখন আমরা তাঁহাকে খণ্ড করিয়া জানি। এই সামাজিক পরিচয়ের সী ভেদ করিয়া অখণ্ড মানুষটি প্রায়ই প্রকাশ পাইতে পারে না। এখানে আমরা বস্তুকে যতটা জানি, ব্যক্তিকে ততটা পাই না। জ্ঞানীর চিন্তায় তাঁহার মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশ নাই। কারণ জ্ঞানকে ব্যক্তিলক্ষণমুক্ত করাতেই জ্ঞানের সার্থকতা। অবশ্য একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে, কর্মীর কর্ম এবং জ্ঞানীর চিন্তার সঙ্গে তাঁহাদের অন্তশ্চেতনার সম্পর্কমাত্র নাই। সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। কিন্তু কর্মে এবং চিন্তায় সেই মানুষটাকে সবটা পাই না। চিঠিপত্রে নৈর্ব্যক্তিকতার স্থান নাই, উহা বিষয় হইতে ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া ধরে। তাহা ছাড়াও চিঠিপত্রে প্রাপ্ত তথ্য ও ইঙ্গিতের সহায়তায় উদ্দিষ্ট মনীষীর কর্মজীবন বা জ্ঞানসাধনার স্পষ্টতর ও গভীরতর পরিচয় লাভ করা যায়।

গোপন কথা (বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিল্পীদের সম্পর্কে আরও বেশী করিয়া) জানিবার স্পৃহা জনসাধারণের মধ্যে অতিশয় প্রবল। এ বিষয়ে ম্যাথিও ব্লাইণ্ড লিখিয়াছেন:

অন্তরের অন্তঃপুরের পরিচয়

"Perhaps there is nothing the public enjoys so thoroughly as getting behind the scenes. To sit on the front benches and admire the net result of genius is tame work as compared with the exciting sensation of penetrating into the green room, and seeing with your own eyes how commonplace after all are the materials by which the most striking effects have been obtained:" [—Introduction to the letters of Lord Byron.] সাধারণ পাঠকের কৌতূহল নিবারণের উত্তেজনা অবশ্য খুব বড় ব্যাপার নয়, লেখকের অন্তরলোককে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করার কাজে........"to get behind the work and at the man who made it to pry into the most hidden recesses of his life and charater to analyse his motives to dissect his emotions." (ঐ)

বাংলাদেশে লেখক এবং অন্যান্য স্তরের কর্মী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের পত্রাবলী সংকলনের সংখ্যা খুব বেশী নয়। বাংলা সাহিত্যে পত্রসাহিত্যের ভাণ্ডারটি খুব সমৃদ্ধ এমন কথা বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ পত্রই সংকলিত হইয়া বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। মধুসূদনের চিঠিপত্র তাঁহার জীবনীকারেরা কিছু কিছু সংকলন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি উহার একটি সটীক পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রকাশিত বাংলা পত্রাবলী

শরৎচন্দ্রের কিছু চিঠি সংকলিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। নজরুল ইসলামের চল্লিশখানি চিঠির একটি গুচ্ছ পূর্বপাকিস্তান হইতে নজরুলসাহিত্যের একটি সংগ্রহগ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বহুসংখ্যক চিঠি তাঁহার সমগ্র রচনাবলীতে স্থান পাইয়াছে, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্যপরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত উনবিংশ

[illegible]দীর লেখকদের জীবনচরিতে কিছু কিছু চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের খুব স্বল্পসংখ্যক চিঠিই মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। রমেশচন্দ্র দত্তের কিছু ইংরেজি চিঠি তাঁহার জীবনচরিতে সংকলিত হইয়াছে। সম্প্রতি সুভাষচন্দ্রের যে পত্রাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও উল্লেখযোগ্য।

মধুসূদনের চিঠিগুলি ইংরেজীভাষায় রচিত, তাই ইহাদের বাংলা পত্রসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। কিন্তু কবির অন্তস্তলে প্রবেশের পথ হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব সুপ্রচুর। ভাষার বাধা না থাকিলে ইহাদের উচ্চস্তরের পত্রসাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলিত। কারণ ইহাদের মধ্যে কবির শক্তি এবং দুর্বলতা, তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি এবং ছেলেমানুষী, তাঁহার বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বিস্ময়কর সংযমের পরিচয় রহিয়াছে। এক কথায়, মধুসূদনের চিঠিপত্রের সাহায্য না লইয়া তাঁহার কাব্যলোকে প্রবেশ করাই চলে না। শরৎচন্দ্রের সংকলিত পত্রগুলি তাঁহার শিল্পীব্যক্তিত্বের অন্তর্লোকের একটা নূতন পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থিত করে। শরৎচন্দ্রের ভাবোচ্ছ্বাসের অতিরেকের অন্তরালে একটি যুক্তিপ্রবুদ্ধ পৌরুষ ছিল, তথ্যপ্রমাণের উপরে যিনি আপন প্রত্যয়কে দাঁড় করাইতে চাহিতেন। এই আবিষ্ক্রিয়া শরৎচন্দ্রের নূতন পরিচয় তুলিয়া ধরে। নজরুল ইসলামের চিঠিগুলি তাঁহার কবিসত্তার দ্বৈধকে নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নজরুলের মনের একটি তার রণতূর্য বাজাইলেও অন্য তারে মিঠে গজলের আলাপ চলিয়াছে। ইহার অন্তরালের রহস্যটি ধরা পড়িয়াছে তাঁহার চিঠিতে। রমেশচন্দ্র দত্তের ইংরজী চিঠিতে তাঁহার চাকরিজীবনের বিস্ময়কর সাফল্যের মধ্যেও স্বাধীনচিত্ততার নিগূঢ় বেদনা গুমরাইয়া মরিয়াছে। বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে এই মহাবীর্যবান কর্মী সন্ন্যাসীর অন্তলীন স্নেহময় রূপটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

মধুসূদন—শরৎচন্দ্র—নজরুল—রমেশ—বিবেকানন্দের পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথের পত্রাকারে লেখা অনেকগুলি গ্রন্থের মধ্যে খাঁটি চিঠি বলিয়া বিশেষভাবে উল্লেখ্য "ছিন্নপত্র" এবং কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত চিঠিপত্র। 'চিঠিপত্রে'র প্রথম দিকের রচনাগুলিতে এবং 'ছিন্নপত্রে' আমরা খাঁটি চিঠির রস পাই এবং উচ্চাঙ্গের সাহিত্যেরও। লেখক সে-সব চিঠি চিঠিহিসাবেই লিখিয়াছিলেন। তখনও তিনি খ্যাতির উচ্চশীর্ষে ওঠেন নাই। এই কারণেই ইহাদের মধ্যে পত্রের অন্তঃপুরচারণার ভাবটি সহজভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। অথচ একটা আশ্চর্য সাহিত্য-সৌরভ ইহাদের উচ্চাঙ্গের শিল্পগুণে ভূষিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়: "যারা ভাল চিঠি লেখে তারা মনের জানালার ধারে বসে আলাপ করে যায়—তার কোন ভার নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে। ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস।" রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর মধ্যে এই মহাকবির অন্তরের সহজ মানুষটির এক আশ্চর্য নূতনরূপ দেখি। অথচ এই উৎস হইতেই যে এত সব উচ্চ ভাবুকতাপূর্ণ রচনার উৎপত্তি তাহাতেও সংশয় থাকে না। কবির ভাবলোকের বহু সূক্ষ্ম সূত্রের জট চিঠিগুলির সাহায্য ছাড়া খোলাই সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

ইউরোপীয় সাহিত্যে বহুসংখ্যক চিঠিপত্র সংকলিত হইয়াছে। তাহাদের সুরের বৈচিত্র্যও সমালোচককে প্রায় দিশাহারা করে। ব্যালজাকের বহু চিঠি ঘরোয়া ডাইরীর আঙ্গিকে লেখা। হোরেস ওয়ালপোল চিঠির মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন ঘটনার বিবরণ। লর্ড চেস্টারফিল্ড চিঠির মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দিয়াছেন। আবার মাদাম সেভিঁর চিঠিতে পূর্বোক্ত লক্ষণগুলির সুন্দর মিশ্রণ ঘটিয়াছে। অবশ্য সর্বদাই নিকটবন্ধু বা প্রণয়ীর নিকট লিখিত চিঠির মূল্য এবং সাহিত্যগুণ অনেক বেশী। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকের গ্রন্থে যে গুণের অভাব তাহার সন্ধান মেলে চিঠিপত্রে। যেমন জর্জ স্যাণ্ডের উপন্যাসের তুলনায় চিঠিগুলি অনেক উচুস্তরের। বায়রনের চিঠির ভাষা গদ্যরীতির আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ফ্লবেয়ারের চিঠিতে অনুভূতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ চমৎকার রূপ পাইয়াছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ চিঠি হইল ব্যক্তিগত সুরে বাঁধা হৃদয়োচ্ছ্বাস। Encylopædia of Literature-এ সমালোচক ঠিকই লিখিয়াছেন: "But the most valuable letters from the reader's point of view are those which in their origin were spontaneous outpourings of the heart. Into this category come the great love letters—those of Julie of Lespinasse, those of Mizabeau to Sophie de Monnier, those from Julie Talma to Benjamin Constant. In them truth speaks undisguised."

ইউরোপীয় পত্রসাহিত্যের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য

বাংলা পত্রসাহিত্য আপনার হৃদয়কে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে উল্লেখযোগ্য প্রণয়পত্র রক্ষিত ও সংকলিত হয় নাই। তাহা ছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খুব অল্প চিঠিই আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ফলে আমাদের পত্রসাহিত্য প্রত্যাশার তুলনায় খুব কমই সমৃদ্ধ।

উপসংহার

সাহিত্যে চরিত্রসৃষ্টি

সুপ্রাচীন কাল হইতে সাহিত্যে মানবজীবন—তাহার চরিত্র এবং ভাগ্যের ছবি আঁকা হইয়া আসিতেছে। সাহিত্যসৃষ্টিতে চরিত্রনির্মাণ যুগে যুগে নানারূপ বিবর্তন লাভ করিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের শিল্পীর হাতে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। মানুষ সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তায় যেরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে মনস্তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে যে সব নূতন আবিষ্ক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে। তাহা ছাড়া শিল্পরূপ অনুযায়ীও চরিত্রায়ণরীতির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। এইভাবে নানা দিক হইতে দৃষ্টিপাত করিলে তবেই সাহিত্যের এই বিশেষ প্রসঙ্গটির বৈচিত্র্য জটিলতা ও গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

ভূমিকা

চরিত্রনির্মাণ সাহিত্যের একটি মুখ্য লক্ষ্য। হোমর-ব্যাস-বাল্মীকি হইতে আরম্ভ

করিয়া আধুনিকতম নাটক-উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টির বিচিত্র চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যরীতির মধ্যে একমাত্র গীতিকবিতারই চরিত্র অঙ্কনের কোনোরূপ দায়িত্ব নাই। আধুনিক গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিহৃদয়ের ভাবনা বাসনা বেদনার উচ্ছ্বাস ভাষারূপে প্রকাশ পায়। মানুষের জীবন নয়, ভাবাবেগের নির্যাসমাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে ভাষায় প্রকাশ করাই কবির লক্ষ্য। গীতিকবিতার যে-রূপ আমাদের দেশে মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল, সেই বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীতে কিন্তু চরিত্রের আভাস ছিল। কবির বিশুদ্ধ ভাব ও ভাবাবেগ শুধু নয়—যাঁহাদের ভাবাবেগ সেই নরনারী—কৃষ্ণ, রাধা, মেনকা, উমা প্রভৃতির চরিত্রের একটি পটভূমিও উহার সহিত যুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইত। অবশ্য চরিত্রের আভাসমাত্র সেখানে ব্যক্ত। যথার্থ চরিত্রনির্মিতির দায়িত্ব আমাদের মধ্যযুগের গীতিকবিতাও বহন করে নাই। প্রাচীন সাহিত্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় যে-সব বর্ণনাত্মক খণ্ড কবিতা লেখা হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও মানবব্যক্তিত্বকে রূপ দিবার চেষ্টা নাই। মোট কথা বলিতে গেলে, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে যে-সব ক্ষেত্রে চরিত্রসৃজন অপরিহার্য ছিল তাহারা হইল—মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোট ও বড় গল্প। কিন্তু ইহাদের রূপ ও রসাস্বাদে রহিয়াছে বৈচিত্র্য। ইহাদের চরিত্রসৃষ্টির ভঙ্গির মধ্যেও রহিয়াছে নানাবিধ পার্থক্য।

চরিত্রসংশ্লিষ্ট সাহিত্যের নানারূপ

মহাকাব্যের চরিত্রগুলি আকারে প্রকারে মহাকাব্যের ন্যায়ই বিশাল। দেবদানবের ন্যায় সেখানে মানুষগুলিও বীর্যশালী, অসম্ভব ঘটনা ঘটাইতে সমর্থ, তাহাদের প্রবৃত্তিগুলি খুবই উঁচু সুরে বাঁধা। প্রকৃতপক্ষে আকৃতি ও ক্ষমতার পরিমাণগত কিছু পার্থক্য ছাড়িয়া দিলে দেবতা ও দানবেরাও মানবেরই রূপভেদ ছাড়া আর কিছু নয়। আদি মহাকাব্যের পাত্রপাত্রীরা একটা বৃহৎ গম্ভীর সুর বাজাইয়া তোলে, মহাকাব্যের রসাস্বাদন চরিত্রকল্পনারও সামগ্রিক আবেদনরূপে দেখা দেয়। এক কথায় বলা যায়, তাহারা 'Sublime'-এর বোধই পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করিতে চায়। আদিম মহাকাব্যগুলির মধ্যে মানবচরিত্রে প্রবৃত্তির উদ্দামতা এবং অবিশ্বাস্য উদারতা ও নৃশংসতার সমন্বয় রূপ লাভ করিয়া থাকে। ইহারা সব দিক দিয়াই অসাধারণ। চিত্রণকৌশলের দিক হইতে ইহারা ভাস্কর্যধর্মী। কাব্যভাষায় বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে খুবই কম। কাব্যে অঙ্কিত চরিত্রগুলিতে তাই বিশ্লেষণ অথবা জটিলতার সাক্ষাৎ বিশেষ পাওয়া যাবে না।

মহাকাব্যে চরিত্রসৃষ্টির আদর্শ ও পদ্ধতি

শিল্পরীতিতে আখ্যানকাব্য অনেকটা মহাকাব্যের অনুসারী। তবে মহাকাব্যের তুলনায় ইহা অনেকটা তরল। মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য, মহিমা সমুন্নতি এবং ব্যাপকতা আখ্যানকাব্যের লক্ষণ নয়। প্রধানতঃ রোম্যান্টিক প্রণয়-কাহিনী এবং স্বদেশপ্রেম অথবা য়্যাডভেঞ্চারমূলক প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাহিনীকাব্য রচিত হয়। আখ্যানকাব্যে ঘটনা ও বর্ণনার মধ্যে

আখ্যানকাব্যে চরিত্রসৃষ্টি

একটা সামঞ্জস্য বিধানের অবশ্যই চেষ্টা থাকে। কিন্তু বর্ণনারই সেখানে প্রাধান্য। চরিত্র-সৃজন সেক্ষেত্রে অনেকখানি গৌণ হইয়া পড়িতে বাধ্য। আখ্যানকাব্যের চরিত্রগুলি বহুক্ষেত্রেই কবির মানস ভাবের প্রতিফলনরূপেই অঙ্কিত। পোপ-বায়রনের কাহিনী-কাব্যের সহিত হোমর-মিলটনের মহাকাব্যের চরিত্রচিত্রণের দিক হইতে কোনোরূপ তুলনাই হয় না। অবশ্য মধ্যযুগের লোকগাথা, ব্যালাড্‌কাব্য প্রভৃতিতে চরিত্ররূপ অঙ্কনে স্বাভাবিক প্রাণবন্ত রূপ লক্ষ্য করা যায়।

নাট্যসাহিত্যে চরিত্ররচনা মুখ্য সাহিত্যলক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। নাট্য-রচনায় action এবং conflict খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু ঘটনার মধ্যেই যদি ইহা সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সে নাটক শিল্পসৃষ্টি হিসাবে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। Arthur Jones নামক বিশিষ্ট সমালোচকের মত এই বিষয়ে উদ্ধারযোগ্য : "Dramatic action and conflict unless connected with character is comparatively childish and unintellectual." নাটকে কতকগুলি নরনারীর কার্য ও সংলাপের মধ্য দিয়াই কাহিনীটি অগ্রসর হয়। বর্ণনার স্থান নাটকে নাই, রচয়িতাপ্রদত্ত বিবরণীর মাধ্যমে ঘটনাবর্ত সেখানে উপস্থিত করিবার সুযোগ নাই। সরাসরি ঘটনাসংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রী তাহাদের আচার-আচরণ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়া সেখানে জীবন্ত হইয়া উঠে। মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্যের কবি চরিত্ররচনায় যেমন বর্ণনার সাহায্য গ্রহণ করেন, নাট্যকারের সে সুযোগ নাই। ঔপন্যাসিকের ন্যায় পাত্র-পাত্রীদের অন্তর-ভাবনার নিগূঢ় সংবাদটি দিবার বা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তাহাদের প্রবৃত্তির বিচিত্র সূত্রগুলি বিশ্লেষণের সুযোগ নাট্যকার পান না। কখনো কখনো স্বগতোক্তির ব্যবহার করিয়া নাট্যকার পাত্রপাত্রীর হৃদয়লোকের গোপন সংবাদটি দিতে চান; কিন্তু উহাকে খাঁটি নাট্যরীতি বলা চলে না। আধুনিক নাটক স্বগতোক্তি নামক অনাটকোচিত ব্যাপারটি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছে।

নাটকে চরিত্রসৃষ্টি

উপন্যাসসাহিত্যে চরিত্রসৃষ্টি পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করিবার সুযোগ পায়। ঔপন্যাসিক তখন নাটকীয় পদ্ধতিতে পাত্রপাত্রীদের কর্ম ও সংলাপের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জীবন্ত মূর্তি আঁকিতে পারেন, তেমনি আবার তাহাদের মনোলোকের অন্তরালবর্তী ভাবভাবনার ব্যাখ্যা দিতে পারেন, বিশ্লেষণ করিতে পারেন। নাট্যকারকে ঘটনার চলমানতার সহিত সমান তাল রাখিয়া চলিতে হয়। চরিত্রগুলির গতি রোধ করিয়া ব্যাখ্যা দিবার সুযোগ তিনি পান না। সেই অতিরিক্ত সুযোগটি রহিয়াছে ঔপন্যাসিকের। উপন্যাসে ছোট-বড় নানা ঘটনা, তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ এবং প্রাত্যহিক নিস্তরঙ্গ ব্যাপারের উত্থাপন করিবার সুযোগ থাকে। কাজেই অঙ্কিত চরিত্রগুলির সামগ্রিক পরিচয় সেখানে পাওয়া যায়। উপন্যাসে জীবনের একটি বিস্তৃত পরিবর্তনশীল সমগ্রতা দেখাইবার চেষ্টা হয়। সেইজন্য উপন্যাসে যেমন চরিত্রের পূর্ণরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব, এমন আর

উপন্যাসে ও গল্পে চরিত্রচিত্রণ

কোথাও নয়। ছোটগল্পের চরিত্রগুলি অর্ধাবগুণ্ঠিত। তাহাদের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা থাকে না; সেখানে চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের উপরেই আলোকপাত করেন লেখক। তাহার অনেকখানিই অপ্রকাশিত থাকে, আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয় মাত্র।

চরিত্রসৃষ্টিতে নানারূপ পদ্ধতি প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। সেই পদ্ধতি যেমন রচনাটির প্রকৃতির উপরে অনেকখানি নির্ভর করে, সেইরূপ শিল্পীর জীবনভাবনার সূত্র ধরিয়াই বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। কোনো কোনো ঔপন্যাসিক চরিত্রাঙ্কনে বিশ্লেষণ-মূলক পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী। জীবনকে প্রাত্যহিক ছোটোখাটো ঘটনার মধ্যে, অনাড়ম্বর নিস্তরঙ্গ দৈনন্দিনের প্রবাহে মানুষের যে চরিত্র-পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহাকে ফুটাইয়া তোলার চেষ্টাই ইঁহারা করিয়া থাকেন। উহাতেই মানুষের যথার্থ পরিচয় মেলে। উদাহরণ হিসাবে শরৎচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণপদ্ধতির কথা মনে পড়িবে। কিন্তু উপন্যাস লিখিলেও বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রায়ণে কখনও বিশ্লেষণরীতি অবলম্বন করিতে চাহেন নাই। জীবনের কতকগুলি বিশেষ মুহূর্তে ঘটনাসংঘাতের প্রবল তরঙ্গাঘাতে মানবচরিত্রের যে পরিচয় প্রকাশ পায় উহাই তাহার খাঁটি পরিচয়। গঙ্গাবক্ষে শৈবলিনীপ্রতাপের সন্তরণ তাহাদের চরিত্রের যে পরিচয় অকস্মাৎ মেলিয়া ধরে, বঙ্কিম পরম আনন্দে তাহার চিত্ররচনা করেন। নির্মলকুমারীর ন্যায় এক পার্বত্য ঝরণার সংস্পর্শে ঔরঙ্গজীবের পাষাণদৃঢ় অস্তিত্ব অকস্মাৎ বিদীর্ণ হইয়া অভ্যন্তরের ভাবাস্রোত বাহির হইয়া পড়ে। মবারকের মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়া জেবুন্নিসার প্রণয়বাসনা উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ইহাকে সংশ্লেষণ-মূলক পদ্ধতি বলা চলে। শরৎচন্দ্রের ষোড়শী কিন্তু বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে মনস্থির করিয়াছে। নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়া তাহার মনোভাবে প্রকৃত পরিবর্তন আনিয়াছে। কোনো লেখক গোটা মানুষটাকে ভাষার মধ্য দিয়া তুলিয়া ধরিতে চান। আবার কোনো লেখক তাহার বিচিত্র মনোবৃত্তিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের স্বরূপ ও বিকাশ দেখাইয়া দেন। অতিরিক্ত বিশ্লেষণ চরিত্রের সামগ্রিকতা নষ্ট করে, এইরূপ অভিযোগ সমালোচকদের মহলে দেখা যাইতেছে। আধুনিক সাহিত্যিকেরা জীবনকে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণে দেখিতে চাহেন। তাঁহারা ফ্রয়েডীয় নিজ্ঞান মনস্তত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছেন। মগ্নচৈতন্যকেই তাঁহারা একমাত্র বাস্তব বলিয়া মনে করিতেছেন। সামাজিক নৈতিক আচার-আচরণ তুচ্ছ হইয়া যাইতেছে। অবচেতনার সম্ভাব্য ব্যাখ্যানেই শিল্পী আপনার ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করিতেছেন। কিন্তু এই জাতীয় রচনায় মানুষ আর যেন অবশিষ্ট থাকিতেছে না, কতকগুলি বিশ্লেষিত 'লিবিডো', 'ইগো' প্রভৃতির ছিন্ন সূত্র হইয়া উঠিতেছে।

চরিত্রচিত্রণের বিচিত্র পদ্ধতি

স্থূলতঃ সাহিত্যসৃষ্ট চরিত্রকে সরল এবং জটিল – এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

উহাদের মধ্যে আবার নানাবিধ উপবিভাগ করা সম্ভব। ইংরেজি সাহিত্যসমালোচনায় 'Flat character', 'Round character'—এই দুইটি কথা প্রায়ই শুনা যায়। যে-সব চরিত্র সরল, একটি বা দুইটি সামাজিক বা নৈতিক লক্ষণের দ্বারা যাহাদের চিহ্নিত করা যায় তাহাদের চরিত্রকে Flat বলা হয়; কেহ কেহ এই ক্ষেত্রে type শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই লোকটি ভালো, ঐ লোকটি মন্দ রমেশ নৃশংস স্বার্থপর, যোগেশ মাতাল ('প্রফুল্ল' নাটক) ভীম মহা বীর্যবান (মহাভারত), রমানন্দ স্বামী (সর্বদর্শী সন্ন্যাসী), হানিফ (গ্রামের চাষা)—এই জাতীয় চরিত্র type আখ্যায় অভিহিত হইতে পারে। এইগুলি অবশ্য শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়া সমান গৌরবের দাবি করিতে পারে না। কিন্তু এইগুলি সবই সরল চরিত্র। ইহাদের মধ্যে কোথাও একটা বিশেষ গুণ বা দোষের ভাবই একমাত্র সত্য হইয়া উঠিয়াছে, আবার কোথাও একটি জাতি বা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। উল্লিখিত তোরাপ মোল্লা বাংলাদেশের চাষীর প্রতিভূ, রমানন্দ স্বামী নিরাসক্ত সন্ন্যাসীদের, ভীমসেন দুর্মদ বীর্যের। কিন্তু জীবানন্দ ('দেনাপাওনা' উপন্যাস) মতিবিবি ('কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস), রাবণ ('মেঘনাদবধকাব্য'), নূরজাহান ('নূরজাহান' নাটক), তারাপদ ('অতিথি' গল্প), চাঁদসদাগর ('মনসামঙ্গলকাব্য) প্রভৃতি চরিত্রকে আমরা ভালো বলিয়া প্রশংসাপত্র দিতে পারি না, মন্দ বলিয়াও নিন্দা করিতে পারি না। বিচিত্র বৃত্তির মিশ্রণ ঘটিয়াছে ইহাদের মধ্যে। ইহারা কোনো বিশেষ স্বভাবধর্ম দ্বারা যেমন চিহ্নিত হইতে পারে না, তেমনি আবার কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়বিশেষের প্রতিনিধিরূপে গণ্য হইতে পারে না। ইহাদের ব্যক্তিত্ব যেমন জটিল, তেমনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individuality) চরিত্রসৃজনের সবচেয়ে বড় কথা।

সরল ও জটিল চরিত্র

জীবনকে যাঁহারা বাহিরের দিক হইতে স্থূলভাবে দেখেন নাই—গভীরভাবে দেখিয়াছেন, সামাজিক ও নৈতিক পাপপুণ্য তথা দোষগুণের মাপকাঠিতে বিচার করেন নাই, তাঁহারা মানবচরিত্রের তলদেশে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহারা অনুভব করিতে পারিয়াছেন বিশ্বসৃষ্টিতে এত বড় বিস্ময় আর নাই, মানবমনের এই অজস্র বৈচিত্র্য—অসংখ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। পৃথিবীতে যতগুলি মানুষ, ততগুলি মুখাকৃতি—ততগুলিই চরিত্র। বাহিরের কতকগুলি সাধারণস্তরের সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা ভুলিয়া যাই। কিন্তু সাদৃশ্যের বহিরাবরণ ভেদ করিলে প্রকট হইয়া উঠিবে বিস্ময়কর সব বিভিন্নতা। যাঁহারা চরিত্রসৃষ্টিকে আপনাদের রচনায় স্থান দিতে চান, তাঁহারা আপনার শিল্পীব্যক্তিত্বকে সংহরণ করিয়া লন। আপন মনের মাধুরী দিয়া জগৎকে তাঁহারা অনুরঞ্জিত করেন না। তাঁহারা মানববিশ্বের সাগরতলে ডুব দেন। প্রাচীন কবিদের মধ্যে হোমার, ব্যাস-বাল্মীকি এবং গ্রীক ট্র্যাজেডিকারগণ মানববিশ্বের অনুরূপ এক এক দ্বিতীয় মানবরাজ্য গড়িয়া তুলিতে

চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

পারিয়াছিলেন তাঁহাদের সৃজনকর্মের মধ্যে। প্রথমোক্ত তিনজন যেন চরিত্রসৃষ্টির বিপুল বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যে ঈশ্বরের সৃষ্টির সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। পরবর্তী লেখকদের মধ্যে এ-বিষয়ে সেক্সপীয়রের স্থান সর্বোচ্চ। সেক্সপীয়রের চরিত্রনির্মাণের বৈচিত্র্য ও গভীরতা দেখিয়া, শিল্পীর ব্যক্তিভাবনানিরপেক্ষ রচনাসিদ্ধির প্রশংসা করিয়া জনৈক সমালোচক ঠিকই বলিয়াছিলেন, "After God Shakespeare created most." বাংলা সাহিত্যে এই দিক দিয়া বঙ্কিমের স্থান সর্বাগ্রে। রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্য যত মূল্যই থাকুক না কেন, চরিত্রসৃজনে তিনি বঙ্কিমের ন্যায় প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'বিষবৃক্ষে'র গল্পের কাঠামো মোটামুটি একই জাতীয়। প্রথম উপন্যাসের গোবিন্দলাল, রোহিণী ও ভ্রমর যথাক্রমে দ্বিতীয়টির নগেন্দ্র, কুন্দ ও সূর্যমুখীর সহিত তুলনীয়। কিন্তু এই তুলনা করিলেই তাহাদের পার্থক্য প্রতীয়মান হইবে। অপরপক্ষে শরৎচন্দ্রে ঘটনাংশের পার্থক্য থাকিলেও একটু সতর্কভাবে একটু গভীরভাবে তাকাইলেই বুঝা যাইবে চার-পাঁচটি চরিত্রই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার উপন্যাস ও গল্পগুলির প্রধান পাত্রপাত্রীদের আসন দখল করিয়া বসিয়াছে।

কোনো উপন্যাসে বা নাটকে (আধুনিক কালে আখ্যানকাব্য-মহাকাব্য আর রচিত হয় না।) যতগুলি চরিত্র থাকে, তাহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি চরিত্র পুরোপুরি জটিল তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু বেশীর ভাগ পাত্রপাত্রীর চরিত্রই সরল ও type জাতীয়। Type চরিত্রকে এড়ানো চলে না; এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পাত্রপাত্রীর চরিত্রভিত্তিতেও কিছু কিছু শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যায়। কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব, গভীর জীবনরহস্যের উন্মোচন ঘটে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত চরিত্রগুলির সহায়তায়। আধুনিককালে মার্কসবাদী বস্তুতান্ত্রিকেরা (Socialist Realism) সাহিত্যে শ্রেণীচরিত্রের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিতেছেন। ফলে এই মতাদর্শের অনুবর্তী অধিকাংশ লেখকের অঙ্কিত চরিত্রগুলি ছকে বাঁধা হইয়া পড়িতেছে। উহাদের মধ্যে জীবনের গভীরতা সূক্ষ্মতা জটিলতার সন্ধান তো মেলেই না, উপরন্তু চরিত্রচিত্রণে সাফল্যের যে ন্যূনতম সর্ত জীবনরস তাহারও হানি ঘটে। মার্কসবাদীরা চরিত্রগুলিকে উদ্দেশ্যমূলক করিয়া গড়িয়া তোলায় তাহারা প্রাণের স্বাভাবিক লক্ষণ হইতে চ্যুত হয়। অপরপক্ষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও জটিলতার নামে আধুনিক একদল সাহিত্যিক মগ্নচৈতন্যসর্বস্বতার তত্ত্বটি আনিতেছেন। মানবমনের অসংলগ্নতা এবং এবং বিকৃতিই তাহাদের কাছে প্রধান উপাদান হইয়া উঠিতেছে। চরিত্রসৃজন এক্ষেত্রে স্বাভাবিকতাচ্যুত এবং নিন্দনীয়। সাহিত্যে চরিত্রসৃজনের ন্যূনতম সাফল্য জীবনধর্মে। যেন মনে হয়, এই মানুষটির গায়ে ছুরি বসাইলে রক্ত পড়িবে। চরিত্রটি সরল বা জটিল, স্থূল বা গভীর—যাহাই হউক না কেন, এই বিচারে উত্তীর্ণ না হইলে সফল বলিয়া গ্রাহ্য

চরিত্রসাফল্যের ন্যূন সর্ত

হইবে না। ইহার পরে উৎকর্ষের এবং আরও গভীরতা সূক্ষ্মতা জটিলতার প্রশ্ন। আধুনিক সাহিত্যে এই ভারসাম্য প্রায়ই বিনষ্ট হইতেছে।

জটিল চরিত্রের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য উৎকর্ষসৃষ্টিতে প্রায়ই সাহায্য করে: (১) অন্তর্দ্বন্দ্ব, (২) বিবর্তনধর্ম। বহু চরিত্রের অভ্যন্তরে বিপরীতধর্মী দুইটি প্রবৃত্তির সংঘাত দেখা যায়। একই মানুষের মধ্যে উহা যেন দুইটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে। হ্যামলেটের দার্শনিকতা ও কর্মোদ্বোধন, ফস্টের বিবেকবোধ ও শক্তির অধিকার, গোবিন্দলালের রূপমোহ ও সংযম, সাজাহানের সম্রাটোচিত কর্তব্যবুদ্ধি তথা বিচারহীন বাৎসল্য অন্তরের মধ্যে সুতীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। ইহা চরিত্রের জটিলতা বাড়ায়। এই দ্বন্দ্বের আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ ও অবক্ষয়িত মনুষ্যত্বের হাহাকার ইহাদের শিল্পমূল্য বাড়াইয়া তোলে। বহু সময় জটিল চরিত্রের বিবর্তন চিত্রিত হয়। সরল চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হইতে পারে, কিন্তু উহারা সর্বদাই স্থিতিশীল হয়। গতিশীল করিয়া তুলিতে হইলে উহাদের অভ্যন্তরে পরিবর্তনের কিছু বীজ পূর্ব হইতেই বপন করিতে হয়। জটিল চরিত্রগুলি সর্বদাই গতিশীল হয় না। কখনও কখনও স্থিতিধর্মীও হইতে পারে। বিশেষতঃ, জীবনঘটনা অথবা ভাগ্যের পরিবর্তন এবং চরিত্রের মূলধর্মের পরিবর্তন এক বস্তু নয়। কুন্দনন্দিনীর ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, জীবনসম্পর্কিত বোধেও আসিয়াছে পরিবর্তন, কিন্তু চরিত্রের ভিত্তি নড়িয়া যায় নাই। জীবনঘটনার পরিবর্তনের সঙ্গে চরিত্রের মূলটি বদলাইয়া গিয়াছে শৈবলিনীর, চন্দ্রশেখরের, প্রতাপেরও। ষোড়শী এবং জীবানন্দ দুটিই বিবর্তনধর্মী চরিত্র: কারণ উপন্যাসের প্রারম্ভে তাহাদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের যে মূল লক্ষণগুলি দেখিতে পাই, সমাপ্তিতে তাহার স্থলে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের বিশিষ্টতা প্রকটিত হইতে দেখি।

জটিল চরিত্র: অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গতিশীলতা

সাহিত্যিকের সহিত তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের সম্পর্কটি বিশেষ ভাবে অনুধাবনীয়। থিওডোর ওয়াটস্ ডানটন 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'য় কাব্যসৃষ্টির একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির নাম দিয়াছেন 'Absolute Vision'। আপনার মনের রঙের প্রতিফলন না ঘটাইয়া জীবনের রূপানুসরণই ইহার লক্ষ্য। হোমার সেক্সপীয়ার প্রভৃতি কবিরা এই দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বলিয়াই চরিত্রাঙ্কনে এত অধিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এক কথায়, চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে শিল্পীকে আশ্চর্যরকম নির্বিকার নিরাসক্ত হইতে হইবে। ইহা দুরূহ সন্দেহ নাই। কিন্তু উচ্চ সাফল্যের মূল্য দেওয়া সর্বদাই কঠিন। মধুসূদন রামের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেন, রাম তাই ঘৃণার বর্ণে রঞ্জিত পুত্তলিকা হইয়া উঠিয়াছে, সেক্সপীয়রের শিল্পীমন ইয়াগোর প্রতিও বিরূপ নয় বলিয়াই উহা অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টি। রোহিণীর প্রতি ব্যক্তি-বঙ্কিমের ঘৃণা শিল্পী বঙ্কিম উত্তীর্ণ হইয়াছেন বলিয়াই চরিত্রসৃষ্টি হিসাবে উহা অনবদ্য। আপনার মনের মাধুরী মিশাইয়া চরিত্রাঙ্কন করা যায় না। চরিত্রসৃষ্টিতে আত্মপ্রতিফলন বর্জনীয়।

সাহিত্যিক ও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র

রাবণে মধুসূদনের আত্মপ্রতিফলন ঘটিয়াছে ব্যক্তিবুদ্ধির অতিরেকে, কিন্তু কবির অন্তরনিবাসী শিল্পীসত্তা উহাকে বিশ্বের বেদনায় রূপান্তরিত করিয়াছে বলিয়াই উহার শিল্পমূল্য এত অধিক। লেখক যখন আপনার বক্তব্যের বাহন হিসাবে চরিত্র গড়েন, তখন তাহার স্বাভাবিক প্রাণধর্মে হানি ঘটে। রূপকধর্মী চরিত্র এইজন্য উচ্চস্তরের শিল্পসৃষ্টি নয়।

উপসংহার

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় চরিত্রসৃষ্টি খুব পুরাতন লক্ষ্য, কিন্তু অদ্যাবধি কেন্দ্রীয় লক্ষ্য রূপেই চিহ্নিত। জীবনদৃষ্টির পরিবর্তনের ফলে কোথাও কোথাও বিরতি দেখা দিলেও মানবজগৎকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করার আনন্দকে শিল্পীরা আজও মূল্য দেন, পাঠকদের নিকটে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আনন্দ আর কি হইতে পারে?

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী

শাশ্বত মানুষের ভ্রমণ-বাসনা

সাহিত্যে ভ্রমণবৃত্তান্ত অতি প্রাচীন কাল হইতেই একটি উল্লেখযোগ্য উপাদানরূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। গ্রীকবীর অডিসিউস ট্রয়বিজয়ের পরে দেশের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। পথে বিচিত্র দেশ, বিচিত্র জাতি তাঁহার অভিজ্ঞতার সামগ্রী হইয়াছে। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে পৃথিবীর অন্যতম আদি মহাকাব্য 'অডিসি'। কিন্তু সেখানে লেখক দেশ ও জাতি বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিতে চাহেন নাই, বিচিত্র য়্যাডভেঞ্চার কাহিনীর উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু অডিসি কাব্যের ভিত্তিতে যে এককালে ভ্রমণচারিতার বীজ ছিল তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। রামায়ণে রামচন্দ্র বনগমন করিয়া কিরূপে বিন্ধ্য, দণ্ডকারণ্য, গোদাবরী প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করিলেন তাহার অনেকটা বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা আছে। উক্ত আরণ্য প্রদেশ-সমূহের বর্ণনায় বাল্মীকি শিল্পসাফল্যের অপূর্ব পরিচয় দিয়াছেন। মহাভারতের সমাপ্তি-অংশে মহাপ্রস্থানযাত্রা-প্রসঙ্গে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের কাহিনী আছে। ভগীরথের গঙ্গাবতরণ প্রসঙ্গেও গঙ্গা-ধারার পথ ধরিয়া কিছুটা ভৌগোলিক বিবরণ মহাকাব্যমধ্যে স্থান করিয়া লইয়াছে। এইগুলিই আমাদের দেশের প্রাচীনতম ভ্রমণসাহিত্যের নিদর্শন। অতি প্রাচীন হইতে একান্ত আধুনিক কাল পর্যন্ত সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে মানবমনের দেশদেশান্তরকে দেখিবার আগ্রহ। কবির এই রচনা—

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি !
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।

—মানবপ্রাণের নিভৃত বাসনাটির খবর দেয়। মানুষের প্রয়োজনবদ্ধ সত্তাটি যখন কর্মরত থাকে তখনও তাহার হৃদয়ের গভীরে বাজে নিখিলের বাঁশী, যাহা ঘরকে দূরে লইয়া যায়, দূরকে কাছে আনিতে চায়।

দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়,
আমার অন্তরে বারবার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা,
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা ক'রেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।

ইহা চিরকালের ভ্রমণচারী মানুষের অন্তরের কথা। নানা কারণে মানুষ ভ্রমণ করে। য়্যাডভেঞ্চারের নেশায় কেহ মধ্যআফ্রিকার অরণ্যে প্রবেশ করে, এভারেস্টের শৃঙ্গে আরোহণ করে, নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য কেহ দুস্তর বারিধি অতিক্রম করিতে চায়, নূতন বৈজ্ঞানিক পরিবেশ ঐ মহাকাশেও কেহ যাত্রা করে। ভৌগোলিক বিবরণ, ইতিহাসপ্রসঙ্গ, বিবিধ জ্ঞান অর্জনের জন্য, বাণিজ্যপথ বাহির করিতে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মানুষ দেশভ্রমণ করে। কিন্তু সব প্রয়োজনেরই গভীর কথাটি ঐ দূরের বাঁশী শুনিবার ব্যাকুলতা।

ভ্রমণসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। কারণ ইহা অনেকটা স্বাধীন মনের সৃষ্টি, এ বিষয়ে কোনো বিশিষ্ট আদর্শ নির্দেশ করা কঠিন। উপন্যাস বা নাটকের, মহাকাব্য বা সনেটের রূপরীতি ও রসাস্বাদের বিশিষ্টতা লইয়া সমালোচকমহলে যেমন সুপ্রচুর আলোচনা চলিয়াছে, ভ্রমণসাহিত্য সম্বন্ধে সেরূপ দেখা যায় না। আমরা ভ্রমণ-সাহিত্যের একটা আদর্শ চেহারা মোটামুটি দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতে পারি। ভ্রমণ-সাহিত্য গদ্যে রচিত প্রবন্ধশ্রেণীর সাহিত্য। উপন্যাস বা গল্পের ন্যায় কাহিনীনির্মাণ ও চরিত্রসৃষ্টি ইহার মুখ্য লক্ষ্য হইতে পারে না। অবশ্য

কোনো কোনো লেখক ভ্রমণকাহিনীর উপাদানকে গল্পে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কয়েকটি চরিত্রের ক্রমবিবর্তনের ছবিও আঁকিয়াছেন। উদাহরণ হিসাবে প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' এবং অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজে'র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমটিতে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে কেদার-বদরী তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে। সেই অভিজ্ঞতা কতকটা বস্তুনিষ্ঠার সহিত অঙ্কিত হইলে ভ্রমণকাহিনী হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু লেখক উহাকে পটভূমিরূপে ব্যবহার করিয়া প্রণয়-বিরহের একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছেন। উহার রসাস্বাদ উপন্যাসের, ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার মিশ্রণে তাহা বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এইমাত্র। মরুপথ দিয়া তীর্থযাত্রীদের হিংলাজ অভিমুখে যাত্রা অবধূতকে উপন্যাসগঠনের উপকরণ যোগাইয়াছে। এই শ্রেণীর রচনাকে খাঁটি ভ্রমণ-কাহিনী বলা চলে না। ভ্রমণ-সাহিত্যে ঘটনার নানারূপ বিচ্ছিন্ন অংশ প্রবেশ করিতে পারে, বিচিত্র চরিত্রের মানুষের আনাগোনা এবং ভগ্ন পরিচয়ও প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু ইহা কখনই সেখানে লক্ষ্য হইয়া উঠিবে না, গৌণ হইয়াই থাকিবে। ভ্রমণ-কাহিনীকে এইজন্যই গদ্য-প্রবন্ধ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। কিন্তু জ্ঞানমূলক প্রবন্ধরূপে ইহাদের গ্রহণ করা চলে না। ভ্রমণকাহিনীর সর্বাপেক্ষা বড় কথা উহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুর। যিনি ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়াটিই এখানে প্রধান কথা। 'জাপান' সম্বন্ধে অন্নদাশংকর রায় যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা লেখকের ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার বিবরণ। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, যে সব মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, যে সব ভাবনা ভাবিয়াছেন তাহারই ভাষারূপ এই গ্রন্থ। জাপান সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করিতে হইলে উহার মধ্য হইতে এই ব্যক্তিগত উপাদানটিকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইবে। কারণ জ্ঞান ব্যক্তি-সুরনিরপেক্ষ —উহা বস্তুগত। ভ্রমণসাহিত্য আমরা জ্ঞানলাভের জন্য পড়ি না। জাপান সম্বন্ধে ইতিহাস ভূগোলের তথ্য জানিবার জন্য অন্নদাশংকরের গ্রন্থটি একান্ত অপর্যাপ্ত। উহাতে প্রকাশিত তথ্যাদি অপেক্ষা অনেক বেশী খবরই অনেকে জানেন। তবুও তাঁহারা ঐ গ্রন্থটি পড়িবেন। আমরা আনন্দ পাইবার জন্য ভ্রমণসাহিত্য পড়ি, জ্ঞান লাভ করিবার জন্য নয়। ঐ আনন্দ ভ্রমণকারীর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শের ফলও বটে। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকাহিনীতে তাঁহার মনের অন্তরঙ্গ যে পরিচয়টুকু প্রকাশ পায় উহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্জীবের 'পালামৌ'র পাহাড়ী অঞ্চল, কোল নরনারীর জীবনলীলার সহিত তাঁহার সরস সহৃদয় মনটিও বিজড়িত হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু ভ্রমণসাহিত্যকে একান্ত subjective রস-রচনার শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করা চলে না। দেশভ্রমণকে বিষয়রূপে মাত্র গ্রহণ করিয়া লেখক আপনার মনের রঙে তাহাকে পরিপূর্ণভাবে রঞ্জিত করিয়া রূপ দেওয়ায় প্রত্যাশিত ভ্রমণরসের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ভ্রমণসাহিত্য যেমন

ভ্রমণসাহিত্য : তত্ত্বগত আদর্শ

subjective শ্রেণীর সাহিত্য, সেইরূপ উহা আবার পরিপূর্ণ subjective রচনাও নয়। বস্তুর নিজস্ব রসকে অস্বীকার করিয়া ভ্রমণকাহিনী গড়িয়া উঠিতে পারে না। সমুদ্রযাত্রায় যেন উহার রূপরস অভিব্যক্ত হয়। হিমাচলভ্রমণে 'দেবতাত্মা সেই মহাপর্বতে'র ভীষণতা নির্জনতা ও গাম্ভীর্য যেন প্রকাশ পায়। হিমালয় সম্পর্কে তথ্যমূলক জ্ঞান লাভ করিতে আমরা চাই না, উহার স্বরূপ আস্বাদ লাভ করিতে চাই। এবং সে আস্বাদের সহিত অবশ্যই ভ্রমণকারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিজড়িত। কিন্তু এই subjectivity যেন সর্বগ্রাসী হইয়া না উঠে। যেন স্থানমাহাত্ম্যকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া না ফেলে। কাশ্মীরের রমণীয় উপত্যকা যেন ব্যক্তিভাবনার স্পর্শে মরুভূমির রূপ ধরিয়া না দেখা দেয়; অথবা যেন কল্পলোকের মায়াকাননে না পরিণত হয়। আমরা এখানে ভ্রমণসাহিত্যের একটি আদর্শ রূপের সন্ধান লইতে চেষ্টা করিয়াছি। উহার মুখ্য লক্ষণগুলি সূত্রাকারে নির্দেশ করা হইল: (১) ভ্রমণসাহিত্য গদ্যে রচিত প্রবন্ধজাতীয় রচনা, উপন্যাসশ্রেণীর নয়। (২) ইহা আনন্দমূলক সাহিত্য, জ্ঞানমূলক নয়। (৩) ভ্রমণকারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গিই ইহার মুখ্য সূত্র। (৪) Subjectivity থাকিলেও উহা সর্বগ্রাসী হইয়া স্থান-বৈশিষ্ট্য লুপ্ত করিবে না। ভ্রমণস্থানের মানুষ ও প্রকৃতির বিশেষ রূপরসটি ভ্রমণসাহিত্যে প্রকাশিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ subjectivity ও objectivity-র মিশ্রণ এক্ষেত্রে কাম্য। কিন্তু এই objectivityও তথ্য ও জ্ঞানমূলক নয়, রস রূপ-ভিত্তিক। আমরা ভ্রমণসাহিত্যের যে আদর্শ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলাম উহা আদর্শমাত্র এবং উক্ত আদর্শ যে দুর্লভ তাহাতেও সন্দেহ নাই।

ভ্রমণসাহিত্যের আদর্শ ও রূপরীতির ক্ষেত্রে লেখকদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যজাত বৈচিত্র্য তো রহিয়াছেই। কিছু কিছু শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্যেরও নির্দেশ করা চলে। এইসব শ্রেণীর মধ্যে বহুক্ষেত্রে ভ্রমণসাহিত্যের আদর্শচ্যুতি যে ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চিত। (১) আমরা পূর্বেই ভ্রমণোপন্যাসের কথা বলিয়াছি। উহারা মুখ্যতঃ উপন্যাস, গৌণতঃ ভ্রমণকাহিনী। কিন্তু এই শ্রেণীর রচনার পরিমাণ সম্প্রতি খুবই বাড়িয়া গিয়াছে।

নানাশ্রেণীর ভ্রমণ-সাহিত্য

ইহাতে দেশ-বিদেশের বৈচিত্র্যের রূপরস এবং উপন্যাসপাঠের কাহিনী ও চরিত্রগত আনন্দ যুগপৎ বিতরণ করিবার সুযোগ থাকে। এই কারণে ভালো লেখকের হাতে পড়িলে উহার আকর্ষণ হয় অমোঘ। এই জাতীয় রচনার মধ্যে কোথাও কোথাও স্থানটি পটভূমিতে প্রাণহীনভাবে পড়িয়া থাকে না, জীবন্ত হইয়া ওঠে, স্থানিক বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ করে, উপন্যাস কাহিনীর পশ্চাতে ম্লান ও গৌরবহীন হইয়া থাকে না। কালকূটরচিত 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' বা 'নির্জন সৈকতে' বা পূর্বোক্ত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' প্রভৃতি গ্রন্থে উপন্যাসের পশ্চাৎপট হইতে ভ্রমণরস প্রকাশ পাইয়াছে। ভ্রমণসাহিত্যের দিক হইতে

ইহাদের অবহেলা করা চলে না। (২) রামনাথ বিশ্বাসের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার বিবরণগুলি যথেষ্ট সাহিত্য-গুণান্বিত নয়। বিশেষ করিয়া subjective উপাদান সেখানে অত্যন্ত অল্প। নানাদেশের তথ্যমূলক বিচিত্র বিবরণ সেখানে মোটামুটি বস্তুনিষ্ঠার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। বস্তুনিষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী অনেকটা রোজনামচার ন্যায় লেখা হয়। কখনো কখনো তাহাতে লেখকের হৃদয়রসের কিছুটা স্পর্শ থাকে কিন্তু উহা হয় গৌণ। প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের মানসসরোবর ও কৈলাসভ্রমণের বিবরণ অনেকটা বস্তুমূলক। জলধর সেন রচিত 'হিমালয়' এবং অন্যান্য ভ্রমণকাহিনীগুলিও প্রধানতঃ বস্তুগত বিবরণে পূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাভাষায় যে ভ্রমণকাহিনীগুলি রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এই শ্রেণীরই প্রাধান্য। প্রসঙ্গতঃ 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিমাচল অঞ্চলে ভ্রমণের বিবরণ উল্লিখিত হইতে পারে। (৩) বাংলা ভাষায় সবচেয়ে ভালো যে ভ্রমণকাহিনীগুলি রচিত হইয়াছে তাহাতে লেখকের ব্যক্তিগত মনন ও দর্শন যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি তাহাদের আত্মোদ্ঘাটনেরও সুযোগ হয়। কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্যটি রসরূপে ফুটিয়া ওঠে। তত্ত্বগত আলোচনার দিক হইতে এই জাতীয় রচনাকেই শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের জাভাভ্রমণের বিবরণ, য়ুরোপ ভ্রমণকথা বা রাশিয়ার ভ্রমণ-প্রসঙ্গের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পালামৌ-রচয়িতা সঞ্জীবচন্দ্রও উচ্চস্তরের ভ্রমণসাহিত্যিকরূপে স্বীকৃতি পাইবেন। (৪) অন্য এক শ্রেণীর ভ্রমণকথা লিখিবার প্রবণতা বর্তমানকালে খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভ্রমণ ও গাল-গল্প, ইতিহাস-কিম্বদন্তী-কথা, সৌন্দর্যব্যাখ্যা মিশ্রিত একটি ঢঙ মনোজ বসুর ভ্রমণকাহিনীতে, সুবোধ চক্রবর্তীর 'রম্যাণি বীক্ষ্য' শীর্ষক পুস্তকগুলিতে এবং মুজতবা আলীর কয়েকটি গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে। তাঁহাদের লেখার মধ্যেও সেই উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়। এইভাবে দেখিলে ভ্রমণসাহিত্যের মধ্যে বিচিত্র রস-উপকরণের সন্ধান মিলিবে। কাহারও ভ্রমণ অধ্যাত্ম-উপলব্ধির সঙ্গে জড়িত। এদেশে প্রাচীনকালে তীর্থযাত্রাই ছিল একমাত্র পরিভ্রমণ। একালেও তীর্থে তীর্থে পরিক্রমা করিয়া সহস্র সহস্র লোক ধর্ম ও ভক্তির ভাবকে তৃপ্ত করিতে চায়। কেদারবদরী তীর্থভ্রমণ, গঙ্গোত্রী অভিযান, মানসসরোবর ভ্রমণ প্রভৃতি প্রসঙ্গে অবশ্য ভক্তির সহিত য্যাডভেঞ্চার মিলিয়াছে। এই জাতীয় ভ্রমণ-কাহিনীতে কখনও কখনও অবিশ্বাস্য অলৌকিকতাকে স্থান দেওয়া হয়। উহা একেবারেই কল্পনাপ্রসূত। ভ্রমণকাহিনীর মর্যাদা ইহার ফলে বিনষ্ট হয়। উদাহরণ হিসাবে প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের 'গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী গোমুখ' গ্রন্থের মরকতরাজ্যের ছবিটির উল্লেখ করা চলে। কোথাও আবার নির্জন-ভ্রমণ আত্মার উদ্বোধন ঘটায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'তে ইহার অনেক

ভ্রমণের বিচিত্র উদ্দেশ্য ও রসবৈচিত্র্য

উদাহরণ আছে। অনেকের কাছে ভ্রমণ শুধুই দুর্গমকে জয় করার আনন্দ, রহস্যকে উন্মোচন করিবার সাধনা। হিমালয়শৃঙ্গে দুঃসাহসিক অভিযান, মরু অভিযান প্রভৃতির বহু কাহিনী আমাদের ভাষায়ও রহিয়াছে। কেহ কেহ শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আনন্দামৃত পান করিতে চান। কেহ ঐতিহাসিক-পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের সন্ধান করেন। কেহ আবার বিচিত্র মানবজাতির পরিচয় লইতে চান। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যের ফলে ভ্রমণসাহিত্যও বিচিত্র রসের আশ্রয় হইয়া ওঠে। কোনো রচনায় ইতিহাস-পুরাতত্ত্বের পটভূমিটি বড় হইয়া ওঠে, কোনো রচনায় ভাস্কর্য-স্থাপত্যকীর্তির সৌন্দর্য-ব্যাখ্যান দেখা যায়, কোথাও-বা প্রকৃতিসৌন্দর্যের বর্ণনাই মুখ্য।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী রচনার কোনো সচেতন চেষ্টা নাই। কিন্তু কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যে এবং চরিতগ্রন্থে ভ্রমণবৃত্তান্তের কিছু কিছু পরিচয় মিলিতেছে। মনসামঙ্গলের কবিরা চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে কতকগুলি স্থানের উল্লেখ থাকিলেও উহাদের ভৌগোলিক যাথার্থ্য অপেক্ষা কাল্পনিকতাই অধিক। কবিকঙ্কণে অবশ্য আদিগঙ্গা ধরিয়া যাত্রায় ভূগোলের মোটামুটি সঠিক অনুসরণ লক্ষ্য করি। গঙ্গাসাগর, পুরীর প্রসঙ্গ প্রভৃতিও পার্থিব অভিজ্ঞতা এবং পৌরাণিক ঐতিহ্যভাবনায় সমৃদ্ধ। কিন্তু উহার পরেই ধনপতি শ্রীপতি কিম্বদন্তীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে মানসিংহের সমভিব্যাহারে ভবানন্দ পুরী—ভুবনেশ্বর এবং গঙ্গা-যমুনা নদীপথে আগ্রা দিল্লী পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। এইসব প্রসঙ্গের কোথাও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্পর্শ অনুভব করা যায়। চৈতন্যদেবের চরিতকাব্যগুলিতে চৈতন্যদেবের পুরীগমন, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, উত্তরাপথ ভ্রমণের কাহিনী স্থান পাইয়াছে।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকথা

আধুনিক সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ভ্রমণসাহিত্য প্রথম রচিত হইল বঙ্কিমযুগে। উল্লেখ্য গ্রন্থের মধ্যে দুর্গাচরণ রায় রচিত "দেবগণের মর্ত্যে আগমনে"র কথা প্রথমেই বলিতে হয়। ইহার মধ্যে কাল্পনিক কাহিনীবর্ণনায় বাংলাদেশ এবং উত্তরভারতের কতকগুলি বিশিষ্ট তীর্থস্থানের নাম-করা সহরের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উহা শুষ্ক বিবরণের ঊর্ধ্বে ওঠে নাই। বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের অতি ক্ষুদ্র আকৃতির "পালামৌ" গ্রন্থটি ভ্রমণসাহিত্য হিসাবে অত্যুচ্চ শিল্পমূল্যের অধিকারী। ছোটনাগপুরের প্রকৃতি তাহার অপরূপ সৌন্দর্যে এবং বিশিষ্টতায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এই রচনাটিতে। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, "সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিষ সজীব কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়া তাহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।" উনবিংশ

ভ্রমণসাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জলধর

শতাব্দীর শেষদিকে প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'র একটি প্রধান অংশ হিমাচল অঞ্চলের ভ্রমণকথায় পরিপূর্ণ। দেবেন্দ্রনাথ প্রশান্ত প্রীতির দৃষ্টিতে হিমাচল অঞ্চলের একটি জীবন্তরূপ প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমার বোম্বাইপ্রবাস" বর্ণনাপ্রধান রচনা। কিছু পরবর্তীকালে জলধর সেন হিমালয় অঞ্চলে ভ্রমণ প্রসঙ্গে একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উহা বস্তুপ্রধান বর্ণনামূলক। লক্ষণীয়, এই যুগে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যায় নাই। ভারতের ভিতরেই উহা প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া ভ্রমণসাহিত্যের সীমা বাড়াইয়া দিয়াছেন, উহার সাহিত্যগুণেও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছেন। তিনি ইউরোপ ভ্রমণপ্রসঙ্গে উভয় জাতির সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের কথাই বেশী করিয়া চিন্তা করিয়াছেন। উহার বস্তুরস তাহার ফলে কিঞ্চিৎ ব্যাহত হইয়াছে সন্দেহ নাই। "রাশিয়ার চিঠি"তে নূতন রুশদেশের সংস্কৃতির যে চেহারা তাহার মর্মমূলটি তিনি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। "জাভাযাত্রীর পত্রে" ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের সভ্যতার কেন্দ্রে ঠিক হাত দিয়াছেন। কবির "জাপানযাত্রী"ও ভ্রমণকাহিনী হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ-সাহিত্য

রবীন্দ্র-সমকালে অতুল গুপ্তের লেখা নদীমাতৃক বাংলাদেশের আভ্যন্তরিক চিত্রে এবং স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে ভ্রমণোপলক্ষে দুই দেশের সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক ভ্রমণসাহিত্যে প্রবোধকুমার সান্যালের হিমালয়প্রসঙ্গ, মনোজ বসুর রুশ ও চীন পরিক্রমা, দেবেশ দাসের দেশবিদেশে নানাস্থানে ভ্রমণ, মুজতবা আলির মধ্যপ্রাচ্য-ভ্রমণ, কুমারেশ ঘোষের ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য এবং রুশদেশ ভ্রমণ সাহিত্যিক গুণের দিক হইতে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক ভ্রমণসাহিত্য

সাহিত্যে দুর্বোধ্যতা

আধুনিক কবিতার পাঠকের প্রধান অভিযোগ ইহার দুর্বোধ্যতা। যাহারা সাম্প্রতিক কবিতা পড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই দুর্বোধ্যতার জন্যই প্রধানতঃ তাহা করিয়াছেন। আমাদের দেশে গল্পসাহিত্যেও দুর্বোধ্যতা প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপে বহু পূর্বেই তাহা জাঁকিয়া বসিয়াছে। এক কালের লেখক-পাঠকেরা শ্লীলতা নীতি প্রভৃতি প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক করিয়াছেন, একালে প্রধানতঃ বোধগম্যতার সমস্যাই দেখা দিয়াছে।

ভূমিকা

দেশ-বিদেশের সাহিত্যের ইতিহাস অনুশীলন করিলে দেখা যায়, এরূপ সমস্যা অতীত কালেও বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ চলিয়াছে। তাঁহার কবিতা নাকি যেমন অস্পষ্ট তেমনি অর্থহীন। "সাহিত্য" পত্রিকা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ এই সূত্র ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যের প্রধান গুণ স্পষ্টতা এবং প্রত্যক্ষতা, এরূপ অভিমত তাঁহারা পোষণ করিলেন। এবং অনেকেই এরূপ ভাবিয়া থাকেন। সংস্কৃত আলংকারিকেরা এই প্রসাদগুণকে বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, ব্যাকরণ দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রে তিনি সুপ্রচুর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

স্পষ্টতা অস্পষ্টতার সমস্যা সেকালেও ছিল

পড়িয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি।
কি সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী-মিশাল॥

তিনি লোকের মুখের বুলিকে স্থান দিয়া কাব্যকে কাঠিন্যমুক্ত এবং সুবোধ্য করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা জানি ভারতচন্দ্রের সেই কাব্য নাগর রুচির বিদগ্ধজনের কাছে যতটা স্পষ্ট ছিল, জনসাধারণের নিকট সেইরূপ ছিল না। একারণেই কিছুকাল পরে গোপাল উড়ে প্রচুর পরিমাণে তারল্য মিশাইয়া বিদ্যাসুন্দরকে জনভোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা লইয়া যখন সমালোচনা তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল তখন কবি উহার উত্তরে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধে সাধারণভাবে এ সমস্যার গোড়ায় হাত দেওয়া হইয়াছিল। প্রবন্ধটি হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল: "কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায়, ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না, কেবল লক্ষ্য করিয়া নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিব্যক্ত ভাষাই একমাত্র ভাষা। এইপ্রকার ভাষাকে কেহ বলেন 'ধুঁয়া', কেহ বলেন 'ভাঙা ভাঙা'....। প্রকৃতির নিয়ম-অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। চিত্রেও যেমন কাব্যেও তেমনি—দূর অস্পষ্ট, নিকট স্পষ্ট; বেগ অস্পষ্ট, অচলতা স্পষ্ট; মিশ্রণ অস্পষ্ট, স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। আগাগোড়া সমস্তই স্পষ্ট, সমস্তই পরিষ্কার, সে কেবল ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে

রবীন্দ্রনাথের অভিমত

থাকিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিতেও নাই, কাব্যেও নাই। অতএব ভাবুকেরা স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট লইয়া বিবাদ করেন না, তাঁহারা কাব্যরসের প্রতি মনোযোগ করেন। ....নিরতিশয় স্পষ্ট যাঁহাদের আবশ্যক তাঁহাদের পক্ষ কেবল পাঁচালি ব্যবস্থা; যাঁহারা কাব্যের সৌরভ ও মধু উপভোগে অক্ষম তাঁহারা বায়রনের 'জ্বলন্ত' চুল্লিতে হাঁক-ডাক ঝাল-মসলা ও খরতর ভাষার ঘণ্ট পাকাইয়া খাইবেন।....যাঁহারা মনোবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, যেমন জগৎ আছে তেমনি অতিজগৎ আছে। সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত রাজ্যে বাস করে। তাই তাহার সকল কথা জগতের সঙ্গে মেলে না। এইজন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হয় যাহা আলোকে অন্ধকারে মিশ্রিত; যাহা বুঝা যায় না, অথচ বুঝা যায়। যাহাকে ছায়ার মতো অনুভব করি, অথচ প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অধিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি: সেই সর্বত্রব্যাপী অসীম অতিজগতের রহস্য কাব্যে যখন কোন কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তখন তাঁহার ভাষা সহজে রহস্যময় হইয়া উঠে। সে স্থলে কেহ-বা কেবলই ধুঁয়া ছায়া দেখিয়া ফিরিয়া যায়, কেহ-বা অসীমের সমুদ্রবায়ু সেবন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করে।"

যে-সব কারণে কোনো রচনা পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয় তাহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, প্রচলিত রচনাধারার সহিতই পাঠক ও সমালোচক পরিচিত। উহা তাহাদের মনের তারের সহিত বাঁধা হইয়া গিয়াছে। এইরূপ হয়, এইরূপ হওয়াই সংগত, ইহা ছাড়া অন্যরূপ হইতে পারে না।
দুর্বোধ্যতার নানা কারণ এ জাতীয় বদ্ধমূল ধারণা-–নের মধ্যে ক্রমে বাসা বাঁধিতে থাকে। কোনো রচনা যদি ভাব বা ভাষাভঙ্গির দিক হইতে অভিনবত্ব লইয়া আসে আমরা উহা বুঝিতে পারি না, অর্থাৎ উহা খাপছাড়া অসংগত বলিয়া মনে হয়। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং ভাষার সংস্কৃতানুগ ভঙ্গি সমকালীন পাঠকের নিকট ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল। মধুসূদন দুর্বোধ্যতা ও কাঠিন্যের অভিযোগ-প্রসঙ্গে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন: "I am afraid you think my style hard, but believe me, i never study to be grandiloquent like the majority of the 'barren rascals' that write in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration! Good blank verse should be sonorous and the best writer of blank verse in English is the toughest of poets—I mean old John Milton." রবীন্দ্রনাথের কবিতাও নূতন বলিয়া, ইহার ভাব-ভঙ্গি রূপ ও রস অপরিচিত বলিয়া,

হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-পড়া পাঠকগণ একটা অস্পষ্টতার রাজ্যে গিয়ে পড়িকেন। বর্তমান পাঠকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ আর ঠিক অস্পষ্ট নয়, দুর্বোধ্য বলিয়া পরিহার্য নয়। একান্ত আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার যে অভিযোগ তাহার কতকটা যে অপরিচিত অভিনবত্বের জন্য সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইলে এই দুর্বোধ্যতা হয়তো কিছুটা কাটিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, রোমান্টিক কবিতার মূলে রহিয়াছে অতিমাত্রায় 'সাবজেকটিভিটি'। ব্যক্তিহৃদয়ের কামনা বাসনা আকূতি, সৌন্দর্য-কল্পনার একান্ত ধারণা এবং অকারণ সৌন্দর্য-বিরহের বেদনা সর্ববোধগম্য বিষয় নয়। 'সাবজেকটিভিটি'র রহস্য ভেদ করিতে না পারিলে এই জাতীয় কবিতা অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া রোমান্টিক কবির মন নিকট হইতে দূরে, প্রত্যক্ষ বস্তু অপেক্ষা অস্পষ্ট ও রহস্যবিজড়িত কল্পলোকে বিচরণ করে এবং তাহাকেই ভাষার সুরে ও ইঙ্গিতে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চায়। তৃতীয়তঃ, কবির জীবনবোধের গহনতা জটিলতা কবিতাকে দুর্বোধ্য করিয়া তুলিতে পারে। মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় অস্পষ্ট রোমান্টিকতা নাই, রহস্যজড়িত কল্পনার সুদূর অভিসার নাই। তবুও তাহা দুর্বোধ্য এবং সে দুর্বোধ্যতার কারণ কবির দার্শনিক মনন। রবীন্দ্রনাথের "বলাকা"র কোনো কোনো কবিতা যদি দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়, উহার কারণ কবিতার রীতিঘটিত নূতনত্ব নয়—ভাবনাগত জটিলতা। চতুর্থতঃ, রূপক-সংকেতধর্মী কাব্য-নাটক প্রায়ই অল্পাধিক দুর্বোধ্য হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ অর্থটি সেখানে মুখ্য নয়, কবির অভিপ্রেতও নয়। একটি সংগুপ্ত অর্থ-তাৎপর্য বুঝাইতে চান কবি। রূপকধর্মী রচনায় ভিতরের কথাটি ধরা একটু কঠিন কাজ সন্দেহ নাই। যদিও-বা একটি অর্থ দাঁড় করানো যায়, তাহার যান্ত্রিক প্রয়োগ করিতে গেলে আগন্ত মিলাইয়া তোলা যায় না। সংকেতধর্মী রচনায় প্রত্যক্ষ ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থটি এমনভাবে বিজড়িত হইয়া থাকে যাহাতে সঠিক ভাবটি অনুধাবন করা যায় না। পঞ্চমতঃ, সংস্কৃত আলংকারিকেরা ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অভিধান-গত অর্থ হইতে উহা স্বতন্ত্র, উহা প্রতীয়মান অর্থ। এই দ্বিতীয় অর্থ বা ব্যঞ্জনাটি সাধারণ পাঠকের সহজ বুদ্ধির অনুগামী নয়। এই কারণে ধ্বনিপ্রধান কাব্য সর্বসাধারণের বোধগম্য না-ও হইতে পারে। ষষ্ঠতঃ, মানবমনস্তত্ত্বের গভীর প্রদেশ মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় ক্রমেই পরিজ্ঞাত হইতেছে। ফলে আধুনিক কালে সহজ স্পষ্টতার বিরুদ্ধে অস্পষ্ট অসংলগ্নকেই খাঁটি মানসসত্য বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। আধুনিক কাব্য-উপন্যাসে দুর্বোধ্যতার পরিমাণ তাই বাড়িয়া গিয়াছে।

বোধগম্যতার সীমা সর্বস্তরের পাঠকদের ক্ষেত্রে একরূপ নয়। সর্বসাধারণের মধ্য হইতে সর্বসাধারণের দ্বারা যে সাহিত্য সৃষ্ট তাহা লোকসাহিত্য। সকলের জন্যই তাহা রচিত, সকলেরই বোধগম্য। কিন্তু সমাজে রহিয়াছে শ্রেণীবিভাগ। সেখানে শিক্ষিত এবং

বিদগ্ধজনের বোধগম্যতার সঙ্গে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের বোধের তুলনাই হইতে পারে না। কাজেই দুর্বোধ্যতার প্রশ্নটি তুলিবার আগে ভাবিতে হইবে, উল্লিখিত রচনাটি কাহাদের জন্য লিখিত। জনৈক কবি তাঁহার কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "My guests are few but selected."* তাঁহার কাব্য সর্বস্তরের মানুষের বোধগম্য যে হইবে না, ইহা মনে রাখিয়াই তিনি রচনা করিয়াছেন। কাজেই সকলে বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা যায় না।

পাঠক কে?

সকলেই রসিক নয়—রসবোধের জন্যও মনের নিবিড় অনুশীলন প্রয়োজন। জ্ঞানের রাজ্যে অধিকারীভেদ স্বীকৃত। রসের রাজ্যে কিন্তু সকলেই নিজেকে সমঝদার বলিয়া মনে করে। বিজ্ঞান বা অর্থনীতির প্রসঙ্গে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকিলে কেহ আপনার মতামত ব্যক্ত করিবে না, কিন্তু উপন্যাস পড়িয়া বা নাটক দেখিয়া সমালোচনা করিতে কেহই দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু রসবোধ ব্যাপারটা মোটেই সহজাত নয়। ইহার জন্য জন্মান্তরীণ বাসনালোকের পরিপুষ্টি না হউক, দীর্ঘকালীন নিষ্ঠাপূর্ণ অনুশীলন থাকা আবশ্যক। প্রাচীন আলংকারিকগণ সহৃদয় সামাজিক বা বিদগ্ধ ব্যক্তির মনোজগৎকেই শিল্পবিচারের কষ্টিপাথর বলিয়া মনে করেন। ভবভূতি বলিয়াছিলেন, অরসিককে রস-নিবেদন করিবার দুরদৃষ্ট যেন তাঁহার না হয়।

রস রসিকের অপেক্ষা রাখে

লিরিকধর্মী রচনারই বিরুদ্ধেই দুর্বোধ্যতার অভিযোগ প্রধানতঃ করা হইয়া থাকে। কিন্তু বহু লিরিকধর্মী রচনার লক্ষ্য কোনোরূপ অর্থপ্রকাশ করা নয়, একটা সুরের অনুরণনে চিত্ত ভরিয়া তোলা, একটা অর্ধব্যক্ত আনন্দে হৃদয় তরঙ্গিত করা, একটা দীর্ঘশ্বাসে অন্তর মথিত করা। রবীন্দ্রনাথ "ফাল্গুনী" নাটকে তাঁহার সৃষ্ট এক কবির মুখে বলাইয়াছিলেন, "আমার এ গান বুঝবার জন্য নয়, বাজাবার জন্য।" অর্থাতীত এই সংগীতটুকু কবির কাব্যের বড় ছোট জিনিস নয়। এই উদ্দেশ্যেই কবি অর্থপূর্ণ মানবভাষাকে অর্থহীন ছন্দের সহিত যুক্ত করেন। কবির ভাষায়—

বুঝবার জন্য নয়—বাজাবার জন্য

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে।

মানুষের প্রয়োজনে, দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা ক্ষীণায়ু জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে। ছন্দ ভাষাকে আলিঙ্গন করিয়া মুক্তি দিবে—

অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।

শুধু গীতিধর্মের অনুরোধেই নয়, সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যও কখনও কখনও ভাষার ক্ষেত্রে

অসাধারণত্ব মানিয়া লইতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা" নামক প্রবন্ধে সাহিত্য যাহাতে সর্বসাধারণের বোধগম্য হয় ভাষাকে সেইরূপ সহজ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনিও সৌন্দর্যের জন্য ভাষাকে যে কখনো কখনো কঠিন করিয়া তুলিতে হয় এই সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "যে-রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য; সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য—সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়।" বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র বলিয়াছেন সৃজনশীল রচনার মুখ্য লক্ষ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি। কাজেই তাহা জল পড়ে পাতা নড়ের ন্যায় সুবোধ্য হইবে না, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

সৌন্দর্যের অনুরোধে দুর্বোধ্যতা

আধুনিককালে সাহিত্যে অবচেতনাকে স্থান দিবার চেষ্টায় যে জাতীয় দুর্বোধ্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে তাহাকে কিন্তু সমর্থন করা যায় না। জোর করিয়া ভাষায় প্যাঁচ দিয়া, ভাবকে উল্টাইয়া দিয়া, সাহিত্যকে দুর্বোধ্য করিয়া তোলা সাহিত্যের প্রাণধর্মের পক্ষে হানিকর। মগ্নচৈতন্যের নাম করিয়া ভাষা ও ভাবগত অর্থহীন অসংলগ্নতা ও যথেচ্ছাচার সাহিত্যের ভবিষ্যৎকে বিপদাপন্ন করিবে। আধুনিক সাহিত্য আধুনিক পাঠকসম্প্রদায়ের অধিকাংশের কাছেই খুব দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কবিতা পাঠ করিয়া তাহার অর্থ বা ভাব বোঝার আশা বহু পূর্বেই অনেকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এইবার আধুনিক উপন্যাসসাহিত্য এবং ছোটগল্পও পাঠকসাধারণের বোধগম্যতার সীমা ডিঙাইয়া যাইতে চাহিতেছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে'র লেখা গদ্য প্রবন্ধ পাঠ করিলেও প্রায় অর্থভেদ করা যায় না। গল্পোপন্যাসের ক্ষেত্রে মগ্নচেতনাশ্রয়ী একটি ধারা সম্প্রতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মানবহৃদয়ের যে পরিচয় আমরা এতকাল জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, তাহা আধুনিক কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণে একান্ত বহিরঙ্গ ও কৃত্রিম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাহিরের ঘটনাবর্তের সহিত মিলাইয়া আমাদের মনের যে প্রতিক্রিয়া হয় উহার কতকটা মাত্র সজ্ঞানতার স্তরে বিরাজ করে। আমাদের নীতিবোধ সমাজচেতনা উহার অনেকাংশকেই অবচেতনার স্তরে ডুবাইয়া দেয়। স্বাভাবিক ভাবে বাহিরে প্রকাশ পায় না বলিয়াই ঐ সব কামনাবাসনা নানারূপ বিকৃত ও ভগ্ন আকার লইয়া মাঝে মাঝে সচেতন ভাবনার স্তরে ভাসিয়া ওঠে। উহাকে বাস্তব বলিয়া সুর রিয়ালিষ্টরা অর্থাৎ মগ্নচৈতন্যবাদীরা রায় দিয়াছেন। তাহাদের রচিত শিল্পসাহিত্যে মগ্নচৈতন্যের জগৎ এমনভাবে প্রকাশ পায় যাহাতে সহজ স্বাভাবিক ভাবনা ও মানসিকতা কৃত্রিম বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। এবং সহজ মনের পাঠকদের কাছে উহার সম্ভাব্য সংগতিটি আর কিছুতেই ধরা পড়ে না।

আধুনিক সাহিত্যে দুর্বোধ্যতা

আধুনিক গল্পকবিতার লেখকেরা ভাবকল্পনা এবং ভাষাবিষয়ে প্রচলিত সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণ ও প্রথানুগত্য অস্বীকার করিতে চান। নিরঙ্কুশ আত্মস্বাতন্ত্র্যবলে আপনার অনুভূতির এককত্বে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ বিশ্বাস। তাই যে-সব শব্দের মধ্যে সংগতি নাই তাহাদের অনায়াসে পাশাপাশি বসাইয়া দিতে তাঁহাদের দ্বিধা নাই। শব্দের ধ্বনি ও অর্থের পরিবর্তন ঘটাইয়া, মুহুর্মুহু চমক লাগাইয়া তাঁহারা আসলে বাহাদুরি লইতে চান, কিন্তু মুখে বলেন ভাবানুভূতির একক স্বাতন্ত্র্যের কথা। ইহার ফলে সাহিত্যে যে জাতীয় দুর্বোধ্যতা প্রধান হইয়া উঠিতেছে উহা একরূপ অসুস্থতাই। উহা পরিহার না করিলে জাতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন হইয়া উঠিবে।

বাংলা লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য বলিতে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত মৌখিক সাহিত্যকেই বুঝি। ইহার মধ্যে থাকে নানাধরনের গালগল্প, কাহিনী, রূপকথা, উপকথা, ছড়া, গাথা, প্রবাদ প্রভৃতি। লোকসাহিত্যের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া ইউরোপীয় সমালোচকেরা বলেন: "Under this rather loose heading are to be included those traditional legends, tales, ballads, songs, proverbs, riddles and play which form the popular entertainments of primitive peoples or of the uncultured elements of the more civilized peoples. It is essentially an oral literature handed down for generation after generation by word of mouth..." লোকসাহিত্যকে অভিজাত লেখ্য-সাহিত্যের ধারাটি হইতে প্রথমেই পৃথক করা উচিত। জনসাধারণের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক রচিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। ইহা অনেকটা পরিমাণে সমাজের যৌথসৃষ্টি। সাহিত্যের উৎস নির্দেশ করিতে গিয়া আদিম যূথবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর সৃজনশীলতার কথায় পৌঁছাইতে হইবে। তাহাদের যৌথকর্ম ও জীবনানুকরণ, তাহাদের ইন্দ্রজালে বিশ্বাস, টোটেম-উপাসনা প্রভৃতির মধ্যেই আদিম গান ও গল্পগুলি জন্মাইতে থাকে। মানবসভ্যতা উন্নততর হইলে, ক্রমে লেখ্য-সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে সব দেশে এখনও সমাজে আদিম অবস্থা রহিয়াছে, যে-সব জাতির এখনও লেখ্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই, তাহারা মুখে মুখে প্রচলিত লোকসাহিত্যের স্তরেই রহিয়া গিয়াছে। ভারতের নানা আদিবাসীদের ভাষায় লোকসাহিত্যের রূপেই

লোকসাহিত্যের স্বরূপ লক্ষণ

সমগ্র সাহিত্যকর্ম ছড়াইয়া আছে, এবং তাহাদের সে লোকসাহিত্য-সৃষ্টিতে বিরামও নাই। আবার যে সব সমাজে জাতির সর্বস্তর শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে নাই, সেখানে লোকস্তরে লোকসাহিত্যের প্রচলন এখনও কমে নাই। লোক-সাহিত্য মৌখিক সাহিত্য হইবার ফলে ইহার কয়েকটি বিশিষ্টতা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। প্রথমতঃ,লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু ও বর্ণনারীতির ক্রমান্বয় পরিবর্তন ঘটিতেছে। লোকের মুখে নূতন সাহিত্য যেমন সৃষ্ট হইয়াছে, পুরাতন সাহিত্যও সেইরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে। কাজেই ইহার কোন আদি ও authentic রূপের সন্ধান মিলিবার আশা নাই। একই গল্প বা ছড়ার নানারূপ পাঠ নানা অঞ্চল হইতে সংকলিত হইতে পারে। ইহার কোন্‌টি প্রাচীনতর এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য তাহার হদিশ লইবার চেষ্টা করা বৃথা। কারণ লোকসাহিত্যের রীতি-অনুযায়ী দুইটিই খাঁটি। লোকসাহিত্য তাহার চারিপাশে ভাষার ও শব্দের কোনো সুনির্দিষ্ট বন্ধন বাঁধিয়া দেয় না। উহার পরিবর্তন নিজের প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম। দ্বিতীয়তঃ, লোকসাহিত্য মৌখিক বলিয়াই উহার কোনো রচয়িতা ঠিক করা যায় না। কে উহার কোন্‌টি রচনা করিয়াছে তাহা চিহ্নিত করিবার চেষ্টা করিয়া লাভ নাই, নিশ্চয়ই কয়েকজন মিলিয়া যুগ্মভাবে উহার আদিরূপটি রচনা করে নাই। কিন্তু প্রথম যাহার দ্বারা গল্প বা ছড়াটি রচিত হইয়াছিল তাহা নির্দেশ করিবার আর কোনো সম্ভাবনা রহিল না। তৃতীয়তঃ, মৌখিক সাহিত্যের রচনার কাল নির্দেশ করিবারও কোনো উপায় নাই। হাজার বছর পূর্বে যে-সব লোকসাহিত্যের সৃষ্টি তাহাদের ভাষাও কালের সহিত এরূপ বদলাইয়া গিয়াছে যে, আজ আর পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় নাই। উহাদের একান্ত আধুনিক সামগ্রী বলিয়াই মনে হয়। কাজেই ঐতিহাসিক গবেষকগণ লোকসাহিত্যের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিলে পণ্ডশ্রমই করিবেন। যখন আধুনিক কালে লোকসাহিত্য সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে, তখনই তাহার একটি বিশিষ্ট কালে প্রচলিত রূপকে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বাঁধিয়া রাখা সম্ভব হইয়াছে। তবে উহা বনের পাখিকে খাঁচায় পুরিবার মত। মুদ্রিত লোকসাহিত্য শিক্ষিত সমাজের গবেষণা-আলোচনা ও কৌতূহলের বস্তু। উহার প্রাণটি কিন্তু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। লোকসাহিত্যের সৃষ্টির ও প্রচলনের জন্য একটি বিশেষ ধরনের সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন। আধুনিক সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লোকসাহিত্যের সৃষ্টি ও উপভোগের অন্তরায়। পুরাতন ধাঁচের গ্রাম্য সমাজ, যেখানে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি সংহত, সেখানেই লোকসাহিত্য সৃজন ও প্রচলনের সম্ভাবনা। একালের গ্রাম-সমাজ তাহার পুরাতন সংহতি একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এখন আর নূতন লোকসাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়।

বাংলা দেশের লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্য আধুনিক কালে শিক্ষিত বাঙালীর নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন লালবিহারী দে, দীনেশচন্দ্র সেন, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। ইঁহাদের সংকলনগ্রন্থগুলির মাধ্যমে বাঙালী সংস্কৃতির এমন একটি নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইল যাহার পরিচয় তাহার লিখিত ইতিহাস ও সাহিত্যকর্মে মেলে নাই। তবুও সেই মধ্যযুগে এইরূপ বিপুল লোকসাহিত্য বাংলা দেশে সৃষ্ট হইয়াছে সেকালের লিখিত সাহিত্য ও জনসাধারণের সর্বস্তরেরই মনের নৈকট্য পাইয়া। বাংলা ভাষাসৃষ্টির পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সাহিত্য অভিজাত সমাজকে আশ্রয় করিয়া জনসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। চৈতন্যচরিতামৃত জাতীয় কিছু তত্ত্বপ্রধান গ্রন্থ লোকসমাজের উপযোগী ছিল না। তাহা ছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণনগরের রাজসভার কবির রচনা ভাষাবৈদগ্ধ্যে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য ছিল না। লোকসাধারণের নিকট উহাদের পৌঁছাইয়া দিবার জন্য গোপাল উড়ের তারল্যবিধায়ক শক্তির প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। অন্যথায় রামায়ণাদির অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য বা পদাবলী কথকতা, ভাসান, অষ্টমঙ্গলা এবং কীর্তনগানের মাধ্যমে লোকজীবনের সর্বস্তরে ছড়াইয়া পড়িত। লোকসাধারণের রসাস্বাদে বিঘ্ন ঘটিবার কিছুই ছিল না। পাশাপাশি এ ঘটনাটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, লোকসাহিত্যের একান্ত নিজস্ব ভাণ্ডার হইতে বাংলার মধ্যযুগের লেখ্য সাহিত্য অনেক-কিছু গ্রহণ করিয়াছে। বাংলার মাটিতে পৌরাণিক দেব-দেবীর যে জাতীয় রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহাদের কেন্দ্র করিয়া যে-জাতীয় কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কোনো বিে কবির মৌলিক উদ্ভাবনা নয়। মঙ্গলকাব্যের গল্পগুলি, নারীদের পতিনিন্দা, রন্ধনবর্ণনা প্রভৃতি প্রসঙ্গ, রামায়ণাদিতে প্রবিষ্ট নূতন অপৌরাণিক প্রসঙ্গের অনেকাংশ লোকসাহিত্যরূপে বীজাকারে মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইত। না হইলে বহু কবির রচনায় একজাতীয় প্রসঙ্গের এরূপ ছড়াছড়ি দেখা যাইত না।

মধ্যযুগের বাংলার লেখা সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের সম্বন্ধ

আধুনিক সাহিত্যেও লোকসাহিত্যের রীতি গৃহীত হইতে দেখা যায়। বাংলাদেশের আধুনিক শিশুসাহিত্যিকদের অনেকে বিশেষ করিয়া উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপকথার রাজ্য হইতে বহু বিষয় সংকলন করিয়া নূতন রূপে প্রায় মৌলিক করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় শিল্পীও "তাসের দেশ" "একটি আষাঢ়ে গল্প" প্রভৃতিতে রূপকথার জগতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক বালসেব্য ছড়া-রচনার পশ্চাতে এবং আধুনিক Nonsense Rhyme-এর উৎসে সক্রিয় রহিয়াছে ছেলেভুলানো ছড়ার প্রভাব। কোনো কোনো আধুনিক গল্পকার গ্রাম্য বৈঠকী গল্পের রূপাদর্শটি অনুসরণ করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথের আজগুবি গল্পগুলি এবং পরশুরামের বৈঠকী গল্পগুলির কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্য মনে পড়িবে। লোকসাহিত্যের প্রাণবন্ত রূপ

লোকসাহিত্যের রীতি ও আধুনিক সাহিত্য

বহুক্ষেত্রে লেখ্যসাহিত্যের বহুপ্রচলিত জীর্ণ ধারাকে সবল করিয়া তোলার কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপ উদাহরণ কম নাই।

বাংলা লোকসাহিত্যের উৎস বিচার করিতে গেলে মেয়েমহল, গ্রামবৃদ্ধদের জটলা ও যুবকদের আড্ডাকেই প্রধান স্থান দিতে হইবে। ঠাকুরমা-দিদিমার মুখে মুখেই রূপকথা-উপকথার গল্পগুলি সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া। মা-মাসির কণ্ঠে ছেলেভুলানো ছড়া ছেলেদের কান্না থামাইতে এবং ঘুম পাড়াইতে এক কালে বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে, এখনও এই ব্যবহার কমিয়া যায় নাই। মেয়েদের লৌকিক ব্রতকথা হইতে উদ্ভব ঘটিয়াছে ব্রতগীতির ও ব্রতকথার। গ্রামবৃদ্ধদের জটলা এবং যুবকদের আড্ডায় নানারূপ আজগুবি ও ভৌতিক গল্পের উদ্ভব। গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবন-অভিজ্ঞতার সূত্র ধরিয়াই প্রবাদ-প্রবচনের জন্ম হইয়াছে।

লোকসাহিত্যের উৎস

লোকসাহিত্যের মধ্যে প্রবাদ-প্রবচনের সাহিত্যমূল্য সর্বাপেক্ষা কম। এমন কি, ইহাদের বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেও অনেকেই রাজী হইবেন না। তবে ইহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, জাতির জীবন-অভিজ্ঞতার নানা দিক বিস্ময়কর প্রজ্ঞার সহিত সংশ্লিষ্ট বাক্যাংশে প্রবাদ-প্রবচনরূপেই আপনি দানা বাঁধিয়া উঠে। বেকনের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে : "The genius, wit and spirit of a nation are discovered by their proverbs." একটি জাতির ভাষাসম্পদের দিক হইতে প্রবাদপ্রবচনের গুরুত্বর মূল্য রহিয়াছে। কোনো ভাষার বৈশিষ্ট্য প্রবাদের ব্যবহারের দ্বারা কতকাংশে যে চিহ্নিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষার প্রাণবন্ত দ্রুতগতি, কৌতুকস্পৃষ্ট তীক্ষ্ণতা প্রবাদাদির সহযোগে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রবাদগুলি খাঁটি লোক-উৎসজাত। কখনও কোনো লেখকের ব্যবহৃত বাক্য হয়তো প্রবাদের স্তরে উন্নীত হয়—সর্বসাধারণ নিজেদের সম্পদ বলিয়া উহাকে গ্রহণ করে, কিন্তু বেশীর ভাগ প্রবাদের জন্ম ঘটিয়াছে জনসাধারণের ভাবনার ও অভিজ্ঞতার জগতে। ডিজরেলির ভাষায়: "Proverbs are anterior to books, and formed the wisdom of the vulgar, and in the earliest ages were the unwritten laws of morality." তবে প্রবাদে ব্যক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে লোকচরিত্র, নীতি প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সব প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে তাহাদের অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহা আংশিক লক্ষণমাত্র। প্রবাদসংগ্রহেই পরস্পর-বিরোধী বহু প্রবাদের সমাবেশ দেখা যাইবে।

প্রবাদ-প্রবচন

খনার বচন ও ডাকের বচন নামে পরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছড়াকে প্রবাদ-প্রবচনের

নিকটপ্রদেশের অধিবাসী বলা যায়। ডাকের বচনে মানবচরিত্র-বিষয়ক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা হইয়াছে কিছুটা নীতিবাদীর দৃষ্টিতে—উহাদের সার্বজনীনতা তাই প্রশ্নের অতীত নয়। খনার বচনে কৃষিবিষয়ক বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি ভাষারূপ পাইয়াছে।

খনার ও ডাকের বচন

ছেলেভুলানো নানাজাতের ছড়া লোকসাহিত্যের একটি প্রধান সম্পদ। নাগরিক সভ্যতায় শিক্ষাগর্বিত পরিবারেও উহাদের প্রচলন একেবারে লোপ পায় নাই। ছড়াগুলিকে শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। রূপকথা প্রভৃতির শ্রোতাদের মধ্যে বয়স্কদের স্থানও গ্রামসমাজে ছিল, কিন্তু ছড়াগুলি একান্তভাবে শিশুদের জন্যই রচিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "এই সকল ছড়ার মধ্যে একটা চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয়মাত্র নাই এবং কোন শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।" সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে ছেলেভুলানো ছড়াগুলির বৈশিষ্ট্য দুইটি: (১) চিত্রধর্মিতা, (২) অসংলগ্নতার এক অভিনব আস্বাদ। স্বল্পভাষার আয়োজনে সুন্দর চিত্রাঙ্কন, চিত্রে গতিবেগ যুক্ত করা এবং হৃদয়ের বর্ণে চিত্রগুলিকে রঞ্জিত করা ছেলেভুলানো ছড়াকে এক বিশেষ ধরনের রসাস্বাদের বিষয়ে পরিণত করিয়াছে। ছড়ার মধ্যে প্রাপ্ত অসংলগ্নতার বিশিষ্ট স্বাদটি ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মতো যে-সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন্ অলক্ষ্য বায়ুপ্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো সংলগ্ন কখনো বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ পরিবর্তনপূর্বক ক্রমাগত মেঘ রচনা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা যদি কোনো অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্ব-প্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত, তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো।"

ছেলেভুলানো ছড়া

ছেলেভুলানো ছড়া ও গানের পাশাপাশি বয়স্কলোকের উপযোগী নানাবিধ গান ও ছড়া রচিত হইতে দেখা যায়। কোথাও নূতন করিয়া রাস্তা বাঁধা হইয়াছে, পুল তৈরী হইয়াছে, তাহার আঞ্চলিক গুরুত্ব বহুক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষ ছড়া কাটিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কখনো কখনো দেখা যায় ডাকাতি, নৌকাডুবি, কোনোরূপ আকস্মিক বিপদপাত প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীকাব্য গ্রাম্যকবি বাঁধিয়াছেন।

উহা লোকসাধারণের সার্বজনীন সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া গ্রাম্য ছড়ায় দুইটি বিষয় খুবই প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে—"হর-গৌরী বিষয়ক এবং কৃষ্ণরাধাবিষয়ক। হরগৌরী বিষয়ে বাঙালির ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধা বিষয়ে বাঙালির ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে। একদিকে সামাজিক দাম্পত্যবন্ধন, আর একদিকে সমাজবন্ধনের অতীত প্রেম।" মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসাহিত্যের একটা বড় অংশের সহিত এই গ্রাম্য কবিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

বড়দের ছড়া ও কবিতা

ধর্মভিত্তিক সাহিত্যকে লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত করিবার অনেকেই পক্ষপাতী নন। লোকধর্মের মধ্যে নানারূপ বিশ্বাস ও আচার দেখা যায়। উহা লোকজীবনের সহিত স্বাভাবিকভাবে সম্পৃক্ত বলিয়া লোকসাহিত্যরাজ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার দাবি করিতে পারে। কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত জড়িত সাহিত্য লোকসাহিত্য নয়, আধুনিক লোকসাহিত্যের গবেষকদের এইরূপই অভিমত। এই কারণে বাউল, সহজিয়া, দেহতত্ত্ববিষয়ক গানকে অনেকে লোকসাহিত্য বলিতে চান না। কিন্তু বাংলাদেশের লোকসাধারণ এই জাতীয় সহজিয়া ধর্মভাবনাকে, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত না হইয়াই, জীবনের মধ্যে অনেকখানি বরণ করিয়া লইয়াছিল। কাজেই উহাদের লোক-সাহিত্যের জগৎ হইতে বহিষ্কার করা চলে না।

ধর্মভিত্তিক সাহিত্য কি লোকসাহিত্য?

বাঙালী মেয়েদের একটি আদিম ধর্মাচরণ ব্রত। ব্রতানুষ্ঠানের সহিত কতকগুলি ছড়া ও কবিতা উচ্চারিত হয়। উহার মধ্যে কোথাও সোজাসুজি মনের কামনাটি ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহাদের কাব্যমূল্য কিছু নাই। কতকগুলি ছড়ায় অবশ্য মানবিক ভাবাবেগের কিছুটা স্পর্শ মিলিতেছে। জনৈক সমালোচক লিখিয়াছেন, "কবির নিকট ব্রতকথা বাঙলার আদিম কাব্য; ঐতিহাসিকের নিকট ইহা বঙ্গের গৃহ ও সমাজের, ধর্ম ও কর্মের পুরাতন ইতিহাস; আর মাতৃভক্ত বাঙালীর নিকট ব্রতকথা বঙ্গজননীর স্তননিঃসৃত প্রথম ক্ষীরধারা।"

ব্রত

লোকসাহিত্যে গল্পের আয়োজনটি বিপুল। বিষয় এবং রসের দিক হইতে উহার মধ্যে রহিয়াছে বৈচিত্র্য। রূপকথা কল্পনা-আশ্রিত লৌকিক অলৌকিকে মিশ্রিত কাহিনী। ইউরোপে পরীর গল্প, ভূতপ্রেত-দৈত্যদানার গল্প, পশুপক্ষীর কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজকুমার রাজকুমারীর নানাবিধ গল্প সাধারণ একটি নামে অভিহিত হয় 'ফেয়ারি টেল'। আমাদের দেশে একটু লঘুধরনের পশুপক্ষী-বিষয়ক গল্পগুলি উপকথা নামে পরিচিত। একটু ভাবগম্ভীর রাজা-রানী রাক্ষস-পরীদের বর্ণঘন কাহিনীগুলি রূপকথা নামে অভিহিত। রূপকথা উপকথার মধ্যে প্রকাশিত জীবনসত্যটি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় ব্যক্ত করা যায়: "পৃথিবীর চিরপরিচিত

মূর্তিগুলিই একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত হইয়া রূপকথার রাজ্যের অলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে-সব রাক্ষস-খোক্কস আমাদের পথরোধ করে তাহারা আমাদের পার্থিব বাধাবিঘ্নেরই একটা রূপান্তরিত সংস্করণমাত্র, যে অনুকূল দৈব বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর রূপে সেই সমস্ত রাক্ষস-খোক্কসের মৃত্যুরহস্য আমাদের শিখাইয়া দেন, তিনি যেন অযাচিত সাহায্যের দ্বারা এই পৃথিবীতে তাঁহার কার্পণ্য-কলঙ্কের ক্ষালন করেন।........যে বাধাবিপদের মধ্য দিয়া রূপকথার রাজপুত্র নিজ প্রিয়াকে লাভ করেন, তাহা আমাদের বর্তমান বণিকধর্মী বিবাহের উপর আমাদের অন্তঃস্থ আদর্শ প্রেমিকের অভিমানক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসমাত্র।[৪] রূপকথা-উপকথা বড়ছোট নির্বিশেষে সব আসরে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু বড়দের নিজেদের আসরের জন্য নানারূপ উদ্ভট রসের আজগুবি গল্প, ভূতের গল্প, হাসির গল্পও লোক-সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশরূপে প্রচলিত।

গল্পসাহিত্য—রূপকথা—উপকথা—আজগুবি গল্প

ব্যালাড্ সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণা এদেশে প্রচলিত তাহাতে গবেষকদের মনে কিছু সংশয় আছে। মৈমনসিং হইতে প্রাপ্ত ব্যালাড্গুলিকে তাঁহারা খাঁটি লোকসাহিত্যের অংশ বলিয়া মানিতে চাহেন না। অবশ্য ইহাদের লোকসাহিত্যরূপে গ্রহণ করিলে বাংলা লোকসাহিত্যের কাব্যগুণের কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ব্যালাড্ কি লোক-সাহিত্য?

লোকসাহিত্যের রস শিক্ষিত আধুনিক লোকের জন্য নয়, কিন্তু উহার মধ্যে মাটির একটি ভিজা গন্ধ পাওয়া যায় উহা আমাদের লোহাকাঠ-যন্ত্রপূর্ণ জীবনে নূতনত্বের স্বাদ আনিতে পারে।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসঃ উহার আদর্শ এবং ক্রমবিকাশ

বাংলা সাহিত্য লইয়া রীতিমত পঠন-পাঠন এবং অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিক হইতে। জাতীয় সাহিত্যের স্বরূপ অনুধাবনের জন্য বাঙালীর আগ্রহ উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সহিত সম্পৃক্ত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করিল। বাঙালীর সৃজনশীলতা যেমন নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল, সেইরূপ সাহিত্যবিষয়ে আলোচনার সূত্রপাতও ঘটিল। ক্রমে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া গবেষণার নানাসূত্র উন্মোচিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গবেষণালব্ধ তথ্যাদির সহায়তায়

ভূমিকা

পূর্ণতর ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা দেখা দিল। বিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের উদ্বোধনের ফলে সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা আর একধাপ আগাইয়া গেল। সাহিত্যের ইতিহাস রচনা ক্রমে বিস্তৃত, বিকসিত এবং আরও অনেক বিজ্ঞানসম্মত হইয়া উঠিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিবর্তনধারাটি লক্ষ্য করিলে তথ্যসঞ্চয়, বিন্যাস এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির নানারূপ পার্থক্য এবং ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যাইবে।

সাহিত্যের ইতিহাসের লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে নানারূপ ধারণা প্রচলিত আছে। বিভিন্ন সংঘর্ষমূলক মতামতের বিশ্লেষণ করিয়া উহার আদর্শরূপের একটি ধারণা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সাহিত্যের ইতিহাসে কালানুক্রম রক্ষা করিয়া লেখকদের এবং রচনাবলীর বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় দিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন তথ্যসঞ্চয়। পুরাতন লেখকদের রচনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য নির্ণয় করা খুবই কঠিন ব্যাপার। ইহার জন্য প্রয়োজন পুঁথিসংগ্রহ, পুঁথির প্রাচীনতা পরীক্ষা, বিভিন্ন পুঁথির পাঠ মিলাইয়া কোনো গ্রন্থের গ্রহণযোগ্য রূপটি দাঁড় করানো। এইভাবে লেখার পরিচয়—লেখকের পরিচয়—লেখার কালনির্ণয় বহু বিস্তৃত এবং জটিল গবেষণার কায সন্দেহ নাই। আধুনিক কালের লেখকদের সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের কাজ তুলনামূলকভাবে কিছু সহজ হইলেও শ্রমসাধ্য এবং উহা নিপুণ সাহিত্যবোদ্ধার অপেক্ষা রাখে। লেখকদের জীবনী-সংকলন, রচনাবলীর কাল-নির্ণয়, প্রকাশের কাল-নির্ণয় প্রভৃতি হইল প্রাথমিক কাজ। এই কাজ অনেকদূর অগ্রসর না হইলে সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনা সম্ভবপর হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতির সংগ্রহে বহুসংখ্যক হাতে-লেখা পুঁথি রহিয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বসন্তরঞ্জন রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিশিষ্ট গবেষকেরা বহু বিশিষ্ট গ্রন্থের সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশও করিয়াছেন। প্রাচীন বাংলার লেখকদের সম্পর্কে, নানা পুঁথি বিষয়ে বিশিষ্ট পত্রপত্রিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে সামান্য এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ব্যাপকভাবে আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। এই আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল অবশ্য অনেক পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকায়। কবিওয়ালাদের জীবনী ও কবিতা-সংগ্রহ, ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের জীবনী সংগ্রহ করিয়া গুপ্তকবি তথ্যসংগ্রহের পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। আজ পুরাতন যুগের সব না হইলেও, অনেক তথ্য আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আধুনিক কালের তথ্যসংগ্রহে লঙ্ সাহেব কৃত বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তকতালিকা খুবই মূল্যবান উপাদান। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "বঙ্গভাষার লেখক" এবং আরও বেশী

তথ্যসংকলন

ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সহিত সংগৃহীত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সাহিত্যসাধক-চরিতমালা"র নয় খণ্ড গ্রন্থ ইতিহাসপ্রণয়নের দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়তঃ, কালানুক্রমে সজ্জিত করিবার সময়ে সংগৃহীত তথ্যকে বিশ্লেষণ করিয়া যুগবিভাগ এবং শাখাবিভাগ এই দুইটি কার্য করা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রধান যুগভেদ একটি। ইংরেজ আগমনের ফলে সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত। ইংরেজপূর্ব বাংলা সাহিত্য প্রাচীনযুগের সাহিত্য। এই দুই যুগের পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। অনেকে রাজনৈতিক শক্তির উত্থানপতন দেখিয়া এই ইতিহাসকে তিন যুগে ভাগ করিয়াছেন—তুর্কিবিজয়-পূর্ব হিন্দুযুগ বা আদিযুগ, মুসলমান আমল বা মধ্যযুগ এবং বৃটিশ আমল বা আধুনিক যুগ। আদিযুগ এবং মধ্যযুগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য না থাকায় অনেকেই ইহাদের দুইটি পৃথক যুগরূপে চিহ্নিত না করিয়া একই যুগের অন্তর্ভুক্ত দুটি পর্বরূপে চিহ্নিত করিতে চান। পুরাতন বাংলা সাহিত্যকে কয়েক পর্বে ভাগ করিয়া দেখিবার কথা সাহিত্যের অনেক ঐতিহাসিকই প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছেন তুর্কিবিজয়ের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবকাল—দীনেশচন্দ্র সেন ইহার নাম দিয়াছিলেন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ। প্রাক্-চৈতন্য কাল-পর্ব—দীনেশচন্দ্র ইহাকে হুসেনশাহী আমল বলিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভাবকাল এবং উত্তর-চৈতন্য পর্ব, বা দীনেশচন্দ্রের মতানুযায়ী কৃষ্ণচন্দ্রীয় পর্ব। দীনেশচন্দ্রের ব্যবহৃত অভিধাগুলি অনেকেই এখন আর মানিতে চাহেন না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পর্ববিভাগ করিতে গেলে (১) তুর্কিবিজয়পূর্ব কাল, (২) প্রাক্ চৈতন্য স্তর এবং (৩) উত্তর-চৈতন্য স্তর—এইভাবে ভাগ করিতেই হইবে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের মধ্যে স্তরভেদ করিয়া বিশ্লেষণ করাই বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া অনেকে মনে করেন। কেহ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে স্তরভেদ করিতে চান। প্রথমার্ধে মননশীল প্রস্তুতি এবং দ্বিতীয়ার্ধে সৃজনশীল উৎসব-সমারোহ ঠিক এক বস্তু নয়। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার প্রভাবকালকে একটি স্বতন্ত্র পর্ব বলিয়া চিহ্নিত করার পিছনেও যুক্তি আছে। যুগবিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন শাখাবিভাগ এবং প্রতিটি শাখার ক্রমবিবর্তনও লক্ষ্য করিবার বস্তু। পুরাতন বাংলা সাহিত্যে পুরাণানুবাদ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য এবং অন্যান্য রাগাত্মিকা সংগীত—প্রধানতঃ এই চারিটি শাখার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুগের সাহিত্যে উপন্যাস ও গল্প, কাব্য-কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ও রচনাসাহিত্য প্রভৃতি শাখা রহিয়াছে।

যুগবিভাগ এবং শাখাবিভাগ

সাহিত্যের ইতিহাসপ্রণয়নে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিটি বিশ্লেষণ

করাও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। সাহিত্যসৃষ্টি একটি স্বয়ম্ভু জিনিস নয়। লেখকের মন যুগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব সরল হইতে পারে আবার জটিলও হইতে পারে। কোনো রচনার শিল্পগুণ বিচারের সময়ে ঐতিহাসিক পটভূমি কতটা অনুসরণ করা হইবে, সে বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু

সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমি

সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ-ইতিহাসের পটভূমিটি অনুধাবন করা যে অপরিহার্য ব্যাপার, সে-বিষয়ে কোনো সাহিত্যসাধকই সংশয় প্রকাশ করেন না। সাহিত্য ব্যক্তিগত ভাবে একজন শিল্পীর মনোলোকের সৃষ্টি, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াও জাতীয় ইতিহাস নানা ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। মার্কস্‌বাদী ইতিহাস-দর্শন অবশ্য অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের উপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে, উহার নিয়ামক শক্তিকে অসাধারণ মর্যাদা দেয়। যুগসর্বস্বতা শিল্পীর ব্যক্তিপ্রতিভাকে একরূপ অস্বীকার করে। সকলে তাই এই মত মানিয়া লইতে চান না। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক পরিবেশের সহিত তাল মিলাইয়াই সাহিত্যেরও ক্রমবিবর্তন ঘটে। দীনেশচন্দ্রের সময় হইতেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসলেখকগণ অল্পাধিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমির বিশ্লেষণ করিয়া কাজে লাগাইয়াছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস লইয়া যে-সব উল্লেখযোগ্য গবেষণা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায় প্রভৃতি করিয়াছেন তাহার সহায়তায় পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সম্ভাবনা বাড়িয়া গিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনের দুইটি সংশ্লিষ্ট সূত্রের সম্বন্ধ আছে। সাময়িক পত্রের প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। সাংস্কৃতিক পটভূমি হিসাবে সাময়িক পত্রের ইতিহাসও বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। কেদারনাথ মজুমদার এবং বিশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ এই দিক দিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য পটভূমি। নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের সহিত রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। রঙ্গালয়ের ইতিহাস বিষয়ে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

জীবনীসাহিত্যের এবং সাহিত্যসমালোচনার সমৃদ্ধি সাহিত্যের ইতিহাস-রচনাকে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকখানি উল্লেখ-যোগ্য চরিতগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বিংশ শতকেও অনুরূপ অনেকগুলি গ্রন্থ লেখা

লেখকদের জীবনী এবং গ্রন্থ সমালোচনা

হইয়াছে। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিদ্যাসাগরের জীবনী, শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ীর জীবনী, রামমোহন রায়ের ইংরেজী এবং বাংলায় লেখা জীবনী, যোগীন্দ্রনাথ বসুর লেখা মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, জে. এন গুপ্তের ইংরেজিতে লেখা রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনী, বিনয় ঘোষের

লেখা তিন খণ্ডে বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, প্রভাত মুখোপাধ্যায় রচিত চারি খণ্ডে রবীন্দ্রজীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন বিশিষ্ট লেখকের জীবন এবং তাঁহাদের কাল সম্বন্ধে নানা তথ্য এবং ব্যাখ্যান লাভ করা যায়। তাহা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি বড় ছোট অধিকাংশ লেখক সম্বন্ধে বিস্তারিত সমালোচনা করা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতি সমালোচকদের আলোচনার মধ্য দিয়া বড়-মাঝারি সব লেখকেরই শিল্পমূল্যের মান মোটামুটি সুনির্দিষ্ট হইয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এই মূল্যমান অবশ্যই অনুধাবনীয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশ দার্শনিক ও ধর্মীয় মতবাদের আদর্শে পুষ্ট। এই মতাদর্শের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইলেই উক্ত ধারাগুলির বিকাশ ও স্বরূপ বুঝা সম্ভব। বৌদ্ধসহজিয়া নাথপন্থ, শাক্ততন্ত্র, বৈষ্ণব সহজাচার, বাউলমার্গ প্রভৃতি দর্শন ও সাধনরীতি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের পুরাতন যুগের ইতিহাসে বিশেষ গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এ বিষয়ে গবেষণামূলক অনেকগুলি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে সংযোজিত হইয়াছে। শশিভূষণ দাশগুপ্তের "Obscure Religious Cults," "Tantric Buddhism," "শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ" "ভারতীয় শক্তিসাধনা" প্রভৃতি, রাধাগোবিন্দ নাথের চার খণ্ডে প্রকাশিত "গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনা অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

দার্শনিক পরিচিতি

সাহিত্যের ইতিহাসে শুধুমাত্র গ্রন্থের বিবরণ থাকিলেই চলে না, একটি কালপর্বের সহিত অপর কালপর্বের যোগসূত্রটি ধরিয়া দিতে হয়, একজন লেখকের সহিত অপর লেখকের সম্বন্ধ, একটি ধারার উপর অপর ধারার প্রভাব আবিষ্কার করিতে হয়। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে কোনো গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের আলোচনা করিতে গেলে একবার পিছনে এবং একবার সম্মুখে তাকাইতে হইবে এবং পূর্বাপর ক্রমবিকাশের সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হইবে।

যোগসূত্রের সমস্যা

গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের বিচারের সময়ে তাঁহাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং শিল্পমূল্য দুই দিক হইতেই দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এমন অনেক লেখক আছেন যাঁহাদের রচনা শিল্পবিচারে খুব উচ্চস্তরের বস্তু নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক ধারাসৃষ্টির দিক হইতে তাঁহাদের মূল্য অসাধারণ। উদাহরণস্বরূপ বিহারীলাল চক্রবর্তীর নামোল্লেখ করা চলে। রোমান্টিক গীতিকবিতার ধারা বাংলা সাহিত্যে আজ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইহার সূচনা বিহারীলালে।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং শিল্পমূল্য

কিন্তু বিশুদ্ধ শিল্পমূল্যের দিক দিয়া বিহারীলাল আদৌ প্রথম শ্রেণীর কবি নন। সাহিত্যের ইতিহাস এক্ষেত্রে তাঁহাকে কিরূপ মূল্য দিবে? পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের সংকেতনাট্যের কোনো উত্তরসূরী পাই না। ইহা যেন সর্ববিধ অনুকরণ-ক্ষমতার বাহিরে। কিন্তু উহাদের শিল্পমূল্য অসাধারণ। সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক হইতে বিচার করিয়া গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে মূল্য দিতে হইবে, সেইরূপ শিল্পমূল্যকেও বিশেষ মর্যাদা দিতে হইবে। সাহিত্যের চরম গৌরব শিল্পোৎকর্ষে। সাহিত্যের ইতিহাসেও তাই শিল্পগুণের আলোচনা স্থান পাইবে, এবং শিল্পোৎকর্ষ-অনুযায়ী গুরুত্বের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের পূর্বে কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় কাশীপ্রসাদ ঘোষের লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের (১৮৩০ সালে প্রকাশিত)। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রস্তাবে" প্রাচীন বিখ্যাত কবিদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসুর "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" এই পর্বের অনুরূপ পুস্তক ও প্রবন্ধগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্গভাষার ইতিহাস", হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের "কবিচরিত" গ্রন্থ দুটিতেও ইতিহাস-রচনার খণ্ডিত চেষ্টা আছে। রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" এই পর্বের গ্রন্থগুলির মধ্যে তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত। এই সব গ্রন্থ প্রাথমিক চেষ্টা মাত্র। পুরানো সাহিত্যের মধ্যে অধিকাংশেরই অবলম্বন কিম্বদন্তী এবং শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত কৃত্তিবাস, কাশীরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থ।

দীনেশচন্দ্রপূর্ব ইতিহাসচর্চা

দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত হয়। হাতে-লেখা পুঁথির জগৎ হইতে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনার এই সাধনা ঐতিহাসিক গুরুত্বমণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: "এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড়ো একটা ব্যাপার যে আছে তাহা আমরা জানিতাম না.... আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখা-সম্পন্ন ইতিহাস-বনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।" দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির চমৎকার পরিচয় রহিয়াছে। তাহা ছাড়া রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক যুগপরিবেশের ব্যাখ্যানে, লেখকদের সাহিত্যপ্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনি একই সঙ্গে ঐতিহাসিক এবং রসবেত্তার উচ্চ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

দীনেশচন্দ্র এবং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'

দীনেশচন্দ্রের গবেষণার অনেকাংশ পরবর্তীকালে সংশোধিত হইয়াছে, তাঁহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও সব ক্ষেত্রে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হয় না—কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি মহাগুরুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহার সে মর্যাদা চিরদিন অম্লান থাকিবে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন এবং আধুনিক কালের পূর্ণাঙ্গ এবং সুবৃহৎ ইতিহাস লিখিলেন সুকুমার সেন। আধুনিক কাল সম্পর্কে সুশীলকুমার দের '19th Century Bengali lilerature,' প্রিয়রঞ্জন সেনের 'Western Influence on Bengali literture' এবং হারানচন্দ্র রক্ষিতের "ভিক্টোরিয়া যুগের বাংলা সাহিত্য' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইলেও সুকুমার সেন আধুনিক কাল পর্যন্ত একটা সামগ্রিক সুসম্বদ্ধ ইতিহাস প্রথম রচনা করিলেন। তাঁহার গ্রন্থ তথ্যের মহামূল্যবান খনিসদৃশ। যুগবৈশিষ্ট্য এবং পারস্পরিক যোগসূত্র বিষয়ে তিনি ইঙ্গিতবহুল রচনারীতি অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার একান্ত বস্তু-অনুগ দৃষ্টি এবং সুপ্রচুর অধ্যয়ন গ্রন্থটিকে পণ্ডিতদের নিকট আদরণীয় করিয়াছে, শিক্ষার্থীদের অনুধাবনযোগ্য রীতি এখানে অনুসৃত হয় নাই।

সুকুমার সেন
আশুতোষ ভট্টাচার্য
অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আশুতোষ ভট্টাচার্য "লোকসাহিত্যে'র যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন বাংলা সাহিত্যে তাহা মহামূল্যবান সামগ্রী। তাঁহার "নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস"ও উল্লেখ্য পুস্তক। কিন্তু "বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস" বাংলা সাহিত্যের একটি শাখার ইতিহাস হিসাবে পূর্ণাঙ্গ এবং দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে মূল্যবান। লোকসংস্কার এবং কৌম জীবনযাত্রার দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি মঙ্গলদেবদেবীর উৎস খুঁজিয়াছেন। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" চৈতন্যপর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে দুইটি সুবৃহৎ খণ্ডে। প্রস্তাবিত সব কয়টি খণ্ড প্রকাশিত হইলে ইহা বাংলা সাহিত্যের সর্ববৃহৎ ইতিহাসরূপে গণ্য হইবে। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক পটভূমির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী এবং সমকালীন মতামত উদ্ধার ও বিচার করিয়া আপনার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। ফলে গ্রন্থটি সাহিত্যের ইতিকথার কোষগ্রন্থের রূপ গ্রহণ করিতেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা" ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে নয়, সমালোচনাগ্রন্থ হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান। শতাব্দীর বর্তমান অর্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চা যে আরও সমৃদ্ধ হইতে থাকিবে এরূপ ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে।

বাংলা সনেটের ক্রমবিবর্তন

(মধুসূদন হইতে মোহিতলাল)

বাংলা সাহিত্যে সনেটের আগমন ঘটে ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে এবং মধুসূদনের হাতেই উহার প্রতিষ্ঠা। বাংলা সাহিত্যে সনেটের ধারাটি মোটামুটি ফলপ্রসূ হইয়াছে। সে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে সনেটের রূপরীতি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। চৌদ্দ চরণের কবিতাকেই সনেট বলা হইয়া থাকে। ইহার ছন্দভঙ্গি দেশানুযায়ী স্বতন্ত্র—ইতালীয় ভাষায় hendecasyllable, ফরাসিতে 'alexandrine', ইংরেজিতে "decasyllable", সনেটের উদ্ভবের অনুসন্ধান করিতে গিয়া গবেষকেরা পেত্রার্কা-পূর্ববর্তী দু'-একজনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া থাকেন। দান্তের কোনো কোনো রচনায় এই রীতি অনুসরণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। পেত্রার্কার হাতেই এই শিল্পরীতির পূর্ণপ্রতিষ্ঠা। "Petrarcha established both its form and its spirit by using it in his Rime to express his idealized love for Laura di Novi." পেত্রার্কার আদর্শে ইউরোপের নানা স্থানে সনেটরীতির বিস্তার ঘটে। ইউরোপে সনেটের যে-সব নূতন আদর্শ প্রচলিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সেক্‌স্‌পীরীয় রীতিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মিল্টনের সনেটগুলির মধ্যেও রীতি ও রসঘটিত কিছু কিছু নূতনত্ব চোখে পড়ে।

সনেটের রূপনীতি—পেত্রার্ক-প্রবর্তিত আদর্শ

পেত্রার্কা-সনেটের চৌদ্দ চরণে দুটি বিভাগের কল্পনা করা হয়। প্রথম আটটি চরণকে বলা হয় Octave, শেষ ছয়টি চরণকে Sestet। Octave-এ মিলের ধরনটি প্রায়ই সুনির্দিষ্ট নিয়মানুসারী—ক-খ-খ-ক, ক-খ-খ-ক। Sestet-য়ের মিলে তুলনামূলক স্বাধীনতা থাকে কবির। তবে মোটামুটি তিনটি প্যাটার্নেরই অনুসরণ বেশী হয়—গ-ঘ-গ, ঘ-গ-ঘ ; গ-ঘ-ঙ, গ-ঘ-ঙ ; গ-ঘ-ঙ, ঘ-গ-ঙ। Octave-য়ে কবি উপস্থাপিত করিবেন একটি ভাবকল্পনা, Sestet-য়ে তাহাকে বিস্তার দিবেন, বিশেষিত করিবেন। ভাবকল্পনা, ছন্দের সংগীত, অন্ত্যানুপ্রাস সব মিলাইয়া সমুদ্রতরঙ্গের এক ধরনের প্রসারণ-সংকোচন অনুভূত হইবে, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে বিখ্যাত সমালোচক উইলিয়াম শার্পের বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য : "When it is a love-sonnet, or the emotion is tender rather than dignified, it will correspond to the law of 'flow' and 'ebb' i.e. of the inflowing solid wave (the octave), the pause, and then the broken resilient wash of the wave (the sestet). When on the other hand, it is intellectually or passi-

-onately forceful rather than tender or pathetic, dignified and with impressive amplitude of imagery rather than strictly beautiful then it will correspond to the law of 'ebb' and 'flow'—i.e., of the steady resilient wave-wash till the culminating moment when the billow has curved and is about to pour shoreward again (the octave), and of the solid inflowing wave sweeping through forward (the sestet)."

সেক্‌স্‌পীয়র সনেটের স্তবকবন্ধনে নূতনত্বের সৃষ্টি করিলেন। Octave-Sestet-এর ভাগটি তিনি অনুসরণ না করিয়া তিনটি চার চরণের স্তবক এবং সমাপ্তিতে একটি সমিল যুগ্মচরণের সাহায্যে সনেটে নবতর স্বাদ সঞ্চারের চেষ্টা করিলেন। সাধারণতঃ অন্ত্যানুপ্রাসের পদ্ধতিটি হইল ক-খ-ক-খ, গ-ঘ-গ-ঘ, ঙ-চ-ঙ-চ, ছ-ছ। স্তবক হইতে স্তবকান্তরে, ভাবভঙ্গির উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্দায় উঠিয়া সমাপ্তির সমিল পয়ারে গোটা সনেটের সারনির্যাস আনিয়া পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দেওয়াই এই রীতির লক্ষ্য। বিখ্যাত সমালোচক থিওডোর ওয়াট্‌স-ডান্‌টনের মতে : "The quest of the Shakespearean sonnet is not like the sonnet of the Octavo and Sestet, senority, and so to speak, metrical counterpoint, but sweetness; and the sweetest of all possible arrangements in English versification is a succession of decasyllabic quatrains in alternate rhymes knit together and clinched by a couplet... A chief part of the pleasure of the Shakespearean sonnet is the experience of the climacteric rest of the couplet at the end."

সেক্‌সপীরীয় ও মিলটনীয় সনেট রীতি

মিলটনের সনেটে যেমন সেক্‌স্‌পীরীয় স্তবকসজ্জা নাই, তেমনি নাই পেত্রার্কাচঙের অষ্টক-ষটকে বিভাগ ও তরঙ্গ-ভঙ্গ। চৌদ্দটি চরণ মিলিয়া সেখানে ঘনপিনদ্ধ একটি রূপ গঠন করিয়াছে। একটা সংহত তীব্র বিদ্যুৎদীপ্তি এ জাতীয় সনেটের বিশিষ্ট স্বাদ।

সনেটের রূপটির সঙ্গে মধুসূদন পরিচিত হইলেন ইংরেজি সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে। হিন্দু কলেজে পাঠকালে তিনি ইংরেজিতে একাধিক সনেট লিখিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মেঘনাদবধকাব্যাদি রচনা করিয়া যশস্বী হইবার পরে "কবি-মাতৃভাষা" নামে একটি সনেট রচনা করেন। তারপরে বহুদিন তিনি এই ধারাটির অনুশীলন করেন নাই। অবশেষে ১৮৬৫ সালে ফরাসী দেশে ভার্সাই নগরীতে বাস করিবার সময়ে তিনি পেত্রার্কার সনেট-আদর্শের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আসেন। তিনি তখন ইতালীয় ভাষা খুব ভালো ভাবেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কাব্য ও

নাটকের নানারূপ রূপরীতির উদ্‌গাতা, বাংলা সনেটেরও তিনিই জনক। মধুসূদনের সনেটগুলি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। মধুসূদনের কবিমনে আবেগের প্রবলতা যেমন রোমান্টিক গীতিধর্মের অনুকূল ছিল, সেইরূপ মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য ও বিস্তারের জগতে তাঁহার কবিহৃদয়ের ছিল স্বচ্ছন্দবিহার। সনেটের জীবনদৃষ্টির যে মূল কথা ক্ষুদ্রের মধ্যে মুহূর্তের চকিতে চমকে পূর্ণের রূপদর্শন, মধুসূদনের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব বড় ছিল না। বরং বহুক্ষেত্রে তিনি যে সনেটদেহের ক্ষুদ্র পিঞ্জরে বন্ধনের অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মধুসূদন দীর্ঘকাল ক্লাসিক কাব্যাদির চর্চা করিয়াছেন। তাহার ফলে সনেটের সুসংবদ্ধ রূপরীতিটি আয়ত্ত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হয় নাই। মধুসূদনের সনেটগুলির মধ্যে তাঁহার জাতীয় ভাবনায় প্রত্যাবর্তনের সুরটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে যে সব সনেটে কবি আপনার ব্যক্তিহৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়া সোনামুঠি কুড়াইয়া আনিয়াছেন, তাহাদের শিল্পোৎকর্ষই সবচেয়ে বেশী। কবির অন্তর দীর্ণ করিয়া একটি হতাশার সুর উঠিয়াছে এই কবিতাগুলির মধ্যে। বিশেষ করিয়া অর্থ ও কাব্যের দুই বিপরীত তারকে এক বীণায় বাঁধিবার ব্যর্থ চেষ্টা এবং আপনার ক্ষীয়মাণ কাব্যরচনাশক্তির জন্য বেদনাবোধ কবিতাগুলিতে একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে।

বাংলা সনেটের জন্ম—মধুসূদন

যে জাতীয় প্রতিভা না থাকিলে সনেটরচনা একেবারেই অসম্ভব, মধুসূদনের উত্তর-কালের হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কৃত্রিম ক্লাসিকতায় তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না। নবীনচন্দ্রের বাধাবন্ধহীন উচ্ছ্বাস সনেটরীতির একেবারেই প্রতিকূল ছিল। অপর পক্ষে রোমান্টিক গীতিকবি বিহারীলালের শিল্পরচনাও যথেষ্ট সচেতন ও নিপুণ ছিল না। তাঁহার পক্ষে সনেটরচনার চেষ্টাও অনেকটা হাস্যকর হইত। তিনি আপন প্রতিভার প্রকৃতি বুঝিয়াছিলেন। সনেট লিখিবার চেষ্টাও তিনি করেন নাই। তাঁহার প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ সনেটরচনায় উচ্চস্তরের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিপ্রকৃতির আলোচনা করিতে গিয়া মোহিতলাল লিখিয়াছেন,—"দেবেন্দ্রনাথের কল্পনায় ধ্যান ছিল না, নেশার মত্ততা ছিল। 'He ate the laurel and is mad'—এ কথা তাঁহার সম্বন্ধেই খাটে। ...তাঁহার কল্পনায় তীব্র মাদকতা ছিল, সজ্ঞানতা ছিল না; তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম ভাবাবেগবিহ্বল, বস্তুজ্ঞানবিমুখ, তাহাতে চেতনা অপেক্ষা মোহই অধিক। বিদ্যাপতির রূপ-মোহ 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল'—আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিতে গভীর হইয়া উঠিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের অতৃপ্তি নাই, তিনি বিভোর। কীটস-এও এই ভোগ-বিভোরতা আছে, কিন্তু তাহা বাস্তবকে বরণ করিয়া—সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মসাৎ করিয়া। এজন্য কীট্‌স্-এর কাব্য ও দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে অনেক প্রভেদ।

দেবেন্দ্রনাথ সেন

দেবেন্দ্রনাথ আপনার ভাবাবেগে আকুল হইয়া ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেও স্তম্ভিত করিয়া গাহিয়া উঠেন—

দুর্জয় বানের মুখে ভাসাইয়া দিব সুখে
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন।

এই 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন' তাঁহার কল্পনালোকে অদ্ভুত হইয়াই রহিল ;… তাঁহার কবিতায় আর্টের সংযম নাই, কিন্তু অসংযমের আর্ট আছে। "দেবেন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ের উচ্ছ্বাস-আবেগের অতিরেক সনেটরীতি অনুশীলনের পক্ষে বাধাস্বরূপ। কিন্তু কবির sensuousness, মোহিতলাল কথিত অসংযমের 'আর্ট' সনেটের বন্ধনে সাফল্য লাভ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ আপন উচ্ছ্বসিত কবিপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলিয়াই সনেটের রূপগত সংযমকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার বড়াল
গোবিন্দচন্দ্র দাস

অক্ষয়কুমার বড়াল রোমান্টিক মনের অধিকারী লিরিক কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কবিতার মধ্যে রহিয়াছে বাস্তব অনুভূতি—ভাবচেতনায় চিরাগত সংস্কার ও প্রাচীন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং প্রকাশভঙ্গির সংযম। এই কারণেই তাঁহার সনেট-রচনার চেষ্টাও ব্যর্থ হয় নাই। সমালোচকেরা তাঁহার গীতিধর্মের বাধা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "অতিরিক্ত সংযমের ফলে ভাষার একপ্রকার রুক্ষতা ঘটিয়াছে, ছন্দের গতি ও কল্পনার রসাবেশ মন্দীভূত হইয়াছে।" কিন্তু এই কারণেই সনেটে "ভাব ভাবুকতার পীড়নে গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে, ভাষাও স্বৈরাচার সম্বন্ধে অতিশয় সতর্ক ও সজাগ।" গোবিন্দচন্দ্র দাস স্বভাবকবি ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল না। মধুসূদনের সনেট হইতেই তিনি প্রাথমিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিল ও স্তবকবন্ধনের ব্যাপারে বিশেষ করিয়া সমাপ্তির সমিল চরণ দুইটিতে ভাবসংগীত কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সেক্সপীরীয় সনেটের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের নানা কাব্যগ্রন্থেই কতকগুলি করিয়া সনেট সংকলিত হইতে দেখা যায়। তবে বিশেষ করিয়া "কড়ি ও কোমল", "নৈবেদ্য" এবং "চৈতালির" কাব্যগ্রন্থগুলিকে সনেট-সংকলন বলিয়া অভিহিত করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা আবেগে উত্তাপে উচ্ছ্বসিত প্রবাহে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্যকীর্তিরূপে গণ্য হইতে পারে। ভাবকল্পনায় যত গভীর ও প্রবল উচ্ছ্বাসধর্মই থাকুক না কেন, রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা ছিল অতি উচ্চ মার্গের। সনেটের আকৃতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য তিনি জানিতেন। বুদ্ধি দিয়া বুঝিয়াছিলেন, সমগ্র শিল্পচেতনা দিয়াও অনুভব করিয়াছিলেন। প্রয়োজনবোধে তিনি লিরিকের রূপাকৃতি হইতে সরিয়া আসিয়া সনেটের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। "কড়ি ও কোমলে" রবীন্দ্র-ভাবকল্পনার মধ্যে প্রথম যৌবনের প্রণয়াবেশ ও রূপমোহ প্রবলবেগে তরঙ্গিত হইতেছিল। তাহারই রঙে বিশ্বকে নারীকে রঞ্জিত করিয়া দেখিতে গিয়া যে পরিমাণ

আবেগোচ্ছ্বাস ফেনিল হইয়া উঠিতে পারে, কবি তাহা অনুমান করিয়াছিলেন। সেই সম্ভাব্য অসংযমের হাত হইতে কবিতাকে বাঁচাইবার জন্য কবি সনেটের স্বেচ্ছাবৃত বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করিলেন। "কড়ি ও কোমল" রবীন্দ্রনাথের পরিণত কাব্য নয়। কিন্তু ইহার সংহত দেহরূপের পাত্রে ভাবাবেগের তীব্রতা প্রতিহত হইয়া ঘনীভূত রসাস্বাদ সৃষ্টি করিয়াছে। সনেটের পেত্রার্কা-প্রবর্তিত বা সেক্‌স্‌পীয়র-অনুসৃত ব্যাকরণ হইতে বহু ক্ষেত্রেই কবি বিচ্যুত হইয়াছেন, কিন্তু সনেটের বিশেষ আস্বাদটি তাঁহার কবিতা বহন করিয়াছে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। "নৈবেদ্য" কাব্যে ভারতীয় প্রাচীন জীবনাদর্শের জয়গান গাহিয়াছেন কবি। ভাবগাম্ভীর্য এবং মননশীলতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই কবি এক্ষেত্রে সনেটরূপটি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কবিতাগুলি প্রগাঢ় ভাবনার অনুগামী, উচ্ছ্বাস-তারল্য বা আবেগস্রোতের স্থান এখানে বড় নাই। সে উদ্দেশ্যে সনেটরীতির ব্যবহার নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু 'নৈবেদ্যে'র কবিতাগুলি যতটা তত্ত্বভাবনা এবং আদর্শ-প্রচার ততটা শিল্পগুণসম্পন্ন নয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সনেটগুচ্ছরূপে "চৈতালি"কে অভিহিত করা চলে। "সোনার তরী-চিত্রায়" যে প্রবল মর্ত্যমমতা, জীবনপ্রেম এবং ইন্দ্রিয়ানুগ সৌন্দর্যোপভোগ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই সংহত সংযত হইয়া সনেটের রূপ ধারণ করিয়াছে। যে পাখি ডানা মেলিয়া ভাবের সপ্তস্বর্গে উড়িয়া বেড়ায়, সে ডানা গুটাইয়া বসিতেও জানে। গুটানো ডানায় আকাশে উড়িবার স্বপ্ন ও শক্তি স্তম্ভিত হইয়া থাকে। 'চৈতালি'তে কবির সৌন্দর্য-কল্পনা, প্রেমের আবেগ সব-কিছুরই ঘনীভূত সারটুকু যেন ভাষারূপ লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সনেট

রবীন্দ্রানুজ কবিদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র রায়, দিগেন্দ্রনাথ ঠাকুর সনেট রচনায় বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সনেটের একটি বিশেষত্ব আছে। বলেন্দ্রনাথ কবিতার ক্ষেত্রে প্রবল রূপবাসনা ও ইন্দ্রিয়সম্ভোগের পরিচয় দিয়াছেন। সনেটরূপে কল্পনার অসংযম অনেকখানি সংহত হওয়ায় একধরনের রসসৃজন সফল হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনেকগুলি সনেট লিখিয়াছেন। দীর্ঘ কবিতায় তিনি লঘু বালসুলভ কল্পনাবিলাস, রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং তথ্যচয়নের প্রাচুর্যে কবিধর্মচ্যুত। কিন্তু সনেটে সত্যেন্দ্রনাথ আপন কবিপ্রকৃতির উপরে এমন একটা সংযম আরোপ করিয়াছেন যাহাতে ঐ সব উৎকেন্দ্রিকতা দূরীভূত হইয়াছে। গাম্ভীর্য ও কঠিন পৌরুষ তাঁহার সনেটে সাফল্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

বলেন্দ্রনাথ
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সনেটের রূপে এবং রসে প্রমথ চৌধুরীর "সনেট-পঞ্চাশৎ" এবং "পদচারণ"—অনেকটা অভিনবত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। পেত্রার্কা বা সেক্‌স্‌পীয়র কাহারও আদর্শের অনুসরণ না করিয়া প্রমথ চৌধুরী ফরাসি রীতির প্রভাবে একটি নূতন আঙ্গিকের প্রবর্তন করিলেন।

তাঁহার সনেটে পর পর দুইটি চৌপদীর পরে একটি মিত্রাক্ষর পয়ার। তাহার পরে আবার একটি চৌপদীতে কবিতার সমাপ্তি। প্রথম দুইটি চৌপদীতে ভাবরস ও সংগীতের ক্রমিক সমুচ্চতা, মিত্রাক্ষর পয়ারটিতে কিঞ্চিৎ আকস্মিকতাযুক্ত climax এবং turning point। শেষের চৌপদীতে anticlimax।

প্রমথ চৌধুরী

এই আঙ্গিকবিশিষ্টতা প্রমথ চৌধুরীর জীবনদৃষ্টি এবং রসঘটিত বিশিষ্ট আবেদনের সহিত একেবারে মিলিয়া গিয়াছে। প্রমথ চৌধুরী রোমান্টিকতা-বিরোধী দৃষ্টিতে জীবনের দিকে তাকাইয়াছেন। ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস এবং উত্তেজনার স্পর্শশূন্য ভাবে মননের তীক্ষ্ণতা, ব্যঙ্গের তীব্রতা এবং বুদ্ধির বৈদগ্ধ্যযুক্ত একটি বিশিষ্ট স্বাদ তিনি সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন। নবম-দশম চরণে একটু প্যাঁচ কষাইয়া ভাবকল্পনাকে বিপরীতমুখী করিবার সাধনায় কবি অম্ল-কটু রসের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যসংকলনগুলিতে অনেকগুলি সনেট স্থান পাইয়াছে। মোহিতলাল কাব্যগঠনের দিক হইতে খুবই সচেতন এবং নিষ্ঠাবান কবি। 'রচনার দেহ পরিমার্জিত করিবার ঝোঁক তাঁহার অত্যন্ত। সনেট রচনা করিতে বসিয়া তিনি আঙ্গিকগত পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তাঁহার সনেটে মিলবিন্যাস এবং স্তবকগঠনে পেত্রার্কা-আদর্শের অনুসরণ করা হইয়াছে। তাঁহার গম্ভীর ভাষা, কখনও চতুর্দশ কখনও অষ্টাদশ অক্ষরবিশিষ্ট চরণ-নির্মিতি আদি সনেটের সমুদ্রস্তনিত তরঙ্গিত সুরটি বজায় রাখিয়াছে। মোহিতলালের কল্পনায় দেহবাদী উপভোগের সুরটি পরিব্যক্ত।

মোহিত লাল মজুমদার

অতি আধুনিক বাংলা কবিতায় সনেটরচনায় কোনো নূতন ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা বা বিশেষ ধরনের সাফল্যের পরিচয় মেলে না।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গীতিকবিতার গতিপ্রকৃতি

ইউরোপীয় জীবনধারায় এবং ভাব-ভাবনায় প্রথম মহাযুদ্ধ গুরুতর প্রভাব ফেলিল। আধুনিক কবিতার উপরে এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া Geofrey Bullough "The Trend of Modern Poetry" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন : "On the whole this poetry before 1914—18 war was optimistic, sentimental and inspired by the passing moment. But with the disintegration of the age-old assumptions about the nature of man and universe, and with the collapse of optimism in war and unrest, there rose a fierce intellectualism, a literary revolt against the cult

ভূমিকা—যুগগত, ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিত

of progress, cosmic emotion and subjectivity, accompanied by a search for impersonal concreteness and terseness of expression." প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীর আবেগ ও চিন্তার অবশেষটুকুও নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইল। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ স্থানকালের বোধকে উল্টাইয়া দিল। চিরন্তন কালের বোধ নস্যাৎ হইয়া গেল। গ্রহজগতের নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া নিখিল বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-অস্তিত্বকে তুচ্ছ বলিয়া ঘোষণা করিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মানবজীবন তথা জীবনমাত্রই বিশ্বপ্রবাহের 'বাই-প্রোডাক্ট' বা অপ্রয়োজনীয় আকস্মিক সৃষ্টি বলিয়া পরিচিত হইল। ভবিষ্যতের "Cold death"-এর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না। পূর্ব শতাব্দীর যে বিজ্ঞান-ভাবনা মানবকল্যাণের আশা-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে মোহাবিষ্ট ছিল, আজ তাহা সংশয়ে কম্পিত, হতাশায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। ফ্রয়েডের গবেষণা সচেতন ভাবনা ও অনুভূতিকে কৃত্রিম এবং মগ্নচৈতন্যকে সত্য বলিয়া প্রচার করিল। মানুষের মনোরাজ্যের বিরাট এক অন্ধকার প্রদেশ আলোকোজ্জ্বল হইল। কিন্তু উহাকে আদিম প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ দেখিয়া শিহরিত হইয়া উঠিল। অবশ্য যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিতে, চিকিৎসাশাস্ত্রের আশ্চর্য অগ্রগতিতে ভোগ্য পৃথিবীর সীমা অনেক বেশী আয়ত্ত হইয়া পড়ায় নূতনতর আনন্দের জ্যোতি দেখা দিল। কিন্তু ব্যবহারিকতার ঊর্ধ্বে উচ্চতর দার্শনিক চেতনায় অথবা ভাবাবেগের গভীরে ইহার অনুপ্রবেশ ঘটে নাই। আশা-সম্ভাবনার দিক হইতে এই যুগে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক প্রভাব ফেলিল ১৯১৭ সালের রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। উনিশের শতকে পরিকল্পিত মার্কসীয় সাম্যচিন্তার এই বাস্তব প্রয়োগে শোষণহীন দারিদ্র্যহীন জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর অলীক কল্পনামাত্র রইল না। কিন্তু ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ রক্তপাতে বিমর্ষ হইল; সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতার অবলুপ্তির দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কিত হইল।

এই পরিবেশে ইউরোপে যে আধুনিক কবিতার জন্ম হইল তাহা শুধু ইউরোপের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীরই উত্তরাধিকার। কারণ ইউরোপীয় জীবন-পরিস্থিতি কাস্পিয়ান সাগর—ভূমধ্যসাগর দ্বারা সীমাবদ্ধ রহিল না। সমগ্র পৃথিবীতে জীবনপরিবেশে যেখানে রহিয়াছে মূলগত ঐক্য, সৃষ্টিলোকেও তাহার প্রভাব সহজেই পড়িবে।

আধুনিক কবিতার ভাব ও রূপগত লক্ষণ নির্ণয়

আধুনিক কবিতার ভাবকল্পনা এবং আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া জনৈক সমালোচক যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল। ভাবধর্মের দিক হইতে—"১। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস। ২। বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে (যেমন প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্ম) সংশয়

এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ। ৩। দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা। ৪। ভগবান এবং প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস। ৫। নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত। ৬। বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ। ৭। আত্মবিরোধ ও অনিকেত (rootless) মনোভাব। ৮। মননধর্মিতা—অনেক সময় জ্ঞানের বিপুল ভারে দুরূহতার সৃষ্টি। ৯। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হ'তে সচেতন গ্রহণ। ১০। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অবচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারার অসংবদ্ধতা। ১১। প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানীর প্রভাব। ১২। মার্কসীয় দর্শনের, বিশেষতঃ সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নূতন সমাজসৃষ্টির আশা।" শৈলী ও প্রকরণের দিক হইতে আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য হল—"১। বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ। গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলিত শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য, পদ্য ও কথ্য ভাষার ব্যবধান-বিলোপের চেষ্টা। পরবর্তী পর্যায়ে অতি-ব্যবহৃত পদ্যগন্ধী শব্দকেও গ্রহণ অর্থাৎ ভাষা সম্পর্কে সর্বপ্রকার শুচিবায়ু পরিহার। ২। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ এবং বিখ্যাত কবিদের কাব্য অথবা চিন্তা থেকে উদ্ধৃতির যত্রতত্র প্রয়োগে মিশ্ররসকে চূর্ণ করা বা অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে নূতন অনুভূতির সমন্বয় সাধন। ৩। প্রচলিত কবিপ্রসিদ্ধ উপমা, শব্দ ও বর্ণনার ব্যবহার না করা। প্রচলিত কাব্যিক শব্দ (যথা হিন্দু, গেনু, মনে, হিয়া) প্রভৃতির বর্জন। ৪। প্রাচীন উপমা বা শব্দের অভিনব অর্থে প্রয়োগ এবং তৎসহযোগে নূতন চিত্রকল্পের সৃষ্টি। ৫। শব্দপ্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা ও অর্থঘনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা। ৬। এই মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্যে বাহুল্যবর্জনের ফলে মধ্যবর্তী চরণের অনুল্লেখ। তার জন্য চিন্তাধারার মধ্যে একটা উল্লম্ফনের সৃষ্টি, আপাতদৃষ্টিতে যাকে মনে হয় অসংবদ্ধ। ৭। নামবাচক বিশেষ্য, বহুপদময় বিশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়ার পূর্ণরূপের ব্যবহার। চলতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংস্কৃতবহুল বিশেষ্য বা বিশেষণের সংযোগ। ৮। প্রচলিত পয়ার, সনেট ও মাত্রাপ্রধান ছন্দের রূপান্তর এবং মধ্যমিলের (internal rhyme) সৃষ্টি। ৯। গদ্যছন্দের ব্যবহার। ১০। ব্যঙ্গ, বিতর্ক, অদ্ভুত, বীভৎস রসের বহুল ব্যবহার। ১১। শব্দালংকার অপেক্ষা বিরোধাভাস, বক্রোক্তি, স্মরণ প্রভৃতি অর্থালংকারের ব্যবহার। ১২। বিষয়বৈচিত্র্য।" আধুনিক কবিতার এই লক্ষণগুলির দিকে তাকাইলে বুদ্ধদেব বসুর প্রদত্ত এই সংজ্ঞা অপর্যাপ্ত মনে হইবে—"এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্নদ্বারা অবিকলভাবে সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য,

অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।" আধুনিক কবিতায় এজাতীয় সুর থাকা সম্ভব, কারণ এই সুরগুলি মানবহৃদয়ের চিরকালের সামগ্রী। সর্বযুগের কবিতায় এই সব ভাবানুভূতি নানা রূপে ও ভাষাচিত্রে প্রকাশিত। আধুনিকতার স্বতন্ত্র মুদ্রাঙ্কনটি কোথায় তাহার সন্ধান করা কর্তব্য। ভাবকল্পনা এবং রূপলক্ষণগত পূর্বোক্ত সূত্রগুলি সেদিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ। উহাদের অনুসরণেই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার স্বরূপ চিনিয়া লইতে হইবে।

আধুনিক কবিতার কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত। ইউরোপীয় আধুনিক কবিতায় মগ্নচৈতন্যের লীলা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মানবমনের সচেতন অনুভূতি যে কৃত্রিম ব্যাপার, অবদমিত হৃদয়বৃত্তির গভীর স্তরেই যে সঞ্চিত হয় তাহার যথার্থ আবেগ ও কামনাবাসনা, এইরূপ একটি বিশ্বাস ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব-অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের মনে আসন পাতিয়া বসিতে থাকে। সাহিত্যে মগ্নচৈতন্যলোককে প্রকাশ করাই অকৃত্রিম হৃদয়বৃত্তির রূপায়ণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই মতবাদটি সুর্-রিয়ালিজম্ তথা মগ্নচৈতন্যবাদ নামে পরিচিত। আমাদের দেশের বহু কবির রচনায়ও মগ্নচৈতন্যলোকের স্বপ্নচ্ছবি প্রকাশ পাইতেছে।

মগ্নচৈতন্যলোকের প্রকাশ

বাস্তবতা আধুনিক সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা। উপন্যাস-সাহিত্যেই এই দৃষ্টিভঙ্গি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পায়। কিন্তু আধুনিক কাব্যেও বাস্তবতা প্রভাব বিস্তার করিতেছে দেখা যায়। বাস্তবতার নামে জীবনের ক্লেদগ্লানিযুক্ত কদর্যতার চিত্রাঙ্কনে কবিদের আসক্তি লক্ষ্য করিবার মতো। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার কথাটি স্মরণ করা যাইতে পারে: "আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে (অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাহা ছিল আধুনিক তাহাকে) মধ্য-ভিক্টোরীয় প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরামকেদারায় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড়, ছাঁটা চুলের খটখটে আধুনিকতা। ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার, ঠোঁটে রঙ লাগানো হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে, উদ্ধত অসংকোচে। বলতে চায়, মোহ জিনিসটাতে আর কোনো দরকার নেই। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ, সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানারূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু বিজ্ঞান তার নাড়ীনক্ষত্র বিচার করে দেখেছে; বলছে, মূলে মোহ নেই, আছে কার্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকোলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্তার

বাস্তবতা

সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দেবন্ধে ভাষায়-ভঙ্গিতে মায়া বিস্তার করে' মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছি, একথা কবুল করতেই হবে।" সেই মোহের বর্ণাঢ্যতা ঘুচাইয়া কবিতায় বাস্তবতার রূপ প্রকাশ করা হইল। ইহার ফলে কবিতা যে শ্রীভ্রষ্ট হইল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভাষার অসজ্জাহীন বিপর্যয়

ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির দিক হইতেও আধুনিক কবিতা প্রচলিত ধারাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিল। সুন্দর সজ্জা, শব্দচয়নে সচেতন শিল্পদৃষ্টির প্রয়োগ, প্রসাধন, অলংকরণ বর্জিত হইতে লাগিল। ভাষাকে বাঁকাইয়া-চুরাইয়া, অর্থের বিপর্যয় ঘটাইয়া, ভাবগুলিকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলাইয়া, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মারিয়া, চমক লাগাইয়া দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। এইরূপ মতবাদ ইউরোপীয় সাহিত্যে "ডাডায়িজম্" নামের একটি আদর্শকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমাদের কবিতায়ও ভাষাঘটিত এই বিপর্যয় প্রবেশ করিয়াছে।

আধুনিক কবিতার একটি বড় লক্ষণ হইল গদ্যরীতির ছন্দব্যবহারে। রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম এই ছন্দের জন্ম। প্রচলিত ছন্দে ভঙ্গিতে ও মাত্রাবিভাগে একটি সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ণের অনুসরণ করা হইয়া থাকে। আধুনিক কবিতায় ভাবাবেগের ক্ষেত্রে যখন ন্যূনতা ঘটিল, উচ্ছ্বাসের স্থানে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা, গদ্যাত্মক অনুভূতি, নিত্যকার প্রচলিত জীবনরূপ যখন প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন বাধ্য হইয়াই ছন্দের আবেগ-তরঙ্গিত প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন দেখা দিল। গদ্যছন্দ কাব্যরীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিল। গদ্যের ন্যায় যে কোনো সংখ্যক মাত্রার পরে যে কোনো সংখ্যক মাত্রার উপস্থাপনার সাহায্যে কথ্যভঙ্গিটি আমদানী করিবার চেষ্টা চলিতে লাগল। ইহার কবিত্ব রহিল অন্তঃস্রোতা

গদ্যরীতি

ফল্গুর মতো ভাবকল্পনা ও শব্দসজ্জার ভিতরের মৃদুকল্লোলিত সুরধারায়। কিন্তু বহু আধুনিক কবির হাতেই গদ্যছন্দ সেই অন্তরের সুরটি হারাইয়া ফেলিল। উহার কবিত্ব প্রায় কিছু আর অবশিষ্ট রহিল না।

দারিদ্র্যবিলাস

আধুনিক কবিতায় দরিদ্রনারায়ণের প্রতি সমর্থনের একটা সর্বব্যাপী ঝোঁক দেখা দিয়াছে। কখনও সহজ মানবপ্রেমের নামে, কখনও অত্যুৎকট সাম্যবাদী রাজনৈতিক চেতনার সহিত বিজড়িত আকারে। কিন্তু আসলে উহা একটি ফ্যাশান অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলকতা ছাড়া কিছু নয়। দরিদ্রজীবনের বাস্তবরূপ বা কামনা-বাসনার সুর কাব্যে প্রকাশ পাইবার অবশ্যই অধিকারী। কিন্তু দারিদ্র্যপ্রীতির সস্তা ফর্মুলার সহযোগে কবিতাকে আধুনিকতার ছাপ দেওয়া কোনো অর্থেই সমর্থনযোগ্য নয়।

ইন্দ্রিয়লালসার সুরও আধুনিক কাব্যে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। এ

বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "সাহিত্যে লালসা ইতিপূর্বে স্থান পায়নি বা এর পরে স্থান পাবে না, এমন কথা সত্যের খাতিরে বলতে পারিনে। কিন্তু ও জিনিসটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদ্‌জনক। বলা বাহুল্য, সামাজিক বিপদের কথাটা আমি তুলছিনে। বিপদের কারণটা হচ্ছে, ওটা অত্যন্ত সস্তা—ধুলোব উপরে শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য। অর্থাৎ ধুলোয় যার লুটোতে সংকোচ নেই তার পক্ষে একেবারেই সহজ। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়। এই জন্যেই পাঠক-সমাজে এমন একটা কথা যদি ওঠে যে, সাহিত্যলালসাকে একান্ত উন্মথিত করাটাই আধুনিক যুগের একটা মস্ত ওস্তাদি।"

ইন্দ্রিয়লালসার সুর

আধুনিক কবিতার এই বৈশিষ্ট্যগুলির কথা স্মরণ রাখিয়া বাংলা রবীন্দ্রোত্তর কবিতার আলোচনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতায় 'পুনশ্চ' হইতে আরম্ভ করিয়া ভাষারীতি ও ছন্দে নবীনতা প্রকাশ পাইতে থাকে। 'ভাবকল্পনার ক্ষেত্রেও মননপ্রাধান্য ও বুদ্ধিদীপ্ত বৈদগ্ধ্য দেখা দিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনামূলে মানবিক আস্তিক্যবোধ, প্রগাঢ় প্রকৃতি-চেতনা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, ঔপনয়িক ভাবনা সমানভাবেই কাযকর ছিল। তবুও উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ই রবীন্দ্রোত্তর কালের কোনো কোন লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠিল। কালের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের শেষ বারো তেরো বৎসর কাল বাংলা কাব্যে উত্তরকালের লক্ষণ প্রধান হইয়া উঠিতেছিল, এমন কি রবীন্দ্রনাথও কোনো কোনো দিকে তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকালের সুর

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার প্রথম স্তরের কবিদের মধ্যে নয় জনের নামোল্লেখ করিতে হয়। ইহাদের রচনাকে আধুনিক কবিতার পূর্ববর্তী স্তর হিসাবে উল্লেখ করা চলে। ইহাদের কয়েকজন কবির মধ্যে সাম্প্রতিক কবিতার পূর্বসূত্র অস্পষ্ট ভাবে অঙ্কুরিত হইতেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক কবিতা লিখিয়াছেন। কোনো গভীর ভাবকল্পনা তাঁহার রচনায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হইলেও রবীন্দ্র-ভাবধারার উত্তরাধিকারী তিনি ছিলেন না। সত্যেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ বস্তুকে কাব্যে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। কল্পনার অতিরেকের স্থানে বস্তু-প্রাধান্য তাঁহার কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। কালিদাস রায়-করুণানিধান-যতীন্দ্রমোহন-কুমুদরঞ্জন এই চারিজন কবি রবীন্দ্রপ্রভাবপরিমণ্ডলের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহাদের কবিতায় পল্লীপ্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা, নগর-জীবনের প্রতি বিরূপতা, ধর্মীয় ভাবালুতা তথা বৈষ্ণব বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা অত্যন্ত প্রকট।

রবীন্দ্রোত্তর কবিতার প্রথম স্তর—সত্যেন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন

ইঁহাদের সমকালীন কবি—বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে যাঁহাদের কবিপ্রতিভা বিকশিত হইয়াছে—তাঁহাদের কয়েকজনের রচনায় রবীন্দ্রবিরোধিতা তথা নূতন কল্পনার সুর লক্ষ্য করা যায়। প্রমথ চৌধুরী রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৈদগ্ধ্য মননের, ব্যঙ্গপ্রধান বিষয়ের রূপরচনা করিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় আধুনিককালসুলভ দুঃখ ও নৈরাশ্যের সুরটি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় দেহবাদ প্রবলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অতীন্দ্রিয় প্রণয়কল্পনাকে অস্বীকার করিয়া তিনি দেহধর্মের জয়গান গাহিয়াছেন তাঁহার কবিতায়। নজরুল ইসলাম গাহিয়াছেন সাম্যের গান। এই কবিদের সম্পূর্ণ আধুনিক কবিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না করা হইলেও, রবীন্দ্রোত্তর ধারার সূত্রপাত যে ইঁহাদের রচনায় তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

প্রমথ চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল

রবীন্দ্রোত্তর কবিতার দ্বিতীয় স্তর "কল্লোল" পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া স্পষ্ট রূপ ধারণ করিল। "কালিকলম" প্রভৃতি পত্রিকার অবদানও এক্ষেত্রে কম উল্লেখযোগ্য নয়। এই ধারার কবিদের মধ্যে বিশেষ করিয়া যাঁহাদের নাম করিতে হয় তাঁহাদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় শ্রমিকজীবনের প্রতি প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে। ইতিহাস-চেতনা, ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা, তাঁহার কবিতার অন্যতম প্রধান সুর। বুদ্ধদেব বসুর কবিতার গীতিধর্ম এবং মাধুর্য রবীন্দ্রপ্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে প্রেমকবিতাগুলিতে দেহকামনার রক্তরাগ সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার রচনাকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। অন্তরের গভীরে তিনি রোমান্টিক, অনেকেই এই বিশ্বাস পোষণ করেন। জীবনানন্দ দাশের বাগ্‌বিন্যাসপদ্ধতি এবং চিত্ররচনারীতি সাংকেতিকতায় পূর্ণ। তাঁহার কবিতায় মগ্নচৈতন্যের ব্যাখ্যাতীত রহস্য যেন হাতছানি দেয়। তবে সব অস্পষ্ট সাংকেতিকতার মধ্য দিয়া বাংলা দেশের গ্রামের স্পর্শ তাঁহার কবিতায় অনুভব করা যায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষারীতি ক্লাসিক সংহতিতে পিনদ্ধ। ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতি ও বিশ্বচেতনার সহযোগে, বিষণ্ণ বেদনার অনুরণনে এবং প্রকাশরীতির দুরূহতায় তাঁহার বিশিষ্টতা চিহ্নিত। বিষ্ণু দের কবিতায় রহিয়াছে অধ্যয়ন-গভীরতার চিহ্ন। মার্ক্সবাদী গণপ্রীতি এবং ব্যক্তিগত সৌন্দর্যচেতনার আশ্চর্য মিশ্রণ তাঁহার কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় অনুভূতি ও মননের সমন্বয় ঘটিয়াছে। জ্ঞানসাধকের দূরত্ব লইয়া তিনি পৃথিবীকে ভালোবাসিয়াছেন। নিরাসক্তের আসক্তির এই সুর আশ্চর্য মূর্ছনা তুলিয়াছে তাঁহার কবিতায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় রাজনৈতিক প্রচারকে শিল্পরূপ দেওয়া হইয়াছে।

রবীন্দ্রোত্তর কবিতার দ্বিতীয় স্তর 'কল্লোল' 'কালিকলম' কেন্দ্রিক—প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য

সময় সেনে ফুটিয়া উঠিয়াছে নাগরিক জীবনের গ্লানিমলিন ক্ষুব্ধতা। কবিকিশোর সুকান্তের গভীরতর জীবনানুভূতি ও প্রত্যাশা প্রাত্যহিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতা হইতে উৎসারিত।

সত্যই আধুনিক বাংলা কবিতা বিচিত্র পথে শিল্পসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিবর্তনে নবনাট্য আন্দোলনের ভূমিকা

বাংলা নাট্যসাহিত্যের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ হইল "নবনাট্য আন্দোলন"। অতি আধুনিক কোনো নাট্যকার বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠীর বিচিত্র চেষ্টাই বড় বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ যদি কোথাও থাকে তাহা ঐখানে। নাট্যসাহিত্যের বিকাশ চিরকালই নাট্যাভিনয়—প্রযোজনা—মঞ্চরীতি প্রভৃতির সহিত জড়িত। অপরাপর সাহিত্যধারার ন্যায় ইহা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার নয়। নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যপ্রযোজনার একটি মিশ্রিত আন্দোলনরূপে নবনাট্য আন্দোলনকে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে রোমান্টিক আন্দোলন বা রিয়ালিজ্‌মের আন্দোলন বহুমুখী নবীনতা সঞ্চার করিয়াছিল, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এইরূপ ভাবের আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহার বিকাশ-পথটিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। নবনাট্য আন্দোলন নাটকের ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী প্রভাব ফেলিয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। উহার শক্তি এবং দুর্বলতা কোথায়, উহার ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের কোনোরূপ উন্নতি সূচিত হইতেছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে।

ভূমিকা

বাংলা নাটকের আবির্ভাব সম্ভব হইত না যদি ইংরেজি আদর্শের মঞ্চ এদেশে প্রতিষ্ঠিত না হইত। বাংলা নাটক প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করিল মধুসূদনের হাতে। যদি বেলগাছিয়া—পাথুরিয়াঘাটা—বাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে য়্যামেচার থিয়েটার গড়িয়া না উঠিত, যদি শখের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করিবার ধূম কলিকাতা এবং বড় বড় জেলা-শহরে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি না করিত, বাংলা নাট্যরচনার প্রাথমিক পর্বের এই উৎসাহ দেখা দিত না; কিন্তু এই যুগের শখের থিয়েটারগুলি প্রায়ই অর্থবানদের প্রচেষ্টায় গঠিত হইত। ফলে নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে

শখের থিয়েটারের যুগ : ঊনবিংশ শতক

ঔজ্জ্বল্য এবং রুচিবোধের পরিচয় যতটা মিলিত, নাট্যবস্তু সম্পর্কে ততটা প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পাইত না। এই ঘটনা কৌতুককর যে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' বেলগাছিয়ার কর্তৃপক্ষ সোৎসাহে অভিনয় করিলেও উন্নততর রচনা 'কৃষ্ণকুমারী' তাঁহাদের আনুকূল্য পায় নাই। এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর ন্যায় সমাজসচেতন এবং শিল্পনিপুণ রচনা অভিনয় করিবার সাহসই তাঁহাদের ছিল না। এই একটি ঘটনা দ্বারা শখের থিয়েটারের সীমাবদ্ধতা সহজেই অনুভব করা যায়। শখের থিয়েটারে অভিনয় নিয়মিত ছিল না। জনসাধারণের তাহাতে প্রবেশাধিকারও ছিল না। জনসাধারণের নাট্যরুচি বিবর্ধন বা আগ্রহসৃষ্টির পক্ষে ইহা ছিল বড় রকমের বাধা। তাহা ছাড়া নিয়মিত সুপ্রচুর অভিনয়ের ব্যবস্থা না থাকায় নাটকরচনার বিশেষ চাহিদাও ছিল না। কাজেই শখের থিয়েটারযুগে বাংলা নাট্যসাহিত্যের পূর্ণবিকাশ সম্ভব হয় নাই।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও উহার প্রভাব

১৮৭২ সালে প্রথম পাবলিক থিয়েটার স্থাপিত হইল। পেশাদারী রীতির ইহাই প্রথম নাট্যশালা। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই থিয়েটারে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল। নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থার ফলে নাটকের চাহিদা বাড়িয়া গেল। ক্রমে বহুসংখ্যক পাবলিক থিয়েটার গড়িয়া ওঠায় বহুসংখ্যক অভিনেতা, কলাকুশলী, পরিচালক এবং নাট্যকার জীবিকার বন্ধনে একটা নিয়মিত কর্মডোরে নিজেদের আবদ্ধ করিলেন। পাবলিক থিয়েটারের গৌরবের যুগে বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যেও দেখা দিল জোয়ারের গতিবেগ। পেশাদারী মঞ্চগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাটকের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রযোজনা-পদ্ধতিতেও উন্নতির চেষ্টা দেখা দিল। গিরিশচন্দ্র হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট সব নাট্যকারই পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন। বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিলে বাঙালীর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ অনুভব করা যাইবে। প্রথমতঃ, পৌরাণিক নাটক রচনার প্রাচুর্য লক্ষ্য করিবার মতো। ইহাদের সহিত মধ্যযুগীয় ভক্তিরসের যতটা সম্বন্ধ, বাস্তব জীবনের সম্পর্ক তত অধিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসচেতনা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও স্বাদেশিকতার প্রচার বিশেষ উচ্চকণ্ঠ। জাতীয় জীবনে উহার প্রভাবও পড়িয়াছিল গভীরভাবে। তৃতীয়তঃ, সামাজিক নাটকে পারিবারিক—সামাজিক কিছু কিছু সমস্যা প্রতিফলিত হইলেও কোনোরূপ স্পষ্ট সমাজ-সচেতনতা প্রকাশ পায় নাই। চতুর্থতঃ, নাট্যপ্রযোজনা বিষয়ে কোনোরূপ রীতিমত অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগত দক্ষতা কোথাও কোথাও প্রকাশ পাইলেও নাট্যশিক্ষা ব্যাপারটি সকলেরই অজ্ঞাত ছিল। প্রযোজনা এবং নাট্যরচনা কোনো বিষয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রথা-

নির্দিষ্ট পথ পরিহার করিবার সাধনা দেখা যায় নাই। চতুর্থতঃ, নাটকের রসাবেদন ছিল তুলনামূলক ভাবে স্থূল। জনসাধারণের নাট্যরুচি বর্ধনের পরিবর্তে অর্থোপার্জনই ছিল তাহাদের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের বাহিরে নাট্যবিষয়ে বিচিত্র সব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইয়াছিলেন। উচ্চশ্রেণীর শিল্পগুণসমৃদ্ধ গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কাব্যনাট্য রচনা করিয়া, সংকেত ও রূপকনাট্যে য়ুরোপীয় সাম্প্রতিক রীতিকে শক্তির সহিত আমন্ত্রিত করিয়া, বিশেষতঃ নাট্যপ্রযোজনায় সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক নবীনতার সূচনা করিয়া, তিনি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বাংলা নাটকে পরবর্তীকালে তাহার উত্তরাধিকারী মেলে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য যে উৎকর্ষ লাভ করিল তাহার পরোক্ষ প্রভাব বিংশ শতাব্দীর নাট্যকারদের উপর পড়িতে লাগিল।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে বিংশ শতাব্দী

বিংশ শতাব্দীতে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের রূপে এবং রীতিতে, নাট্যপ্রযোজনার ভঙ্গিতে, মঞ্চে মঞ্চে প্রতিযোগিতায়, নাট্যশিক্ষার প্রকৃত চর্চা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সহিত মৌলিক কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। শুধুমাত্র নাট্যরচনায় কিছুটা সাহিত্যগুণের সমাবেশ দেখা দিতে লাগিল। দ্বিজেন্দ্রলাল হইতেই ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। শচীন সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতির রচনায় শিল্পোৎকর্ষ মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মহেন্দ্র গুপ্তের ন্যায় দুই একজন পৌরাণিক বিষয়ের চর্বিতচর্বণ এবং ইতিহাস বিষয় অবলম্বনে স্থূল স্বদেশপ্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, জীবনের কঠিন বাস্তবকে নাট্যসাহিত্যে স্থান দিতে ইহারা কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। উপন্যাস এবং কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর কালে যে আধুনিকতা, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিকতা, আঙ্গিকের বৈচিত্র্য ও জটিলতা, বাস্তব তীক্ষ্ণতা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল নাট্যসাহিত্যে পূর্বোক্ত লেখকদের শক্তিসত্ত্বেও তাহা ঘটিয়া উঠিল না। বাহিরের জাঁকজমক, ঘটনার আকস্মিক চমক, জীবন হইতে দূরবর্তী রসরসিকতার প্রতি আকর্ষণ সমানে চলিতে লাগিল। কারণ মঞ্চে নাটক জমাইতে হইবে। জনসাধারণকে আকর্ষণ করাই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই সময়ে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের পরিবেশে তুলসী লাহিড়ীর "দুঃখীর ইমান" মঞ্চস্থ হইল। নাটকটির বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, শ্রমজীবী মানুষকে নায়কত্বে বরণ করা বাঙালী দর্শকের নিকট নূতন পথ দেখাইল। এই সময়ে গণনাট্যসংঘ নামক সংস্থার উদ্ভব ঘটিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্যের লেখা "নবান্ন" নামক নাটক মঞ্চস্থ হইল। এখানেও আমরা পাইলাম, জীবনের বাস্তব সমস্যার অভিনব ভঙ্গিতে

রূপায়ণ। প্রকৃতপক্ষে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের বাহিরে গণনাট্যসঙ্ঘের আদর্শে নবনাট্যের বীজ উপ্ত হইল। তখনও পেশাদারী থিয়েটারে গতানুগতিক নাটকের অভিনয় হইতেছিল। পেশাদারী থিয়েটারগুলির আকর্ষণ কমিয়া আসিতে লাগিল—সিনেমার সহিত প্রতিযোগিতায়, নূতন আকর্ষণীয় নাটকের অভাবে, পরিচালক-ব্যবসায়ীর অর্থবিনিয়োগে নাট্যালয় এবং প্রযোজনা-ব্যবস্থার দৈন্য দূর করার অক্ষমতায়।

নবনাট্যের অঙ্কুর

গণনাট্যসংঘ রঙ্গমঞ্চের পেশাদারী ব্যবস্থার বাহিরে নূতন ধারার নাট্যপ্রযোজনার পথ ধরিল। ইহার পূর্বে শখের থিয়েটার বলিতে বুঝাইত অপেশাদার সংস্থা কর্তৃক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের দুর্বল অনুকরণ। একই নাটকের একই ভঙ্গিতে উপস্থাপনের সেই সব চেষ্টা নাট্যসাহিত্যের উপরে কোনোরূপ উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গণনাট্যসংঘ মঞ্চব্যবস্থায় অভিনয়রীতিতে যেমন পরিবর্তন ঘটাইল, তেমনি নূতন নাটকরচনার প্রেরণাও যোগাইল। "নবান্ন" একটি নাট্যযুগের স্পষ্ট সূচনা করিল। "দুঃখীর ইমানে" যাহার বীজ দেখা গিয়াছিল, তাহারই বিকাশ দেখা গেল "নবান্নে"র মধ্যে। গণনাট্যসংঘ এবং তাহার প্রেরণাজাত নাট্যরচনায় তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনতা প্রকাশ পাইল, রাজনৈতিক প্রচারচেষ্টাও সেই সূত্রে উহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে গণনাট্যসংঘ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হইয়া পড়িল এবং উহাতে ভাঙন ধরিল। গণনাট্যসংঘের প্রথম যুগে "নবান্ন" ছাড়া অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হয় নাই। গণনাট্যসংঘ প্রধানতঃ সংগীতনৃত্যাদির উপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতে থাকে। গণনাট্যের মধ্যে ভাঙন ধরিল রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং প্রযোজনাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ফলে। নূতন করিয়া গণনাট্যের মূল সংগঠন নাট্যপ্রযোজনা শুরু করিল। "রাহুমুক্ত" নামক যাত্রাধর্মী নাটকটি নূতন আঙ্গিকে রচিত যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা। এ জাতীয় চেষ্টা এককালে মনোমোহন বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র করিয়াছিলেন অবশ্য মধ্যযুগসুলভ ধর্মভাবনার পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে। গণনাট্যসংঘের এই চেষ্টার উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট মতবাদের প্রচার। দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "বাস্তুভিটা", "তরঙ্গ" প্রভৃতি কয়েকটি নাটক লিখিয়াছেন। "সংক্রান্তি", "বিশে জুন" প্রভৃতি নাটকেরও নাম করা চলে। গণনাট্যের সহিত সংশ্লিষ্ট নাটকগুলি আঙ্গিকের দিক হইতে কোনোরূপ নবীনতার পক্ষপাতী নয়—বিষয়বস্তুর দিক হইতে প্রচারধর্মী। নাট্যসাহিত্য হিসাবে ইহাদের মূল্য অধিক নয়।

গণনাট্যসংঘ—বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন বন্দ্যো।

'বহুরূপী' নামক সংগঠন নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে সংকেতধর্মী আধুনিকতা এবং সুপরিণত নৈপুণ্য সৃষ্টি করিল। রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী", "রাজা", "চার অধ্যায়", "বিসর্জন", "ডাকঘর" প্রভৃতি নাটকের পরিবেশন নবনাট্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া

তুলিল। ইবসেনের "দশচক্র" "পুতুলখেলা" এবং গ্রীক ক্লাসিক "এডিপাসে"র পরিবেশনও 'বহুরূপী'র একটি কীর্তিরূপে গণ্য হইতে পারে। মৌলিক নাটকের দিক হইতে এই সংস্থার ছত্রচ্ছায়ায় যে নাটকগুলি রচিত হইল তাহা নাট্যাঙ্গিকে এবং নাট্যরসসৃষ্টিতে যেমন শিল্পমর্যাদায় অভিষিক্ত হইবার মতো, সেইরূপ জীবনদৃষ্টির দিক হইতেও প্রগতিশীল, অথচ আদৌ প্রচারধর্মী নয়। 'বহুরূপী'র সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া "দুঃখীর ইমানে"র নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী "পথিক", "ছেঁড়াতার" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিলেন। 'পথিকে' কয়লাখনির শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ অনেকটা শিল্পরূপ লাভ করিয়াছে। "ছেঁড়াতারে" দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে একটি মুসলমান পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব খুবই নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। শম্ভু মিত্রের অনূদিত বিদেশী নাটকগুলি যেমন মূল্যবান অনুবাদনাটক, তেমনি নাট্যরচনা হিসাবে "কাঞ্চনরঙ্গ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৌতুক-প্রধান সমাজব্যঙ্গ এবং নাট্যরসের তীক্ষ্ণতা ইহাকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

'বহুরূপী' নাট্যসংস্থা—তুলসী লাহিড়ী, শম্ভু মিত্র

লিট্‌ল থিয়েটার সংস্থাটি প্রথম দিকে সেক্সপীয়রের ইংরেজি নাটক এবং তাহার বাংলা অনুবাদ প্রযোজনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করে। গোর্কির "নীচের মহল" অনুবাদ-নাটকটি উল্লেখযোগ্য। লিট্‌ল থিয়েটার মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সহিত নবনাট্য আন্দোলনের মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করিল। নাট্যাঙ্গিকে এবং মঞ্চনিপুণতায় ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ থিয়েটারের অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া লিট্‌ল থিয়েটার বাংলা নাট্যামোদীদের চমকাইয়া দিল। পরিচালক উৎপল দত্ত এই নব্য আঙ্গিকের নাট্যকাররূপে দেখা দিলেন "অঙ্গার", "ফেরারী ফৌজ" এবং "কল্লোল" নাটক লইয়া। 'অঙ্গারে' খনি-দুর্ঘটনা, 'ফেরারী ফৌজে' বাংলার বিপ্লব আন্দোলন এবং 'কল্লোলে' নৌসেনাবিদ্রোহের চিত্র আঁকা হইয়াছে। জনতার যৌথ চরিত্রসৃষ্টিতে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় থাকিলেও উন্নতস্তরের সাহিত্যগুণ অপেক্ষা রাজনৈতিক প্রচারধর্মই যেন এই নাটকগুলির মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

লিট্‌ল থিয়েটার উৎপল দত্ত

অপরাপর অনেকগুলি সংস্থার উদ্ভবের ফলেও বাংলা নাট্যপ্রযোজনায় বিচিত্র ধরনের অভিনবত্ব এবং নাট্যরচনায় নবধারার সূত্রপাত ঘটিল। এই সব নাট্যকারের মধ্যে সলিল সেনের "নোতুন ইহুদি", "মৌচোর" প্রভৃতি নাটকের শ্রেণী-সচেতনতা যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি ধনঞ্জয় বৈরাগী বা তরুণ রায়ের আঙ্গিককুশলতাও প্রশংসনীয়। তরুণ রায়ের নাট্য-ভাবনায় ভাবকল্পনার কোনোরূপ অভিনবত্ব প্রকাশ পায় নাই। কিরণ মৈত্রের "বারো ঘণ্টা" প্রভৃতি নাটকও উল্লেখযোগ্য।

সলিল সেন, তরুণ রায়, কিরণ মিত্র

আধুনিক বাংলা নাটকে "একাঙ্কিকা"র বিশেষ প্রচলন ঘটিয়াছে। সংহত আঙ্গিকে

রচিত এই নাট্যরূপ একাগ্র আবেদনের জন্য এবং ইঙ্গিতধর্মী চরিত্ররচনার নিমিত্ত বুদ্ধিজীবী এবং রুচিশীল জনসাধারণের নিকট বিশেষ উপভোগ্য হইয়া দেখা দিয়াছে। মন্মথ রায় এই নূতন রীতির নাটকের সূত্রপাত করেন। তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই ইহার বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন। বিমল রায়, রমেন লাহিড়ী, বীরু মুখোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একাঙ্কিকা

নবনাট্য আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া পেশাদার রঙ্গমঞ্চের উপরেও পড়িয়াছে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বে প্রযোজনারীতি নাট্যমূল্য সব দিক দিয়াই জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং জনপ্রিয়তা হারাইয়াছিল। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে উহার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হইল। একান্ত স্থূল পারিবারিক রসের ভাবালুতা মঞ্চে প্রাধান্য পাইল। সেন্টিমেন্টাল বাঙালী আবার নূতন করিয়া এই জাতীয় নাটকের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল। নবনাট্য আন্দোলনের প্রভাবে মঞ্চসজ্জা ও প্রযোজনারীতিতে কিছু কিছু নূতনত্ব দেখা দিল। বিশ্বরূপা নাট্যসংস্থা মঞ্চব্যবস্থায় যে সংস্কার সাধনের চেষ্টা করিল, বহুক্ষেত্রেই তাহা বহিরঙ্গ প্রসাধন মাত্র। পেশাদারী মঞ্চগুলির আনুকূল্যে যে সব নূতন নাটক দেখা দিল তাহার বেশীর ভাগই জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ। নূতন নাট্যসৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা বিধায়ক ভট্টাচার্যের "ক্ষুধা"। নবনাট্যের পরিবেশেই বিধায়কের নাটকে বাস্তবধর্মী এই জাতীয় জীবনরূপ প্রকট হইয়া উঠিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে নব নাট্য আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে নবনাট্য আন্দোলন কিছুটা আশার সুর লইয়া আসিয়াছে। তবে নাট্যপ্রযোজনায় যতটা উৎকর্ষ ঘটিয়াছে, নাট্যরচনায় সে পরিমাণ উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। বিদেশী নাটকের অনুবাদ, পুরাতন নাটকের সম্পাদিত রূপ লইয়াই নব্য সংস্থাগুলি প্রযোজনকুশলতার পরিচয় দিতেছেন। মৌলিকনাট্য রচনার তুলনামূলক অপ্রতুলতার অন্যতম কারণ নাট্যপ্রতিভার অভাবও হইতে পারে।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার অভিযান

"রোমান্টিক" কথাটির মূল হইল প্রাচীন ফরাসি "romanz" শব্দ। উহার অর্থ ছিল লাতিন ভাষার পরিবর্তে গ্রাম্য ভাষায় প্রয়োগ। "Roman" এই বিশেষ্যপদটি কাল্পনিক রচনা বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত। এইভাবে দেখা যায় যে, ব্যুৎপত্তিগত দিক হইতেও রোমান্টিসিজ্‌মের অর্থ হইল "ক্লাসিসিজমের" বিপরীত প্রান্তীয় সাহিত্যরূপ। প্রধানতঃ জনপ্রিয়, দুঃসাহসী কর্মকাণ্ডে পূর্ণ এবং সুনির্দিষ্ট ও সুনিপুণ গঠনহীন রচনার জন্য এই শব্দটির

ভূমিকা—ইউরোপে রোমান্টিক ভাবান্দোলনের সূচনা

প্রয়োগ ছিল। ফরাসি এবং ইংরেজি সাহিত্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমান্সজাতীয় সাহিত্যের অন্তর্লীন কবিচিত্তের মনোভাব প্রসঙ্গে এই শব্দটি প্রযুক্ত হইত। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে রোমান্টিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উহা বিকশিত হইয়া একটি স্পষ্ট সাহিত্যরীতি হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। রোমান্টিক সাহিত্যান্দোলন বিকশিত হইয়া উঠিবার পূর্বে এই সব দেশেই সাহিত্যশিল্পীদের মধ্যে "Pre-romantic" ধারার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। অভিজাতদের সামাজিক প্রাধান্য ভাঙিয়া গিয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে এই নব্য দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা সংযোগসূত্র আছে। ক্লাসিকধর্মী সংহতি ও সংযমের পরিবর্তে ভাবাবেগপ্রাধান্য, মানবিক অনুভূতি উপলব্ধির সুর লইয়া দেখা দিল রোমান্টিক আন্দোলন।

ইংলণ্ডে রোমান্টিক আন্দোলনের সূত্রপাত দেখা দিল যে-সব রচনায়, তাহাদের মধ্যে টমসনের "Seasons", ইয়ং-এর "Night Thoughts", গ্রে-এর "Elegies" এবং রিচার্ডসনের উপন্যাসগুলির নাম করা যাইতে পারে। ফরাসি দেশে রুশোই ছিলেন আদি রোমান্টিক লেখকদের মধ্যমণি। দিদেরো রিচার্ডসনের আদর্শে উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন, ভাবপ্রধান কমেডি রচনার চেষ্টাও তিনি করিয়াছেন। মধ্যযুগের রোমান্সকে নূতন রূপে পুনরুজ্জীবিত করিলেন সেণ্ট পেরি। জর্মন সাহিত্যিক হার্ডার এবং "Sturns and Drang" আন্দোলনের মধ্য দিয়া রোমান্টিকতার জয়যাত্রার সূত্রপাত। ফরাসি বিদ্রোহের ফলে ভাবাবেগপ্রধান ধারাটি রুদ্ধ হইয়া সেখানে ক্লাসিক আদর্শের পুনরুত্থান সূচিত হইল। কিন্তু এই বিপ্লবের ফলে যে রুদ্ধ ভাবাবেগ মুক্তি পাইল, রোমান্টিক আন্দোলনের পশ্চাৎপটে তাহার গুরুতর প্রভাব বর্তাইল। আপাতদৃষ্টিতে যে ফরাসি-বিপ্লব ক্লাসিকতার পুনর্জীবন সূচিত করিয়াছিল, তাহাই হইয়া দাঁড়াইল রোমান্টিক আন্দোলনের একটি প্রধান শক্তি। জর্মানীতে এই বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটিল। ফিকটের ভাববাদী দর্শনের প্রভাবে, ফ্রেডারিক শ্লেগেলের নেতৃত্বে রোমান্টিকতার জয়যাত্রা সূচিত হইল। শ্লেগেল লিখিলেন, "Romantic poetry is alone infinite, because it alone is free and recognizes as its only law that the poet's license tolerates no law." ইংলণ্ডেও প্রায় সমকালে রোমান্টিক ভাবধারা প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজের কাব্যে উহার সাফল্য চরমে ওঠে। ফরাসি সাহিত্যে Chateaubriand-এর গদ্য রচনায় একটা সংগীতময় সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, পারিপার্শ্বিকের নিপীড়নে আর্তচিত্তের ক্রন্দন উহাকে জনপ্রিয় করিতে বিশেষ সাহায্য করে। ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষার সাহিত্যে এইভাবে রোমান্টিক

ইউরোপে রোমান্টিক আন্দোলনের বিকাশ

দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারে ঘটে। উহাই অল্পকালমধ্যে কুলীন সাহিত্য-ভাবনারূপে অভিনন্দিত হইতে থাকে।

রোমান্টিসিজ্‌মের স্বরূপ লইয়া সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে। রোমান্টি-সিজ্‌মের মধ্যে থাকে একটি বিদ্রোহের সুর। প্রাণশক্তির অতিরেক যেমন বাস্তব জীবনে বিদ্রোহ আনে, যৌবনের উচ্ছলতায় যেমন মানুষ বাস্তবের বন্ধন ভাঙিয়া ফেলিতে চায়, সেইরূপ সাহিত্যেও কল্পনার আধিক্যে বস্তুবোধকে অতিক্রম করিয়া যাইবার অপর নামই রোমান্টিসিজ্‌ম্। ক্লাসিক সাহিত্যে কল্পনা নাই এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু কল্পনা সেখানে বস্তুবোধকে ডিঙাইয়া আপনার গতিতে ও উচ্ছ্বাসে দূরাভিসার করে না। বস্তুচেতনার সহিত কল্পনার সমন্বয় ঘটানো হয় সেখানে। ক্লাসিসিজ্‌মের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করায়। বস্তু ও কল্পনার মধ্যে যেমন ভারসাম্য সৃজিত হয়, সেইরূপ কাব্যদেহগঠনে বর্ণনায় একটা সংযম, একটা নিয়মনিষ্ঠা, একটা সংহতি দেখা দেয়। রোমান্টিসিজ্‌ম্ কল্পনাকে প্রাধান্য দিয়া অন্য সব-কিছুকে গৌণ করিয়া তোলে। প্রাচীন সাহিত্যাদর্শ, রূপরীতিগঠিত প্রচলিত নিয়মকানুন রোমান্টিসিজ্‌মের উচ্ছ্বাসে একেবারে তলাইয়া যায়। কবির হৃদয়াবেগ প্রধান হইয়া ওঠায় রীতিনীতি প্রথানুগত্য একেবারেই বিপর্যস্ত হইয়া যায়। অবশ্য শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক শিল্পীদের হাতে এই অস্বীকৃতিই একটা শিল্পরূপে বদ্ধ হইয়া পড়ে। অন্যথায় শুধুই প্রথা ভাঙার চেষ্টা, শুধুই উচ্ছ্বাসের আধিক্য ভালো শিল্পরীতি হইয়া উঠিতে পারিত না। এ বিষয়ে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের ব্যাখ্যান অনুধাবন-যোগ্য: 'জার্মান কবি হাইনে (Heinrich Heine) রোমান্টিক রচনাকে চিত্রকলার সহিত ও ক্লাসিকাল রচনাকে মূর্তিশিল্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন। চিত্রে বিষয়াতি-রিক্ত বহু অর্থের ব্যঞ্জনা থাকে, তাহার পটভূমিকার দৃশ্যসন্নিবেশ ভাব ও অর্থকে বহুদূর প্রসারিত করিয়া দেয়, তাহা ছাড়া তাহাতে ছায়া ও আলোকের খেলা, চোখের ধাঁধা রহিয়াছে—ধরিবার ছুঁইবার কিছুই নাই। অপর পক্ষে, কোনও মূর্তিরচনার মধ্যে আমরা একটা পরিষ্কার আয়তন পাই, তাহার কোনোখানটায়ই ধাঁধা নয়, অপরিস্ফুট নয়। তাহার কোথাও অসীমতার ব্যঞ্জনা নাই, তাহাকে চারিদিক হইতে স্পর্শ করিয়া অনুভব করা যায়; তাহার মধ্যে শিল্পী যে সৌন্দর্য ফুটাইতে চাহিয়াছে, তাহা বস্তু বা বিষয়কে ছাড়াইয়া নহে, অথচ অসম্পূর্ণ নহে। ......অর্থে নহে—ভাবে যাহা গভীর, শব্দ হইতে শব্দাতিরিক্ত ভাবসৃষ্টি যাহার উদ্দেশ্য, প্রকাশ অপেক্ষা ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা যাহাতে অধিক, তাহাকেই আমরা রোমান্টিক রচনা বলিতে পারি।"

ইংরাজী সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার ফলে বাংলা দেশে সাহিত্য ও সমাজভাবনায় রেনেসাঁ দেখা দিল। ইউরোপীয়

রোমান্টিসিজ্‌মের স্বরূপ লক্ষণ

রেনেসাঁর মানববাদ, যুক্তিবাদ প্রভৃতি বহু মন্ত্রই বাঙালী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী গ্রহণ করিল। কিন্তু পাশাপাশি একথাও সত্য, ইউরোপীয় রেনেসাঁর সহিত একটি দিকে ইহার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা গেল। ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে রোমান্টিকতার জয়যাত্রা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আমরা রেনেসাঁর আদর্শটি রোমান্টিকতার মিশ্রিত রূপে লাভ করিলাম। ইহাদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, আমাদের সাহিত্যিকদের নিকট তাহা একটি মিশ্র সমন্বিত রূপধারণ করিল। বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের সুর শুধুমাত্র প্রাচীন ক্লাসিক আদর্শের পুনরাবর্তনে প্রকাশ পাইল না, আত্মার মুক্তির আকৃতিরূপেও দেখা দিল। এই ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন সৃজনশীল বাংলা সাহিত্যে নবযুগের উদ্বোধন ঘটিল, ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত মিশ্রিত আকারে রোমান্টিক সুরও বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু রোমান্টিক ভাবান্দোলন একটা নূতন ব্যাপার হইলেও পূর্বযুগের নানা রচনায় ইহার পরিচয় মিলিবে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথানুবর্তী ধারায়ও এমন দু'একজন কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাঁহাদের রচনায় রোমান্টিক 'লক্ষণটি প্রধান। উদাহরণ হিসাবে পদকর্তা চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাসের নাম করিতে পারি। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট পদকর্তার রচনায় চমৎকার গীতিধর্মের প্রকাশ লক্ষণীয়। কিন্তু কল্পনার আধিক্যে বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া, রূপলোক হইতে অস্পষ্ট রহস্যময় ভাবলোকে উত্তরণের পরিচয় আছে ইঁহাদের কবিতায়। ইন্দ্রিয়াতীত একটি ব্যঞ্জনাই ইঁহাদের বৈষ্ণবপদের প্রধান রস। আসলে রোমান্টিক ভাবান্দোলনের যুগে আবির্ভূত হইয়া সচেতন বুদ্ধিবশে রোমান্টিক ধারার অনুবর্তন করিলেই রচনায় রোমান্টিক সুর শিল্পরূপ ধারণ করিবে ইহা বলা যায় না। শিল্পীচেতনার ভিত্তিতে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে রোমান্টিক উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক ভাবধারার প্রবেশ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের কাব্যকল্পনায়ই প্রথম রোমান্টিক সুরের খাঁটি মূর্ছনা শুনিতে পাই। অথচ তাঁহার অধিকাংশ রচনাই ক্লাসিক রীতির অনুবর্তী। তাঁহার "মেঘনাদবধকাব্যে"ই মহাকাব্যিক রূপাবেদনের অন্তঃস্থলে 'রোমান্টিক প্রবাহটি অনুভব করা যায়। "মাইকেলের মহাকাব্যে য়ুরোপীয় ক্লাসিক্যাল আদর্শে লিখিত হইলেও তাহার ছন্দ, ভাষা ও কাব্যনিহিত কবিহৃদয়ের প্রেরণা লক্ষ্য করিলে, তাহাকে আমাদের সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কাব্য বলা যাইতে পারে। কাব্যের আকৃতি বা রচনারীতিতে 'রোমান্টিসিজ্‌ম্' নাই সত্য, কিন্তু সমগ্রভাবে তাহার মধ্যে সর্ববিষয়ে যে স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্র-সৃষ্টির বিশেষত্ব লক্ষিত হয়—তাহাতে যে বিদ্রোহ পরিস্ফুট হইয়াছে—তাহা কোন ইংরেজ রোমান্টিক কবির সাহস ও স্বেচ্ছাবৃত্তির সহিত তুলনায় ন্যূন নহে। বস্তুতঃ এক অমিত্রাক্ষর ছন্দেই যে প্রবল বিদ্রোহ সূচিত হইয়াছে, এবং রাবণের চরিত্রে

মধুসূদন ও উত্তরসূরীগণ

যে ভ্রূক্ষেপহীন self-representation বা কবির আত্মপ্রচারবাসনার পরিচয় পাওয়া যায়—তাহাই তাহাকে আমাদের সাহিত্যে প্রথম ও প্রধান রোমান্টিক রচনার আসন দান করিয়াছে।" বীরাঙ্গনাকাব্যের নারীচরিত্রগুলির কল্পনায়ও এই রোমান্টিক মনোভাব জয়ী হইয়াছে। মধুসূদনের ধারাবাহীদের মধ্যে উল্লেখ্য কবিরা (হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র) কেহই খাঁটি ক্লাসিক বা রোমান্টিক ধারার অনুসারী ছিলেন না। তাঁহারা একদিকে কৃত্রিম ক্লাসিক আদর্শের অনুবর্তী হইয়া মহাকাব্য লিখিয়াছেন, অন্যদিকে কিছু কিছু গীতিকবিতাও লিখিয়াছেন। উহার মধ্যে কোথাও রহস্যপ্রগাঢ়তা নাই। দুঃখের হতাশার সুর আছে, কিন্তু তাহা দিগন্ত স্পর্শ করে নাই। নবীনচন্দ্রে অবশ্য উচ্ছ্বাসাতিরেক আছে, কিন্তু উহা রোমান্টিক মনোভাবেরই প্রতিফলন এরূপ মনে হয় না।

(বিহারীলাল প্রবর্তিত নব্য লিরিকধারায় রোমান্টিসিজম্ অবশ্য খুবই বিশুদ্ধ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।) বিহারীলালের কল্পনার মধ্যেই রহিয়াছে বস্তুরূপের প্রতি বিরূপতা। বস্তুর অতীত অস্পষ্ট রহস্যব্যাকুলতা অথবা রূপজগতের সৌন্দর্যনির্যাস দিয়া গড়া এক নারীসত্তার কল্পনা করিয়া তিনি উহার নাম দিয়াছেন 'সারদা'। তিনি কবির ব্যক্তিসত্তা হইতে উদ্ভূত এবং বিশ্বের রূপলোকে আপনার প্রভা বিকীর্ণ করেন। বিহারীলালের অনুগামী গীতিকবিরা তাঁহাদের রচনায় রোমান্টিক কল্পনার ধারাটি বহিয়া লইয়া চলিয়াছেন। অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ইঁহাদের মধ্যে প্রধান। এই রোমান্টিক ভাবনার ধারাটি রবীন্দ্রকাব্যে এক নূতন স্তরে সমুন্নত হয়।

বিহারীলাল হইতে রোমান্টিক গীতিকবিতার ধারা

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনার মূল কথা হইল সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব করিবার সাধনা। পূর্ববর্তী কবিরা বস্তুর সহিত সৌন্দর্যকল্পনার আদর্শকে মিলাইতে না পারিবার এক বেদনা ও অতৃপ্তিকেই প্রধানতঃ ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ বস্তুজগৎকে অস্বীকার করিয়া বা এড়াইয়া গিয়া সুদূর কল্পনাজগতে আশ্রয় লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বস্তুর রূপের মধ্যে ডুব দিয়া তাহার স্বরূপ আবিষ্কার করিতেন। সেই স্বরূপ আপনার কল্পলোকের মাধুর্য ও বর্ণবিচ্ছুরণে পূর্ণ। বস্তুকে সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ করিবার অসাধারণ কবিক্ষমতার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ কল্পনা দিয়া গড়া এক আদর্শ প্রেম ও সৌন্দর্যলোকের সহিত আপনার অকারণ বিচ্ছেদের ভাবনাকে বিচিত্র বিরহসংগীতে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ভাবনা মর্ত্যের মৃত্তিকাকে অনায়াসে স্বর্গের মহিমায় রূপান্তরিত করিয়াছে। প্রকৃতির আমন্ত্রণে বিশ্বসৌন্দর্যের ইঙ্গিত বারবার ধরা পড়িয়াছে। রবীন্দ্রকাব্য শেষজীবনে সুরে ভাবে রূপে নূতনত্ব অবলম্বন

রবীন্দ্রকাব্য

করিলেও, কোথাও-বা সাম্প্রতিক বস্তুবাদী ভাবধারার সহিত সন্ধি করিলেও, মূলে জগৎ জীবন সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁহার রোমান্টিক বিশ্বাসে কোথাও ব্যত্যয় ঘটে নাই।

রবীন্দ্রোত্তর কবিতা—রোমান্টিক ধারার পরিণতি

রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে রোমান্টিক ভাবধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। ক্রমেই বাস্তবতা এবং উহার সহিত সম্পৃক্ত নানা ধরনের মতবাদ ও জীবন-দর্শন কাব্যের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করিল। ইহার ফলে রোমান্টিকতার ধারাটি অনেক পরিমাণে সংকীর্ণ ও গৌণ হইয়া পড়িল। আবার কাহারও কাহারও রচনায় আধুনিক চটকদারী বাস্তবতার অন্তরাল হইতে উঁকি দিতে লাগিল।

বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলা উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যে রোমান্টিকতার ধারা প্রতিষ্ঠালাভ করিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান জীবনধারার সামান্যতায় আপনার সৌন্দর্যমুখী কল্পনাকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। তিনি অতীতচারী হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের যথাযথ রূপ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য রোমান্স রচনা করেন নাই। বর্তমানের সামান্যতা অতীতের বর্ণাঢ্য সৌন্দর্যস্বপ্নে তিনি পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া মানবজীবনের সুদূরপ্রসারী কামনা, বাস্তব অবস্থা, সমাজের বন্ধনকে লঙ্ঘন করিয়া হৃদয়ের মুক্তসুন্দর লীলা, জীবনব্যাপী সাধনার অচরিতার্থতা, প্রণয়রহস্যে জীবনসার্থকতার অনুসন্ধান এবং চরিত্র সম্বন্ধে চিরকালীন সমাধানহীন জিজ্ঞাসা তাঁহার রোমান্স এবং সামাজিক উপন্যাস সর্বজাতীয় রচনাকে রোমান্টিক ধারার অনুবর্তী করিয়াছে। বঙ্কিমের রোমান্টিকতা বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদারের এই উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ "ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতে খাঁটি রোমান্টিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই, বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে নূতন মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ও উদ্গাতা কবি হইতে পারিয়াছিলেন। 'তিনি যে অর্থে Hindu Revival-য়ের নায়ক, তাহা কোন অংশে সংকীর্ণ নহে; তাহার দ্বারা যেমন উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল, তেমনই জাতির প্রাণমূলে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে।" বঙ্কিমের রোমান্টিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার কমলাকান্ত নামক অভিনব গদ্যগ্রন্থটি।

বঙ্কিমোত্তর ঔপন্যাসিক—রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা—উপন্যাসে ও গল্পে

বঙ্কিমোত্তর ঔপন্যাসিকেরা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন না। রোমান্স রমেশচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা প্রায়ই ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠার পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এবং বিশেষ করিয়া ছোটগল্পে রোমান্টিক কল্পনার প্রাধান্য লক্ষণীয়। উপন্যাসে ইহার ফলে বস্তুবোধহীন কবিত্ব বহুস্থলে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বহুস্থলে চরিত্রসৃজনও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু ছোটগল্পে কল্পনাপ্রাধান্য, প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত মানবজীবনের তাৎপর্যময় বস্তু-অতীত রূপে আশ্চর্য শোভায় মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

শরৎচন্দ্র এবং পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনায় ভাবাবেগপ্রাধান্য থাকিলেও উহা রোমান্টিক কল্পনাজাত নয়। এই পর্ব হইতেই বাংলা উপন্যাস আধুনিক জগতে প্রবেশ করিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে যে সব রোমান্স রচিত হইতেছে উহার পশ্চাতে অন্য যে কোন মনোভাব সক্রিয় থাকুক না কেন, খাঁটি রোমান্টিক ব্যাকুলতা নাই।

সাম্প্রতিক উপন্যাস রোমান্টিকতা-মুক্ত

বাংলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী হইতে সংস্কৃত ক্লাসিক রীতির অবসান হইয়া সেক্সপীরীয় রীতি দেখা দিল। উহার মধ্যে নাট্যকার সামান্যতঃ রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রাখিয়াছেন। দীনবন্ধুর বস্তুতন্ত্রে বা রাজকৃষ্ণ-মনোমোহনের মধ্যযুগ-সুলভ ভক্তিরসে রোমান্টিকতার স্পর্শমাত্র নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক প্রণয়াখ্যানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় রোমান্টিক মনোভঙ্গির কিছু কিছু পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—কতকটা চরিত্রকল্পনায়, কিছুটা সংলাপের ভাষায়। গীতিসংস্থানে এবং লিরিক মনোভাবের প্রতিফলনেও রোমান্টিকতার চিহ্ন মিলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য কাব্যনাট্য সাংকেতিক নাটকে মানবভাবনায়, প্রকৃতিচেতনায় এবং ঈশ্বরবিষয়ক চেতনায় তথা ভাষায় রোমান্টিকতার প্রকাশ ঘটিয়াছে।

নাটকে রোমান্টিকতা

বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিকতার আদর্শটি বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর হইতেই ক্ষীণতর হইয়া আসিতে থাকে। বাস্তবতার প্রাধান্য এবং নানাবিধ নব্য জটিলতা বর্তমানে সাহিত্যজগতে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

উপসংহার

বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তন

গল্প বলিবার এবং শুনিবার প্রবৃত্তি মানবসভ্যতার ইতিহাসের আদিম পর্যায়গুলির সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বিজড়িত। আদিমতম সেই গল্পগুলি রূপকথা এবং উপকথা নামে পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে, সভ্যতার স্তর যাহাই হোক না কেন, রূপকথার এবং উপকথার বড় ধরনের সঞ্চয় থাকে লোকমানসে। মুখে মুখেই এইগুলির প্রচার ঘটিত। লিখিত সাহিত্যেও খণ্ড খণ্ড গল্পের সুপ্রচুর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। বিচিত্র মিথ্ বা পুরাণধর্মী গল্প যেমন আছে তেমনি উপদেশমূলক নীতিগল্পের সংকলনও মেলে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এবং ঈশপ্স্ ফেব্ল্স্-এর কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে পড়িবে। মানবজীবনের নানাবিধ কাহিনী লইয়া প্রাচীন কাল হইতে নানা ধরনের গল্প লেখা হইতেছে। ভারতে প্রচলিত প্রাচীন গল্প-সাহিত্যের ধারাটি ছিল বিশেষ সমৃদ্ধ। বৌদ্ধ জাতকের অনেকগুলি গল্পে মানব-

পুরাতন গল্পসাহিত্য

জীবন, ভাগ্য ও চরিত্রের নানা দিকের প্রকাশ ঘটিয়াছে। বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ পুতুলের গল্প, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, গুণাঢ্যের বৃহৎকথা এবং কথাসরিৎসাগরের নাম ভারতের ন্যায় পৃথিবীর গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। (অনেকেই মনে করেন, ভারত হইতে অতি প্রাচীন কালে গল্পসাহিত্যের ধারা আরব-পারস্যে প্রসারিত হয়।) বিখ্যাত আরব্যরজনীর কিছু কিছু গল্পের পিছনে ভারতীয় প্রভাব আছে বলিয়া কোনো কোনো গবেষক মনে করিয়াছেন। বোকাচিওর দেকামেরনের গল্পগুলি হইতে ইউরোপে আধুনিক গল্পসাহিত্যের সূত্রপাত হইল।

ছোটগল্পের লক্ষণ

আধুনিক ছোটগল্পের রূপরীতিঘটিত বিশিষ্টতা আলোচনা করিলে ইহার বৈচিত্র্যে বিস্মিত হইতে হয়। জনৈক বিশিষ্ট সমালোচকের মতে "A story can be all things a poem and a novel cannot be. A story can be a poem and it can be a novel in essence and it can be both of these things at once, but no poem can be s short story and no novel can be a short story." (কিন্তু পাশাপাশি একথা আরও বেশী সত্য যে, ছোটগল্পের একটি প্রাণধর্ম আছে) এই প্রাণধর্মটি অবশ্যই একটি ফর্মুলার মতো নয়। উহা রূপগত, ভাবগত নানাবিধ স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও মূল সুরে বহমান থাকে। ছোটগল্পের আকৃতিটি সচরাচর খুব বড় হয় না। অবশ্য মপাসাঁর "জাভেৎ" এবং রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়"ও উচ্চাঙ্গের ছোটগল্পরূপে পরিচিত। কিন্তু ইহাদের আকৃতি নেহাৎ ক্ষুদ্র নয়। আবার এক পৃষ্ঠা-দেড় পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প বনফুলের গল্প-সংগ্রহে পাওয়া যায়। আকার সম্বন্ধে কাজেই কোনো কথা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় না। তবে একথা মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ছোটগল্প আকারে ছোটই হয়। উপন্যাসোপম বড় আকারের রচনা অথচ ছোটগল্পের গুণধর্মে অবিচল এরূপ রচনার সংখ্যা অল্পই। ছোটগল্পের এই প্রকৃতি হইল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অপরিহার্য সংহতি। ছোটগল্পে এমন কোনো কিছুই থাকে না, যাহা গল্পটির কেন্দ্রীয় ভাব বা প্রসঙ্গের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত নয়। ছোটগল্পে পল্লবিত বর্ণনা বা শাখায়িত কাহিনীবিস্তার থাকে না। চরিত্রের সামগ্রিক পরিচয় বা ঘটনার ক্রমবিকাশ দেখানো ছোটগল্পের লক্ষ্য নয়। ছোটগল্পকার জীবনের একটি খণ্ড অংশের চিত্র আঁকেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিই এইরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে শিশিরবিন্দুতে বিশ্বের আকাশের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। জীবনের খণ্ড অংশে তিনি আলোকপাত করেন, চরিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্ত তিনি তুলিয়া ধরেন। কিন্তু সমগ্রের আভাস তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। এইজন্য সনেটের অনুসরণে অনেকেই ছোটগল্পকে বলিয়াছেন "moment's monument"। একটি মুহূর্তের ইঙ্গিতে জীবনসত্যের উপলব্ধি, জীবনের মধ্যে অবতরণ করাইতে পারে ছোটগল্পই। জনৈক বাঙালী ছোট গল্পকার বলিয়াছেন "অঙ্গুলি-নির্দেশ" ছোটগল্পে উহা খুবই মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে

ওয়েব্‌স্টার এনসাইক্লোপিডিয়ায় প্রদত্ত সংজ্ঞাটির কথা স্মরণ করা যাইতে পারে—"A short story usually presenting the crisis of a single problem". ইহার সঙ্গে Upham-এর বক্তব্যটি মিলাইয়া পড়িলে ছোটগল্পের পূর্ণ স্বরূপটি বুঝা যায়—'Out of the rapidly moving current of life's experiences the author's imagination seizes upon an impressive situation or a striking contrast that affects him keenly".

ইউরোপে ছোটগল্পে নানা প্রকৃতির কয়েকজন বিশিষ্ট গল্পলেখক আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবনবোধ এবং শিল্পরীতির কিছু পরিচয় লওয়া যাইতে পারে। এডগার অ্যালান পো-এর ছোটগল্প সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলেন, "The short stories of Edgar Allan Poe are stories of plot, suspense, atmosphere and wood. They are, all of them, art stories, and altogether lacking in connexion with real life". পো-এর গল্পে জীবনচেতনার গভীরতা না

ইউরোপীয় গল্প-লেখকগণ—পো, মপাসাঁ, চেহভ

থাকিলেও রূপবন্ধের যে নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। গী দ্য মপাসাঁ ছোটগল্পের রূপরীতিকে বাহিরের কঠিন বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। কিন্তু ছোটগল্পের একটি নিজস্ব আঙ্গিক তাঁহার হাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া গল্পের পরিণতির নাটকীয় চমক-টুকু তাঁহার ন্যায় উপভোগ্য ও শিল্পসম্মত করিয়া আর কেহই প্রায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার গল্পে বহিরঙ্গ ঘটনার প্রবলতা এবং প্রাধান্য স্থাপিত কিন্তু জীবনের অকপট স্পর্শে উহা উজ্জ্বল। মরণশীল মানব-অস্তিত্বের আনন্দবেদনার নিখুঁত চিত্ররূপে এইগুলি মূল্যবান। ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার হইলেন আন্তন চেহভ। এই রূপশিল্পীর গল্পে কোনো বাঁধাধরা climax সৃষ্টির চেষ্টা নাই। বহিরঙ্গ প্রসাধন এত নিপুণ যে উহাকে প্রসাধন বলিয়া মনেই হয় না। একটা শান্ত বিষণ্ণতা তাঁহার ছোটগল্পগুলিকে ঘিরিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অথচ আশ্চর্য তাহাদের আকর্ষণী শক্তি, অবিস্মরণীয় তাহাদের লাবণ্য।

বাংলা ছোটগল্পের সম্যক প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের হাতে। পূর্বে বঙ্কিম-সঞ্জীবের কোনো কোনো রচনায় ইহার কিছু কিছু ছাপ থাকিলেও, ছোটগল্পের শিল্পরূপটি রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর বহির্বিকাশের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া জীবনের তলদেশে প্রবহমান নিভৃত ফল্গুধারাটির প্রতি বাঙালীকে আকৃষ্ট করিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লিরিক প্রতিভা লইয়া বাঙালীকে আকৃষ্ট করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লিরিক প্রতিভা লইয়া বাঙালী জীবনের একটি নূতন সত্য আবিষ্কার করিলেন। তাঁহার গীতিপ্রবণ হৃদয়কে সহজেই দোলা দিল জীবনের নিভৃতগোপন প্রবাহটি, যেখানে জীবনের খণ্ডাংশের

মধ্যেই একটা অনির্বচনীয় অসীমের সুর স্বাভাবিক ভাবে গুঞ্জরিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ গল্পই একান্তভাবেই গীতিকবিতার ধর্ম লাভ করিয়াছে। কবির ছোটগল্পের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মবোধ, জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলিকেও পরম রমণীয় ও অপূর্ব রহস্যময় বলিয়া অনুভব অপূর্ব রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশের একটি নির্জন প্রান্ত, তাহার নদীতীর, উন্মুক্ত আকাশ, বালুর চর, অবারিত মাঠ, ছায়া-সুনিবিড় গ্রাম, সহজ অনাড়ম্বর পল্লীজীবন, দুঃখে পীড়িত অভাবে ক্লিষ্ট অথচ শান্ত সহিষ্ণু গ্রামবাসী—সব-কিছুকে কবির চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছে, আর কবি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে পুলকে শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে তাহার অপরিসীম সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পে দুইবার পালাবদল হইয়াছে। গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডের বহু গল্পে ভাষার সেই রসনিটোলতা চলিয়া গিয়াছে। তীক্ষ্ণ ভাষা দেখা দিয়েছে, সমাজসচেতনা প্রকৃতি রসরহস্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। "তিন সঙ্গী" গল্পগ্রন্থে কবির দৃষ্টির আরও বিবর্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার বাক্‌ভঙ্গি যেমন হইয়া উঠিয়াছে অত্যন্ত শাণিত বক্র এবং বুদ্ধিদৃপ্ত, তেমনি ভাববস্তুতে রহিয়াছে মোহমুক্ত ভালোমন্দ নিরপেক্ষ বাস্তব দৃষ্টির প্রয়োগচেষ্টা। "আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের সমস্ত দিকেই রবীন্দ্রনাথের মহিমচ্ছায়া পড়েছে। সমাজসমস্যা, নারী, রোমান্স, দার্শনিকতা, কাব্যধর্মিতা এবং এমন কি ব্যঙ্গগল্পেও তাঁর কলম সর্বসিদ্ধি লাভ করেছে। ঐতিহাসিকভাবে না হোক, সাহিত্যিক বিচারে একালীন বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টাই হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ এবং আজ পর্যন্তও তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার।"

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সমকালে হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক গল্পরচনায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ আসর-জমানো বৈঠকী সরস গল্পের প্রাচীন ঐতিহ্যটিকে ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। মৌতিক আঘাতে গল্পগুলিতে লেখকের ভাষার সারল্য সরসতা এবং রচনারীতির অন্তরঙ্গ কুশলতা রহিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথ হাস্যরসের শিল্পী। কৌতুক ও রঙ্গ হাস্যরসের এই দুইটি উপাদান তাঁহার রচনায় সমভাবে লভ্য। তাহা ছাড়া আছে উদ্ভট কল্পনার নিরঙ্কুশ উদ্দামতা ও জাতীয় চরিত্রের তীক্ষ্ণ ও সরস সমালোচনা।

ত্রৈলোক্যনাথ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় চমৎকার প্রসাদগুণমণ্ডিত ভাষায় ছোটখাটো জিনিষগুলিকেও উপভোগ্য গল্পে পরিণত করিতে পারিতেন। Climax রচনায় তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। সিচুয়েশন-সৃষ্টির কৌশল ছিল তাঁহার অধিগত এবং চকিত একটি বিদ্যুচ্ছটা এক অপরিচিত ভাবজগৎকে উদ্ভাসিত করিবার বা হৃদয়ের গভীরতমচারী রহস্যলোককে তেমনভাবে আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও তিনি ছোটখাটো হাসিকান্নাগুলিকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে উপস্থিত করিতে

প্রভাতকুমার

পারিতেন। বিশেষ করিয়া সুবিন্যস্ত ঘটনাসন্ধি সৃষ্টি করিয়া জীবনের লঘু অংশগুলিকে তিনি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিতেন। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় তাঁহার গল্পের নিপুণ আঙ্গিক রচনায় সাহায্য করিয়াছিল। ইংরাজিতে যাহাকে precision বলা হয়—প্রভাতকুমারের গল্পে তাহার খুব ভালো নিদর্শন মেলে। রচনাগত এই কৃতিত্বের জন্যই কোনো কোনো সমালোচক তাঁহাকে মপাসাঁর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মপাসাঁর জীবনদৃষ্টির সহিত প্রভাতকুমারের সাদৃশ্য ছিল না।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পে পরিবারজীবনের হাস্য-অশ্রুর বিচিত্র খেলা স্নিগ্ধ-সজল রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার বহু ছোটগল্পকে ক্ষুদ্র উপন্যাস বা উপন্যাসের খসড়া বলিয়া মনে হয়। অবশ্য সহজ মমতারসে তাঁহার এই জাতীয় সব রচনাই উজ্জ্বল। সমকালীন অপরাপর গল্পলেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সরোজনাথ ঘোষ প্রভৃতির রচনায় প্রভাতকুমারের প্রভাব খুবই বেশী।

শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য

পরশুরাম হাস্যরসাত্মক গল্পে শুধু এদেশের নয়, সর্বদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে গণ্য হইতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম গল্পগ্রন্থটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন: "সহসা ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল। ...বইখানি চরিত্রচিত্রশালা। ...তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।" পরশুরামের গল্পে সমাজব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা আছে, কিন্তু প্রায়ই উহা রঙ্গরসে, উদ্ভট কল্পনায় ও উচ্চ হাস্যে বৈঠকী মেজাজের রসোল্লাসে তিনি ব্যঙ্গের আঘাতকে হাস্যের আতিশয্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

পরশুরাম

বাংলা গল্পে বিশুদ্ধ মনস্তত্ত্ব এবং মর্বিডিটির প্রবর্তনে জগদীশ গুপ্তের দান অসামান্য। শৈলজানন্দের গল্পে শরৎচন্দ্রের সমাজবোধ এবং জগদীশ গুপ্তের তির্যক মনস্তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়াছে। যৌনবোধের সহিত বিজড়িত আকারে কয়লাকুঠির জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁহার গল্পে নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। "এর মধ্যে কল্লোল পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছে বাংলা দেশে। এই কল্লোলকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গড়ে উঠল, যৌন সমস্যা, দুঃখবাদ, পরাজিত বুদ্ধিজীবীর মানসিক বিকৃতি, বিদ্রোহ এবং চড়া রোমান্টিসিজম্ দিয়ে তাঁরা বীণার তার বেঁধে ছিলেন। তাঁরা সোজাসুজি প্রথম যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ধারাকে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এলেন।"

জগদীশ গুপ্ত
শৈলজানন্দ
কল্লোল পত্রিকার ভূমিকা

আধুনিক বাংলা গল্পের কয়েকজন প্রধান লেখকের পরিচয় লইলে উহার বৈচিত্র্যে বিস্মিত হইতে হয়। একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তারাশংকরের ছোটগল্পে সর্বদা

ছোটগল্পের আঙ্গিক-সিদ্ধি পাওয়া যায় না। কিন্তু উহাদের মধ্যে জীবনের এমন একটি অভিনব রূপ ও রস প্রকাশ পাইয়াছে যাহাতে উহাদের অত্যুচ্চ শিল্প-কীর্তি রূপে অবশ্যই মানিয়া লইতে হয়। রাঢ়ের রুক্ষরিক্ত পটভূমিকায় তিনি যেসব বিচিত্র মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করাইয়াছেন তাহার নবীনতা অবশ্য স্বীকার্য। টাইপ চরিত্রসৃষ্টিতে তারাশংকর অদ্বিতীয়। তারাশংকরের গল্পে জনজীবন রাজনৈতিক দৃষ্টির আবরণ ছাড়াই আদিম প্রবৃত্তিতাড়িত প্রবল মূর্তিতে দেখা দিয়াছে।

তারাশংকর

বিভূতিভূষণের সাহিত্যের মূল উপকরণ দুইটি—রূপরহস্যময় প্রকৃতি এবং অতি চেনা সহজ সাধারণ মানুষ। তাঁহার গল্পের মানুষ কোমল নম্র শান্ত ও সংযত। বিভূতিভূষণের গল্পে গ্রামীণ জীবনের প্রাধান্য স্থাপিত। পল্লীজীবনের দীনতাহীনতাকুশ্রীতা তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত খড়্গপাণি হইয়া ওঠেন নাই। "ছোট দুঃখ, ছোট ব্যথা"—যাহা "নিতান্তই সহজ সরল" তিনি তাহারই শিল্পী।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প যেমন আঙ্গিকসিদ্ধ তেমনি ভাবকল্পনায় আধুনিকতম জীবনসত্যকে আয়ত্ত করিয়া বসিয়াছে। বাংলা ছোট গল্পে মনস্তাত্ত্বিক তির্যকতা এবং কূটৈষণার উদ্ঘাটনে তাঁহার সমকক্ষ শিল্পী আর নাই। মানুষের গোপন হিংসা আর অবচেতন আত্মপীড়নে, বাস্তব-অবাস্তব লৌকিক-অলৌকিকের এক বিষাক্ত অন্ধকারে, নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনসম্পর্কে চূড়ান্ত নেতিবাদে তাঁহার অধিকাংশ গল্পই পূর্ণ। শেষ দিকে তিনি সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন ধারার গল্পরচনায় হাত দিয়াছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাপর গল্পলেখকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বনফুলের আঙ্গিক-নিষ্ঠা, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কৌতুকরস, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোমান্টিক মাধুর্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবাদীর বিকৃতি ও যন্ত্রণা, আদিমতা-সংসক্তি যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি আছে উহার অন্তরে পূর্ণতর সৌন্দর্যের পিপাসা, মহত্তর তাৎপর্যের সন্ধিৎসা। তাঁহার জীবন-বিশ্লেষণ এবং মুক্তি-বাসনার মধ্যে কোথাও ফাঁক বা ফাঁকি নাই। কিছুটা অস্বচ্ছতা এবং অনিশ্চয়তা অবশ্যই আছে। বনফুলের আঙ্গিকগত পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য হইতে ব্যঙ্গের সুরটিই প্রধান। মানবচরিত্রের হীনতা-দীনতা ও বক্রতারই অভিব্যক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ 'সিনিক'।

প্রেমেন্দ্র, বনফুল, বিভূতি মুখো, শরদিন্দু

অতি সম্প্রতি বাংলা ছোটগল্পে ভাবসূত্রের অসংলগ্নতা, এবং অবচেতনায় অবগাহন একদিকে অতিপ্রকট হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে অভিজ্ঞতাহীন জীবনরূপায়ণ এবং কদর্য কামকণ্ডুয়ন দেখা দিয়াছে। উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংগত ভাবেই মানুষের মনে সংশয় দেখা দিয়াছে।

উপসংহার

বাংলা উপন্যাসে সমাজচেতনা

উপন্যাস-সাহিত্যের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া অনেকেই বাস্তবতাকে উহার একটি বিশিষ্ট ধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এমন কি, রোমান্টিক মনোভাবসম্পন্ন কবিরাও উপন্যাস লিখিতে গিয়া বাস্তবতার রীতি-নীতি অস্বীকার করিতে পারেন না। বিশুদ্ধ রোমান্সধর্মী উপন্যাসে অবশ্য কাব্যকল্পনা ডানা বিস্তার করিয়া জীবনের বাস্তবতা হইতে বহুদূরে উড়িয়া যায়। কিন্তু সেখানেও বর্ণাঢ্যতার অন্তরাল হইতে জীবনের বাস্তব রূপ উঁকি দেয়। অন্ততঃ চরিত্রচিত্রণে জীবনধর্ম অনুসরণ করিতেই হইবে। এই জীবনধর্ম ও বাস্তবতার মাপকাঠিতেই মধ্যযুগের কাহিনীর সহিত উপন্যাসের পার্থক্য। অবশ্য সব জাতীয় উপন্যাসে সমাজচেতনার পরিমাণ সমান নয় এবং সব শিল্পী একই রূপ জীবনমুখী নন। কেহ কেহ জীবনের গভীরে চিরকালীন সত্যের অনুধ্যান করেন, দেশকাল-নিরপেক্ষ মানববৃত্তির প্রবলতা খুঁজিয়া বেড়ান। কেহ আবার একান্ত সাময়িক রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ চিত্রটি তুলিয়া ধরেন। ঔপন্যাসিকদের প্রতিভাব বিশিষ্টতা এবং প্রবণতার স্বরূপানুযায়ী সমাজচেতনা বিচিত্ররূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করে। আবার ইহাও একটি প্রধান সমস্যা যে সমাজচেতনার প্রত্যক্ষতা তীক্ষ্ণতা এবং সর্বব্যাপকতা সত্ত্বেও উহাদের শিল্পসিদ্ধি না ঘটিতে পারে, আবার সমাজচেতনার দিক হইতে দুর্বল রচনা শিল্পগুণে সমৃদ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ সাহিত্যিক উৎকর্ষ এবং সমাজচেতনা কোনোরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধনেই আবদ্ধ নয়।

ভূমিকা।

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রকৃত জন্মের পূর্বে দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় উহার পূর্বরূপ ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছিল। একদিকে সমাজব্যঙ্গমূলক নকশায় উপন্যাসের বীজ উপ্ত হইতেছিল, অন্যদিকে কল্পনাপ্রধান রোমান্টিক কাহিনী-আশ্রয়ে রোমান্সের আদি রূপ দেখা দিয়াছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নববাবুবিলাস" এবং "নববিবিবিলাসে"র মধ্যে সমকালীন হঠাৎ-ধনীদের উচ্ছৃঙ্খলতা, রুচিদুষ্টি এবং শিক্ষাসংকটের ছবি ব্যঙ্গাত্মক কাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই রচনা দুইটি ঔপন্যাসিক শিল্পগুণে উল্লেখ্য নয়, তবে ১৮২২-২৩ সালে বাংলা গদ্যের আদি যুগের রচনা হিসাবে মূল্যহীন নয়। ব্যঙ্গের এই সুরটি "আলালের ঘরের দুলালে" আরও পরিণত রূপ লাভ করে। চরিত্রসৃজনের কলাকৌশলে এবং নকশার বিচ্ছিন্নতাকে লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র অনেকটা পূর্ণদেহ কাহিনীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

প্রাক্-বঙ্কিম উপন্যাস রচনার চেষ্টা ও সমাজচেতনার স্বরূপ

আলালের সমাজচেতনাও ইংরেজসংস্পর্শজনিত প্রাচীন দেশীয় সমাজে যে সব বিকৃতি দেখা দিয়াছিল তাহার সমালোচনায় পূর্ণ। ১৮৫২ সালে হ্যানা ক্যাথারীণ ম্যলেন্স নাম্নী জনৈকা খ্রীষ্টান মহিলা "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার মধ্যেও উপন্যাসোচিত কতকগুলি লক্ষণ রহিয়াছে। গ্রন্থটিতে সামাজিক মূল সমস্যার রূপায়ণ নাই। কিন্তু সমকালীন বাঙালী নারীমহলের একটি ঘরোয়া ছবি স্থান পাইয়াছে। বাঙালী অন্তঃপুরিকাদের বাস্তবচিত্র বাংলা গল্পসাহিত্যে এই প্রথম প্রবেশ করিল। বঙ্কিমের পূর্বে রচিত অপর একটি উপন্যাস-কল্প রচনা খুবই উল্লেখযোগ্য। উহা হইল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "অঙ্গুরীয়-বিনিময়"। অনুবাদধর্মী এই রচনাটির মধ্যে মৌলিকতার পরিমাণ বড কম নয়। ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া কাল্পনিক কাহিনীর এই ধারাটি বঙ্কিমযুগে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সমাজচেতনার প্রত্যক্ষ প্রকাশ নাই। কাল্পনিক কাহিনীর রসই এখানে বড।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাস আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং শিল্পগুণে অসাধারণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মানুষের চিরকালীন বৃত্তিগুলির গভীর আলোড়ন এবং অন্তহীন রহস্যের ছবি ধরা পডিয়াছে। কিন্তু তিনি বাংলা-দেশের সমকালীন জীবন সম্পর্কে চোখ বুজিয়া মানুষের চিরন্তন রূপটি ধরিতে চাহেন নাই। সমকালের রূপ ধরিয়াই চিরকাল দেখা দেয় উপন্যাসে। বঙ্কিমের প্রথম দুইটি উপন্যাসে গুণগত তারতম্য রহিয়াছে সুপ্রচুর। কিন্তু একদিকে উহাদের মধ্যে মিল আছে। কারণ, উভয়েরই মধ্যে বঙ্কিমের সমাজচেতনার বিশেষ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র "মৃণালিনী" উপন্যাসেই কিছু বক্রভাবে হইলেও প্রথম সমাজচেতনার পরিচয় দিলেন। 'মৃণালিনী'তে তিনি ইতিহাসাশ্রিত কল্পনারঞ্জিত কাহিনীই রচনা করিয়াছেন। কিন্তু উহারই মধ্যে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ভাবনার একটি প্রধান গ্রন্থি তাঁহার জাতীয় চেতনার ছবি আঁকিয়াছেন। বাঙালীর স্বাধীনতা-প্রীতি প্রাচীন পরিবেশে আপনাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গদর্শনপর্বে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষতঃ সমাজভাবনার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি একদিকে প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালী সমাজের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, তাহার সবলতা দুর্বলতা লইয়া সুগভীর ভাবনাকে তথ্য ও যুক্তির মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই পর্বের উপন্যাসগুলিও তীক্ষ্ণ সমাজচেতনায় পরিপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "রজনী" নামে পূর্ণাঙ্গ তিনটি সামাজিক উপন্যাস লিখিলেন। উহাদের মধ্যে সমকালীন উচ্চবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরসংসারের ছবি কতকটা ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক বড় কথা হইল সামাজিক সমস্যার গভীরতর প্রদেশে অবতরণ। বঙ্কিমচন্দ্র বরং পরিবারজীবনের বাস্তব চিত্রকে প্রায়ই কল্পনার সাহায্যে আবৃত

করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু সমাজজীবনের সহিত সংঘাতের মধ্য দিয়া মানবচরিত্রের যে বৃহত্তর সংকট রূপ পায় তাহার মধ্যে তলাইয়া যাওয়াতেই বঙ্কিমের বিশেষ প্রবণতা।

বঙ্কিমের উপন্যাসে সমাজচেতনার পরিমাণ এবং শিল্পসার্থকতা

তাহা ছাড়া বঙ্কিমের শিল্পচেতনা ছিল অত্যন্ত গভীর। সমাজ-চেতনাকে চোলাই করিয়া উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্ররূপের মধ্যে মিলাইয়া দিতে তিনি জানিতেন। বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসগুলিতে একদিকে মানবপ্রেমের সর্ববাধামুক্ত রূপের বহ্নিদাহ, অন্যদিকে সামাজিক রীতি ও শৃঙ্খলার বন্ধন। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বে অবক্ষয়িত, তাঁহার গোবিন্দলাল রূপমোহের আগুনে আত্মাহুতি দিয়াও জ্বালা জুড়াইতে পারে নাই, তাঁহার অমরনাথের সংযমের অন্তরালে প্রবৃত্তির দাহ প্রতিনিয়ত বিধূমিত হইয়াছে। বঙ্কিমের সমাজচেতনা এই সব উপন্যাসে কখনও কখনও তাঁহাকে নীতিবাগীশ করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরে তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, বঙ্কিম কখনও মানবপ্রবৃত্তির দাবদাহের, অগ্ন্যুদ্গারের ছবি আঁকিয়াছেন, আবার অন্যদিকে সমাজচেতনার শক্তির প্রবলতার রূপটিও ধরিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সব মিলাইয়া মানবহৃদয়ের অতলান্ত গভীরতার বিস্ময়টিই বড় হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক শিল্পসার্থকতার মধ্যে রূপায়িত করিয়াছেন নব্য ইউরোপীয় ভাবাবেগজনিত চিত্তমুক্তির চেতনা এবং প্রাচীন সামাজিক সংস্কারের দ্বন্দ্বটি। এই পর্বে লেখা বঙ্কিমের পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক রোমান্স "চন্দ্রশেখরে"ও তাঁহার সমাজচেতনার সক্রিয় রূপটি লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের নায়িকা শৈবলিনীর চরিত্রে ও ভাগ্যে মুক্তপ্রেম ও সমাজনীতির সংঘর্ষ শিল্পনিপুণতায় সম্পূর্ণ ধরা পড়ে নাই বটে, কোথাও কোথাও নীতিবাগীশতা প্রধান হইয়া উঠিয়াছে ঠিকই—তবু নারীহৃদয়ের এই নবীন উদ্‌ঘাটন বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে দিগ্‌দর্শন সৃষ্টি করিয়াছে এইরূপ বলা চলে। বঙ্কিমের তত্ত্বপ্রধান তিনটি উপন্যাসেও তাঁহার সমাজচেতনার সুন্দর পরিচয় রহিয়াছে। উপন্যাস হিসাবে অবশ্য "আনন্দমঠ" এবং "দেবী চৌধুরাণী" সম্পূর্ণ সার্থক হইয়া ওঠে নাই। তত্ত্বভাবনার মধ্যে মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বিকাশ অনেকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। "সীতারাম" সম্বন্ধে সে অভিযোগ করা যায় না। উহা শিল্পসিদ্ধির উচ্চমার্গে উঠিয়াছে। এই তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিম মানবজীবনের সার্থকতা খুঁজিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার এই সন্ধান সন্ন্যাসমার্গ-অভিমুখী নয়। জীবনের মধ্য দিয়াই তিনি সত্য খুঁজিয়াছেন। বাঙালীর সমাজসমস্যা, রাজনৈতিক ভাবনা, কর্মের স্থবিরতা, চিন্তার বন্ধন, স্বার্থের সংকীর্ণতাই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে এই নিষ্কাম কর্মের বোধে লইয়া গিয়াছে। এককালে বঙ্কিম বেন্থাম-মিল-রুশো কথিত পজিটিভিজম্ ও সাম্যবাদের মধ্যে খুঁজিয়াছিলেন বাঙালী-জীবনের সমস্যার সমাধান, কিন্তু পরিণত বয়সে বঙ্কিমের মনে হইয়াছে নিষ্কাম

কর্মেই মিলিবে সমাধান। কাজেই বঙ্কিম প্রচারিত অনুশীলনতত্ত্ব গভীর সমাজ-চেতনাসম্ভূত। "দেবী চৌধুরাণী" ও "আনন্দমঠে" তত্ত্বটি প্রচার করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মানবপ্রাণের জটিলতার চিত্র বড় অঙ্কন করিতে পারেন নাই। তবে "সীতারামে" ব্যক্তির ট্র্যাজিক হাহাকারের যে বিপুল মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে পূর্বোক্ত তত্ত্বটি কোথাও প্রধান হইয়া উঠিতে পারেন নাই। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে আরও একটি দিক দিয়া সমাজচেতনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বঙ্কিম বাঙালীকে শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। বাঙালীর মনে স্বাধীনতার আবেগটি তিনি সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন। আসলে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম পাদে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র এক বিপুল শক্তিধর সমাজব্যক্তিত্ব হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাসে উহারই শিল্পসমৃদ্ধ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিমানুজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ক্ষমতার দিক হইতে প্রথমেই নাম করিতে হয় রমেশচন্দ্রের। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে সমাজচেতনার প্রকাশ প্রথাবদ্ধ ভাবে ঘটিয়াছে। "রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা" এবং "মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাতে" তিনি ইতিহাসপ্রসঙ্গের উপন্যাসরূপ অঙ্কিত করিতে গিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা-চেতনাকেই বাণীরূপ দান করিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক উপন্যাস-দুটিতে সেকালের বাংলাদেশের পরিবারজীবনের এবং গোটা গ্রামসমাজের একটি অরঞ্জিত চিত্র ধরা পড়িয়াছে। "সংসার" উপন্যাসে যেন কোথাও গল্প বা চরিত্র গড়িয়া তোলার চেষ্টামাত্র নাই। মানবজীবন যেন আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে সেকালীন সমাজের স্বাভাবিক পরিবেশে। উপন্যাসের দ্বিতীয়াংশে সেকালের কলিকাতার লম্পটসমাজের ছবি যেমন ধরা পড়িয়াছে, তেমনি নূতন ভাবান্দোলনের একটি রেখাচিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। অবশ্য "সমাজ" উপন্যাসে চিত্রধর্মিতার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুকৌশলে গড়িয়া-তোলা গল্প প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। রমেশচন্দ্র শুধুমাত্র সমাজজীবনের ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি সমাজসংস্কারের ভূমিকাও কিছুটা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার "সংসার" উপন্যাসে বিধবাবিবাহ এবং "সমাজ" উপন্যাসে অসবর্ণবিবাহকে সোজাসুজি সমর্থন জানানো হইয়াছে। অবশ্য চরিত্র ও ঘটনার স্বাভাবিকতা নষ্ট করিয়া তাহা করা হয় নাই, ইহা লেখকের শিল্পবোধের প্রমাণ।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে সমাজ-সংস্কারের চিত্র

বঙ্কিমোত্তর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বস্তুধর্মী পারিবারিক চিত্রাঙ্কনে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলতা"র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ নরনারীর প্রাত্যহিক জীবনের সহানুভূতিস্পৃষ্ট এরূপ চিত্র উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে বড় দেখা যায় না। স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক উপন্যাসগুলিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত রূপ পাইয়াছে। তবে বহুক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক প্রধান

হইয়া উঠিয়া শিল্পরূপের হানি ঘটাইয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" উপন্যাসটির নাম এদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। গ্রামের শান্তছবি এবং সহরের বিচিত্র ধরনের উত্তেজনার মধ্যে পার্থক্যটি সুন্দর ভাবে তাঁহার উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মীর মশাররফ হোসেনের "গাজী মিঁয়ার বস্তানী" নামক উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে সমাজের বিচিত্র অনাচার ও সুবিধাবাদ সম্পর্কে ব্যঙ্গচিত্র। প্রাক্-বঙ্কিমযুগের নকশা, বঙ্কিমের কমলাকান্ত এবং মুচিরাম গুড়ের প্রভাব এই রচনাটির উপরে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে, লেখকের ব্যঙ্গরস বিশেষ উপভোগ্য।

বঙ্কিম-অনুজ কয়েকজন লেখক

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস-সাহিত্যে আদর্শবাদ লইয়া আসিলেন; কবিত্ব এবং তত্ত্বপ্রাধান্য তাঁহার উপন্যাসকে নূতন রূপ ও রসে মণ্ডিত করিল। তবে তাঁহার কয়েকটি গ্রন্থে সমাজচৈতন্যের গাঢ় প্রতিফলন দেখিতে পাই। বিশেষ করিয়া নাম করিতে হয় "চোখের বালি", "গোরা", "ঘরে বাইরে", "চার অধ্যায়" এবং "যোগাযোগের"। "শেষের কবিতা"য় আধুনিক অভিজাত সমাজের বুদ্ধিদৃপ্ত তির্যকরূপের কিঞ্চিৎ ছবি প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এ গ্রন্থ মূলতঃ রোমান্টিক সৌন্দর্য ও প্রেমব্যাকুলতার কাব্য। "চতুরঙ্গে"র জ্যাঠামশাইয়ের বিবরণে নব্য যুগভাবনার, বিশেষতঃ পজিটিভিষ্ট আচরণের প্রকাশ থাকিলেও আসলে এই গ্রন্থ আধ্যাত্মিক আত্মানুসন্ধানে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"তে সামাজিক সমস্যার এক নূতন দিকে দৃষ্টিপাত করা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র অবৈধ প্রণয়ের যে নিগূঢ় সমস্যাটিকে উপন্যাসে স্থান দিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"তে নবতম পর্যায়ে উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে কখনও কখনও সমাজনীতির দিক হইতে কিছু কিছু রক্ষণশীল প্রবণতা দেখাইয়াছেন। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা বিশ্লেষণমূলক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া সমালোচকেরা মনে করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে শুরু করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক ভাবাকাশটি খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গোঁড়াহিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদ, ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন এবং নব্য স্বাদেশিকতার উত্তেজনা এই উপন্যাসে যুগের একটি শিল্পসম্মত ছবি ধরিয়া রাখিয়াছে। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসটি সমকালীন স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। কিন্তু গোরার ন্যায় ব্যাপক সমগ্রতা এবং সুস্থ ভারসাম্য এখানে নাই। সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের ছবিটি এখানে ধরা পড়ে নাই। কবির মনের রঙে রঞ্জিত হইয়া উহার যে রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যে অনেকটা বিকৃত সন্দেহ নাই। ঔপন্যাসিক অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তাঁহার তীব্র বিরূপতা প্রকাশ করিয়াছেন বিকৃতস্বভাব অর্থ-

রবীন্দ্রনাথ

লোলুপ প্রণয়ব্যবসায়ী সন্দীপের চরিত্রের দ্বারা। আন্দোলন-বিরোধী নিখিলেশই কবির রচনায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে আদর্শ মানুষ। "চার অধ্যায়" উপন্যাসটিতেও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যে সব দিক দিয়া ব্যর্থ তাহাই দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের উপন্যাসগুলিতে ("শেষের কবিতা", "দুই বোন" প্রভৃতি) নব্য অভিজাতদের সমাজজীবনের একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সমাজচৈতন্য নানাভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। ঔপন্যাসিক দরদী শিল্পী। পরম স্নেহভরে জীবনের দিকে তাকাইয়াছেন এবং নীতিবোধ অপেক্ষা মানবহৃদয় যে শ্রেষ্ঠ সে-সম্পর্কে দ্বিধাহীন চিত্তে জীবনসমালোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের বড় গল্প এবং উপন্যাসগুলির মধ্যে

শরৎচন্দ্র

বাঙালীর পারিবারিক জীবন এবং পারিবারিক সমস্যা বড় সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। "পণ্ডিত মশাই", "বড়দিদি", "মেজদিদি", "বিন্দুর ছেলে", "অরক্ষণীয়া", "পল্লীসমাজ" প্রভৃতি রচনায় বাংলাদেশের গ্রামজীবন তাহার নানাবিধ সমস্যা লইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়িয়া বাংলা দেশের পল্লীজীবনের যে বাস্তব সুখদুঃখের লীলাভিনয় হইতেছিল, যে সব সমস্যা সমাজজীবনকে প্রতিনিয়ত কাঁটার মত বিঁধিতেছিল, তাহার প্রাণবন্ত ছবিটি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ধরা পড়িয়াছে। কুরূপা কন্যার বিবাহসমস্যা, ভাইয়ে-ভাইয়ে গৃহবিবাদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীবাসীর সংকীর্ণ ঘোট সৃষ্টি, একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন, বাল-বৈধব্য, বোষ্টম-সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, গ্রামে জলকষ্ট, চিকিৎসকের অভাব, মহামারী, অশিক্ষা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যেরূপ মমতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে এমনটি আর কোথাও নয়। সমাজচিত্রণের দিক হইতে চার পর্ব শ্রীকান্তের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। "শ্রীকান্ত" উপন্যাসে পশ্চিমের প্রবাসী বাঙালীগৃহ, বাংলার ম্যালেরিয়াজীর্ণ গ্রাম, বৈষ্ণবদের আখড়া, ব্রহ্মদেশের প্রবাসী বাঙালী সমাজ রূপবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ-চিত্রণে শুধু নয়, সমাজসমস্যার গভীরে প্রবেশ করায়ও তাঁহার উপন্যাস আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয় হইতেই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ্য করিবার মতো। শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় নীতিবাগীশের দৃষ্টিকোণে মানবজীবনের মূল্যবিচার অথবা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় নিরপেক্ষ বিশ্লেষণরীতি অনুসরণ করেন নাই। তিনি পরম মমতাভরে মানবজীবনের গভীরে দৃক্‌পাত করিয়াছেন। সমাজের নীতিবোধের দৃষ্টিতে যাহা স্খলন-পতন এবং অমার্জনীয় অপরাধরূপে গণ্য হয়, শরৎচন্দ্র তাহাকে সহানুভূতির সহিত দেখিতে চাহিয়াছেন। দেবদাসের জন্য, সুরেশের জন্য তিনি পাঠকের দুই কোঁটা অশ্রুভিক্ষা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে সমাজ একটা বাহিরের শক্তি নয়। বাহির হইতে মানুষের মুক্ত হৃদয়ের কামনাবাসনাকে উহা আঘাত করে না। সামাজিক মানুষের আচারে আচরণে বিশ্বাসে উহা তাহার

চিত্তবৃত্তির গভীরে বাসা বাঁধিয়া থাকে। উহা তাহার সত্তার, তাহার ব্যক্তিত্বের একটা অংশ হইয়া দাঁড়ায়। অথচ মানবপ্রাণের মুক্তির কামনাও অত্যন্ত তীব্র। সামাজিক সব বন্ধন লঙ্ঘন করিয়া উহা ব্যাকুল হইয়া উঠে চরিতার্থতার জন্য। এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব বাহিরে যতটা হয় তাহা অপেক্ষা অনেক গভীর হইয়া বাজিতে থাকে অন্তর্লোকে। ইহার সংঘর্ষে তাহার ব্যক্তিত্ব অবক্ষয়িত হইতে থাকে। শরৎচন্দ্রের বহু মুখ্য চরিত্রের ট্র্যাজেডির মূলে রহিয়াছে এই দ্বন্দ্ব। এই সুতীব্র বেদনা, এই অন্তহীন চিত্তজর্জর যন্ত্রণা মৃত্যু অপেক্ষা অনেক ভয়ানক। রাজলক্ষ্মী এবং শ্রীকান্ত উভয়ের চরিত্রে ইহার চমৎকার প্রকাশ ঘটিয়াছে। সাবিত্রী এবং কিরণময়ীও ইহার ভালো উদাহরণ। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে রাজনৈতিক ভাবনা বিশেষ প্রাধান্য পায় নাই। যদিও সে-যুগ রাজনৈতিক আন্দোলন-উত্তেজনার যুগ। সমাজশক্তিতে উহার ব্যাপক প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু "বিপ্রদাস" উপন্যাসে সামান্যতঃ এবং "পথের দাবীতে" মুখ্যতঃ এই সুর বাজিয়াছে। অন্যত্র ইহার চিহ্নমাত্র মেলে নাই। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার অস্পষ্ট উচ্ছ্বাসাতিরেকের প্রমাণ আছে শেষোক্ত উপন্যাসে। শিল্পকর্ম হিসাবেও উহা উল্লেখযোগ্য রচনা নয়। "শেষ প্রশ্নে" নব্যরীতির উৎকেন্দ্রিক সমাজজিজ্ঞাসার অস্পষ্ট চিত্রটিও লক্ষ্য করিবার মতো।

শরৎচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে প্রত্যক্ষ সমাজ-সচেতনতার পরিমাণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। অবৈধ প্রণয় ও সামাজিক বাধা বিষয়হিসাবে অব্যাহত প্রতাপে চলিতেছে। আধুনিক লেখকেরা ব সামাজিক বাধাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তির উল্লাস ও উদ্দামতাকেই জয়মাল্য দিতে চাহিতেছেন। তাহা ছাড়া রাজনৈতিক সামাজিক নানা বিধ গতিপ্রকৃতি একালের উপন্যাসে রূপ গ্রহণ করিতেছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বসংঘাত, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনা, আদর্শের সংঘাত সব-কিছুই আধুনিক উপন্যাসের পটভূমিরূপে গৃহীত হইতেছে। তবে কেহ কেহ এ বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা দেখাইতেছেন. দেশকালের ভূমিকাটিকে স্পষ্ট করিয়া তাহারই মধ্যে স্থাপন করিতেছেন ; কেহ আবার সমাজজীবনের সাম্প্রতিক জটিলতাকে চরিত্রকল্পনায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মার্ক্সবাদীরা চাহিতেছেন আধুনিক উপন্যাস সমাজ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হোক এবং তাহাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত ইতিহাসের অগ্রগতি, শ্রেণীসংগ্রামের প্রকৃতি উহাদের মধ্যে জীবন্ত ভাবে প্রতিফলিত হোক। উপন্যাসগুলি যেন ব্যাখ্যায় নিবৃত্ত না হইয়া পাঠকশ্রেণীকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াও তোলে। মার্ক্সবাদীদের এই দাবির মধ্যে অবশ্য অনেকখানি রাজনৈতিক প্রচারধর্মিতা রহিয়াছে।

আধুনিক উপন্যাসের প্রবণতা

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের রচনায় পূর্বোক্ত

ধারাগুলি কিভাবে কতটা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার পরিচয় লওয়া যাক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র আছে। বাস্তবের নগ্নতা আছে, দারিদ্র্য-দুঃখ আছে, চরিত্রের হীনতা তুচ্ছতা আছে। কিন্তু এক সুকুমার কল্পনার আলিম্পনে তিনি উহাকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। কোথাও পল্লীপ্রকৃতির বর্ণনা, কখনও নায়কের কবিজনোচিত কল্পনার রঙ, কখনও আরণ্যপ্রদেশের পটভূমি তাঁহার উপন্যাসকে ঠিক সমাজসচেতন হইয়া উঠিতে দেয় নাই। তাঁহার উপন্যাস জীবনকাব্য—শিল্পমূল্যে অনুপম, অলীক পদার্থ নয়,—কিন্তু আধুনিক কালে কোনো উপন্যাসকে আমরা যে-অর্থে সমাজসচেতন বলি, সে-অর্থে উহারা মোটেই সমাজচৈতন্যের বাহন নয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যো৷

তারাশংকর অত্যন্ত সমাজসচেতন শিল্পী। মার্কসবাদীদের প্রচারধর্মিতা হইতে তিনি মুক্ত এবং শিল্পসিদ্ধিতে তাঁহার সমাজভাবনা সার্থক। সমাজ ও জীবনের সর্বস্তরের ক্ষয়িষ্ণুতা তিনি দেখিয়াছেন। গ্রামীণ শ্রমজীবী জনসাধারণ তাঁহার উপন্যাসে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছে। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে শোষণমুক্ত কর্মী মানুষের ভূমিকার কথা তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান সামাজিক পটভূমিতে তাহাদের পঙ্গু জীবন আঁকিতে তাঁহার কুণ্ঠা নাই। কোনো কোনো উপন্যাসে তিনি কাহার, বেদে, ডোম প্রভৃতি এক একটা গোটা সমাজের চিত্র জীবন্ত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। তারাশংকরের উপন্যাসে আধুনিক ও নূতনের দ্বন্দ্বের জীবন্ত চিত্র আছে। দেশীয় জমিদারী প্রথার সহিত আসন্ন শিল্পযুগের সংঘর্ষের চিত্র এমন দরদের সহিত তিনি আঁকিয়াছেন, অন্যত্র যাহার তুলনা মেলা ভার। একান্ত আধুনিক রাজনৈতিক সমাজনৈতিক সমস্যাও তাঁহার উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়-বস্তুরূপে গৃহীত হইয়াছে।

তারাশংকর বন্দ্যো৷

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের উপন্যাসে বাস্তব সমাজজীবনচিত্রণ ও সামাজিক সমস্যার রূপায়ণ অপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছে আধুনিক সমাজচৈতন্যের প্রভাবজাত একটি সংশয়তীক্ষ্ণ বক্রদৃষ্টি। আধুনিক সভ্যতার বাহিরের আড়ম্বর ও পালিশের অন্তরে অন্তরে যে সর্বনাশা ঘুণ ধরিয়াছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীদৃষ্টিতে উহা ধরা পড়িয়াছে। সত্য-শিব-সুন্দরের যে অনেকটাই ভেজাল, বর্ণাঢ্য মুখোসের অন্তরালে যে রহিয়াছে কুশ্রী মুখাবয়ব, ঔপন্যাসিক তাহার চমৎকার রূপ রচনা করিয়াছেন প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে। তাঁহার শেষ দিকের উপন্যাসে সমাজচৈতন্য নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী হইয়া তিনি শ্রমিকদের জীবন এবং পুঁজিপতিদের শোষণের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার মধ্যে প্রচার বড় হইয়া

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উঠিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বহু স্থানে তাহা যে শিল্পরূপ লাভ করিয়াছে সেরূপাও স্বীকার করিতে হয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সমরেশ বসুর উপন্যাসে সমাজচৈতন্য কতকটা সাম্যবাদ-ঘেঁষা, তবে ইঁহাদের প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য রূপাস্বাদে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

উপসংহার

গোপাল হালদারের উপন্যাস কমিউনিস্টদের রোজনামচার মতো এবং শিল্পগুণভ্রষ্ট। বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিকৃত যৌনভাবনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন আধুনিক সামাজিক বিকৃতি ও নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়ায়। এবং একালের অনেক ঔপন্যাসিকই সস্তা রোমান্সের রাজ্যে পলায়ন করিয়া বেগম-বাঁদী-বাবু-বাদশাব কাহিনী লিখিতেছেন।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট স্থান

আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে নূতন সাহিত্যসৃষ্টি ইংরাজী সভ্যতা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে ঘটিয়াছে উনবিংশ শতাব্দীতে। মধ্যযুগে ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যসম্পদগুলির মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায় তাহা প্রধানতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য হইতে আগত এবং ভারতীয় ধর্মপ্রবণতার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি রূপে উত্থাপিত। নব্যযুগে ইংরাজ শাসনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনজীবনধারায় মোটামুটি সাদৃশ্য দেখা দিয়াছে; ফলে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যেও নানা ধরনের ঐক্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় আধুনিক সাহিত্যগুলির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের স্থান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কারণ বাংলা সাহিত্য এদেশের অন্যান্য প্রাদেশিক

ভূমিকা

ভাষাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষার সংস্পর্শে আসিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ ঘটিয়াছে সর্বাগ্রে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকেই (ষষ্ঠ দশকে) মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মহৎ শিল্পগুণের অধিকারী শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এবং বিংশ শতাব্দীতে পা দিতে দিতেই রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিশ্ববরেণ্য শিল্পী বাংলা ভাষায় আবির্ভূত হইয়াছেন। এই কারণে দেখা যায়, ভারতের অধিকাংশ ভাষায় নব্যসাহিত্যের জন্ম ঘটিয়াছে বাংলা সাহিত্যের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করিয়া। ইংরাজী সাহিত্য যেমন বাংলার নব্যসাহিত্যের উৎসে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেইরূপ বাংলা সাহিত্য অপরাপর প্রাদেশিক সাহিত্যের উৎসে প্রভাব সংক্রামিত করিয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত না হইলে শুধু অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দি প্রভৃতি প্রতিবেশী সাহিত্যই নয়, সুদূর তেলেগু, মারাঠী সাহিত্যেরও বিকাশ বিলম্বিত হইত। আধুনিক প্রাদেশিক সাহিত্যের কোন কোন পণ্ডিত-গবেষক বাংলা সাহিত্যের

এই ঋণের কথা শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করেন ;যেমন ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য-সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে বলা হইয়াছে : "পশ্চিমীয়া লিখা আমার দেশলৈ নিজরি আহে যাই কৈ ইংরাজী ভাষায় জরিয়তে। কাজেই নতুন ধরনর এই লিখাই প্রতিভাবান বাঙালী লিখকসকলকো উদ্বুদ্ধ করিলে। আমার দেশত প্রভাব আছে বাংলারো, ইংরাজীরো।" হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে এস. এইচ. বাৎস্যায়নও স্বীকার করিয়াছেন : "Hindi assimilated the influences of the renaissance in Bengali directly and through translations." আবার কেহ কেহ এই প্রভাবকে অশুভ বলিয়া মনে করেন। ইহা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টাকেই গৌরব দান করিতে চান। ফকিরমোহন সেনাপতির সাহিত্যমূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া অধ্যক্ষ মায়াধর মানসিংহ মন্তব্য করিয়াছেন : "The fact that in addition to being a great creative writer, Fakirmohan in his early youth was the spearhead of the resistance against the Bengali cultural and linguistic dominance and helped to revive his mother-tongue, has naturally secured for him a unique place in Oriya literature." বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে প্রভাবে ও আদর্শে ওড়িয়া সাহিত্যের নবজীবনায়ন, তাহাকে বেশ বিকৃত ভাবেই এখানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতিরিক্ত এবং উগ্র প্রাদেশিক মনোভাবের জন্য যদি কেহ স্বীকার নাও করেন, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলির ইতিহাস অনুসরণ করিলেই তাহার দেহে বাংলা সাহিত্যের প্রভাবের চিহ্ন দেখা যাইবে।

ওড়িয়া সাহিত্যের নবজন্ম হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাধানাথ রায়, মধুসূদন রাও এবং ফকিরমোহন সেনাপতির সাধনায়। রাধানাথ রায় ছিলেন উড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙালী। অমিত্রাক্ষর ছন্দে "লেখাবলী" নামক এক বাংলা কাব্য তাঁহার প্রথম রচনা। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে ইনি ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টিতে অগ্রসর হইলেন। প্রকৃতি-বিষয় লইয়া রচিত কয়েকটি কাব্য বিশেষ সাফল্যলাভ করিলেও তাঁহার খ্যাতি বিশেষ করিয়া নব্য ভাবকল্পনা এবং রূপরীতি সৃষ্টি করায়। অসমাপ্ত "মহাযাত্রা"ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ওড়িয়া ভাষায় তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পুরাতন কাহিনীর মধ্যে তিনি আধুনিক মানবতা ও ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উপরে মধুসূদন দত্ত এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবল প্রভাব দেখা যায়। মধুসূদন রাও মাইকেল মধুসূদনের বাংলা চতুর্দশপদীর আদর্শে ওড়িয়া ভাষায় সনেটের প্রবর্তন করেন। প্রথম শিশুপাঠ্য ওড়িয়া কবিতারও রচয়িতা তিনি। প্রথম সার্থক ওড়িয়া লিরিক কবিতা প্রণয়ন করেন মধুসূদন রাও। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হিসাবে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলির মধ্যে হেমচন্দ্রের উত্তেজনার কিছু সুর যেন

ওড়িয়া সাহিত্য

শোনা যায়। ফকিরমোহন সেনাপতি আধুনিক ওড়িয়া কথাসাহিত্যের জনক। সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনী, গ্রাম্য নরনারীর বাস্তব জীবনের রূপ তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে জীবন্ত রূপ ধারণ করিয়াছে। বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শের প্রভাব তাঁহার উপরে পড়িয়াছিল। তাঁহার জীবনচরিত ফকিরমোহন ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির বাস্তব-ধর্মী সামাজিক উপন্যাসের প্রভাব ছিল তাঁহার উপরে। বঙ্কিমের ভাষার ছন্দ অনুসরণ দেখা যায় তাঁহার বহু উপন্যাসে, যদিও একেবারে স্বতন্ত্র পথ ধরিয়া তিনি অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন। ওড়িয়া সাহিত্যের এই তিন প্রধানের প্রভাব দীর্ঘকাল তাঁহাদের সাহিত্যে বহমান ছিল। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে যুদ্ধোত্তর বিদেশী সাহিত্যের সাধারণ প্রভাবে এবং রবীন্দ্রকাব্য ও প্রমথ চৌধুরীর "সবুজ পত্রের" প্রভাবে "সবুজ আন্দোলন" নামে একটি সাহিত্য আন্দোলন দেখা দেয়। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, অন্নদাশংকর রায়, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, হরিহর মহাপাত্র এই দলভুক্ত ছিলেন। এছাড়া শচী রাউত রায় কবিতার বিষয় ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে নজরুলের এবং অশ্বিনীকুমার রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাব স্পষ্টতঃ অনুভব করা যায়। তাহা ছাড়া রাজনৈতিক ঐতিহাসিক পরিবেশের ঐক্য আধুনিক ওড়িয়া ও বাংলা সাহিত্যে সমান্তরাল ধারার সৃষ্টি করিয়াছে।

অসমীয়া সাহিত্য

নব্য অসমীয়া সাহিত্যের উদ্ভবের পশ্চাতেও বাংলা সাহিত্যের গুরুতর প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না। কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কয়েকজন অসমীয়া তরুণ নূতন বাংলা আর ইংরাজি সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া কলিকাতা হইতেই অসমীয়া পত্রিকা "জোনাকি" বাহির করিলেন। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যে নবযুগের স্রষ্টা এই পত্রিকাটি। প্রচলিত ধ্যানধারণার স্থানে নূতন জীবনদর্শন ও নূতন মূল্যবোধের রূপায়ণে "জোনাকি" সাহিত্যজগতে বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়া "জোনাকি" আসামের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নূতন সাহিত্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিল। সাহিত্যকে এই প্রথম ধর্মের প্রভাবমুক্ত করিয়া মানবতার বাণীতে এবং শিল্পসৌন্দর্যে মহিমান্বিত করিয়া তোলার চেষ্টা হইল। জোনাকি-গোষ্ঠীর তথা নব্য অসমীয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা এবং হেমচন্দ্র গোস্বামী। এই তিনজনের রচনায়ই রোমান্টিক মনোভাব চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে। লক্ষ্মীনাথের সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল বহুমুখী। পরবর্তী বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে ভোলানাথ দাস মধুসূদনের ন্যায় দৈব-বাদের বিরোধিতা করেন, তাঁহার কাব্যে ব্যক্তিমহিমার জয় ঘোষণা করেন। অসমীয়া ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন তিনিই। হেমচন্দ্রের আদর্শে উত্তেজনাপূর্ণ দেশপ্রেমমূলক কবিতাও লিখিয়াছিলেন। নলিনীবালা দেবী প্রকৃতিবাদী কবি:

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার উপর প্রবল ভাবেই পড়িয়াছিল। প্রথম দিকের ঔপন্যাসিক পদ্মনাথ গোহাঞী বড়ুয়ার ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের উপরে স্কট এবং বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। বিংশ শতকের সামাজিক উপন্যাসের লেখক দৈবচন্দ্র তালুকদার এবং দণ্ডীনাথ কলিতার রচনায় শরৎচন্দ্রের প্রভাবে নারী-চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা দেখা যায়।

হিন্দি সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে বাঙালী মনীষিগণের প্রত্যক্ষ দানের কথা বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয় যে, আধুনিক হিন্দি সাহিত্য যে বাংলার বহু পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে এবং মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া ছোট বড় প্রায় প্রত্যেকটি হিন্দিলেখকই যে বাংলা সাহিত্যের নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াছে, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে বাংলা সাহিত্যের অনুকরণ করিয়াছেন, উগ্র হিন্দি-দরদীরা অস্বীকার করিলেও উহা বাস্তব সত্য। তাহাই শুধু নয়—আধুনিক হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে বাঙালীর দানও সমাগ্রগণ্য। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের হেডমুন্সী তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রামমোহন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম এদিক দিয়া বিশেষ স্মরণীয়। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৭২ সালে হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার আবশ্যকতার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন ঐ একই মতাবলম্বী। বাংলার বাহিরে হিন্দির পক্ষে এক প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তোলেন পাঞ্জাবের শিক্ষা-বিভাগের বাঙালী কর্ণধার নবীনচন্দ্র রায়। ইঁহাদের চিন্তাধারায় যে ভুল ছিল আধুনিক বাঙালী ও অহিন্দিভাষী ভারত তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিবে। কিন্তু ইঁহাদের উদারতার কথা ভোলা সহজ নয়। ১০৫৪ সালে প্রথম হিন্দি দৈনিক (দ্বিভাষিক) "সমাচার সুধাবর্ষণ" প্রকাশিত হয় শ্যামসুন্দর সেন নামক জনৈক বাঙালীর সম্পাদনায় এই কলিকাতা মহানগরী হইতেই। হেমন্তকুমারী দেবী নাম্নী জনৈকা বাঙালী নারী প্রথম হিন্দি মহিলাপত্রিকা "সুগৃহিণী" প্রকাশ করেন ১৮৮৮ সালে পাঞ্জাব হইতে। প্রাক্-ভারতেন্দু যুগের শ্রেষ্ঠ দুটি হিন্দি পত্রিকা "বনারস অখবার" এবং "সুধাকর"-এর সম্পাদক ছিলেন বাঙালী তারামোহন মিত্র। আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের জন্ম ইংরাজী প্রভাবের ফলে এবং সে প্রভাব গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়িয়াই আসিয়াছে বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে। এবিষয়ে বিখ্যাত হিন্দি লেখক সাংকৃত্যায়ন লিখিয়াছেন: "From Harischandra's time to the end of the nineteenth century the influence of English had generally been imbibed through Bengali……" ভারতেন্দু হরিশচন্দ্রের রচনাবলী, বিশেষ করিয়া নাটকগুলি বাংলা নাটকের প্রথম যুগের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। হিন্দি সাহিত্যিক গদ্যের আদর্শটি সুস্থির হইয়া উঠিল মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর হাতে। দ্বিবেদী ইংরাজী এবং বাংলা এই দুই গদ্যরীতির সাহায্য সচেতন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার

হিন্দি সাহিত্য

অনুবাদগ্রন্থগুলির একটি বড় অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে বাংলা বই। এই পর্বের বিশিষ্ট কবি অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায় মধুসূদন দত্তের আদর্শে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রার পৌরাণিক কাহিনীকে নূতন মানবিক ব্যাখ্যা দিয়া নব্যকাব্য গড়িয়া তুলিলেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত। বাংলা কাব্যসাহিত্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মধুসূদনের মহাকাব্যের অনুবাদ করিয়া ইনি খ্যাতি অর্জন করেন। ইঁহার জাতীয়তা-উদ্বোধক সুরটির উপরে হেমচন্দ্রের কবিতার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। হিন্দি কাব্যসাহিত্যে ছায়াবাদী আন্দোলনের জন্ম হয় বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে। ইহার উপরে রবীন্দ্রকাব্যধারার গুরুতর প্রভাব রহিয়াছে। এই ধারার সব কবিই ভাবকল্পনা, ভাষাব্যবহার, প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাংলা রোমান্টিক গীতিকবিতার ধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। বিশেষ করিয়া সুমিত্রানন্দন পন্থ এবং নিরালার গীতি-কবিতায় বাংলা কবিতার প্রভাব এত বেশী যে উগ্র হিন্দিপ্রেমী সমালোচকেরাও তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। হিন্দি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনজীবনচিত্রণে প্রেমচন্দ প্রভৃতি বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে ঐতিহাসিক রোমান্স এবং শরৎচন্দ্রের আদর্শে সামাজিক উপন্যাস অনেকে লিখিয়াছেন। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের রীতিনীতিও খুবই অনুসৃত হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকার শ্রীনিবাস দাস, রাধাকৃষ্ণ দাস প্রভৃতির ঐতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের এবং পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের অনুসরণ প্রবল ভাবে চলিয়াছে।

সুদূর মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাদের সাহিত্যের উপরেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রভাব পড়িয়াছে। মহারাষ্ট্রের উপন্যাস ও নাট্যসাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের গভীর প্রভাব লক্ষণীয়। মামা ওয়ারেকর ঐতিহাসিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্র-লালের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি

মারাঠী সাহিত্য

তিনি মারাঠীতে অনুবাদ করেন। বঙ্গদেশের পটভূমিকায় রচিত তাঁহার নাটকগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হরিনারায়ণ আপ্তের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসেই প্রথম মারাঠী উপন্যাসের ভিত্তি স্থাপিত হইল। উহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে সৃষ্ট। সাভারকর, গণেশ বস্তু, কুসুমাগ্রজের কবিতায় হেমচন্দ্র-সুলভ জাতীয়তাবাদের সুর উচ্চকণ্ঠে বাজিয়াছে। আধুনিক কবিদের মধ্যে দেহবাদী কবি রেগের সহিত মোহিতলালের তুলনা করা চলে।

আধুনিক গুজরাতি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক উমাশংকর যোশী রবীন্দ্রভাবধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। সমকালীন কবি জভেরচন্দ রবীন্দ্রকাব্যের গুজরাতি

গুজরাতি সাহিত্য

অনুবাদ প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অতি আধুনিক কবিদের মধ্যে রাজেন্দ্র সাহ ও নিরঞ্জন ভগৎ আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, তবে অন্ধ অনুকারক নন। গুজরাতি সাহিত্যের প্রথম যুগের ঔপন্যাসিক মহিপৎ রাম এবং নন্দশংকর বঙ্কিম এবং স্কটের ইতিহাসাশ্রিত

উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট এমন কোনো বাঙালী লেখক নাই যাহার রচনার গুজরাতি অনুবাদ হয় নাই।

তেলেগু সাহিত্য

অন্ধ্রের নবজাগরণে বাংলার ভূমিকাই প্রধান। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অন্ধ্রের আত্মোপলব্ধিতে যেমন সহায়তা করিয়াছে, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ হইতে প্রেরণা সঞ্চয় করিয়াই আধুনিক তেলেগু সাহিত্যের অগ্রগমন আরম্ভ। রবীন্দ্রপ্রভাবের সূচনা করেন সুব্বারাও তাঁহার কবিতার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রাদর্শে এক নূতন সাহিত্যান্দোলনেরও সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রধারার গীতিকবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হইলেন বেঙ্কট পার্বতীশ্বর এবং রামকৃষ্ণ রাও। নোরি নরসিংহ শাস্ত্রী এবং উন্নব লক্ষ্মীনারায়ণ ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনা করিয়া তেলেগু উপন্যাসের ভিত্তি স্থাপন করেন। বঙ্কিমের উপন্যাসের তেলেগু অনুবাদের দ্বারা ইঁহারা প্রভাবিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

কানাড়ী সাহিত্য

ঐতিহাসিক রোমান্সই কানাড়ী সাহিত্যের প্রথম যুগের কথাসাহিত্যের সম্পদ-রূপে গণ্য ছিল। বি বেঙ্কটচর এবং গালাগানাথের উপরে বঙ্কিমের প্রভাব রহিয়াছে। আধুনিক কানাড়ী কবিতার যাদুকর নামে খ্যাত ডি. আর. বেন্দ্রে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রভাবকে আমন্ত্রণ করেন কানাড়ী সাহিত্যের বুকে।

তামিল সাহিত্য

প্রাচীন ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ তামিল সাহিত্যের আধুনিক নবজন্মের পশ্চাতেও রহিয়াছে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর তামিল অনুবাদ তামিলনাদে খুবই জনপ্রিয়। কুমারস্বামীর ভূমিকা এই দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে মুদলিয়রই বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারেন। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের লেখক "কল্কি" (কৃষ্ণমূর্তি) বঙ্কিমের দ্বারা প্রভাবিত। তামিল সাহিত্যের নবযুগের জনক সুব্রহ্মণ্য ভারতীও টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

মালয়ালম কবিতা

মালয়ালী পণ্ডিত উক্ত সাহিত্যের উপর বাংলা কাব্যের বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা উচিত :…"the Gitanjali of Rabindranath Tagore came to the notice of the people of Malabar when the great poet was awarded the Nobel Prize, and his famous poem was made available in English. Soon his other poems also became accessible to the people in a language known to them. This was the turning point in the history of contemporary Malayalam poetry."

নিকট প্রতিবেশী অথবা দূর অঞ্চলবাসী ভারতীয় ভাষাগুলির প্রতিটির ক্ষেত্রে

তথা সাহিত্যে-বাংলা সাহিত্য গুরুতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই ঐতিহ্যগর্ব বাঙ্গালী সাহিত্যকর্মীদের যদি আপনাদের উন্নত শিল্পমানরক্ষায় এবং উন্নয়নে উৎসাহিত করে, তবেই তাহা কল্যাণকর হইবে।

উপসংহার

যদি বাঙ্গালী এই গৌরব ভাবিয়া তরল উল্লাসে আত্মহারা হয়, তবে অন্য প্রদেশবাসীর নিকট হইতে প্রাপ্য সম্মানটুকু পাইবে না। বাংলা সাহিত্য ঐতিহাসিক গুরু দায়িত্ব পালন করিয়াছে, আধুনিক সাহিত্যকে ভারতীয় ভাষাসমূহের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছে। শিল্পগুণে উৎকৃষ্ট হইলে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও বাংলা সাহিত্যের অনুকারকের অভাব হইবে না। কিন্তু আত্মগর্বে স্ফীত হইলে পরাপর ভাষাভাষীর জাতীয় বোধে অন্যায় ভাবে আঘাত করা হইবে। তাহা ছাড়া অপরাপর সাহিত্যের মধ্য হইতে গ্রহণের যোগ্য যে সব বস্তু আছে তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

পরিশিষ্ট

আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধরচনার সংকেত-সূত্র

[এক] অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সহিত উহার পার্থক্য।

উত্তর-সংকেত : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' খণ্ডে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্তর্গত প্রশ্ন ১-এর ও আধুনিক যুগের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্ন ১-এর উত্তরাদি দ্রষ্টব্য।

[দুই] বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব।

উত্তর-সংকেত : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-খণ্ডে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্তর্গত প্রশ্ন ৭-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

[তিন] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যের স্থান।

উত্তর-সংকেত : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' খণ্ডে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্তর্গত প্রশ্ন ৬, ১২, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮-এর উত্তরাদি দ্রষ্টব্য।

[চার] চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের রূপরেখা।

উত্তর-সংকেত : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-খণ্ডে প্রশ্ন ৮ ও ৯-এর উত্তরাদি দ্রষ্টব্য।

[পাঁচ] বৈষ্ণব কবিতার ক্রমবিকাশ—চৈতন্যপূর্ব কাল হইতে শুরু করিয়া চৈতন্যোত্তর কাল অবধি।

উত্তর-সংকেত : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-খণ্ডে প্রশ্ন ৪-এর এবং 'সাহিত্য-তীর্থে'র অন্তর্গত 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী'র অথবা 'সাহিত্যের তীর্থপথে' ১ম পর্বের অন্তর্ভুক্ত 'বৈষ্ণব পদাবলী'র বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

[**ছয়**] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ কাব্যধারার স্বরূপপ্রকৃতি।

উত্তর-সংকেত ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-খণ্ড প্রশ্ন ৫ ও ১১-এর উত্তরাদি দ্রষ্টব্য।

[**সাত**] বৈষ্ণব পদাবলী এবং শাক্ত পদাবলী ঃ ধর্মগত প্রেরণা ও শিল্পমূল্যের অবধারণা।

উত্তর-সংকেত ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-খণ্ডে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্তর্গত প্রশ্ন ১০ ও ১৯-এর উত্তরাদি এবং 'সাহিত্যের তীর্থপথে' প্রথম পর্বের 'বৈষ্ণব পদাবলী' ও 'শাক্ত পদাবলী' প্রসঙ্গের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

[**আট**] বাংলা গদ্যরীতির ক্রমবিকাশ।

উত্তর-সংকেত ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-খণ্ডে আধুনিক যুগের অন্তর্গত প্রশ্ন ২ ও ৩-এর উত্তরাদি দ্রষ্টব্য।

[**নয়**] বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ধারা এবং বিভিন্ন প্রবণতা।

উত্তর-সংকেত ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-খণ্ডে আধুনিক যুগের অন্তর্গত প্রশ্ন ৫-এর উত্তর এবং 'সাহিত্যতীর্থের' অন্তর্গত 'সমালোচনা-সাহিত্য' অথবা 'সাহিত্যের তীর্থপথে' ১ম পর্বের অন্তর্গত 'সমালোচনা-সংগ্রহ' পুস্তকের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

[**দশ**] বাংলা নাটকের জন্ম এবং গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত ক্রমবিকাশ : সংস্কৃত রীতি, ইংরাজী রীতি এবং যাত্রারীতির প্রভাব।

উত্তর-সংকেত ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' খণ্ডে আধুনিক যুগের অন্তর্গত প্রশ্ন ৬ ও ৭-এর উত্তরাদি দ্রষ্টব্য।

[**এগারো**] বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ।

উত্তর-সংকেত ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' খণ্ডে আধুনিক যুগের অন্তর্গত প্রশ্ন ৯, ১০, ১১ ও ১৪-এর উত্তরাদি দ্রষ্টব্য।

[**বারো**] বাংলা মহাকাব্যের গতিপ্রকৃতি।

উত্তর-সংকেত ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' খণ্ডে আধুনিক যুগের অন্তর্গত প্রশ্ন ১২-র উত্তর দ্রষ্টব্য।

[**তেরো**] বাংলা গীতিকবিতার ক্রমাভিব্যক্তি।

উত্তর-সংকেত ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-খণ্ডে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্তর্গত প্রশ্ন ১০-এর এবং আধুনিক যুগের অন্তর্গত প্রশ্ন ১৬-র উত্তরাদি দ্রষ্টব্য।

UNSEEN ঃ POETRY

ভাবপরিস্ফুটন ও কাব্যোৎকর্ষবিচার

॥ এক ॥

কবি বলে, 'যাত্রি আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বরবরমালা-সাথে, দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা
মন্দির-অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকরপাঁতি,
গেছে উড়ি মর্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।
                                        আমি তব সাথি,
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশিরসিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা—মোর সুচিরসঞ্চিত
অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে,
সমর্পিব নির্বাকের নির্বাণবাণীর হোমানলে।'

ক. বি. বি. এ. (প্রথম পর্যায়)

উত্তর ঃ কবির চিরন্তন সৌন্দর্যকামনা এই কাব্যাংশে আশ্চর্যসুন্দর বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছে। জীবনে যে সব অচরিতার্থ আশা, অপূর্ণ কামনা প্রতিদিন বিক্ষুব্ধ করিতেছে হৃদয়তল, তাহা যেন এক কল্পলোকে মূর্তি ধারণ করিয়া আছে। জীবনে বস্তুময়তা বিশুদ্ধ প্রেম, আনন্দ ও সুন্দরের সাধনাকে প্রতিমুহূর্তে করিতেছে লাঞ্ছিত। প্রাত্যহিক ক্ষুদ্রতা, স্বার্থমগ্নতা কামনার অসীমাভিমুখী ডানাকে আহত ও শক্তিহীন করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু তবুও কবিচিত্ত মরিয়া যায় না, মৃত্তিকাচারী সরীসৃপ-বৃত্তিতে লীন হয় না। অনন্তের বাসনা তাঁহার কল্পনায় কাম্যজগৎ সৃষ্টি করে ভাষায় ছন্দে।

আলোচ্য কবিতাংশে সেই কাম্যজগৎ যেন মূর্তি ধারণ করিয়াছে রাত্রির অসীমতায়, মহাশূন্যের নক্ষত্রখচিত প্রাঙ্গণে। হারাইয়া-যাওয়া প্রিয়বান্ধবের দল, স্খলিত সার্থকতা, না-পাওয়া বাসনা—সব প্রতীক্ষা স্তব্ধ হইয়া আছে অনন্তের প্রাঙ্গণে।

রাত্রের যে স্বপ্ন প্রভাতের তীক্ষ্ণ আলোয় মুছিয়া যায়, জাগিয়া থাকে শুধু বিচ্ছেদের বেদনা, সেই স্বপ্ন কি অনন্তের মধ্যে স্থান করিয়া লয় নাই? জীবনের অসমাপ্ত সংগীতগুলি লইয়া সেই মহামৌন কাম্যলোকে মৃত্যুদ্বার দিয়া কবি প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

আলোচ্য কবিতাংশে রোমান্টিক সৌন্দর্যকামনার সহিত কবির অনন্ত চেতনার চমৎকার মিলন ঘটিয়াছে। কবির এই ভাবকল্পনা যেমন গভীর তেমনি অকারণ। বস্তুবোধের সহিত উহার সম্পর্কমাত্র নাই। বাস্তব প্রাপ্তির দ্বারা উহার বিচার করা যায় না। কারণ,—ঐ কামনা অস্পষ্ট এবং রহস্যমণ্ডিত, উহার সহিত কোনোদিনই মিলন ঘটিতে পারে না। আসলে ঐ কামনা এবং ঐ বিচ্ছেদ দুই-ই একান্ত কাল্পনিক। কিন্তু কাল্পনিক বলিয়া উহা মিথ্যা নয়। কবির নিকট তাঁহার কল্পলোক মোটেই অর্থহীন, মূল্যহীন নয়। উহার মধ্যেই তাঁহার গভীর সত্তার আলোড়ন।

কবির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি প্রগাঢ়। ভাষা কোথাও তরল ও প্রগল্‌ভ হইয়া পড়ে নাই। বিশেষ করিয়া আঠারো মাত্রার চরণ গঠন করায় কোথাও লঘুতা প্রশ্রয় পায় নাই। কিন্তু কবির কামনার তীব্রতা ভাষায় চমৎকার রূপ ধারণ করিয়াছে। অনন্তের প্রাঙ্গণে যে অচরিতার্থ কামনা রূপ ধারণ করিয়া আছে, তাহাকে কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্তিতে রঙে রেখায় গন্ধে স্পর্শে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অথচ মহাকাশব্যাপ্ত গাম্ভীর্য তাহাকে একান্ত লৌকিকতার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে।

॥ দুই ॥

তব পাঠগৃহ-লগ্না চামেলীর লতা
প্রতিদিন ফুটাইছে ফুল নব নব,
মধুর সৌরভস্নাত, শুভ্র ও পেলব,
তাহার জীবনে নাই কোন ব্যাকুলতা,
অঙ্গে থাক ক্ষতচিহ্ন, ঢেকে রাখে ব্যথা
কাটিবার ছাঁটিবার, গৃহমাঝে তব
ছড়ায় সুরভিশ্বাস। আমি কবে হব
ব্যথায় নীরব নম্র, পুষ্পভার-নতা?
প্রতিদিন দীপ্ত রবি ক্ষত প্রাণখানি
করিবে কিরণস্নাত; বিনত এ শিরে
বহি যাবে বর্ষা বায়ু; অমৃতের বাণী
কভু উচ্চৈঃস্বরে, কভু অতি ধীরে ধীরে

স্নদূর সাগর হ'তে দিবে মোরে আনি,
আমিও আনন্দগন্ধ দিব ধরণীরে ?

ক. বি. বি. এ. (প্রথম পর্যায়)

উত্তর ঃ 'কবি চামেলীফুলের ন্যায় স্নিগ্ধ সৌন্দর্যটি নিজের জীবনে কামনা করিতেছেন। উহার মধুর গন্ধটি কিছুতেই ঢাকা পড়ে না। উহার পেলব শুভ্র সৌন্দর্যটি কখনও ম্লান হয় না। সংসারের কত বাধা অতিক্রম করিয়া ঐ সৌন্দর্য ফুটাইতে হয়, ঐ সৌরভ বিলাইতে হয়। বাস্তব পৃথিবীর কত আঘাত, কাটিবার ছাঁটিবার কত রকম ব্যথাই তাহাকে সহ্য করিতে হয়, কিন্তু সে-ই সব-কিছু অনায়াসে সহ্য করে, বাহিরে প্রকাশ পর্যন্ত করে না। আঘাত ও যন্ত্রণা বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া সে গন্ধ, বর্ণ, শোভা বিতরণ করে। যাহা পায় নাই তাহার জন্য কোনোরূপ ব্যাকুলতায় সে অস্থির নয়। যাহা আছে তাহাই শতধারে সে বিলাইয়া দিতেছে।

কবিও জীবনের সব আঘাত, সব বেদনার ঊর্ধ্বে আপনাকে উন্নীত করিয়া শোভা আনন্দ বিতরণ করিবেন ধরণীর বুকে—ইহাই তাঁহার একান্ত কামনা। প্রকৃতির স্বাভাবিক উৎস হইতে তিনি শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করিবেন। সূর্যকিরণ তাঁহার অন্তরকে দীপ্ত করিবে, বর্ষাবায়ুর সজল স্নিগ্ধতা সহজ নম্রতায় তাঁহাকে অভিষিক্ত করিবে। বিশ্বের মর্মকোষ হইতে উদ্ভূত অমৃতের বাণী উদ্‌বুদ্ধ করিবে তাঁহার চিত্ত। প্রকৃতির দানে পূর্ণ হইয়া প্রকৃতিকে তিনি কাব্যসৌন্দর্যের স্বাদ দিবেন।'

সনেটের আকারে লেখা কবিতাটির স্বাদ মৃদু ধরনের। বর্ণ-গন্ধ-স্বরে তীব্রতা নাই। কোথাও যেন উজ্জ্বল বর্ণবিলাস দেখা যায় না। তুলনামূলক ভাবে এখানে বড় হইয়া উঠিয়াছে প্রশান্ত শুভ্রতা। কবিতার কল্পনা এবং ভাষারীতি ঐকতানে বাজিয়াছে—মৃদু শান্ত নম্রতায়। কবিতাটির মধ্যে চামেলীফুলের সঙ্গে উপমা দিবার চেষ্টাটিই যেন প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। অথচ তাহা অপরিহার্য হইয়া কবিতার আত্মার অঙ্গ হইয়া পড়ে নাই। কবিতার শেষাংশই প্রধান, তবুও উহা অনেকটা বিবৃতিধর্মী। বিবৃতিধর্মী বলিয়াই তাহাকে কাব্যরূপ দিবার চেষ্টায় কবি প্রথমাংশে চামেলীফুলের প্রসঙ্গটি তুলিয়াছেন। কিন্তু উহা অনিবার্য হইয়া উঠে নাই, শেষাংশের বিবৃতিধর্মকে পরিবর্তিতও করিতে পারেন নাই তিনি

।। তিন ।।

খুলে দাও দ্বার,
নীলাকাশ করো অবারিত ;
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ ,

প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায় ;
আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ;
এ প্রভাত
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক মোর মন
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্প শ্যামল প্রান্তর।
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে
তারি পুণ্য-অভিষেকে করি আজি স্নান।
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহাররূপে
দেখি ওই নীলিমার বুকে।

ক. বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পর্যায়)

উত্তর : কবির কণ্ঠে জীবনপ্রেমের, মর্তপ্রীতির এক বিচিত্র মধুর সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। কবি বাহির-বিশ্বের সহিত আপনার অন্তরকে মিলাইতে চাহিয়াছেন। নীলাকাশের মুক্তি তাঁহার চোখের সম্মুখে আজ খুলিয়া যাক। বদ্ধ মনের দরজা উদ্ঘাটিত করিবার জন্য কবি আজ সমুৎসুক। প্রকৃতির রূপরসগন্ধবর্ণ-স্পর্শকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া তিনি আজ ভোগ করিতে চাহিতেছেন। বাহিরে পুষ্প-গন্ধ যেন তাঁহারই জন্য তাঁহার কক্ষে প্রবেশার্থে পরম আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। প্রথম রৌদ্রের আলো তিনি আপনার সর্বদেহ দিয়া, প্রতিটি রোমকূপের মধ্য দিয়া অন্তরের গভীরে টানিয়া লইতে চান। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে কবিহৃদয়ের এই যে আনন্দের যোগ, তাহার মধ্যেই তিনি অনুভব করেন প্রাণের মহামন্ত্র। প্রভাতের প্রসন্ন আলো পরম প্রীতিভরে যেন কবির মন ঢাকিয়া দিতেছে। পল্লবের মর্মরে মর্মরে কবি যেন শুনিতেছেন তাঁহারই অভিনন্দনের বাণী। কবির বাঁচিয়া থাকিবার আনন্দ-উপলব্ধি প্রকৃতির রূপরসগন্ধবর্ণস্পর্শের মধ্যে যেন হিল্লোলিত হইতেছে। জীবনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া কবি আজ বিশ্বপৃথিবীর সহিত তাঁহার দীর্ঘস্থায়ী সম্বন্ধের বিচার করিতেছেন। তিনি জীবনে লাভ করিয়াছেন মানবের ও প্রকৃতির নিবিড় ভালোবাসা। আজ বিদায়ের মুহূর্তে আকাশে বাতাসে সেই ভালোবাসারই শব্দহীন ভাষা শুনিতেছেন কবি। সেই প্রীতিধারায় স্নান করিয়া জীবনে যে পুণ্যময় অভিষেক তিনি লাভ করিতেছেন, তাহার মূল্য কবির কাছে অপরিসীম। জীবনের প্রেমসত্য

একটি রত্নহারের মতো বিশ্বের আকাশে—অসীমের দ্যোতনায় যেন বিস্তৃত। সীমাবদ্ধ জীবনসত্য এমনি করিয়াই হইয়া উঠিয়াছে সীমাতীত।

কবিতাটির মধ্যে বিশ্বপ্রেমের সুগভীর প্রত্যয় পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। রচনারীতিতে এবং কল্পনায় জীবন-বিদ্ধ-করা মহাপ্রজ্ঞা যেন মূর্তিলাভ করিয়াছে, কিন্তু প্রণয়াবেগে উহা হিল্লোলিত মর্মরিত কম্পিত স্খলিত বিকিরিত বিচ্ছুরিত নয়। যৌবনের রক্তবেগতরঙ্গ মর্ত্যপ্রেমের মধ্যে 'উচ্চকণ্ঠে আর বাজে না'। যেন কবিমন আজ ক্লান্ত, যেন জীবনে—উহার সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দের স্রোতে—কবি আর ভাসমান নন। তিনি যেন আজ উৎসের অভিমুখে ভাঁটার টানে চলিয়াছেন। বিশ্বপৃথিবীর প্রতি কবির এই ভালোবাসায় কিছুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু ইহার মধ্যে যৌবনের উচ্ছ্বসিত চাঞ্চল্যের স্থানে বার্ধক্যের প্রজ্ঞা ও সংযম ঘনীভূত। কবির দৃষ্টি নীলাকাশের অসীমের দিকে। কিন্তু সীমাবদ্ধ জগতে এই মানবজন্মের সত্য যেন অসীমের কোলে রত্নহারের ন্যায় শোভা পাইতেছে। মহাশূন্যতার পটভূমিকায় কবির জীবনপ্রেমের এ এক আশ্চর্য অর্ঘ্য।

কবিতাটির মধ্যে ইন্দ্রিয়াবেগের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াবেদনের রসাস্বাদ নাই। ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া একটি অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির কথাই কবি বারবার বলিয়াছেন। পাঠক তাই শুধুমাত্র ভাবাবেগের সহায়তায় ইহার রস আস্বাদ করিতে পারেন না, সঙ্গে কিছু পরিমাণ মননেরও সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়।

॥ চার ॥

আজি দুর্দিনে ঝড়ে,
তোমায় আমায় দেখা গো বন্ধু, পুনঃ বহুদিন পরে।
জলদগর্জে ভাঙালে নিদ্রা বিদ্যুতে ধাঁধি আঁখি,
শোনো মোর কথা—ও সবের তোয়াক্কা নাহি রাখি।
হানো বর্ষার শর,
নিরন্ধ্র মেঘে ঘেরিয়া বজ্রে ভেঙে ফেলো ধরাতল।
ও তর্জনের অর্থ বুঝিতে হয় না আমার ক্লেশ ;
আমি বেশ জানি—সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটো শ্লেষ
জোড় করি, দুটি কর,
মাগিব না আমি তুষ্টি তোমার যতই বহুক ঝড়।
আমাদের কাছে তুমিও যে কিছু চাহো না, সে জানি আমি
আপন খেয়ালে ঢালিয়া বর্ষা আপনিই যাবে থামি

এ ধরা গোরস্থান ;—
মরণের ভিতে স্মরণের টিপি দু'দিনে ভূমি-সমান !
কত না অশ্রু কত হাহুতাশ কত হাতে পায়ে ধরা,
শ্রান্ত হইয়া শান্তি লভিতে কত না ফন্দি করা ।
সব হয়ে যায় বৃথা,
আসে, হাসে, কাঁদে চ'লে যায় ঘুরে বায়স্কোপের ফিতা !
আমারি মতন এসেছে হেসেছে কেঁদেছে কত না প্রাণী,
আজ তাহাদের একটিরও কেহ সন্ধান নাহি জানি ।
আমারও দুঃখ সুখ,
ধূলা হয়ে যাবে—চাহি বা না চাহি তোমার পাষাণ মুখ ।

ক. বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পর্যায়)

উত্তর ঃ আলোচ্য কবিতাংশে কবির বাস্তব দৃষ্টিই জয়ী হইয়াছে । কবি জীবনের সত্য খোলা-চোখে দেখিয়াছেন এবং মোহহীন বর্ণের অনুরঞ্জনহীন তাহার প্রকৃত তাৎপর্যটি মনেপ্রাণে ঠিক বুঝিয়া লইয়াছেন । কবি ঝড়ঝঞ্ঝায় বজ্রপাতে—প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং জীবনে বিষম বিপদপাতেও সংকুচিত হন না । কারণ উহার চরম ফলশ্রুতি তিনি জানেন, সে-বিষয়ে তাঁহার মনে মোহের লেশমাত্র নাই । বন্ধু বলিয়া যাহাকে তিনি সম্বোধন করিতেছেন তিনি বিশ্বনিয়ন্তা । কিন্তু কবি তাঁহাকে মঙ্গলময় ঈশ্বর, প্রেমময়, আনন্দময় বলিয়া মনে করেন না । এই বন্ধু এক প্রচণ্ড রুদ্র অন্ধশক্তি । দৃষ্টির মর্মমূলে ধ্বংসের ও দুঃখের ভীষণ শূলহস্তে তিনি জীবলোককে তাড়না করিয়া বেড়াইতেছেন । কবি তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন । কিন্তু এই বন্ধুর সহিত তাঁহার প্রীতির সম্পর্ক প্রকাশ পায় নাই, ভীতির সম্পর্কও অবশ্য নয় । কবির এই সম্বোধনের মধ্যে ঐ সর্বধ্বংসী জড় শক্তির প্রতি একটু বক্র কটাক্ষ নাই, একথাও বলা চলে না ।

কবির দৃষ্টিতে জীবজীবনে সুখদুঃখের ঝড় ওঠে—কি কারণে, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে না । কারণ উহার নিয়ন্ত্রাশক্তি চক্ষুহীন—বিচারহীন । কবি তাই সুখে উৎফুল্ল হন, দুঃখেও কাতর হন না । তিনি চরম নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া বুঝিয়াছেন সুখ-দুঃখ শ্লেষ ছাড়া আর কিছুই নয় । কবির ঐ "বন্ধু"টিকে তাই তাঁহার ভয় নাই ; তাঁহাকে সর্বশক্তিমান মনে করিয়া করজোড়ে দুঃখবিপদনাশের জন্য প্রার্থনা করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার নাই । কারণ কবি জানেন, মানুষের প্রার্থনায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয় না । জীবের নিকট কোনো কিছুর প্রত্যাশী তিনি নন—তিনি চাহেন না পূজা বা প্রেম, চাহেন না ভীতি বা নতি ।

তাহা ছাড়া কবি দুঃখনাশের প্রার্থনা করিবেনই বা কেন? কি কারণে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে চাহিবেন তিনি! বিপদ ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। বিপদস্রষ্টা "বন্ধু"র কাছে নতি জানাইয়া সেই ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিতে চাহেন না কবি। কারণ,—কে বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছে এই বিশ্বে! মহামরণের দুন্দুভি সারা জগৎকে একটা গোরস্থানে পরিণত করিয়াছে। জীবনটা চলচ্চিত্রের ন্যায় চলমান। হাসিকান্নার তীব্রতা, স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার আয়োজন মহাকাল নীরব হাস্যে মুছিয়া দেয়। চিরকাল ইহা ঘটিয়াছে এবং চিরকাল এইরূপই ঘটিবে। মানবজীবনে এই নিঃশেষ অবলুপ্তি ছাড়া অন্য পথ নাই। তখন ঝড়ঝঞ্ঝা বিপদপাতকে কি ভয়? নিষ্ঠুর জড় নিখিলের অন্তরস্থিত শক্তি ধ্বংসের আয়োজন করুক, কবি চিন্তিত হইবেন না। মানবের সুনিশ্চিত মহানিয়তিকে তিনি জানিয়াছেন।

আলোচ্য কবিতাংশে কবির প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয় পাই। কবি সৌন্দর্য এবং হৃদয়বৃত্তির সব মোহাঞ্জন বিসর্জন দিয়া জীবনমৃত্যুর সুখদুঃখময় অস্তিত্বের এবং অপরিহার্য চরম পরিণতির সত্য জানিয়াছেন। আশা-বেদনায় তিনি আর তরঙ্গিত নন, ব্যাকুল নন, উচ্ছ্বসিতও নন। কবি নাস্তিক নন; কিন্তু ভগবানের যে-রূপটি তাঁহার দৃষ্টিতে সত্য, উহা জড় নিষ্ঠুর দুঃখ ও ধ্বংসশক্তির এক মহা-উৎস। তাঁহার সহিত মানুষের প্রেমপ্রীতির কোনো সম্বন্ধই থাকিতে পারে না বলিয়াই কবি "বন্ধু" নামে তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন সম্ভবতঃ কিছুটা ব্যঙ্গের মনোভাব লইয়া। কবি নাস্তিক না হইলেও সেই পাষাণচিত্ত জড় ভগবানের সঙ্গে একটা বিরূপতাপূর্ণ দূরত্বই যেন তিনি বজায় রাখিতে চান।

কবির এই কবিতা বিরূপতার কবিতা, ক্রোধের কবিতা। অস্তিত্ব ব্যাপারটা সম্বন্ধেই কবি যেন বিরক্ত। কবির ভাষাভঙ্গিতেও প্রকাশ পাইয়াছে একান্ত লৌকিক শব্দ ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ। কবিতার রূপস্বর্গকেও কবি "তোয়াক্কা", "গোরস্থান" জাতীয় শব্দের দ্বারা আঘাত করিয়াছেন।

॥ পাঁচ ॥

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী॥
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।

তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষস্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব "তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।"

ক. বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পর্যায়)

উত্তর ঃ মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া কবি জীবনের জয়গান গাহিয়াছেন। জীবনকে ভালোবাসিয়া তিনি মৃত্যুকে ভয় পান নাই। মৃত্যুকে বরণ করিয়া তিনি মর্ত্যমমতা ত্যাগ করেন নাই। অপরিহার্য মৃত্যুর মধ্যে চিরন্তন সত্যের জ্যোতি যেমন তিনি অনুভব করিয়াছেন, তেমনি দুর্বল দরিদ্র স্বল্পস্থায়ী নরজীবনের হাসিকান্নার সঞ্চয়কে অমূল্য বলিয়া মনেপ্রাণে বুঝিয়াছেন। মৃত্যুর দ্বার জীবনকে অনন্তের অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার দিতেছে। অসীমের পরম তাৎপর্যটি নিগূঢ় ভাবে উপলব্ধি করিয়াও পৃথিবীর ছোট সুখদুঃখ, ভঙ্গবক্র অস্তিত্ব, ধূলিবিমলিন সামান্যতাকে তিনি তুচ্ছ বলিয়া অবহেলা করিতে পারেন নাই। বরং মৃত্যুর ভূমিকায় অপস্রিয়মাণ জীবন বড় সুন্দর, বড় প্রিয় বলিয়া মনে হইতেছে। পৃথিবীর ধূলিকণাটি পর্যন্ত আজ হইয়া উঠিয়াছে লোভনীয়। কবি আজ মোহমুক্ত। এই মুক্তচিত্তই জীবনের সমগ্রতার মূল্যায়নে সমর্থ। আজ তিনি বুঝিতে পারিতেছেন ক্ষণস্থায়ী মানব-অস্তিত্ব মধুময়, পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় পৃথিবীর তুচ্ছ ধূলিকণাতেও অমৃত ক্ষরিত হইতেছে। বাস্তব জীবনে আঘাত আসিয়াছে, অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে তাঁহাকে, কিন্তু আজ প্রবৃত্তির বন্ধন মোচিত হওয়ায় সে সব ক্ষত আপনিই মুছিয়া গিয়াছে। আজই মুক্তচিত্তে লাভক্ষতির ঊর্ধ্বলোক হইতে তিনি বিচার করিতে পারিতেছেন তাঁহার মানবজন্মের সার্থকতা। আজ নিশ্চিত বিশ্বাসে তিনি অনুভব করিতেছেন, বিশ্বনিখিলের আনন্দস্বরূপ পরম সত্যই পৃথিবীর মৃত্তিকায় রূপধারণ করিয়াছে। এই ধূলি তুচ্ছ নয়। পৃথিবীকে ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ মাটির তিলক ললাটে পরিয়া তিনি আনন্দময় অসীমলোকে মহাপ্রয়াণ করিতে চান।

কবির মর্ত্যপ্রীতির যে-সুর এ-কবিতায় বাজিয়াছে উহার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। উহা কোমল, করুণ এবং গম্ভীর। পৃথিবীকে ভালোবাসিবার যৌবনোচিত উচ্ছ্বাস ও প্রগল্‌ভতা ইহার ভাবকল্পনা বা ভাষারূপের কোথাও নাই। আবেগ যেটুকু আছে

তাহাও ঈষৎ কম্পিত, স্রোতের বেগে প্রবাহিত নয়। তারল্য বা উচ্ছ্বাস ইহার কোথাও স্থান পায় নাই। কবির ভাষায় এবং উপলব্ধিতে বিশ্বসত্যভেদের মহিমা দৃপ্ত হইয়া আছে। ক্ষুদ্রাকার গীতিকবিতায় বিশ্বরহস্যভেদকারী কল্পনা এত সুন্দর ভাবে সহজে আন্তরিক সুরে দানা বাঁধিতে পারে এরূপ কবিতা না দেখিলে বিশ্বাসই হয় না। ভাবে ভাষায় ছন্দবন্ধনে, অনুভূতির প্রগাঢ় গাম্ভীর্যে কবিতাটি একটি শ্রেষ্ঠ লিরিক-রূপে অবশ্যই অভিহিত হইবে।

॥ ছয় ॥

মৃত্যুর বরণ নীল—শুনেছিনু কবে, সে কোথায়!
যমুনার জল, না সে প্রাবৃটের নবঘন-শ্যাম?
অথবা গরলদ্যুতি হরকণ্ঠে নয়নাভিরাম?
উমার কপোলশোভী—সে কি নীল অলকের প্রায়?
অতিদূর কূলে যথা তালবন-রেখা দেখা যায়
নিবিড় আয়স-নীল—তেমনি সে আঁখির আরাম?
কিম্বা সে কি দিকপ্রান্তে আচম্বিতে বিদ্যুতের দাম
ভীষণ নিঃশব্দ-নীল? পরে সে অশনি গরজায়।
উপমা মনেরি খেলা, প্রাণ বুঝে উপমা-বিহনে,
সে যে নীল—নহে রক্ত, পীত, কিম্বা ধূমল ধূসর;
নীলাকাশ-তলে যথা সিন্ধু-জল নীল নিরন্তর,
তেমনি মৃত্যুর ছায়া চেতনার অগাধ-গহনে।
সে নহে যমুনা-জল, নব-ঘন অথবা গগনে।—
মহাশূন্য!—তাই নীল, নীল যথা অসীম অম্বর।

ক. বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পর্যায়)

উত্তর: মৃত্যুর স্বরূপ অনুভব করিতে চাহিয়াছেন কবি। মৃত্যুর বর্ণ ঘননীল এইরূপ একটি ধারণা শুনিয়া কবির কল্পনা নানা চিত্র রচনা করিয়া সেই প্রেক্ষণীয় রূপটিকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। মানুষ অজানাকে জানিতে চায়, ইন্দ্রিয়াতীতকে ইন্দ্রিয়গম্য করিয়া তুলিতে চায়, কবি রূপের বন্ধনে ভাবকে বাঁধিতে চান, অসীমকে সীমা দিয়া অনুভব করিতে চান। মৃত্যু ইন্দ্রিয়াতীত; অনির্বচনীয় অথচ সর্বব্যাপী অপরিহার্য জীবনসত্য। তাহার রূপের বর্ণনা কেহ করিবার অথবা তাহার ভাবটিকে কেহ ভাষারূপে ধরিয়া দিবার অবকাশ পান নাই। কিন্তু আমাদের পৌরাণিক শ্রুতিতে মহামৃত্যু গাঢ় নীলবর্ণের পুরুষরূপে কল্পিত। এই ইঙ্গিতটি কবির মনে কল্পনার দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। কবি সেই নীলবর্ণের যথার্থ রূপটি চিত্রে ধরিয়া অনুভব করিতে

চাহিতেছেন। মানবনয়নে এবং মানবকল্পনায় নীলবর্ণ বিচিত্র রূপে বদ্ধ হইয়া দেখা দিয়াছে। যমুনার জল নীলবর্ণ, নববর্ষার মেঘস্তূপে ঘনশ্যাম যেন নীল হইয়া উঠে, গরল-পানে মহাদেবের কণ্ঠ নীল হইয়া উঠিয়াছিল, উমার কেশকলাপের বর্ণও ঘন নীল। ইহাদের সহিত উপমিত করিয়া কি মৃত্যুর রূপের ধারণা করা সম্ভব? দূরপ্রান্তে তালবন-রেখা নিবিড় নীলবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। বিদ্যুৎচমকে, বজ্রগর্জনে নীলের আভাস পাওয়া যায়। কবির কল্পনা এইরূপ বিচিত্র রূপে ও ভীষণতায় মৃত্যুর উপমা খুঁজিয়া ব্যর্থ হয়। (তখন তিনি বুঝিতে পারেন রূপাঙ্কনের সাহায্যে, উপমাবিলাসের পথ ধরিয়া মৃত্যুরূপ অনুভব করা যাইবে না।) কারণ,—উপমা তো কবিকল্পনার সৃষ্টি। আর মৃত্যু জীবনের একমাত্র স্বাভাবিক ও অপরিহার্য পরিণতি—ভীষণ নির্মম অথচ পরম প্রশান্ত সর্বযন্ত্রণাহর। যদি উপমাই দিতে হয় সমুদ্রের নীলের কথা মনে করা চলে। উহার অতল গভীরতায় রহিয়াছে মৃত্যুগভীরতার ব্যঞ্জনা। অথবা মহাশূন্যের নীলিমার প্রসঙ্গ তোলা যায়। কারণ,—মৃত্যু অপেক্ষা বড় শূন্যতা আর কি আছে!

কবির চিত্ত রূপাবেদনে তৎপর। শব্দচিত্রে একটি গভীর জটিল অনুভূতিকে তিনি ধরিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বড কথা হইল কবিতাটির সনেটোচিত গঠনসাফল্য। সনেটের পেত্রার্কা-রীতির এইরূপ সফল উদাহরণ বাংলা কবিতায় বেশী নাই। উহার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি যেমন সংহত তেমনি গম্ভীর, অথচ একটা বিপুল ভাবকল্পনা—কবিচিত্তের একটা আশ্চর্য ব্যাকুলতা—ইহার মধ্যে রূপলাভ করিয়াছে।

॥ সাত ॥

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য
তাই এ কাব্য।

এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকারপটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।

ক. বি বি. এ. (**দ্বিতীয় পর্যায়**)

উত্তরঃ সৌন্দর্য বস্তুগত নয়, চিত্তগত। মনের রঙ দিয়া বাহিরের দৃশ্য বস্তুকে আমরা রঞ্জিত করিয়া নিজের করিয়া লই। উহার বস্তুগত আকার-প্রকার-পরিচয় একান্তই বাহ্য, আমরা সেই বাহ্য পরিচয়ের উপরে হৃদয়রসের স্পর্শ দিয়া, অন্তরের মোহমুগ্ধ ভাবটি যোগ করিয়া তাহাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করি।

বস্তুর উপরে ভাবের আধিপত্য—ভাববাদী দার্শনিকেদের এইরূপ বিশ্বাস চিরকালের। কিন্তু উহাই আধুনিক গীতিকবিদের দৃষ্টিতে হইয়া উঠিয়াছে জীবনের চরম ও পরম উপলব্ধ সত্য। গীতিকবি বস্তুলোকের চিত্র আঁকেন না, বস্তুকে অবলম্বন করিলেও তিনি আঁকেন আপনার মনোলোকেরই ছবি। গীতি-কবিতার একটি বিষয়—কবির "আমি"—বিচিত্র সুরে ছন্দে প্রসঙ্গে তাহারই গান করিয়া চলেন কবি। তিনি তাই নিশ্চিত ভাবে অনুভব করেন, জগতের বিচিত্র বস্তুপুঞ্জে যে অন্তর্লীন সত্যের লীলা, তিনি এক—একক, কবি-অন্তরের নির্জনতায় তাঁহার একক মৌন অবস্থিতি। কবি বলেন আপনার হৃদয়ের সেই পরম সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

কিন্তু নিজের হৃদয়ের গভীরে অবতরণ করিয়া দেখেন—

অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী।

মহৎ লিরিক কবি বস্তুর বস্তুত্বকে গ্রাস করেন, আপনার ধ্যানমন্ত্রে রঙে রেখায় স্পর্শে ব্যাকুলতা ছানিয়া তাহাকে নূতন করিয়া গড়েন। তাই তিনি অনুভব করেন বস্তুর সত্য বস্তুত্বে নাই, আছে কবির অন্তর-ভাবে, আছে শিল্পস্রষ্টার কল্পনায় ও রচনায়।

কবির প্রকাশভঙ্গি ঋজু এবং অপল্লবিত। একটা পৌরুষদৃঢ় সংহত ভাষা-ভঙ্গি এবং ছন্দের গদ্যরীতি ইহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই ছন্দ আলোচ্য কবিতার ক্ষেত্রে খুবই সুপ্রযুক্ত হইয়াছে। ভাবাবেগের প্রবলতা এবং গতিস্রোত এখানে নাই, বরং আবেগের তুলনায় মননের ঔজ্জ্বল্য এখানে প্রধান। গদ্যরীতির ছন্দ স্বল্প-আবেগ মননকে সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়াছে। কবিতাংশের কল্পনায় যেমন রহিয়াছে

বিশ্বব্যাপ্ত মাহাত্ম্য, ভাষার মধ্যেও রহিয়াছে তেমনি আকাশস্পর্শী আত্মার গৌরব-ঘোষণার সুর।

কবিতাটি প্রায় তত্ত্ব হইয়া উঠিয়াছে কিনা এই প্রশ্ন কবি নিজেই তুলিয়াছেন। কবিতাটিতে তত্ত্ব আছে, তবে ব্যক্তিগত উপলব্ধির উত্তপ্ত স্পর্শে এবং ভাষারীতির বিশিষ্ট আবেদনে তাহা কাব্যসার্থকতা লাভ করিয়াছে। বরং তত্ত্বভাবনা কেন্দ্রে থাকায় ঔপনিষদিক মন্ত্রের প্রগাঢ়তা উহার প্রকাশভঙ্গিকে মহিমা দিয়াছে।

॥ আট ॥

এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুঁড়িল সূর্যের পানে ভাই
পৃথিবী যাহার নাম,
লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন সে যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে
সূর্যেরে অবিরাম।
তারি সন্ততি আমাদেরও ভাই ব্যর্থ যে সন্ধান
লক্ষ্য গিয়াছি ভুলি।
মোদের সকল স্বপনের গায় জানি না কেমন করি'
লেগেছে মলিন ধূলি।
মাটি ও পাথর কাটি আর কুঁদি দেবতা গড়িনু ঢের,
মাগিলাম কল্যাণ।
বেদীমূলে তার তবু শোণিতের দাগ লেগে থাকে ভাই,
দেবতার অপমান!
লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ
বহি মোরা চিরদিন;
আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু ভাই
আদি, পঙ্কের ঋণ।

ক. বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পর্যায়)

উত্তর ঃ কবির চোখে পৃথিবী এবং মানবজীবন সবই একটা উদ্দেশ্যহীন কর্মচক্রাবর্তনরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। আশা লইয়া মানুষ জীবন শুরু করে। রাজনীতিবিদ্ ভবিষ্যতের মনোহর আশার স্বপ্ন গড়িয়া তোলেন। কবিরা রোমান্টিক সৌন্দর্যের রাজ্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু আধুনিক মন জীবনকে মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে নাই। স্পষ্ট চোখে জীবনের দিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইয়াছে—উহা অর্থহীন পরিক্রমা, আশাহীন বিবর্ণতা। আধুনিক কবি বিশ্বের কোনো কল্যাণমুখী তাৎপর্য আবিষ্কার করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। মানবমহিমা তাঁহার নিকট একটা অতীত

কল্পকথায় পর্যবসিত হইয়াছে। যেখানে কল্যাণের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন কবি, সেখানে অত্যাচার শোষণের রক্তরেখা পড়িয়াছে। যেখানে বিশুদ্ধ প্রেম, সৌন্দর্য, মানববোধের দেবপীঠ রচনা করিয়াছিলেন গতযুগের ভাবুক মনীষীবৃন্দ, আজ তাহা অন্তঃসারশূন্য মনে হইতেছে। মানুষের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের ধারা আজও শেষ হয় নাই। প্রভূত ক্ষমতা লইয়া সে বিশ্বের দিকে দিকে বিজয় অভিযান করিয়াছে। কিন্তু এই মহিমার অন্তরালে রহিয়াছে তাহার আদিম স্বার্থবোধের পঙ্কিলতা। উহাই মুখব্যাদান করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে—নামিয়া আসিতেছে ধ্বংসযজ্ঞ, অবিরাম চলিতেছে শোষণ আর অত্যাচার।

কবিতার সুরটি একটু উচ্চকণ্ঠ। কবির ভাবনা-প্রকাশের ভঙ্গিটির মধ্যে উত্তেজনার প্রগল্‌ভতা অনুভব করা যায়। কবি যে শব্দচিত্র রচনা করিয়াছেন তাহা প্রচলিত কাব্যধারার অনুবর্তী। কবির শব্দচয়ন এবং বয়নকৌশলের মধ্যেও নাই আধুনিক কাব্যের প্রসাধনরীতির তির্যকতা, আকস্মিক চমক, দুর্বোধ্যতা, ভাবনাগত দূরান্বয়। কিন্তু কবির অনুভূতিটি একান্তভাবেই আধুনিক কালের। সংকটের যুগে আর্ত কণ্ঠে তিনি একটি জিজ্ঞাসাকে উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, অর্থহীন এই বিশ্বসৃজন—অর্থহীন এই মানব-অস্তিত্ব। কবির নৈরাশ্য খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মনে হয় কবির আশাভঙ্গ সম্প্রতি ঘটিয়াছে। কাজেই প্রথম আশাভঙ্গের তীব্র আঘাত কবিতার ভাবে ভাষায় উচ্চকণ্ঠে বাজিয়াছে

UNSEEN : PROSE

ভাবপরিস্ফুটন : ভাবের মৌলিকতা ও প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আলোচনা

॥ এক ॥

মননের দ্বারা আমরা যে অন্তর্জীবন লাভ করি তাহার মূল লক্ষ্য পরমার্থ। এই আমমহল ও খাসমহলের দুই কর্তা—স্বার্থ ও পরমার্থ। ইহাদের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া চলাই মানবজীবনের আদর্শ। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংসারের বিপাকে পড়িয়া যে অবস্থায় 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' তখন পরমার্থকে রাখিয়া স্বার্থই পরিত্যাজ্য, এবং যাঁহার মনোজীবন প্রবল তিনি অবলীলাক্রমে সেই কাজ করিয়া থাকেন। অধিকাংশের মন সজীব নয় বলিয়া শাস্ত্রে এবং লোকাচারে আমাদের মনঃপুত্তলী-যন্ত্রে দম দিয়া তাহাকে একপ্রকার কৃত্রিম গতি দান করি। কেবল সেই জোরে আমরা বহুকাল ধরিয়া দয়া করি না, দান করি ; ভক্তি করি না, পূজা করি ; চিন্তা

করি না, কর্ম করি; বোধ করি না, অথচ সেইজন্যই কোন্‌টা ভালো ও কোন্‌টা মন্দ তাহা অত্যন্ত জোরের সহিত অতিশয় সংক্ষেপে চোখ বুজিয়া ঘোষণা করি। ইহাতে সজীব দেবতাস্বরূপ পরমার্থ আমাদের মনে জাগ্রত না থাকিলেও তাহার জড়প্রতিমা কোনোমতে আপনার ঠাট বজায় রাখে।

ক. বি. বি. এ. (প্রথম পর্যায়)

উত্তরঃ মানবজীবনের দুই দিক। একদিকে স্বার্থবদ্ধ পার্থিব অস্তিত্ব, অন্যদিকে পরমার্থ লাভ। মূল লক্ষ্য পরমার্থ সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি বাহ্য লক্ষ্যও আছে, উহা বাস্তব জীবনাচরণ। এই দুইয়ের সমন্বয়সাধনের অপর নামই মনুষ্যত্ব। কিন্তু বাস্তবতঃ নানা কারণে এই সমন্বয়সাধন প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখনই বিবেচনা করিয়া নির্বাচন করিতে হয়। নিঃসন্দেহে উহাও কঠিন কাজ। লেখকের মতে, দুইয়ের মধ্যে একটি পথ যদি বাছিয়া লইতেই হয় তাহা হইলে পরমার্থসাধনের পথটিই অনুসরণ করিতে হইবে। কারণ স্বার্থসাধনে, প্রবৃত্তিমার্গে মানুষের যে পরিচয় প্রকাশ পায়, উহা তাহার জীবসত্তার পরিচয়, আত্মার দ্যুতি উহার মধ্যে প্রকাশ পায় না। কিন্তু পরমার্থসাধনের পথ, অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ—ব্রহ্মসাধনা খুবই কঠিন। মননের জোর না থাকিলে সে-পথে সাফল্য লাভ করা বড় সহজ হয় না। আর আপামরসাধারণের মধ্যে এই মনন ব্যাপারটিরই অভাব।

স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে, প্রজ্ঞার বশবর্তী হইয়া মনুষ্যসাধনার চরম লক্ষ্যটি যাহারা স্থির করিতে পারে না, সমাজ তাহাদের জন্য একটি সহজ মার্গের ব্যবস্থা করিয়াছে। উহা শাস্ত্র ও লোকাচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীন চিন্তা ও প্রগাঢ় উপলব্ধির সাহায্যে উহারা ঠিক পথটি খুঁজিয়া পায় না বটে, কিন্তু শাস্ত্রনির্দেশ ও লোকাচার অনুসরণে উহারা তাহার একটি স্থূল সহজ রূপের অনুধ্যান করে। আমরা তাৎপর্য না বুঝিয়া, কতকগুলি বাহ্য আচারের অন্ধ অনুকরণ করি, লোকাচারকেই মানবজীবনের চরম সত্য বলিয়া ঘোষণা করি। এই জড়ত্বই মননহীন জাতির জীবনে আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে। উহা যে মনুষ্যত্বনাশের একটি বড় কারণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

লেখকের চিন্তাধারার স্বাধীন দীপ্তি এই অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। মানবজীবনে পারমার্থিক সাধনার তাৎপর্য যে কত বৃহৎ সে কথা স্বীকার করিয়াও উহা যে প্রথানুগত্য, শাস্ত্র লোকাচার ও কুসংস্কারের বন্ধন হইতে একেবারে স্বতন্ত্র তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন স্পষ্টভাবে। আমরা পরমার্থের সাধনা করিব, ইহাই লেখকের কাম্য। প্রয়োজন হইলে প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগও করিতে হইবে। কিন্তু উহা স্বাধীন মননের বশবর্তী হইয়া করিতে হইবে। স্বাধীন চিন্তা, বিচারবিবেচনার ক্ষমতা এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টি লোপ পাইলে

মনুষ্যজীবন জড় পশুর ন্যায় হীনতায় নামিয়া যাইবে। শাস্ত্র লোকাচার প্রভৃতির দ্বারা পরমার্থসাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা বাহ্যিক, অন্তরের সায় উহাতে নাই—উহা তাই মূঢ়তার আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়।

লেখকের ভাষাটি প্রসন্ন এবং বীর্যবন্ত। উপমাগুলি সহজ এবং বিষয়ানুগ, কোথাও প্রধান হইয়া চিত্ররসের মোহ বিস্তার করিয়া আলোচ্য বিষয়কে আচ্ছন্ন করে নাই। ভাষায় অকারণ পল্লবিত কবিত্বসৃষ্টির চেষ্টা নাই, তবে "আমরা বহুকাল ধরিয়া······ঘোষণা করি।"—এই অংশে পুনরুক্তিমূলক বাক্যাংশের ব্যবহারে বক্তৃতার উত্তাপ যেন কিছুটা সংক্রামিত হইয়াছে।

[দুই]

আমরা সমগ্র সমাজকে একটি ব্যক্তি হিসেবে দেখলেও আসলে মানবসমাজ হচ্ছে বহু ব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের যৌবনের আবির্ভাব হয়। সেই মানসিক যৌবনকে স্থায়ী করতে হলে শৈশব নয়, বার্ধক্যের দেশ আক্রমণ এবং অধিকার করতে হয়। দেহের যৌবনের অন্তে বার্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ হ'তেই সংগ্রহ করতে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না. কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালোবাসা, নূতন কর্তব্য ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তার মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন। ক. বি. বি. এ (**প্রথম পর্যায়**)

উত্তর : আমরা প্রত্যেকে নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে অত্যন্ত বেশী মূল্য দিয়া থাকি। আমরা জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সত্য মিথ্যা যাচাই করি। ব্যক্তিগত ভাবে যৌবন একটা স্বল্পস্থায়ী সত্য বলিয়া উহাকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাঁধিয়া ফেলি। কিন্তু সমাজের প্রকৃত রূপ বহুব্যক্তির সমষ্টিতে—কাহারও ব্যক্তিগত সত্তার সীমাবন্ধনে নয়। একজন মানুষের জীবনে—দেহে ও মনে—যৌবন আসে এবং চলিয়াও যায়। কিন্তু সমগ্র সমাজের দিক হইতে দেখিলে যৌবন চিরকালের ধন। আসা-যাওয়ার স্রোতে ভাসমান, আগমন এবং নির্গমনের মধ্য দিয়া চিরন্তন। বার্ধক্য যৌবনের বিরোধী নয়। মৃত্যুও নয়। উহার মধ্য দিয়া পুরাতন জীর্ণ ঝরিয়া পড়ে, নূতনের জন্য পথ ছাড়িয়া দেয়। এমনি করিয়া নূতনের জয়রথ আগাইয়া চলে, ব্যক্তিগত মরণ-বাঁচনের ঊর্ধ্বে সমগ্র সমাজের যৌবন অক্ষয় হইয়া থাকে। উহা চলমান বলিয়া নিত্য নিত্য ক্ষয়িত

এবং নিত্য নিত্য নূতনের দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে বলিয়া এই অক্ষয় সত্যে জড়ত্ব প্রবেশ করিতে পারে না।

লেখকের ভাবনাটি যেমন স্বচ্ছ তেমনি স্পষ্ট। ইহার মৌলিকতা হইল ব্যক্তিগত যৌবন এবং সামাজিক যৌবনকে কতকটা স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করায়। ব্যক্তিগত যৌবনের অবক্ষয়ে কাতর না হইয়া সামাজিক যৌবন যাহা চিরকালীন, তাহার সত্যটি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিলে বৃদ্ধের মনেও যৌবনের নবীনতা উপলব্ধ হইবে।

রচনাটির ভাষারীতির মধ্যে কোথাও অকারণ এবং অপ্রয়োজনীয় কবিত্ব প্রশ্রয় পায় নাই। বরং একটা পৌরুষের, দৃঢ় ঋজু মেরুদণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা আছে। ভাষায় নাই অলকংরণ-চেষ্টা, এবং শিথিলতা অথবা বর্তুল বিস্তার।

[তিন]

বিশ্বরূপের অন্তরতর এই অপরূপকে প্রকাশ করিবার জন্যই শিল্পীদের গুণীদের এত ব্যাকুলতা। এইজন্য তাঁহাদের সেই চেষ্টা অনুকরণের ভিতর দিয়া কখনোই সফল হতে পারে না। অনেক সময় অভ্যাসের মোহে আমাদের বোধের মধ্যে জড়তা আসে। তখন আমরা যাহাকে দেখিতেছি কেবলমাত্র তাহাকেই দেখি। প্রত্যক্ষ রূপ যখন নিজেকেই চরম বলিয়া আমাদের কাছে আত্মপরিচয় দেয় তখন যদি সেই পরিচয়টাকেই মানিয়া লই তবে সেই জড় পরিচয়ে আমাদের চিত্ত জাগে না। তখন পৃথিবীতে আমরা চলি, ফিরি, কাজ করি, কিন্তু পৃথিবীকে আমরা চিত্ত দ্বারা গ্রহণ করি না। কারণ, এই পৃথিবীর অন্তরতর অরূপতাই আমাদের চিত্তের সামগ্রী। অভ্যাসের আবরণ মোচন করিয়া সেই অরূপতাকে উদ্‌ঘাটিত করিবার কাজেই কবিরা গুণীরা নিযুক্ত।

ক. বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পর্যায়)'

উত্তর ঃ লেখক শিল্পসৃষ্টির স্বরূপ লইয়া সংক্ষিপ্ত অবকাশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। বিশ্বজগতের প্রত্যক্ষ রূপটাকেই আমরা সাধারণ লোকেরা উহার সত্যরূপ বলিয়া জানি। তাই সাধারণের ধারণায় বিশ্বপৃথিবীর প্রত্যক্ষরূপের প্রতিফলন ঘটিলেই সাহিত্যে জীবনসত্য প্রকাশ পাইল। কিন্তু এই অংশের লেখকের মত অন্যরূপ। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে তিনি খণ্ডিত অপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। উহা বাহিরের তথ্যকেই সত্য বলিয়া ভুল করিয়া বসে। অভ্যাসের বশে যাহাকে চোখে দেখে, কানে শোনে—ইন্দ্রিয় দিয়া যাহাকে স্পষ্ট করিয়া অনুভব করে, তাহাকেই খাঁটি বলিয়া জানে। কিন্তু সত্যকে অন্তর্দৃষ্টির বলে তথ্যের মধ্য হইতে আবিষ্কার করিতে হয়। কল্পনার সহযোগে তথ্যের নবরূপ সৃষ্টি করিতে হয়। যাঁহারা শিল্পী তাঁহাদের এই শক্তি আছে বস্তুর প্রত্যক্ষ রূপের গভীরে প্রবেশ করার। বস্তুরূপ আসলে এক রূপাতীত অপরূপের প্রতিফলন। প্রতিবিম্বন

লইয়া সাধারণ মানুষ ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কবিশিল্পী প্রতিবিম্বনের গভীরে মূল বস্তুটির সন্ধান না পাইলে ছাড়েন না। এই কারণে তাহাদের দেখাকে অনেকে কিম্ভূত ব্যাপার বলিয়া সমালোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সত্য বুঝিবার সহজতর কোনো পথ নাই। সাহিত্য-শিল্পের সত্য গভীরভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত—উহা জীবনের সহজ অনুকরণ নয়।

লেখক শিল্পচেতনার ক্ষেত্রে বাস্তববাদের বিরোধিতা করিতেছেন। জীবনের সহিত শিল্পসাহিত্যের সম্পর্ক আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন। আরিস্তোতলের কাল হইতে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অনুকরণবাদ চলিয়া আসিয়াছে এখানে তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করা হইয়াছে। লেখকের ভাবনার মধ্যে মৌলিকতা আছে। তিনি জীবনবিরোধী, রোমান্টিক সৌন্দর্যের মহাশূন্যে বায়বীয় লোকে উড়িয়া যাইতে চাহেন নাই। তিনি কল্পনাপ্রধান শিল্পসাহিত্যের গৌরব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিয়াছেন যে, উহাই জীবনসম্পৃক্ত। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তিনি যে প্রত্যক্ষবাদ ও অনুকরণবাদের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন তাহা নয়, জীবনবিষয়েও তিনি এমন একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন যাহা অভিনব।

লেখকের ভাষার মনোহরত্বও লক্ষ্য করিবার মতো। তিনি জীবন ও শিল্পের যে অভিনব সম্পর্কটি দেখাইতে চাহিয়াছেন তাহা উপলব্ধিগম্য সত্য। যুক্তিপ্রাণতার স্পর্শ তাঁহার ভাষায় বা বাচনভঙ্গিতে বড় অনুস্যূত হয় নাই।

॥ চার ॥

জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নীতির ক্ষেত্রে, যখন আত্মশক্তির ক্লান্তি আসে তখন বৈরাগ্য দেখা দেয়; সেই বৈরাগ্যের অযত্নের ক্ষেত্রেই ঋষিবাক্য, বেদবাক্য, মহাত্মাদের অনুশাসন, আগাছার জঙ্গলের মতো জেগে ওঠে—নিত্যপ্রয়াসসাধ্য জ্ঞানসাধনার পথ রুদ্ধ করে ফেলে। বৈরাগ্যের অযত্নে দিনে দিনে চারিদিকে যে প্রভূত আবর্জনার অবরোধ জমে ওঠে তাতেই মানুষের পরাভব ঘটায়। বৈরাগ্যের দেশে শিল্পকলাতেও মানুষ অন্ধ পুনরাবৃত্তির প্রদক্ষিণপথে চলে, এগোয় না, কেবলই ঘোরে। মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠী পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে, হাজার বছর আগে যে-মন্দির তৈরি হয়েছে ঠিক তারই নকল করবার জন্য। তার বেশি তার সাহস নেই, ক্লান্ত মনের শক্তি নেই; পাখির অসাড় ডানা খাঁচার বাইরে নিজেকে মেলে দিতে আনন্দ পায় না।

ক. বি. বি. এ. (**দ্বিতীয় পর্যায়**)

উত্তর : বৈরাগ্যকে মহৎ ত্যাগবৃত্তি বলিয়া আমরা প্রায়ই উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু বৈরাগ্য যে ত্যাগের আবরণে বহুক্ষেত্রে একটা জড়ত্বের চর্চা করিয়া থাকে ইহা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

বৈরাগ্যের অতিচর্চা যখন কোনো জাতির জীবনে শুরু হয় তখন বুঝিতে হইবে জ্ঞান কর্ম ও শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে সে-জাতির প্রাণশক্তি কমিয়া আসিয়াছে। নিজের বিচার করিবার শক্তি নাই বলিয়াই আমরা তখন গুরুবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসি, নিজের স্বাধীন সৃষ্টির সাহস না থাকায় অনুশাসনের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াই এবং পুরাতনকে অনুকরণ করিয়া চলি।

লেখকের চিন্তার মধ্যে যে নূতনত্ব আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৈরাগ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত উচ্চ। কিন্তু উহা যে প্রাণশক্তি, স্বাধীন ভাবনা এবং শিল্পসৃষ্টির একটা বড় অন্তরায় ইহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। লেখক এখানে স্বল্প কথায় তাহা বুঝাইয়া বলিয়াছেন।

লেখকের ভাষাভঙ্গি অবশ্য ঠিক যুক্তিমূলক নয়। বক্তব্যের ভিত্তিতে যে দৃঢ় যুক্তির বন্ধন আছে একটিমাত্র উদাহরণের ইঙ্গিতে তাহা নিশ্চিত ভাবে বুঝিবার উপায় নাই। তবে গদ্যভাষায় সহজেই কবিত্বের ঝংকার সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন লেখক। বিশেষ করিয়া শেষ উপমাটির সৌন্দর্য উপভোগ্য।

॥ পাঁচ ॥

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ প'রে অভিসারে চলেছে—ওই কালোর দিকে, ওই অনির্বচনীয়-অব্যক্তের দিকে, বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকতেই তার মরণ—সে কুলকেই সর্বস্ব করে চুপ করে বসে থাকতে পারে না, সে কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েছে; এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা; পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি—সমস্ত অতিক্রম করে, বিপদকে উপেক্ষা করে সে যে চলেছে, সে কেবল এই অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তের দিকে, 'আরো'র দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসারযাত্রা—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে। ক. বি. বি এ. (দ্বিতীয় পর্যায়)

উত্তরঃ বিশ্বজগতের সর্বত্র রহিয়াছে একটি চলার সুর, একটি ক্রমবিকাশের আবেগ। কোনো-কিছুই কোথাও চুপ করিয়া থামিয়া নাই। জড়ধর্মী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্থিতিতে নিশ্চিন্ত হইতে চায়, রক্ষণশীলতাকে প্রজ্ঞা এবং বিবেচনা বলিয়া সে মনে করে। কিন্তু জগতের জড় জীব কোনো-কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। পরিবর্তন জীবনের ধর্ম, পরিবর্তন বিশ্বপ্রকৃতির মূল সত্য। যেখানে বিকাশ নাই, পালাবদল নাই, পরিণতিসাধন নাই সেখানে মৃত্যু আসিয়া বাসা বাঁধে।

কিন্তু এই পরিণতিবিধানের কি কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে? অথবা ইহা অকারণ অবারণ চলা? এই চলার লক্ষ্য আছে। কিন্তু লক্ষ্যটি এমনি বিশিষ্ট যাহাতে উহা কোনোরূপ স্থিতিমূলকতায় পর্যবসিত নয়। সীমাবদ্ধ জীবন ও বস্তু

অসীমের সহিত মিলিত হইবার জন্য চলিয়াছে। অসীমের মধ্যে লক্ষ্য এবং লক্ষ্য-হীনতার বিস্ময়কর মিলন ঘটিয়াছে। উহা যেমন যাত্রাপথের শেষ তেমনি আবার অশেষ। কারণ অসীমের মধ্যে কোথাও বন্ধন নাই, স্থিতি নাই—নাই নিশ্চিন্ততা।

লেখকের যে-ভাবনাটি এখানে প্রকাশ পাইয়াছে উহাকে দার্শনিক পরিভাষায় গতিতত্ত্ব বলা যাইতে পারে। ফরাসি দার্শনিক বার্গসঁ জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া গতিকেই জড় ও প্রাণের স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আলোচ্য অংশে প্রকাশিত ভাবনার সঙ্গে গতিতত্ত্বের মিল রহিয়াছে; কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্থক্যও লক্ষ্য করিবার মতো। বার্গসঁর গতিবাদ অপরিণামী। উহার কোনো লক্ষ্য নাই। আলোচ্য অংশে প্রকাশিত গতিবাদের মধ্যে রহিয়াছে একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি। এই পরিণতিটি সুনির্দিষ্ট—কিন্তু আবার অনির্দিষ্টও। অখণ্ড, অনন্ত, অসীমকে কে কবে জাল ফেলিয়া ধরিয়াছে? উহা তৃষ্ণা জাগায়, অতৃপ্ত করে, অস্থির করে, অস্তিত্বের মধ্যে সঞ্চারিত করে গতির আবেগ, কিন্তু প্রাপ্তির নিশ্চিন্ততা আনে না জীবনে।

রচনার ভঙ্গিটি রূপধর্মী, কতকটা রূপকধর্মীও। লেখকের উপলব্ধিটি একটি অভিসারিকার প্রিয়তমের মিলনোদ্দেশ্যে যাত্রার রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষাটি যেরূপ কবিত্বপূর্ণ তেমনি বর্ণবহুল। লেখকের প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে ভাবনার বিষয়টি পর্যন্ত ভাবের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। যাহা বুদ্ধির অধিগম্য বিষয়, তাহা হইয়া উঠিয়াছে রূপধৃত সৌন্দর্য, স্বাদে বর্ণে গন্ধে অপরূপ। উপমা-ব্যবহারে লেখকের কৌশলটিও লক্ষ্য করিবার মতো। উহা যে উপমা বা বহিরাগত অলংকার তাহা বুঝাই যায় না। বক্তব্যের সঙ্গে অলংকরণ অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়া রচনাটিকে বড় লেখকের হাতের চিহ্নমণ্ডিত করিয়াছে।

॥ ছয় ॥

বস্তুর রাজ্যে কবিতার খেলিবার প্রায় সুবিধা হয় না, কোনও প্রকারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া সে একেবারে রিক্তহস্তে ফিরে না, কাঠামোর একটা আবছায়া-স্মৃতি লইয়া ঘরে ফিরে, সেই স্মৃতি হইতে টানিয়া টানিয়া কবিতা আপনাকে ফুটাইয়া তোলে, বস্তুর আবছায়ার মধ্য হইতে প্রাণ বাহির করাই তাহার কাজ। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত তাহার বড় একটা সম্বন্ধ নাই। এই জন্য কবিত্ব ভাবে, ছন্দে, কথায়, অনুপ্রাসে, শ্লেষ-প্রয়োগে কবিত্ব নহে। ভাবপ্রকাশের সহায়তা করে বলিয়াই ইহাদের যাহা কিছু মর্যাদা।

ক. বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পর্যায়)

উত্তর ঃ কবিতার সহিত বাস্তব রাজ্যের একটি সম্পর্ক আছে, তবে উহা সূক্ষ্ম। অনেকে কবিতাকে বস্তুজগতের প্রতিফলন বলিয়াই মনে করে, বাস্তব জীবনের ভালো-মন্দ লাভ-লোকসান ও উহার তথ্যমূলকতা অনেকে কাব্যের মধ্যে সন্ধান করিতে চান। কিন্তু এই ভাবনা কাব্যের স্বরূপ না বুঝিবার ফল। বস্তুজগৎ ও কাব্যলোকের মধ্যের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ প্রতিফলনজাত নয়, সূক্ষ্ম এবং বর্ণবস্তু, তির্যক এবং কবিচিত্তের সংযোগে অপরূপ সে সম্বন্ধ। যাহারা আবার বাস্তবের সহিত কবিত্বের কোনোরূপ সম্বন্ধ মানেন না, উহাকে বিশুদ্ধ কল্পনাচারী একটা ব্যাপার বলিয়া মনে করেন তাহারাও ভুল করেন। কাব্যের সহিত বাস্তব জীবনের সম্পর্ক আছে। তবে উহা বাস্তবজীবনের নিকট আত্মসমর্পণ করে না, অথবা বিজ্ঞানের ন্যায় বাস্তবজীবনের বিশ্লেষণ করে না। কবি বাস্তবজীবনের কাঠামোটি অস্বীকার করিতে পারেন না। বাস্তবজীবনের রূপ রস সংগ্রহ করেন; অন্তর্দৃষ্টিবলে বস্তুপিণ্ডের মধ্যে প্রাণ আবিষ্কার করেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে ব্যক্ত করেন। কাজেই কবিত্ব বাস্তবতাবিশ্লিষ্ট নয় আবার বাস্তবতা দ্বারা সম্পূর্ণতঃ গ্রস্তও নয়।

কবিতার আর একটি বড় সমস্যা হইল ভাষা ও অলংকরণের সমস্যা। অনেকে এই রূপরীতির দিকে, প্রকাশের ভঙ্গির দিকে এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন যাহাতে ভাবকল্পনা গৌণ হইয়া যায়। এই ধারণাটি কবিত্বের স্বরূপ প্রকাশ করে না—একটা ভুল ধারণার দিকে লইয়া যায়, ইহাই লেখকের বক্তব্য। রূপরীতি-ভাষা, অলংকার, ছন্দ প্রভৃতির কাজ ভাবকল্পনাকে প্রকাশ করা। ঐ কার্যের সার্থকতায়ই তাহাদের মূল্য।

আলোচ্য অংশে কাব্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে খুব মৌলিকত্ব কিছু নাই। এবিষয়ে বিস্তর আলোচনা দেশী-বিদেশী সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে হইয়া গিয়াছে। নানারূপ মতভেদ এই ক্ষেত্রে রহিয়াছে। লেখকের বিশিষ্ট মতটি আমাদের মতে গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু প্রকাশের রীতি—ছন্দ, অলংকার, ভাষা প্রভৃতিকে লেখক খুবই গৌণ স্থান দিয়াছেন। প্রকাশের ভঙ্গি এবং প্রকাশের বিষয় অর্থাৎ ভাবকল্পনা যেন দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ, লেখকের আলোচনা পড়িয়া তাহাই মনে হয়। লেখকের এই ধারণাটি গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কবিতার ভাব ও রূপ অচ্ছেদ্য, একটিকে গৌণ করিয়া ফেলিলে কাব্য-ব্যাপারটির প্রকৃত সার্থকতাই চলিয়া যায়।

আলোচ্য অংশের রচনারীতির খুব প্রশংসা করা যায় না। প্রথম দিকে ভাষার মধ্যে আলংকারিকতা আনিবার চেষ্টা আছে। কিন্তু উহা শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। ভাষা সহজ কিন্তু জোরালো নয়। তাহা ছাড়া একটি ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদের মধ্যে দুইটি প্রসঙ্গকে আনিয়া ফেলা হইয়াছে. অথচ তাহাদের দৃঢ় সংসক্তি ঘটে নাই

সাত ॥

বিশ্বের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা তার স্থাবর বস্তুর অর্থাৎ বিষয়-সম্পত্তির দিক নয়, যেটা তার চলচ্চিত্তের নিত্যপ্রকাশের দিক। যেখানে আলো ছায়া সুর, যেখানে নৃত্য গীত বর্ণ গন্ধ, যেখানে আভাস ইঙ্গিত। যেখানে বিশ্ব-বাউলের একতারার ঝংকার পথের বাঁকে বাঁকে বেজে ওঠে, যেখানে সেই বৈরাগীর উত্তরীয়ের গেরুয়া রঙ বাতাসে বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে উড়ে যায়। মানুষের ভিতরকার বৈরাগীও আপন কাব্যে গানে ছবিতে তারই জবাব দিতে দিতে পথে চলে, তেমনি তারাই গানের নাচের রূপের রসের ভঙ্গিতে। বিষয়ী লোক আপন খাতাঞ্চিখানায় বসে যখন তা শোনে তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "বিষয়টা কী। এতে মুনাফা কি আছে। এতে কি প্রমাণ করে?"

ক. বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পর্যায়)

উত্তর ঃ বিশ্বপ্রকৃতিতে বস্তুজগতে রহিয়াছে দুটি বিপরীত দিক। একদিক নিয়মে বাঁধা—সেখানে জীবসৃষ্টি, জীবরক্ষণ প্রভৃতি অতি জরুরী প্রয়োজনের একটি ধারা নিত্য সক্রিয় আছে। কিন্তু পাশাপাশি বস্তুজগতের নিরেট জড়পিণ্ডের মধ্যে রহিয়াছে অবকাশ। আকাশে, সমুদ্রে, বৃক্ষপত্রে কুসুমে বর্ণবিলাসের কী প্রচুর সমারোহ। ইহার অনেকখানিই তো প্রয়োজনের সহিত নিঃসম্পর্কিত। প্রকৃতির আনন্দময় স্বরূপ যেন এই অবাস্তব রঙের আয়োজন রসের সমারোহের মধ্য হইতে উঁকি দিতেছে। তেমনি মানবজীবনেরও দুটি দিক আছে। একদিকে সে প্রয়োজনের চাকায় বাঁধা। বাস্তব পৃথিবীর সহিত সেখানে চলে তাহার লাভ-লোকসানের হিসাব। কিন্তু লাভ-লোকসানের মধ্যেই মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় নাই। হিসাবনিকাশ ব্যবসা-বাণিজ্য জীবনযাত্রার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মানব-অস্তিত্বের এমন একটি দিক আছে, যাহা এই প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায় না। অপ্রয়োজনের আনন্দ, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের জন্য সে ব্যাকুলতা অনুভব করে। মানুষের শিল্পসাহিত্যের জন্ম এই ব্যাকুলতা হইতেই।

এই কারণে সমাজ ও সংসার-জীবনের বাস্তব বুদ্ধি, হিসাবনিকাশের সহিত মিলাইয়া শিল্পসাহিত্যের মূল্য বিচার করিতে গেলে ব্যর্থ হইতে হইবে। উহার আয়োজন যে আমাদের গভীরতর সত্তাকে আনন্দময় আত্মপুরুষকে উদ্বোধিত করিয়া মানবজীবনকে সার্থক করিয়া তোলায়, আমাদের সংসারাচ্ছন্ন মনটা তাহা বুঝিতে চায় না। আমরা হাতে-নাতে বাস্তব পাওনাটি মিটাইতে চাই। সাহিত্যশিল্পের মধ্যে তাই শিক্ষা নীতি ধর্মের উপদেশ খুঁজি, বাস্তব সংসারের লাভালাভের পুঁজি সংগ্রহ করিতে চাই।

লেখকের বক্তব্যটি জীবন এবং শিল্প সম্পর্কে একটি নূতন ভাষ্য উপস্থিত করিয়া উহার ভিতরের গভীর ও সূক্ষ্ম সম্বন্ধটির দিকে আলোকপাত করিয়াছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য লইয়া পণ্ডিতমহলে রহিয়াছে মতানৈক্য। যাঁহারা শিল্পকর্মকে সামাজিক উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ বলিতে চান, বিপরীত মতবাদীদের নিকট হইতে তাঁহারা জীবন-বিরোধিতাব অভিযোগে অভিযুক্ত হইতেছে। বর্তমান লেখক সাহিত্যশিল্পের প্রয়োজনাতীত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যমুখী লক্ষ্যের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন। তবে তাঁহার সাহিত্যজিজ্ঞাসা জীবনজিজ্ঞাসার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া এমন একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছে যাহাতে জীবনবিরোধিতাব অভিযোগটি খণ্ডিত হইয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তথা মানবজীবনের ভিতরে রহিয়াছে অপ্রয়োজনের বর্ণবহুল একটি দিক। সেখানেই বিশ্বজগতের সার্থকতা, সেখানেই মানবত্বের গৌরব। সাহিত্যশিল্প সেই দিকটির প্রকাশ বলিয়াই ঘনিষ্ঠভাবে জীবনসম্পৃক্ত।

আলোচ্য গদ্যাংশটির রচনারীতি কবিত্বপূর্ণ। চলিত ভাষার তীক্ষ্ণ দ্রুতগতির সহিত একটি ছন্দসংগীতকে সুন্দরভাবে মিলাইয়াছেন লেখক। উপমার প্রয়োগ এত সাবলীল যে তাহাদের বহিরাগত অলংকার বলিয়া মনেই হয় না। লেখকের ভাষায় শব্দচিত্র মনোহর রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে। উহাতে ভাবের রঙটিও চমৎকার ভাবে লাগিয়াছে।

॥ আট ॥

আজ অনুভব করছি, নূতন যুগের আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস যদি আলোচনা করি তা হলে দেখতে পাই যে, এক একটি নূতন নূতন যুগ এসেছে বৃহত্তের দিকে, মিলনের দিকে নিয়ে যাবার জন্য সমস্ত ভেদ দূর করবার দ্বার উদ্ঘাটন করে দিতে। সকল সভ্যতার আরম্ভেই সেই ঐক্যবুদ্ধি। মানুষ একলা থাকতে পারে না। তার সত্যই এই যে, সকলের যোগে সে বড়ো হয়। সকলের সঙ্গে মিলতে পারলেই তার সার্থকতা, এই হ'ল মানুষের ধর্ম। যেখানে এই সত্যকে মানুষ স্বীকার করে সেখানেই মানুষের সভ্যতা। ইতিহাসে যেখানে মানুষ একত্র হয়েছে অথচ মিলতে পারেনি, পরস্পরকে অবিশ্বাস করেছে, অবজ্ঞা করেছে, পরস্পরের স্বার্থকে মেলায়নি, সেখানে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে নি।

ফ. বি. বি. এ. (দ্বিতীয় পর্যায়)

উত্তর ঃ লেখক ভারতীয় ইতিহাসের কেন্দ্রীয় বাণীটি উদ্ধার করিয়াছেন এবং উহাকেই মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মানব-সভ্যতার সর্বাপেক্ষা বড় কথা হইল মিলনসাধন—ঐক্যবিধান। সমাজে ব্যক্তির সহিত শ্রেণীর মিলন না সাধিত হইলে কোনো সমাজই বলিষ্ঠ হইতে পারে না। বহিরাগত

জাতিকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা না থাকিলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা-দ্বেষই বড় হইয়া দেখা দেয়। উহার পরিণতি যে কত ভয়ানক হইতে পারে, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছে। অপরের সহিত বিরোধ বাধাইয়া রাখিয়া, অপরকে দলিত বঞ্চিত নির্জিত করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা ভবিষ্যতে সুফল প্রসব করে না। অপর দিকে ভারতের ইতিহাস, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিলনের নিদর্শন উপস্থিত করিতেছে। মিলনের মূল সূত্রই হইল অপরের বৈশিষ্ট্যটি হৃদয়ংগম করিয়া, তাহাকে মর্যাদা দিয়া, সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। ভারত তাহাই করিয়া আসিয়াছে। মানুষের নিকট ইহা অপেক্ষা বড় আদর্শ আর কিছুই হইতে পারে না।

লেখকের ঐতিহাসিক ভাবনার মধ্যে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে। ভারতের সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাসের মধ্য হইতে মূল সূত্রটি এইভাবে আবিষ্কার করা প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ইতিহাস-বিষয়ে কোনো-কোনো পণ্ডিত-মহল সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করেন। কেহ কেহ মানবসভ্যতার ইতিহাসকে শ্রেণীসংঘাতের কাহিনী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু স্বার্থের সংঘাতকে অবলম্বন করিয়া মানবজাতির গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বার্থ এবং বিরোধ বাড়িতে বাড়িতে ধ্বংসের রূপ ধরিয়া দেখা দিয়া থাকে। কাজেই মিলনের পন্থাই যে কল্যাণের, তাহাতে অবিশ্বাস করা চলে না।

লেখকের ভাবাভঙ্গি যেমন স্পষ্ট তেমনি তীক্ষ্ণ। কোথাও অনাবশ্যক উপমার ভারে উহা ভারাক্রান্ত নয়, শব্দচিত্র রচনার প্রবণতায় মননের স্বচ্ছতা আবৃত হয় নাই। ভাষার এই প্রসন্নতা ভাবনার সুষ্ঠু সুনির্দিষ্ট এবং অভ্রান্ত রূপেরই প্রতিফলন

UNSEEN : DRAMA

নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ

॥ এক ॥

[শারদোৎসব হইতে]

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী। বোসো, বোসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েচো। একটু বিশ্রাম করো।

রাজা। বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েচে—তাঁর সৈন্যদল আসচে!

সন্ন্যাসী। বলো কী! বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টিকতে দেয়নি। তিনি রাজ্যবিস্তার ক'রতে বেরিয়েচেন।

রাজা। কি সর্বনাশ! রাজ্যবিস্তার ক'রতে বেরিয়েচেন!

সন্ন্যাসী। বাবা, এতে দুঃখিত হলে চ'লবে কেন? তুমিও তো রাজ্যবিস্তার ক'রবার জন্যে বেরোবার উদ্যোগে ছিলে!

রাজা। না, সে হ'লো স্বতন্ত্র কথা। তাই ব'লে আমার এই রাজ্যটুকুতে—তা সে যাই হোক্, আমি তোমার শরণাগত। এই বিপদ হ'তে আমাকে বাঁচাতেই হবে। বোধ হয়, কোনো দুষ্টলোক তাঁর কাছে জানিয়েছে যে' আমি তাঁকে লঙ্ঘন ক'রতে ইচ্ছা ক'রেচি। তুমি তাঁকে ব'লো সে-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা। আমি কি এমনি উন্মত্ত? আমার রাজচক্রবর্তী হবার দরকার কী? আমার শক্তিই বা এমন কী আছে?

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা!

ঠাকুরদাদা। কী প্রভু?

সন্ন্যাসী। দেখ, আমি কৌপীন প'রে এবং গুটিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম আর ঐ চক্রবর্তী-সম্রাটটা তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই ক'রতে পারে। লোকটা কী রকম দুর্ভাগা দেখেচো!

রাজা। চুপ করো, চুপ করো, ঠাকুর, কে আবার কোন্ দিক থেকে শুনতে পাবে!

সন্ন্যাসী। ঐ বিজয়াদিত্যের 'পরে আমার—

রাজা। আরে চুপ, চুপ। তুমি সর্বনাশ ক'রবে দেখচি! তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক্, সে তুমি মনেই চেপে রেখে দাও।

সন্ন্যাসী। তোমার সঙ্গে পূর্বেও তো সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা হ'য়ে গেছে!

রাজা। কী মুস্কিলেই পড়লেম। সে-সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্ না।...

(বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ)

মন্ত্রী। জয় হোক্ মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য!

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

রাজা। আরে করেন কী, করেন কী! আমাকে পরিহাস ক'রচেন নাকি? আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী। মহারাজ, সময় তো অতীত হ'য়েচে, এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী। ঠাকুর্দা, পূর্বেই তো ব'লেছিলাম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েচি, কিন্তু গুরুমহাশয় পিছন পিছন তাড়া করেচেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু এ কি কাণ্ড! আমি তো স্বপ্ন দেখ্‌চিনে?
সন্ন্যাসী। স্বপ্ন তুমিই দেখ্‌চো কি এঁরাই দেখ্‌চেন তা নিশ্চয় করে কে ব'ল্‌বে?
ঠাকুরদাদা। তবে কি—
সন্ন্যাসী। হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য ব'লেই তো জানেন!

ক. বি. বি. এ. (অনার্স)

উত্তরঃ আলোচ্য নাট্যাংশে একটি ছদ্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনের ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে। এই জাতীয় প্রসঙ্গের সহায়তায় নাট্যমুহূর্ত জমাইয়া তোলা একটি পুরাতন প্রথারূপে প্রচলিত।

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। গ্রামের ঠাকুর্দা এবং ছেলের দল লইয়া শরৎকালের মুক্ত আকাশের নীচে উৎসবে নৃত্যগীতে জীবনের একটি স্বতন্ত্র মহলের সিংহদ্বার খুলিয়া ফেলিয়াছেন। সামন্ত সোমপালের সম্রাটের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আছে। নিরাপদ সন্ন্যাসীর নিকট তিনি সেই মনোক্ষোভ প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

আজ যখন সম্রাটের আগমন-সংবাদটি হঠাৎ পাওয়া গেল, সর্বাপেক্ষা বেশী চঞ্চল ও ভীত হইয়া পড়িলেন সামন্তরাজ সোমপাল। সন্ন্যাসীর নিকটেই তিনি সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। এই সন্ন্যাসীই যে স্বয়ং ছদ্মবেশী সম্রাট, সোমপাল তাহা জানেন না। এখানে রহিয়াছে নাটকীয় কৌতুক। পূর্বে সম্রাটের বিরুদ্ধে যে সব নিন্দাবাদ তিনি সন্ন্যাসীর নিকটে করিয়াছেন, নিজেই রাজচক্রবর্তী হইয়া বসিবার যে বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন, এখন তাহা চাপা দিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার শেষ নাই। পাছে তাঁহার সেই সব কথা কোনোক্রমে সম্রাটের কানে ওঠে, এই ভয়। সন্ন্যাসী-বেশী বিজয়াদিত্য সম্রাটের বিরুদ্ধে দুই চারিটি কটু মন্তব্য করিয়া সোমপালের ভয় আরও বাড়াইয়া দিতেছেন।

এমন সময়ে সম্রাটের অমাত্যগণ প্রবেশ করিল। সোমপালের বাস্তবভীতি এবং অপরাধবোধ, বিজয়াদিত্যের চাপা কৌতুকের সহিত সংঘাতে যে দ্বন্দ্বমূলক নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল, সম্রাট্‌-অমাত্যরা সেখানে প্রবেশ করিয়া সম্রাটের প্রতি অভিবাদন জ্ঞাপন করায় তাহা চরমে উঠিল এবং পরিবর্তন-মুহূর্তটির সৃষ্টি করিল। দৃশ্যটির মধ্যে ঐ অংশই সর্বাপেক্ষা চঞ্চল এবং নাট্যঘন মানস-উত্তেজনায় পূর্ণ। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই দৃশ্যে প্রকাশিত নাট্যদ্বন্দ্বের সুরটি মৃদু, উহা প্রবল এবং প্রচণ্ড হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। তাহার কারণ সংলাপের ভাষার মৃদুতা এবং চরিত্রকল্পনায় প্রবৃত্তির তাড়নার অভাব।

আলোচ্য অংশটুকুতে দুটি চরিত্রই মোটামুটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ছদ্মবেশী

সন্ন্যাসী এবং স্থানীয় রাজা সোমপাল। ঠাকুর্দার উল্লেখ থাকিলেও তাহার কোনো স্পষ্ট ছবি এখানে প্রকাশ পায় নাই। সন্ন্যাসীর চরিত্রে গাম্ভীর্য এবং কৌতুকের সুন্দর মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার সংলাপে জীবন সম্বন্ধে সুগভীর একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পাইয়াছে। কর্মের বন্ধন হইতে মানব মাঝে মাঝে মুক্তি পাইতে চায়—সৌন্দর্যের জগতে, আনন্দের জগতে, প্রকৃতির সহজ পরিবেশের মধ্যে। প্রতিনিয়ত কর্তব্যের নিষ্ঠুর চক্রাবর্তনে মানবত্বের সার্থকতা নাই। বিশুদ্ধ অপ্রয়োজনের আনন্দে সে আপনার হৃদয়কে মেলিয়া ধরিয়াই চরিতার্থতা লাভ করে। সম্রাটের শেষ কথাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাহার মুক্তহৃদয় সন্ন্যাসী-পরিচয়টা স্বপ্ন অথবা সম্রাট-পরিচয় স্বপ্ন সেকথা ঠিক করিয়া বলা সম্ভব নয়। বাস্তব পরিচয়ই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়। স্বল্পকালস্থায়ী সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সরলচিত্ত বালকদের এবং প্রকৃতির সাহচর্যে বিজয়াদিত্যের যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, মানবজীবনে তাহা একটা স্বপ্নমাত্র নয়—গভীর তাৎপর্যে পূর্ণ।

রাজার চরিত্রে স্বল্পশক্তি স্বার্থপরতা-ভীরু রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে।

॥ দুই ॥

[পরিত্রাণ নাটক হইতে]

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজজামাতা—

প্রতাপ। রামচন্দ্র রায়—

মন্ত্রী। হাঁ, তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করে গেছেন।

প্রতাপ। পরিত্যাগ করে গেছেন, প্রহরীরা গেল কোথায়?

মন্ত্রী। বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালিয়ে গেছে।

প্রতাপ। (মুষ্টিবদ্ধ করিয়া) পালিয়ে গেছে? পালাবে কোথায়? যেখানে থাকে, তাদের খুঁজে আনতে হবে। অন্তঃপুরের পাহারায় কে কে ছিল?

মন্ত্রী। সীতারাম আর ভাগবত।

প্রতাপ। ভাগবত ছিল? সে তো হুঁশিয়ার; সেও কি উদয়ের সঙ্গে যোগ দিল?

মন্ত্রী। সে হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপ। হাত-পা-বাঁধা আমি বিশ্বাস করিনে। হাত-পা ইচ্ছা করে বাঁধিয়েছে আচ্ছা সীতারামকে নিয়ে এস, সেই গর্দভের কাছ থেকে কথা বের করা শক্ত হবে না।

(মন্ত্রীর প্রস্থান ও সীতারামকে সহ পুনঃপ্রবেশ)

প্রতাপ। অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হল কি করে?

সীতারাম। (করজোড়ে) দোহাই মহারাজ, আমার কোন দোষ নাই।
প্রতাপ। সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করছে?
সীতারাম। আজ্ঞে না, মহারাজ, যুবরাজ! আমাকে বলপূর্বক বেঁধে—

(ব্যস্তভাবে বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

সীতারাম। যুবরাজকে নিষেধ করলুম, তিনি—
বসন্ত। হাঁ, হাঁ, সীতারাম কি বললি? অধর্ম করিস নে সীতারাম। উদয়াদিত্যের এতে কোন দোষ নেই।
প্রতাপ। তবে তোর দোষ।
সীতারাম। আজ্ঞে না।
প্রতাপ। তবে কার দোষ?
সীতারাম। আজ্ঞা যুবরাজ—
প্রতাপ। তার সঙ্গে আর কে ছিল
সীতারাম। আজ্ঞে বউরানী মা—
প্রতাপ। বউরানী? ওই সেই শ্রীপুরের—উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নেই।
বসন্ত। বাবা প্রতাপ, এতে উদয়ের কোন দোষ ছিল না।
প্রতাপ। দোষ ছিল না। দেখো, তুমি তার পক্ষ নিয়ে যদি কথা কও তাতে তার ভাল হবে না—এই আমি বলে দিলুম।

(বসন্ত রায়ের প্রস্থান)

ক. বি. বি. এ (অনার্স)'

উত্তরঃ আলোচ্য দৃশ্যাংশে মহারাজ প্রতাপের কঠিন প্রহরা হইতে জামাতা রামচন্দ্রের মুক্তি পাইয়া পলায়নের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াটি নাট্যরসসৃজনে অনেকখানি সফল হইয়াছে। প্রতাপ তাহার শক্তির এই অপমানে ক্রুদ্ধ। অপরে বুদ্ধিকৌশলে, রণশক্তিতে বা হৃদয়ধর্মে প্রতাপকে অতিক্রম করিয়া যাইবে, ইহা প্রতাপ ভাবিতেও পারে না। তাহার ব্যক্তিত্বের পক্ষে ইহা সর্বাপেক্ষা বড় অপমান। কারণ প্রতাপ মনে করে, শক্তির প্রতিষ্ঠায়ই তাহার গৌরব। রামচন্দ্র রায় তাহার প্রহরীদের চোখে ধুলা দিয়া পলাইয়া গিয়াছে, এই সংবাদ প্রতাপকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল।

প্রতাপ বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন লোক। এই পলায়ন-ঘটনার পিছনে যে উদয়াদিত্যের হাত আছে, মুহূর্তমধ্যে বুঝিয়া লইতে তাহার অসুবিধা হইল না। তাহার সেই ধারণা যে সত্য প্রহরীদের মুখ হইতে সুকৌশলে সে তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং সফলও হইয়াছে।

এই দৃশ্যাংশে কোনো উচ্চ স্তরের নাট্যকৌশল, ঘটনাগত অথবা চরিত্রগত কোনো গভীর দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিচরিত্র অঙ্কনে কোনো জটিলতা কিংবা অভিনবত্ব প্রকাশ পায় নাই। কামনা ও প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব, অপ্রত্যাশিতের উপস্থাপন, আকস্মিকতা সৃষ্টি, সূক্ষ্ম বৈপরীত্য প্রভৃতি কৌশলের সহায়তায় এই অংশে নাট্যসৌন্দর্য প্রকাশ পায় নাই।

প্রতাপ আপন শক্তির অহংকারে স্ফীত নৃপতি। কোথাও বাধা পাইতে সে প্রস্তুত নয়, তাহার সিদ্ধান্ত অথবা ভাবনার প্রতিকূলাচরণ কথায় অথবা কাজে যে ভাবেই হউক না কেন, সে সহ্য করিতে রাজী নয়। বসন্ত রায়ের চরিত্রে সম্ভবতঃ ন্যায়ধর্মের কিছু পরিচয় আছে, কিন্তু আলোচ্য অংশে উহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই।

প্রতাপের ক্রোধ এবং হুমকির নিকট ম্রিয়মাণ মহিষী [illegible] সহিত কথোপকথনে দ্বন্দ্ব জমিয়া ওঠে নাই। বসন্ত রায়ের সঙ্গে প্রতাপের চরিত্রগত ও জীবনাদর্শগত বৈপরীত্যের ফলে কিছুটা দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইবার সুযোগ ছিল। কিন্তু তাহাও ঘটে নাই।

নাট্যতাৎপর্য তথা চরিত্রকল্পনা উভয় দিক হইতেই আলোচ্য অংশটি একেবারে মামুলি ধরণের রচনা।

॥ তিন ॥

[বিসর্জন নাটক হইতে]

(জয়সিংহের আত্মহত্যার অব্যবহিত পরে রঘুপতি
প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া)

ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে।
(উঠিয়া) দেখো, দেখো, কী করে দাঁড়িয়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির। তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে।
পাষাণচরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি। হা হা হা হা।
কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া—
মা বলিয়া ডাকে যত জীব, হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দয় বিদ্রূপ।
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর! দে ফিরায়ে।
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী!

(নাড়া দিয়া)

শুনিতে কি
পাস? আছে কর্ণ? জানিস্ কি করেছিস্?
কার রক্ত করেছিস পান? কোন্ পুণ্য
জীবনের? কোন্ স্নেহদয়াপ্রীতিভরা
মহাহৃদয়ের? থাক্ তুই চিরকাল
এই মত—এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস!
দিব তোর পূজা প্রতিদিন, পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে। তোর পরিচয়, কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব—শুধু ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে।
কার কাছে কাঁদিতেছি!
তবে দূর দূর দূর দূর করে দাও
হৃদয়দলনী পাষাণীরে: লঘু হোক
জগতের বক্ষ।

(দূরে গোমতীর জলে প্রতিমা-নিক্ষপ)

ক. বি. বি. এ. (অনার্স)

উত্তর: রঘুপতির এই দীর্ঘ স্বগতোক্তি ঘটনাবিন্যাসের দিক হইতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অতি আধুনিক নাটকে এত দীর্ঘ স্বগতোক্তি নাট্যরসের পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচনায় পরিহার করা হইয়াছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সেক্সপীয়রীয় নাট্যাদর্শই এদেশে অনুসৃত হইত। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকটি পুরাতন আদর্শের। দীর্ঘ স্বগত-সংলাপের ব্যবহার এই জাতীয় আধা-ঐতিহাসিক আধা-কাল্পনিক রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতে অসংগতও নয়। কিন্তু ইহার প্রকৃত সার্থকতা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে বক্তার কোনো গূঢ় ভাবনা এই স্বগতোক্তির মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে কিনা। যে-কথা প্রকাশ্যে অপরের কাছে বলা যায় না, যে-ভাবনা অপরের নিকট হইতে গোপন করিতে হয় অথবা যে-ভাবাবেগ শুধুই হৃদয়গত তাহার জন্যই মাত্র স্বগতোক্তির ব্যবহার করা সংগত। ইহার মধ্যে আবার শেষোক্ত কারণে স্বগত সংলাপের ব্যবহার বহু ক্ষেত্রে নাটকীয়তার পক্ষে হানিকারক এবং গীতিধর্মের

অনুপ্রবেশ বলিয়া সমালোচিত হয়। অনুরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ হৃদয়ের নিগূঢ় উপলব্ধিকে প্রকাশ করিতে হইলে নাট্যকারকে খুবই সচেতনভাবে গীতিরসপ্রবাহকে সংযত করিতে হয়। অন্যথায় নাট্যরস তরল হইয়া পড়ে।

আলোচ্য অংশটিতে নাট্যধর্ম ব্যাহত হইয়াছে এইরূপ অভিযোগ করা চলে। এই অংশে গীতিকাব্যোচিত ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস প্রবলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। জয়সিংহের আত্মহত্যা রঘুপতির ধর্মসংস্কারের বন্ধন চূর্ণ করিয়াছে। এতকাল যে বিশুদ্ধ বাৎসল্যকে একটা গৌণ মানসব্যাপার বলিয়া সে মনে করিয়াছে, ধর্মভাবনার এবং ধর্মের নাম করিয়া আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার নিকট যাহাকে তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে আজ জয়সিংহের রক্তস্রোতে তাহা তলাইয়া গেল।

রঘুপতির উত্তেজিত বাক্যস্রোতের মধ্যেও কিন্তু গীতিরসই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, প্রবৃত্তির সংঘাতজাত নাট্যরস প্রকাশ পায় নাই। নাট্যসংগঠনের দিক হইতে আলোচ্য অংশটি গীতিরসের আধিক্যে এবং অকারণ দৈর্ঘ্যে ভারাক্রান্ত। রঘুপতির মোহভঙ্গের মুহূর্তরূপে এই সংলাপাংশটিকে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। কিন্তু রঘুপতির অন্তরের প্রকৃত পরিবর্তনের মুহূর্তটি জয়সিংহের মৃত্যুক্ষণে পূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছে। দেবী-মূর্তি মৃত জয়সিংহকে ফিরাইয়া দিবে, ইহা রঘুপতি কখনও বিশ্বাস করে নাই। দেবীর নিকট তাঁহার জয়সিংহের জীবনপ্রার্থনা হৃদয়ের গভীর বেদনার প্রকাশরূপেই তাৎপর্যপূর্ণ। দেবী জয়সিংহের জীবন ফিরাইয়া না দেওয়ায় রঘুপতির বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হইল এরূপ মনে করার কারণ নাই।

রঘুপতি শুধুমাত্র হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলে তাহা একান্তভাবে গীতিধর্মী হইয়া উঠিত, নাট্যরসের পক্ষে খুব বড় ধরনের বাধা হইয়া দাঁড়াইত। রঘুপতির মন্দিরে আসিয়া দেবীমূর্তির নিকট প্রার্থনা বিফল হওয়ায় প্রতিমা-বিসর্জন প্রভৃতি ঘটনার সহিত যুক্ত করিয়া ভাবাবেগকে নাটকীয় রূপের মধ্যে সংহত করিয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এরূপ চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। রঘুপতির দেবীর নিকট প্রার্থনার পশ্চাতে কোনোরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল না বলিয়া উহা একটি কৃত্রিম ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে। ফলে দেবীমূর্তির বিসর্জন ব্যাপারটিও নেহাৎই একটি মেলোড্রামাটিক ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে, রঘুপতির চরিত্র ও ভাবাবেগের দিক হইতে উহা অপরিহার্য নয়, কারণ রঘুপতি তাঁহার প্রার্থনার সাফল্যের আশা করেন নাই, আশাভঙ্গের তীব্র প্রতিক্রিয়ারও তাই প্রশ্ন ওঠে না।

॥ চার ॥

[সাজাহান নাটক হইতে]

সাজাহান। তাই ত এ বড় দুঃসংবাদ দারা।

দারা। সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ ক'রেছে বটে, কিন্তু সে এখনও সম্রাট নাম নেয় নি। কিন্তু মোরাদ গুর্জরে সম্রাট্ নাম নিয়ে ব'সেছে, আর দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সাজাহান। ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—দেখি, ভেবে দেখি—এ রকম কখনো ভাবিনি। অভ্যস্ত নই। তাই ঠিক ধারণা করতে পার্চ্ছি না—তাই ত (ধূমপান)।

দারা। আমি কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না।

সাজাহান। আমিও পার্চ্ছি না। (ধূমপান)

দারা। আমি এলাহাবাদে আমার পুত্র সোলেমানকে সুজার বিরুদ্ধে যাত্রা করবার জন্য লিখছি, আর তার সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ, আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁকে পাঠাচ্ছি।

(সাজাহান আনত চক্ষে ধূমপান করিতে লাগিলেন।)

দারা। আর মোরাদের বিরুদ্ধে আমি মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান। পাঠাচ্ছ! তাই ত! (ধূমপান)

দারা। পিতা, আপনি চিন্তিত হবেন না। এ বিদ্রোহ দমন করতে আমি জানি।

সাজাহান। না, আমি তার জন্য ভাবছি না দারা, তবে এই—ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—তাই ভাবছি। (ধূমপান—পরে সহসা) না—দারা কাজ নেই। আমি তাদের বুঝিয়ে বলবো। কাজ নেই। তা'দের নির্বিরোধে আসতে দাও।

(বেগে জাহানারার প্রবেশ)

জাহানারা। কখনও না। এ হ'তে পারে না পিতা। প্রজা রাজার উপর খড়্গ তুলেছে; সে খড়্গ তার নিজের স্কন্ধে পড়ুক।

সাজাহান। সে কি জাহানারা! তারা আমার পুত্র!

জাহানারা। হোক পুত্র! কি যায় আসে? পুত্র কি কেবল পিতার স্নেহের অধিকারী? পুত্রকে পিতার শাসনও কর্তে হবে।

সাজাহান। আমার হৃদয় কেবল এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন। বেচারা মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন কর্বো কোন্ প্রাণে জাহানারা? ঐ চেয়ে দেখ—ঐ স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘনিশ্বাস—ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ—তারপর বলিস্ তাদের শাসন কর্তে।

ক. বি. বি. এ. (অনার্স)

উত্তর ঃ উদ্ধৃত নাট্যাংশের আরম্ভটি খুবই চাঞ্চল্যকর। কোনোরূপ অন্তরান্তর ভূমিকা না করিয়াই নাট্যকার সোজাসুজি ঘটনা এবং উহার প্রতিক্রিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন।

আলোচ্য অংশে সাজাহানের পুত্রদের সিংহাসনলাভের জন্য বিদ্রোহের ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে। নাট্যকার খুবই কৌশলে সংবাদকে নিস্তরঙ্গ বিবৃতির স্তর হইতে নাট্যচঞ্চল ঘটমানতায় গতিবেগ দিয়াছেন। দারা বিদ্রোহের সংবাদ দান করিয়াছে সম্রাটের নিকট। কিন্তু সংবাদটির প্রতিটি স্তরে সাজাহানের যে বেদনার্ত প্রতিক্রিয়া, যে বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা উহাকে শুষ্ক সংবাদমাত্র করিয়া রাখে নাই, হৃদয়বৃত্তির চাঞ্চল্যের সহযোগে নাট্যরসে আবৃত করিয়া তুলিয়াছে।

সাজাহানের অন্তরলোকের যে-চিত্র আলোচ্য দৃশ্যাংশে প্রকাশ পাইয়াছে উহার গুরুত্বই সর্বাধিক। সাজাহান সংবাদটি পাইয়া বিমূঢ় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অর্ধস্ফুট বাক্যে অনুচ্চারিত কথায় ও নীরব ধূমপানে উহা সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকাশের এই ভঙ্গিটি আপাতদৃষ্টিতে যতটা শান্ত মনে হয়, কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আদৌ তাহা মনে হইবে না। অন্তরের অভ্যন্তরে বিশেষ বিক্ষোভই সহজ সংযত ভাবে প্রকাশ করিয়া আবেদনটি নাট্যঘন করিয়া তুলিয়াছে।

দারা এবং সাজাহানের মনোগতির পার্থক্যটি একটি সূক্ষ্ম বৈপরীত্যের সৃষ্টি করিয়াছে এখানে। দারাও চিন্তিত। কিন্তু সাম্রাজ্যরক্ষা, ভ্রাতাদের বিদ্রোহদমনের সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া দারার ভাবনা। সাজাহানের চিন্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতীয়। সিংহাসনের অধিকার লইয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থের সমস্যা লইয়া, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিরোধ তাঁহার ভালোবাসা ও বাৎসল্যে আঘাত হানিয়াছে। উভয়ের ভাবনাধারার এই বিপরীত-মুখী গতি নাট্যাংশের প্রথম দিকে প্রায় বিনা আয়োজনে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস আছে এই দৃশ্যাংশে। তবে উহা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। সাজাহান অন্তরের গভীরে বাৎসল্যরসে পূর্ণ। তাঁহার এই বাৎসল্যের সহিত প্রণয়স্মৃতি বিজড়িত হইয়া উহাকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে, উহা যেন তাঁহার গোটা অস্তিত্বের সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। পুত্রদের বিদ্রোহে সাজাহানের হৃদয়ধর্ম আঘাত পাইয়াছে। কিন্তু এখনও তাঁহার বিশ্বাস আছে পুত্রগণকে বুঝাইয়া এই সংঘাত হইতে নিবৃত্ত করা যাইবে। কাজেই এখনও তাঁহার অন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্ব তত তীব্র হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে না। তিনি দুশ্চিন্তাকে, বিদ্রোহী পুত্রদের প্রতি বিরূপতাকে স্নেহধারার মধ্যে সমুন্নীত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন। প্রসঙ্গতঃ সাজাহানের সংলাপের কবিত্বের প্রতিও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

সাজাহানের চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যটি এখানে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে ভাষার এই কা... কিছুমাত্র অসংগত হয় নাই।

সাজাহানের ভাবনাধারার সহিত দারার ভাবধারার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দেখানো হয় নাই। দারা যেন নীরবেই পিতার বক্তব্য মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু জাহানারার উত্তেজিত প্রবেশ এবং সাজাহানের অতিকোমল বাৎসল্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সম্রাটোচিত কর্তব্যবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা দ্বন্দ্বঘন রীতিতে প্রকাশ পাইয়াছে। জাহানারার প্রবেশ এবং বক্তব্য আলোচ্য অংশের নাটকীয়তাকে অনেক তীব্র করিয়া তুলিয়াছে।

॥ পাঁচ ॥

[চন্দ্রগুপ্ত নাটক হইতে]

মুরা। নন্দ তোমার ভাই। কিন্তু আমার কে?

চন্দ্রগুপ্ত। নন্দ তোমার পুত্র মা! গর্ভে ধারণ না করলে কি পুত্র হয় না? নন্দ-মাতার মৃত্যুর পর তার মাতৃস্বরূপিনী হয়ে তুমি তাকে মানুষ করনি? স্তন্যপান করাও নি? বুকে ক'রে ঘুম পাড়াও নি?

মুরা। সেই জন্যেইতো ক্ষমা করতে পারি না। সেই সব কথা নন্দ ভুলে যেতে পারে, আমি পারি না।···তোমার কাছে মাতার অপমান কি কিছুই নয়! মা তোমার কেউ নয়'

চাণক্য। এক মাতৃগর্ভে জন্ম বলেই ভাইয়ের সম্বন্ধ, না? মায়ের চেয়ে ভাই বড়? জগতে প্রথম হ'ল যে, সন্তান মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেয় না! (মুরাকে) কাঁদো অভাগিনী নারী! এই তোমার পুত্র! মা চেনে না—জানে না ... যত পবিত্র জিনিষ আছে, মায়ের কাছে কেউ নয়।

চন্দ্রগুপ্ত। তা জানি গুরুদেব।

চাণক্য। না, জানো না! নহিলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা করে? মা—যার সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে—এক প্রাণ, এক মন, এক নিশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল, তারপর পৃথক হয়ে এল। ···মা—যে তার রক্ত নিংড়ে নিভৃতে বক্ষের কটাহে চড়িয়ে স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরী ক'রে তোমায় পান করিয়েছিল। যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, ... ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশিসচুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল; মা—রোগে, শোকে, দৈন্যে উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে; যার স্বচ্ছ স্নেহ-

মন্দাকিনী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে যাচ্ছে ; মা—যার অপার শুভ্র করুণা মানবজীবনে প্রভাত-সূর্যের মত কিরণ দেয়—বিতরণে কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিদান চায় না ; উন্মুক্ত, উদার, কম্পিত আগ্রহে তাহাতে আপনাকে বিলাতে চায় ;—এ সেই মা !

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব, রক্ষা করুন, আমায় ভ্রাতৃবধে উত্তেজিত করবেন না।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত, এতদিনে বুঝলাম যে, আমি তোমার কেউ নই। নন্দ ক্ষত্রিয়, তুমি ক্ষত্রিয়-কুমার। নন্দ তোমার ভাই। আমি শূদ্রাণী। আমি তোমায় গর্ভে ধারণ করেছিলাম মাত্র। আমি কে ? আমি তো তোমার মা নই।

চন্দ্রগুপ্ত। পুত্রের উপর তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পার মা. তুমি আমার মা নও ! তুমি আমার মা নও ! তুমি শুদ্ধ আমার মা নও—তুমি আমার ধর্ম, তুমি আমার সাধনা, তুমি আমার ঈশ্বরী। তোমার আজ্ঞা আমার কাছে দৈববাণী।

মুরা। তাই যদি সত্য হয়, তবে যুদ্ধে অগ্রসর হও।—কি ! তথাপি নীরব ! চন্দ্রগুপ্ত, (ভগ্নস্বরে) আমি তোমার মা, তোমার অপমানিত প্রপীড়িত মা। এই আমার আজ্ঞা—এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি।

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আর দ্বিধা নাই। তোমার আজ্ঞাই এই প্রশ্নসংকুল জটিল জগতে আমায় পথ দেখিয়ে দিয়ে যাক। আমি যেন তোমাকেই আমার জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে পার্শ্বে ভ্রূক্ষেপ না করে সংসার-সমুদ্রে তীরে বেয়ে চলে যাই।—মা আশীর্বাদ করুন এই মুহূর্তে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।

মুরা। এই তো আমার পুত্র।

চাণক্য। এই তো আমার শিষ্য।

[চন্দ্রগুপ্তের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ চন্দ্রগুপ্তজননী মুরাকে অপমান করিয়াছিল। তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জননী মুরা ও গুরু চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে নন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে উত্তেজিত করিতেছেন।]

ক. বি. বি. এ. (অনার্স)

উত্তর ঃ আলোচ্য নাট্যাংশটিতে একটি ভাবদ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত আত্মিক প্রীতিবশে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে চাহিতেছেন না। মুরা এবং চাণক্য প্রীতির ছদ্মবেশে প্রকাশিত তাঁহার এই জড়ত্ব দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। চন্দ্রগুপ্ত ভ্রাতৃপ্রীতির নাম করিয়া যে ভাবাবেগমূলক বক্তব্য উপস্থিত

করিতেছেন, মুরা এবং চাণক্য উভয়ে তাহার বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতেছেন ভাবাবেগমূলক উপায়ে। ইহার ফলে আলোচ্য দৃশ্যাংশে নাট্যদ্বন্দ্ব দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে দেখা যায়।

কিন্তু নাট্যকার ইহার মধ্যে আরও কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। মুরা এবং চাণক্য উভয়েই চন্দ্রগুপ্তকে নন্দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। উভয়েই সম্প্রতি ভাবাবেগমূলক আবেদনের পথ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের চরিত্রের পার্থক্য সূক্ষ্মভাবে এখানে অল্প অবকাশে ধরা পড়িয়াছে। চাণক্য ভাবাবেগমূলক পন্থায় চন্দ্রগুপ্তকে উত্তেজিত করা সম্ভব ও সহজ বলিয়া সেই পথ ধরিয়াছেন। তাঁহার নিকট উহা একটি কৌশলমাত্র। কিন্তু মুরার বক্তব্যে নন্দের প্রতি তাহার সহজ ঘৃণা এবং পুত্র তাহার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে পরাঙ্মুখ দেখিয়া তীব্র অভিমান আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এক উদ্দেশ্য প্রযুক্ত দুজনের কথা ও আচরণের মধ্যে সূক্ষ্ম বৈপরীত্যের সৃষ্টি করিয়া নাট্যকার নাট্যচমৎকৃতি সম্পাদন করিয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। নন্দকে পরাভূত করিয়া রাজ্যলাভ তাঁহার নিকট তুচ্ছ মনে হইতেছে ভ্রাতৃপ্রীতির কথা স্মরণ করিয়া। এমন কি, সুকুমার হৃদয়বৃত্তির প্রভাবে তিনি মাতার অপমানের কথাও ভুলিয়া যাইতে প্রস্তুত। কিন্তু মাতার প্রতি তাঁহার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাও অত্যন্ত প্রবল। শেষ পর্যন্ত সেই ভাবাবেগই জয়ী হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মানসভাবের তথা সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সু-অঙ্কিত। তবে তাঁহার সংলাপের ভাষায় অতিরিক্ত কাব্যোচিত উচ্ছ্বাস থাকায় নাট্যসৌকর্যের পক্ষে হানিকর হইয়াছে।

চাণক্যের চরিত্রে জটিলতা আছে। অল্প অবকাশেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। মাতৃভক্তি সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘ উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা অকারণ গীতিধর্মের প্রকাশ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আসলে সেখানে চাণক্যের কূটবুদ্ধিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। চাণক্যের আবেগপূর্ণ ভাষণ চন্দ্রগুপ্তের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত। এই ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসের পিছনে চাণক্যের কুশের ন্যায় শাণিত হৃদয়োদ্বেলতাশূন্য রাজনৈতিক বুদ্ধি উঁকি দিতেছে।

[ছয়]

[বিসর্জন নাটক হইতে]

(অর্পণার প্রবেশ)

রঘুপতি— দূর হ ! দূর হ ! মায়াবিনী, !
জয়সিংহে চাস তুই ? আরে সর্বনাশী
মহাপাতকিনী ! (অর্পণার প্রস্থান)

এ কী অকাল-ব্যাঘাত!
জয়সিংহ যদি নাহি আসে? কভু নহে!
জয় মা জাগ্রত দেবী! জয় সর্বজয়ী।
ভক্তবৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ সংসারে, শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে। মাতৃ-অহংকার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
কেহ ডাকিবে না তোরে। ওই পদধ্বনি
জয়সিংহ বটে! জয় নৃমুণ্ডমালিনী!
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি!

(জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ)

জয়সিংহ

রাজরক্ত কই?
আছে আছে! ছাড়ো মোরে।
নিজে আমি করি নিবেদন।—রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষ্ণা? আমি রাজপুত, পূর্বপিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা! (বক্ষে ছুরিকাঘাত)

রঘুপতি— জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দয়! নিষ্ঠুর
এ কী সর্বনাশ করিলি রে? জয়সিংহ
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী। জয়সিংহ, কুলিশ-কঠিন!
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা ধন।
জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর

কিছু নাহি চাহি ; অহংকার অভিমান
দূর হোক, ব্রাহ্মণ সব যাক ! তুই আয় !
[অর্পণার প্রবেশ]

অর্পণা— পাগল করিবে মোরে ! জয়সিংহ, কোথা
জয়সিংহ !

রঘুপতি— আয় মা অমৃতময়ি । ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক্ ব্যাগ্রস্বরে, ডাক্
প্রাণপণে ! ডাক্ জয়সিংহে ! তুই তারে
নিয়ে যা মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি ।

[অর্পণার মূর্ছা]

[প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া]
ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে ।

ক. বি. বি. এ. (অনার্স) '৬০

উত্তর : আলোচ্য নাট্যাংশটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও নানাবিধ ভাবানুভূতির তরঙ্গোৎক্ষেপে বৈচিত্র্যময় । ঘটনার উপস্থাপনা, ভাবচেতনা সব-কিছুর মধ্যেই নাট্যরস ঘনীভূত হইয়া আছে ।

রঘুপতি ব্যগ্রভাবে জয়সিংহের জন্য অপেক্ষা করিতেছে । জয়সিংহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ —আজ রাত্রেই রাজরক্ত আনিয়া দেবীর চরণে অর্ঘ্য দান করিবে । দেশের রাজার সহিত রঘুপতির ক্ষমতার দ্বন্দ্ব । সেই দ্বন্দ্বে সে কিছুতেই হার মানিতে রাজী নয় । প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে পশ্চাদপসরণ করিতে হইলেও গোপনে সে রাজার বিনাশ সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছে । শিষ্য জয়সিংহকে বুঝাইয়াছে, রাজার রক্ত না পাইলে ক্রুদ্ধ দেবী কালিকা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেন না । রঘুপতির তাই ভাবনার শেষ নাই । কখনও আশা, কখনও আশঙ্কা, কখনও ভয় তাহার মনোপটে বিচিত্র বর্ণসম্পাতের সৃষ্টি করিয়াছে । কালীপ্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার উক্তির মধ্যে এই হৃদয়চাঞ্চল্য ধরা পড়িয়াছে ।

তাহার মানসিক উত্তেজনার এইরূপ পরিস্থিতিতে অর্পণার আগমনকে রঘুপতি কুলক্ষণ বলিয়া মনে করিয়াছে । অর্পণা তাহার প্রভাব হইতে জয়সিংহকে যেন ছিনাইয়া লইতে চায় এই ভয় তাহার আছে । তাহা ছাড়া মানুষের হৃদয়দৌর্বল্যকে কঠোরহৃদয় রঘুপতি পরিহার্য ব্যাপার বলিয়া মনে করে । তাই অর্পণার সহিত যেন তাহার চিরবিরোধিতা । অর্পণাকে ভৎসনা করিয়া সে তাড়াইয়া দিয়াছে ।

রঘুপতি যখন জয়সিংহের জন্য, রাজরক্তের উপচারে দেবী পূজা করিয়া আপনার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যগ্র তখন প্রবেশ করিল জয়সিংহ। জয়সিংহের এই আবির্ভাব খুবই নাটকীয় তাৎপর্যপূর্ণ। রঘুপতির উত্তেজনা বাড়িয়া গেল। দীর্ঘস্থায়ী প্রত্যাশার এইবার অবসান ঘটিবে। কিন্তু এইখানে আসিল চরম আঘাত। শুধুমাত্র তাহার আশা চিরতরে বিপর্যস্তই হইল না, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং অত্যন্ত প্রবল একটি আঘাতে সে একেবারে বিমূঢ় ও বেদনার্ত হইয়া পড়িল। কিছু পূর্বেই যে রাজরক্ত না পাইলে আপনার প্রতিপত্তি চূর্ণ হইবে ভাবিয়া সে আতঙ্কগ্রস্ত হইতেছিল, এখন সে-পরাভয় রঘুপতির নিকট অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থান হইতে বজ্রাঘাত নামিয়া আসিল তাহার মস্তকে।

জয়সিংহের মৃত্যু রঘুপতিকে তত্ত্বগতভাবে সম্পন্ন করিল কিন্তু সেই আঘাতের মধ্য দিয়া নূতন জীবনসত্যে জাগিয়া উঠিল। এতকাল স্নেহমমতাকে সে মূল্যহীন মনে করিয়া ব্রাহ্মণত্বের মিথ্যা অহংকারে স্ফীত হইয়াছিল। আজ হৃদয়ব্যাকুলতার একমাত্র অবলম্বন জয়সিংহকে হারাইয়া সে বুঝিতে পারিল কত বড় মিথ্যার স্তূপকে এতদিন মূল্য দিয়া আসিয়াছে। কয়েকটি মাত্র চরণে হৃদয়পরিবর্তনটি সুষ্ঠু নাট্যরীতিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন লেখক। এই নবজাগ্রত জীবনবোধের ফলেই রঘুপতি অপর্ণার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতে পারিল।

রঘুপতির প্রাধান্য আলোচ্য নাট্যাংশে প্রায় সর্বব্যাপী। তবে অল্প অবকাশে আত্মঘাতী জয়সিংহের ব্যক্তিত্ব—তাহার সাহস এবং কল্যাণব্রতে জীবন-উৎসর্গের মাহাত্ম্য সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে।